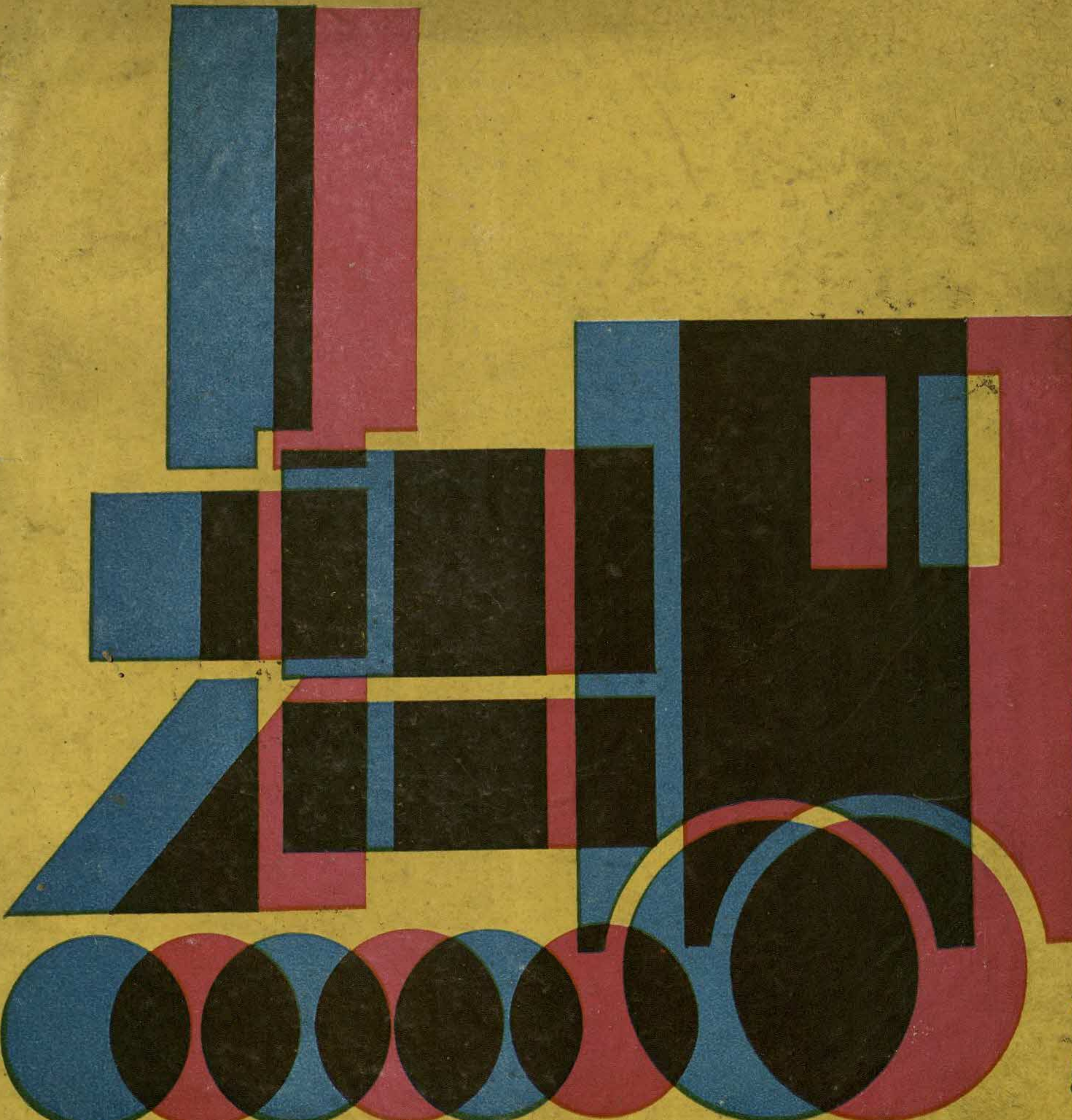
সচিত্র বিজ্ঞান কোষ

প্রথম খণ্ড



জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ

সচিত্র বিজ্ঞান কোষ

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক

যুগল শ্রীমল

জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ
কলিকাতা-১৯

সচিত্র বিজ্ঞান কোষ

প্রথম খণ্ড

পরিবহন

চাকার আবিষ্কার গাড়ী রাস্তা সাইকেল
রেলগাড়ী সুড়ঙ্গপথ সেতু মোটর গাড়ী
মোটর সাইকেল জাহাজ খাল লাইটহাউস
বন্দর সাবমেরিন আণবিক শক্তিচালিত জাহাজ
আণবিক সাবমেরিন ব্যাথিস্কেফ হাইড্রোফয়ল
এরোপ্লেন হেলিকপ্টার বিমানবন্দর র‍্যাডার
রকেট মহাকাশ অভিযান চন্দ্রে অভিযান
গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে

জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক
প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

চিত্রে মহাভারত ...	১৬.০০
মহাভারতের মহাজাগরণ	১০.০০

সচিত্র বিজ্ঞান কোষ সিরিজ

মূল্য—প্রতি কপি ১.২৫

মহাকাশে রকেট
এরোপ্লেন
টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ
মহাকাশ-অভিযান
ইস্পাতের নবযুগ
বিদ্যুৎশক্তি
কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের কথা
আলোর সাথে পরিচয়
মোটর গাড়ী
বেতার
খনিজ পদার্থ ও ধাতুর কাহিনী
আগুন ও উত্তাপ
রেলগাড়ী
কাগজ ও মুদ্রণ
শব্দ ও শব্দগ্রহণ
মানুষের উপকারে কাচ ও রবার
পরমাশ্চর্য পরমাণু
যন্ত্রের কাজ ও শক্তি
জাহাজ ও সাবমেরিন
টেলিভিসন ও র‍্যাডার
শক্তিময়ী প্রকৃতি

সম্পাদক

যুগল শ্রীমল

সহযোগী সম্পাদক

মাখন চক্রবর্তী

সহকারী সম্পাদক

সুকুমার বিশ্বাস

অমর রায়

চিত্রাঙ্কনে

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

বারীন নাগ

রবীন চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক
ধীরেন্দ্র চন্দ্র সিন্‌হা
মুখ্য সম্পাদক, জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ
১৬/৩, গড়িয়াহাট রোড
কলিকাতা-১৯

রূপায়ণে
প্রোগ্রেসিভ পাবলিসিটি সার্ভিস

মুদ্রাকর
ভিসুয়েল প্রিন্টার্স
১৬/৩, গড়িয়াহাট রোড
কলিকাতা-১৯

প্রথম সংস্করণ
৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭

মূল্য : ১২.০০

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে সরকারের অর্থানুকূল্যে এই বই এত স্বল্প মূল্যে দেওয়া সম্ভব হল।

দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'সচিত্র বিজ্ঞান কোষ' নামে একটি এনসাইক্লোপেডিয়া প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ। 'পরিবহন' তার প্রথম খণ্ড। প্রতি খণ্ডে বিজ্ঞানের এক একটি বিষয় নিয়ে বাংলা ভাষায় এনসাইক্লোপেডিয়া সংকলনের এ ধরনের প্রয়াস এর আগে কখনও আমার চোখে পড়েনি এবং অন্য কোন ভারতীয় ভাষায়ও এমন প্রচেষ্টার খবর আমি এখনও জানি না।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার অবাধ সুযোগ থাকা যে একান্ত প্রয়োজন এবং মাতৃভাষার সাহায্যে যে-কোন বিষয়ের রস ও মর্ম গ্রহণ করার মধ্যে মাতৃস্তন্য পানের যে-স্বাভাবিক পুষ্টি ও তৃপ্তি রয়েছে, যা আর কোন ভাষার ফিডিং বটলের মধ্যে দিয়ে আমরা কিছুতেই পেতে পারি না—একথা আমরা অনেকদিন থেকেই জোর গলায় বলে আসছি। কিন্তু যে-কারণেই হোক আমাদের বলার মধ্যে যত জোর, চলার মধ্যে তত জোর নেই। কাজেই এ নিয়ে ভূরি পরিমাণ তর্কবিতর্ক যা হয়েছে, তার তিল পরিমাণ কাজও হয়নি। জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদের প্রচেষ্টা আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে এই কারণে যে, এঁরা এঁদের মতবিশ্বাসকে তর্কাতর্কির তাকে তুলে না রেখে, সোজা চৌরাস্তায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, অর্থাৎ কাজে হাত লাগিয়েছেন। তাই এঁরা যা বলতে চান সেটা অনুমানসাপেক্ষ নয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে আমাদের সামনে এসেছে। ফলে এই প্রচেষ্টাটি নিজেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর একটি সুন্দর নিদর্শন হয়ে গেছে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের পরিচয় ঘটানোর উদ্দেশ্য এই নয় যে, বড় হয়ে সবাই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-চর্চায় আত্মনিয়োগ করবে; উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এর ফলে অধিকাংশেরই একটি বিজ্ঞান-চেতনা গ'ড়ে উঠবে, যাতে দেশের যে-কোন সমস্যার বিচারে তারা গোঁড়ামি এবং কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে যুক্তিনিষ্ঠ মন নিয়ে তার বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং সেই পরিচ্ছন্ন বোধের ওপরই স্বদেশ-কল্যাণের প্রকৃত ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

গত দুই শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যে আশ্চর্য উন্নতি ঘটেছে তা রূপকথার কল্পনাকেও হার মানায়। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে আমরা আজ এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার মুখোমুখি হয়েছি। বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রায় আমাদের জনসাধারণেরও যোগ দেওয়া চাই, নইলে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যে বেদনাদায়ক বিচ্ছিন্নতা ঘটবে তাই নয়, বিশ্বব্যাপী মানবমঙ্গলে আমাদেরও যে-কর্তব্য রয়েছে তা থেকে আমরা ভ্রষ্ট হব।

পরিশেষে, পরিভাষা সম্পর্কে দুয়েকটি কথা না বলে পারছি না। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার কাজকে বিলম্বিত করার জন্যে যত রকম দোহাই দেওয়া হয়ে থাকে, এটি তার মধ্যে মোক্ষম। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার প্রধান অন্তরায় নাকি উপযুক্ত পরিভাষার অভাব, এবং আগে সম্পূর্ণ পরিভাষা তৈরী না করে একে হাত দেওয়া নিতান্তই অবিবেচনার কাজ। অর্থাৎ এঁরা যেন বলতে চান সমগ্র দেশকে যতক্ষণ বৈদ্যুতিক আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দেবার আয়োজন সম্পূর্ণ না হচ্ছে, ততদিন অন্ধকারের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান বন্ধ থাকবে। পথ চলতে যে-প্রদীপ বা হ্যারিকেন আমাদের হাতে রয়েছে তা আমরা ব্যবহার করব না। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা এঁদের সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কোন দেশেই পরিভাষার তালিকা সম্পূর্ণ হবার জন্যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার কাজ অপেক্ষা করে থাকেনি বরং এই চর্চার ক্রমবিকাশের পথেই প্রয়োজনীয় পরিভাষা পাশাপাশি গ'ড়ে উঠেছে।

জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ অবশ্য এই এনসাইক্লোপেডিয়া সংকলনের কাজে পরিভাষার বিতর্কিত পথটি সযত্নে পরিহার করেছেন। তাঁরা ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দের ধ্বনি ও রূপ অক্ষুণ্ণ রেখেই বাংলা ভাষায় গ্রহণ করেছেন। কেননা তাঁদের এই সংকলন বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চার জন্যে ততটা নয়, যতটা আমাদের ছেলেমেয়েদের এবং জনসাধারণের বিজ্ঞান-চেতনার উন্মেষ ঘটানোর উদ্দেশ্যে। কাজেই সাধারণ পাঠকের পরিপাকযন্ত্রকে পরিভাষার গুরুপাক বস্তু থেকে অব্যাহতি দিয়ে পরিষদ সকলেরই প্রশংসাভাজন হয়েছেন ব'লে আমি মনে করি।

ত্রিগুণা সেন
কেন্দ্রীয়শিক্ষা মন্ত্রী

জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ বাংলা ভাষায় শিক্ষামূলক নানা গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনায় রত আছেন। এঁদের কয়েকটি পুস্তিকা ও গ্রন্থ দেখে আমার মনে হয়েছে যে, এরকম প্রয়াস সার্থক। সম্প্রতি এঁরা যানবাহন সম্পর্কে যে গ্রন্থটি প্রস্তুত করেছেন সেটি বিশেষ করে যুগোপযোগী ও প্রয়োজনীয়।

প্রয়োগ-বিদ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন শব্দের বাংলা ব্যবহারে এঁরা যে রীতি অবলম্বন করেছেন, আমার বিবেচনায় সেটি ফলবতী হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা। আমরা দৈনন্দিন জীবনে কথায় বার্তায় যে সব শব্দ বাংলা ভাষার অন্তর্গত করে নিয়েছি, সেগুলিকে বর্জন না করে স্বভাবসিদ্ধ করে নিলে অনেক বিড়ম্বনা এড়ানো যায়।

এঁদের গ্রন্থের অন্য প্রধান গুণ প্রচুর ছবি, নক্সা ও রঙের ব্যবহার; এ ছাড়া বিজ্ঞান বা প্রয়োগ-বিদ্যার বহুল প্রচার ও ব্যবহার সফল হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

আমি এঁদের প্রয়াসের সর্ববিধ সাফল্য কামনা করি।

জ্যোতি ভট্টাচার্য

শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

আমাদের কথা

প্রকৃতির সাজানো সংসারে এমন প্রাণী অসংখ্য, জলে-স্থলে-আকাশে স্বচ্ছন্দ বিচরণের সহজাত শক্তিতে যারা মানুষের ঈর্ষার পাত্র। ডাঙ্গায় খরগোস, জলে মাছ কিংবা আকাশে পাখীর মত অবাধ সঞ্চরণের স্বাভাবিক সুযোগ মানুষের নেই।

প্রকৃতি এইসব দিক থেকে মানুষকে নিরাশ করেছে বটে, কিন্তু পরিবর্তে তাকে দিয়েছে সাতরাজার ধন এক মানিক, যার দৌলতে মানুষ আজ জল-স্থল-অন্তরীক্ষের একচ্ছত্র অধিপতি। সে হচ্ছে মানুষের সুগঠিত মস্তিষ্ক—তার চিন্তা ও নব নব উদ্ভাবনার উৎস। এখান থেকেই সে পেয়েছে প্রকৃতিকে জয় করার প্রেরণা, সম্ভব হয়েছে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক এবং বিরূপ বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম। তাই প্রবল প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীরা আজ যখন ফসিলমাত্র তখনো মানুষ শুধু তার অস্তিত্বের ধারাটিকেই অক্ষুণ্ণ রাখেনি, নব নব প্রগতির দিকে তাকে অব্যাহত রাখতে পেরেছে।

প্রায় তিনশ কোটি বছর আগে যেদিন মানুষ প্রথম এল পৃথিবীতে, সে ছিল নিতান্ত নিঃস্ব এবং নিঃসহায়। আর আজ আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ তার হাতে। মধ্যেকার সুদীর্ঘ ইতিহাস বিবর্তন ও বিপ্লবের বিস্তৃত অধ্যায়। তার প্রতি ছত্রে রহস্যের আলোছায়া, অতন্দ্র অধ্যবসায়ের অলিখিত কাহিনী। বহু বাধা-বিঘ্নের চড়াই পেরিয়ে অবশেষে সার্থকতায় উত্তরণ।

বিভিন্ন যুগে মানবগোষ্ঠীর অগণ্য প্রতিভাধরদের চিন্তা ও বিচিত্র উদ্ভাবনার পরিণত ফসল আমাদের আজকের এই বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি। এই যে প্রচেষ্টা এ যেন একটা অন্তহীন 'রিলে রেস'। যুগে যুগে পূর্বপুরুষেরা তাঁদের যাত্রা শেষ ক'রে, তাঁদের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার অমূল্য সম্পদ পৌঁছে দিয়ে যান উত্তরপুরুষের কাছে। একযুগের অগ্রগতির সমস্ত ঐশ্বর্য আসে অন্যযুগের মানুষের স্বাভাবিক উত্তরাধিকার হয়ে। এই যে প্রবল প্রবাহ, যেখানে সকল যুগের, সকল মানুষের সাধনার ধারা এসে মিশেছে, তা কালের সীমা অতিক্রম ক'রে মানুষের সার্থকতার নব নব দিগন্ত-অন্বেষণে নিত্য প্রবাহিত।

বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর অগ্রগতির সঙ্গে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের এবং জনসাধারণের পরিচয় ঘটিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই দশ খণ্ডে এই এনসাইক্লোপেডিয়া প্রকাশের প্রকল্প আমরা গ্রহণ করি। এর প্রথম খণ্ড 'পরিবহন'-এ আমরা আদিম যুগের পরিবহন-ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ ক'রে এ যুগের মহাকাশ অভিযান পর্যন্ত বিবর্তনের বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর কাহিনী সংক্ষেপে অথচ সুসংঘবদ্ধভাবে তুলে ধরবার প্রয়াস পেয়েছি। এই সংকলনে বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পরিভাষা ব্যবহার না ক'রে তার ধ্বনি ও রূপ অক্ষুণ্ণ রেখে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করেছি এই দিকে লক্ষ্য রেখে যাতে সংকলনটি পাঠক সাধারণের সহজে বোধগম্য হতে পারে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের এবং জনসাধারণের বিজ্ঞান-চেতনার উন্মেষ ঘটানোর কাজে এই এনসাইক্লোপেডিয়া যদি কিছুটা উৎসাহ ও আগ্রহ সঞ্চার করতে পারে তো আমাদের প্রয়াস সার্থক হয়েছে ব'লে মনে ক'রবো।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন ও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্যের কাছে এই সংকলনের ভূমিকা রচনার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র এবং আমাদের অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী, বন্ধু আমাদের এই প্রচেষ্টায় নানাভাবে প্রেরণা, পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। সে জন্য তাঁদের সকলের কাছে আমরা বিশেষভাবে ঋণী।

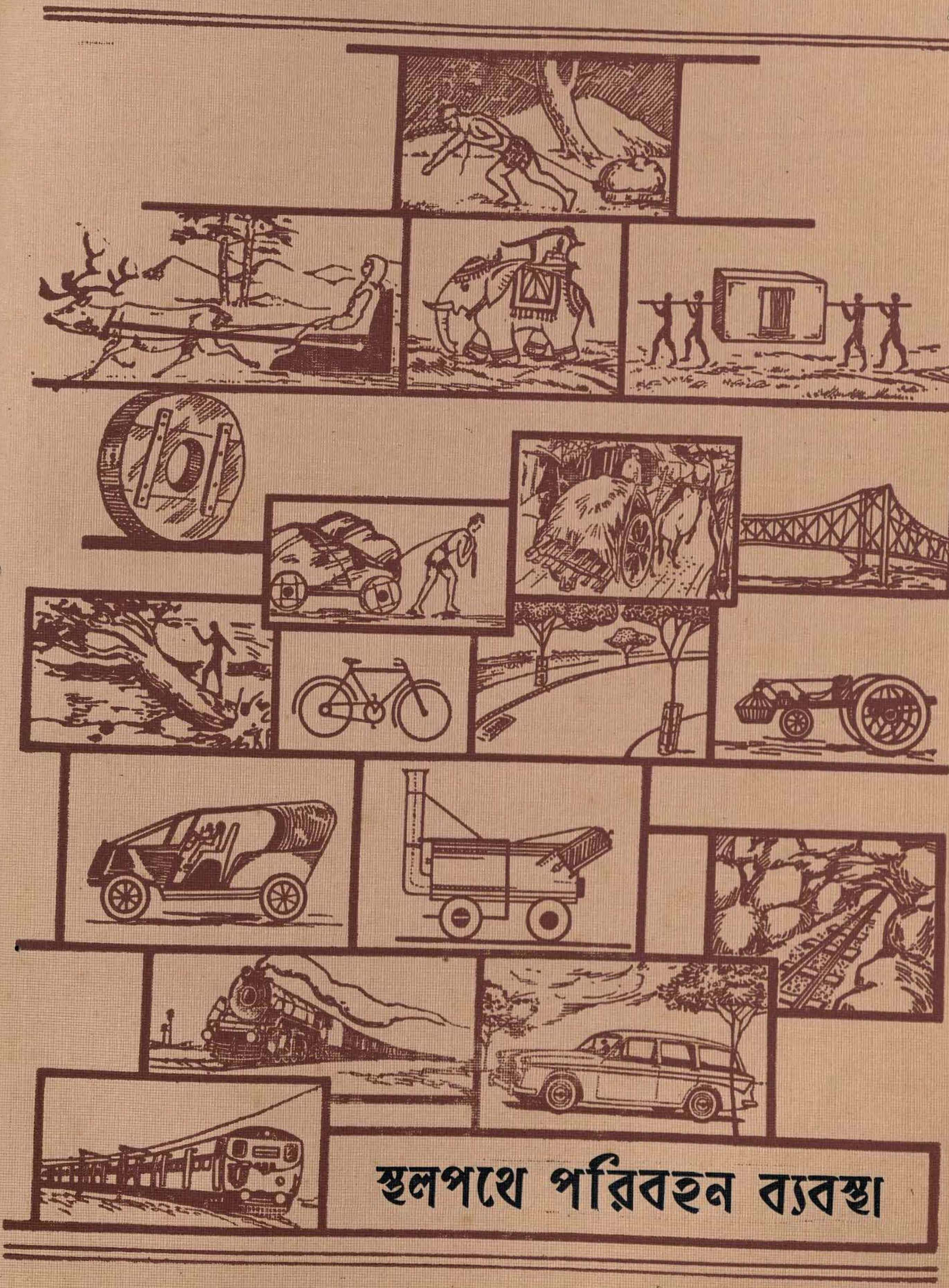
যুগল শ্রীমল

সম্পাদক

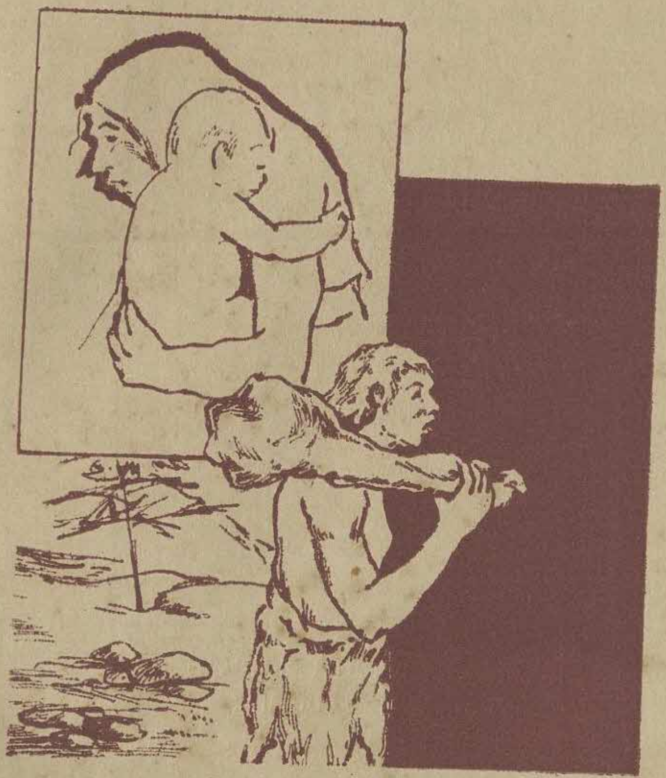
সচিত্র বিজ্ঞান কোষ

প্রথম খণ্ড	পরিবহন
দ্বিতীয় খণ্ড	যোগাযোগ ব্যবস্থা
তৃতীয় খণ্ড	জ্যোতির্বিদ্যা ● নৃতত্ত্ব ● ভূগোল ● ভূতত্ত্ব ● প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাগৈতিহাসিক মানুষ
চতুর্থ খণ্ড	আবিষ্কার ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান
পঞ্চম খণ্ড	খনিজ পদার্থ ● ধাতু ● বস্ত্রশিল্প ● গৃহনির্মাণ
ষষ্ঠ খণ্ড	কৃষি ● রসায়ন ● পদার্থ বিজ্ঞান ● পরমাণবিক বিজ্ঞান
সপ্তম খণ্ড	উদ্ভিদ ● খাদ্য ● খাদ্যশিল্প
অষ্টম খণ্ড	শিলা ● জীবজন্তু ● সামুদ্রিক জীব ● প্রাণী ও কীটপতঙ্গ
নবম খণ্ড	প্রাণীজগৎ—উভয়চর, সরীসৃপ, পাখী, স্তন্যপায়ী ও মাকড়সা
দশম খণ্ড	মানবদেহ ● মানবজীবনের সংরক্ষণ

জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ উপরিউক্ত দশ খণ্ডে সচিত্র বিজ্ঞান কোষ নামে এনসাইক্লোপেডিয়াটি সম্পূর্ণ করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।



স্থলপথে পরিবহন ব্যবস্থা



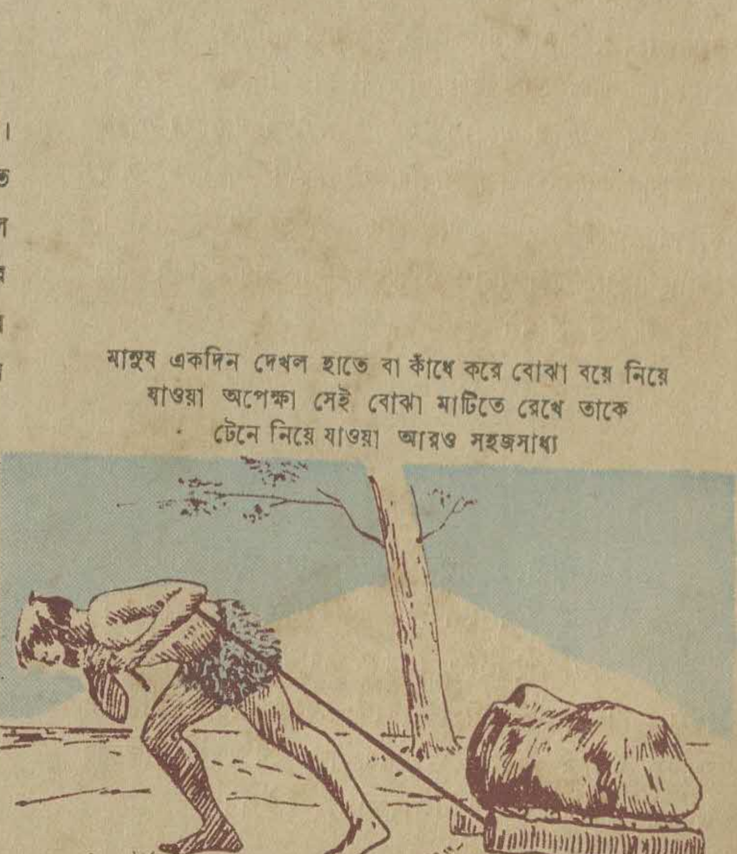
আদিমতম পরিবহন ব্যবস্থা

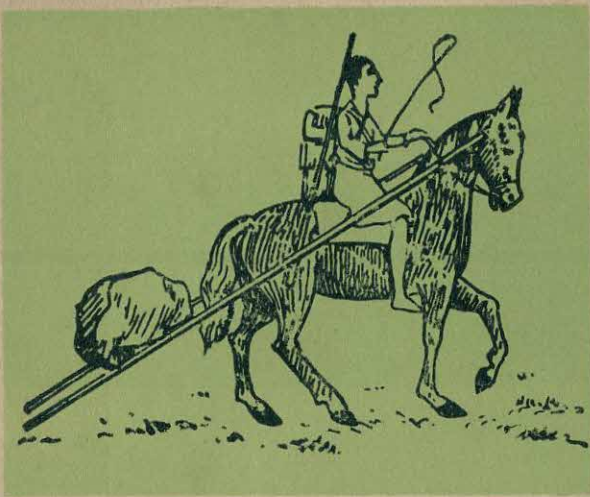
স্থলপথে পরিবহন ব্যবস্থা

প্রকৃতি মানুষকে দ্রুতগতি প্রাণী করে সৃষ্টি করে নি। স্থলে তাকে বনের খরগোসও দৌড়বাজীতে হারিয়ে দিতে পারে। জলে তাকে মাছ সাঁতারে অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে। আর মানুষের আকাশে ওড়বার প্রচেষ্টা দেখলে পাখীরা তো হেসেই আকুল হবে। তাদের সঙ্গে তো কোন প্রতিযোগিতাই চলে না। ওড়বার ক্ষমতাই মানুষের নেই।

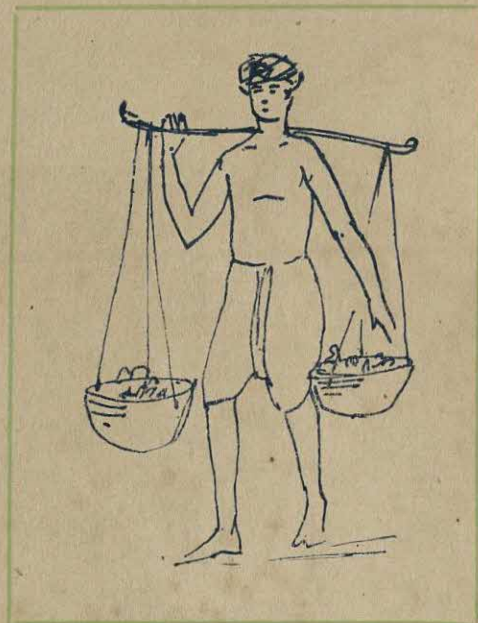
তবু মানুষ যে নিজেকে আজ জল-স্থল-অন্তরীক্ষের অধীশ্বর করতে পেরেছে, তা তার নব নব উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন মস্তিষ্কের কল্যাণে। তার কল্পনাপ্রবণ মস্তিষ্কই মানুষকে ইঙ্গিত দিয়েছে প্রকৃতিকে জয় করতে। সমস্তরকম পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে, প্রকৃতির বিরুদ্ধ-শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মানুষ যে আজও পৃথিবীতে টিঁকে আছে—অন্যান্য বহু অতিকায় প্রাণীর মত লুপ্ত হয়ে যায় নি—তা তার এই কল্পনাপ্রবণ মস্তিষ্কের কল্যাণেই।

মানুষ একদিন দেখল হাতে বা কাঁধে করে বোঝা বয়ে নিয়ে যাওয়া অপেক্ষা সেই বোঝা মাটিতে রেখে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া আরও সহজসাধ্য





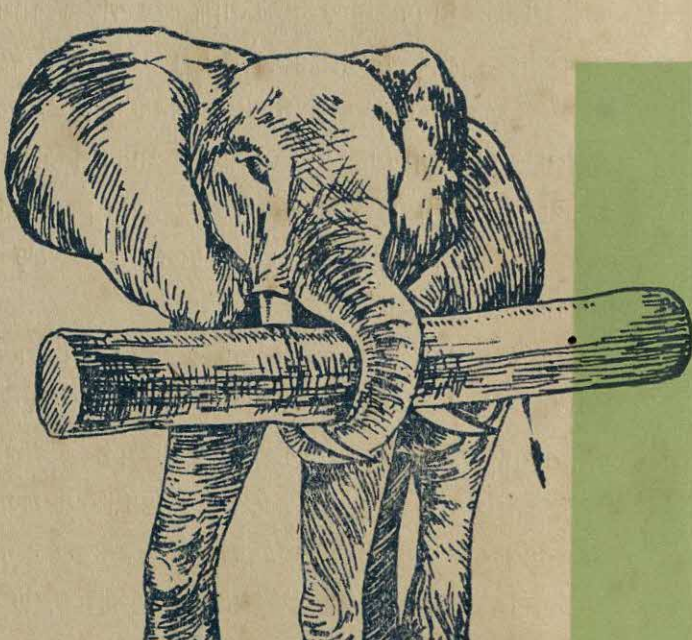
মাল বইবার সহজতর এই কৌশলটি আজও অনেকে ব্যবহার করে



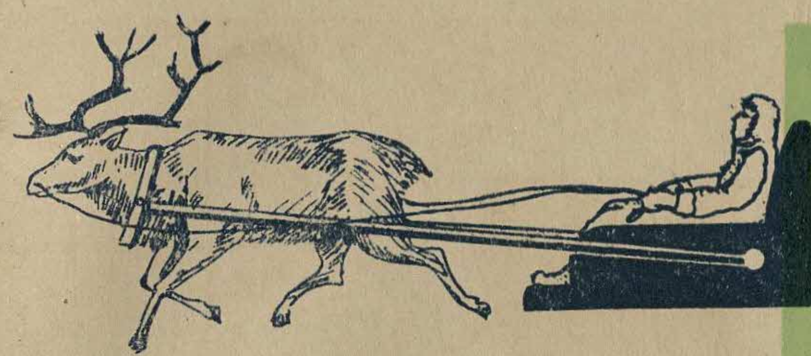
প্রাচ্যের দেশগুলিতে এইভাবে ভারে করে জিনিস বইতে আজও দেখা যায়

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয়েছে প্রায় তিন লক্ষ বছর আগে। কিন্তু রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, জাহাজ, ডুবোজাহাজ, উড়োজাহাজ প্রভৃতি যেসব আবিষ্কারের ফলে মানুষের গতি দ্রুত হয়েছে, সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র দু'শ বছরের মধ্যে। এই পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব থেকে আজ অবধি এই দীর্ঘ সময়কে যদি চব্বিশ ঘণ্টা ধরা যায়, তবে বলতে হয় রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, উড়োজাহাজ প্রভৃতির আবিষ্কার হয়েছে মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড আগে।

বনে-জঙ্গলে হাতিকে দিয়ে এইভাবে কাজ করিয়ে নেবার প্রচলন এখনও আছে



এই পৃথিবীতে মানুষ যেদিন তার প্রথম যাত্রা শুরু করেছে সেদিন পথ চলবার জন্যে দুটি পা এবং মোট বইবার জন্যে দুটি হাত ভিন্ন আর কিছুই তার সম্বল ছিল না। আর আজ কলকাতা থেকে লণ্ডনে যায় সে কয়েক ঘণ্টায়, নিজের ওজনের লক্ষ গুণ বেশী ওজনের মাল সে বয়ে নিয়ে যায় হাজার হাজার মাইল।



এস্কিমোরা আজও বলগা হরিণ দিয়ে তাদের শ্লেজ গাড়ী টানায়

এই দু'য়ের মধ্যেকার ইতিহাস অজানা, রহস্যময়, রোমাঞ্চকর। বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভাবান আবিষ্কারকেরা নিজের নিজের ধারণাকে কাজে লাগিয়েছিলেন। আর তাঁদের সবাইর ধারণার মিলিত যোগফল হল আজকের মানবসভ্যতা।

কিন্তু সেদিনের সব কথাই আজ যুক্তিসঙ্গত অনুমানের ওপর নির্ভরশীল।

সেদিন মানুষের দিন কাটত খাদ্যের জোগাড়ে। তার আর কিছু ভাববার ছিল না। আর কিছু করবার ছিল না। সেদিন নিজের খাদ্যের জন্যে সে পশু শিকার করত। আবার কখনও কখনও নিজেই তাদের শিকার হয়ে তাদের খাদ্য হত। ক্রমে তার মাথায় বুদ্ধি এল, তাইত, হাতে হাতুড়ি গোছের কিছু একটা থাকলে শিকার এবং আত্মরক্ষা, এ দু'টোই তো আরও সহজ হয়ে আসে। এবং সেইটিই বোধ হয় প্রথম বস্তু যা মানুষ বইবার জন্যে প্রথম হাতে তুলে নিল।

তারপর কোন এক শুভক্ষণে মানুষ আগুন আবিষ্কার করল।

কবে কেমন করে মানুষ আগুন জ্বালাতে শুরু করেছে কেউ সেকথা জানে না। সাক্ষ্য প্রমাণ দেখে মনে হয় যে, প্রাগৈতিহাসিক মানুষ ৩,০০,০০০ বছর আগেও আগুন ব্যবহার করত। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, আগুন কি করে জ্বালাতে হয় বা কিভাবে তাকে জীইয়ে রাখতে হয় তা জানার বহু আগে থেকেই মানুষ আগুন ব্যবহার করত।

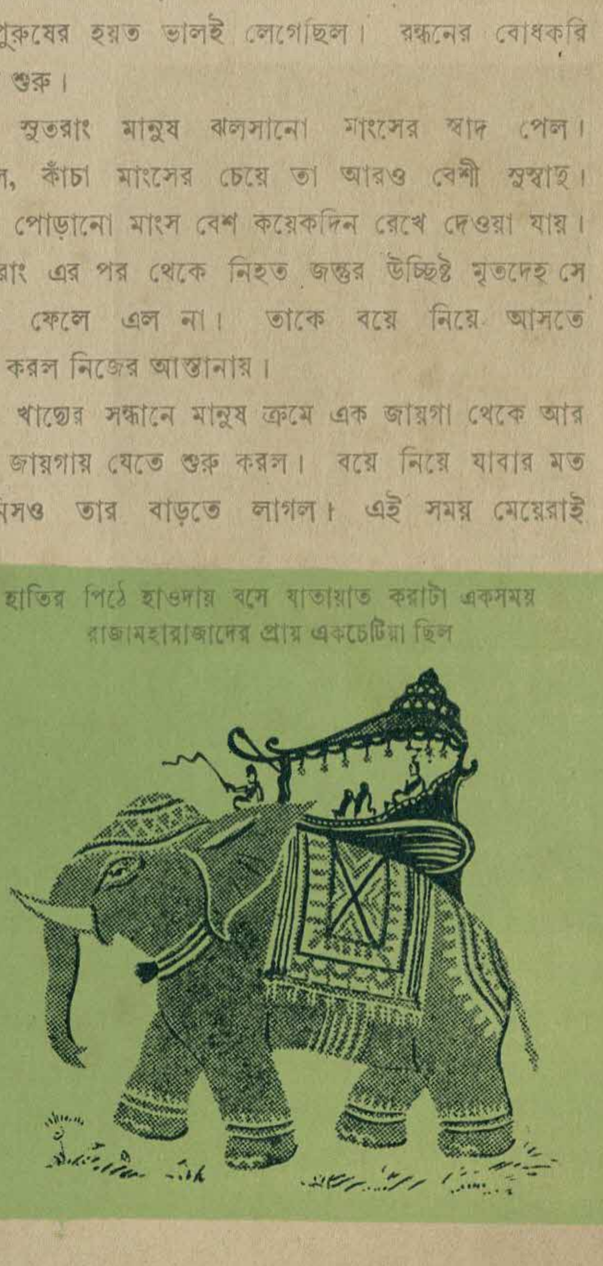
তারপর মানুষ একদিন নিজে আগুন জ্বালাতে শিখল। কিভাবে আগুন জ্বালানো যায়, কিভাবে তাকে জীইয়ে রাখা যায় এবং কিভাবেই বা তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এসব যখন একবার জানা হয়ে গেল, তখন প্রাগৈতিহাসিক মানুষ তাকে নানাভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে দিলেন।

তারপর কোন এক রাত্রে বন্য জন্তুর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে গুহার সামনে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের কাছে পরের দিন সকালে খাবার জন্যে রক্ষিত নিহত জন্তুর মৃতদেহটি হয়ত ভুলক্রমে থেকে গিয়েছিল। ক্রমে হয়ত অগ্নিশিখা তাকেও স্পর্শ করেছিল। এবং পরদিন সকালে সেই পোড়া মাংস খেতে আমাদের কোন এক পূর্বপুরুষের হয়ত ভালই লেগেছিল। রন্ধনের বোধকরি সেই শুরু।

সুতরাং মানুষ ঝলসানো মাংসের স্বাদ পেল। বুঝল, কাঁচা মাংসের চেয়ে তা আরও বেশী সুস্বাদু। এবং পোড়ানো মাংস বেশ কয়েকদিন রেখে দেওয়া যায়। সুতরাং এর পর থেকে নিহত জন্তুর উচ্ছিষ্ট মৃতদেহ সে আর ফেলে এল না। তাকে বয়ে নিয়ে আসতে শুরু করল নিজের আস্তানায়।

খাদ্যের সন্ধানে মানুষ ক্রমে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে শুরু করল। বয়ে নিয়ে যাবার মত জিনিসও তার বাড়তে লাগল। এই সময় মেয়েরাই

হাতির পিঠে হাওদায় বসে যাতায়াত করাটা একসময় রাজামহারাজাদের প্রায় একচেটিয়া ছিল



জিনিস বইত। কারণ বন্য জন্তু এবং শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে পুরুষের হাত যতদূর সম্ভব মুক্ত থাকাই ভাল।

তারপর মানুষ বনের পশুকে বশ মানাতে শিখল। হয়ত একদিন আমাদের কোন এক পূর্বপুরুষ একটি নেকড়ে শিকার করে তার অসহায় বাচ্চাটিকে জীবিত অবস্থায় নিজের গুহায় নিয়ে আসেন। ক্রমে পরিবারের ছেলেমেয়েদের আদর-যত্নে সে বড় হয়ে ওঠে। খাদ্যের জন্যে সে মানুষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। মানুষের সংস্পর্শে, তার ভালবাসায় ক্রমে সেই নেকড়ে শাবকের বন্যভাব কমে আসে।



ঘোড়সওয়ার



মরুভূমিতে উট আজও অপরিহার্য

মানুষ ক্রমে জানল ছাগল এবং ভেড়া পুষলে তার মাংস, দুধ সে খেতে পারে। তার চামড়া দিয়ে নিজের পরিচ্ছদ তৈরী করা যায়। সুতরাং সে ছাগল-ভেড়ার পাল রাখতে শুরু করল। তখন আবার তাদের খাবার জন্যে ঘাসের সন্ধানে তাকে নতুন নতুন জায়গায় যেতে হল। আর ক্রমে ক্রমে ওই নেকড়েগুলিই এইসব পালিত ছাগল-ভেড়ার পাহারাদার হয়ে উঠল।

শুধু তাই নয়। ক্রমে বোঝাও বাড়তে লাগল। অত বোঝা আর মেয়েদের একার পক্ষে টানা অসম্ভব হয়ে উঠল। তখন মানুষ তার বোঝার কিছু অংশও ওইসব নেকড়ে এবং ছাগল-ভেড়ার পিঠে চাপিয়ে দিল।

তারপর মানুষ একদিন দেখল হাতে বা কাঁধে করে বোঝা বয়ে নিয়ে যাওয়া অপেক্ষা সেই বোঝা মাটিতে রেখে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া আরও সহজসাধ্য। তারও পরে মানুষ একদিন সেই বোঝা নিজে না টেনে তার পালিত জন্তু জানোয়ারদের দিয়ে টানাতে শুরু করল। সুতরাং বোঝা টানবার জন্যে আরও বিভিন্ন রকমের বন্য জন্তুকে ধরে বশ মানানোটা জরুরী হয়ে পড়ল।

কুকুরই বোধকরি প্রথম পরিবারে স্থান পেয়েছিল। অবশ্য সঠিক বলা মুস্কিল। যাইহোক, মানুষ যবে থেকে তার কীর্তিকাহিনীর কথা পাথরের গায়ে লিখে রাখতে শিখেছে তারও বহু আগে থেকেই কুকুর, ঘোড়া, গাধা, ষাঁড়, হাতী, উট ও বলগা হরিণ তাকে বিশ্বজয়ে সাহায্য করেছে। প্রকৃতিদত্ত নিজের দুটি পায়ের ওপর কেবলমাত্র নির্ভর না করে মানুষ আরও অসংখ্য পা ব্যবহার করেছে নিজের বোঝা বইবার জন্যে।



জন্তু জানোয়ারদের মধ্যে কুকুর, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর পৃথিবীর সব অঞ্চলেই মোট বইবার বা গাড়ী টানবার কাজে আজও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কয়েক রকমের প্রাণী আছে যারা শুধু বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যেই কার্যক্ষম। যেমন, উট মরুভূমিতে, বলগা হরিণ মেরু অঞ্চলে, লামা পাহাড়ী রাস্তায় ইত্যাদি।

এরই মাঝে মানুষ একদিন দেখল, একজনে বোঝা বওয়ার চেয়ে যদি সেই বোঝা একটি কাঠের মাঝখানে বেঁধে সেই কাঠের দু'প্রান্ত দুজনা হাতে বা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যায়, তবে বোঝা বওয়া আরও কম কষ্টসাধ্য হয়।

তারপর একদিন হয়ত বোঝার পরিবর্তে নিজের এক অসুস্থ প্রিয়জনকে সেইভাবে বইবার প্রয়োজন হল। পাল্কী জাতীয় যানবাহনের বোধকরি সেই শুরু।

ক্রমে বাহক হিসাবে মানুষের পরিবর্তে জন্তুকে ব্যবহার করা শুরু হল।

আজকের এই মোটরগাড়ী আর রেলগাড়ী, জাহাজ আর উড়োজাহাজের যুগেও পৃথিবীতে এমন অনেক জায়গা আজও আছে যেখানকার মানুষ চলবার জন্যে নিজের দুটি পা এবং মোট বইবার জন্যে নিজের দুটি হাতের ওপরেই বেশী নির্ভরশীল। বড় জোর নিজের পালিত জন্তুর সাহায্য সে নেয়।

ভারতীয় কুলিরা আজও মাথায় বা ভারে করে জিনিস বয়। গাধার পিঠে চাপিয়ে বা নিজের কাঁধে করে ভারতীয় ধোবারা আজও কাপড়ের মোট নিয়ে যায়। এস্কিমোরা এখনও কুকুর বা বলগা হরিণ দিয়ে তাদের স্লেজগাড়ী টানায়। কৃষক এখনও তার কাঁধে বা মাথায় প্রকাণ্ড এক খড়ের বোঝা নিয়ে দিব্যি স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারে। মরুভূমিতে উট আজও অপরিহার্য। হাতির সাহায্যে বনে-জঙ্গলে কাটা গাছের গুঁড়ি বওয়া, বা অন্যান্য ভারী কাজ করাবার রেওয়াজ আজও আছে। পেরুতে লামা এখনও পর্যন্ত পাহাড়ী রাস্তায় চলাচলের একমাত্র যানবাহন। বলদ এবং মহিষ আজও এদেশে ও বিদেশের বহু জায়গায় মাল বওয়ার কাজে লাগে। পাল্কী বা ওই ধরনের যানবাহনের চল আজও লুপ্ত হয় নি।

গাধা আজও মাল বইছে



চাকার আবিষ্কার

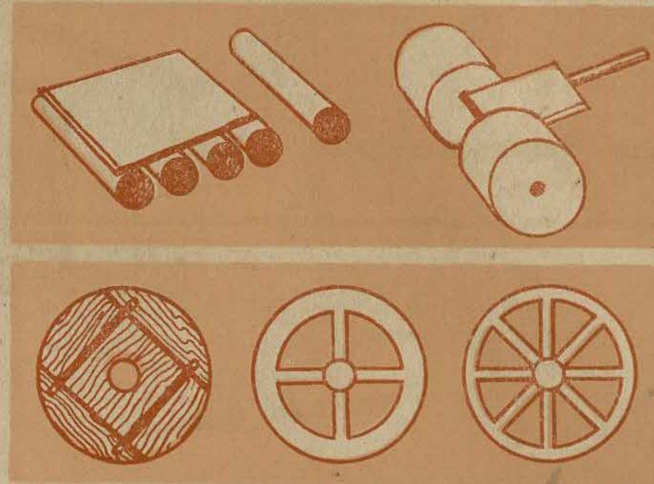
বহু হাজার বছর আগে আমাদের কোন এক পূর্বপুরুষ সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারটি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তাঁর নাম আমাদের কাছে হারিয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর আবিষ্কার মানুষের জীবনটাকেই বদলে দিয়েছে। তিনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি চাকা আবিষ্কার করেছিলেন। বস্তুতঃ তারপর আজ অবধি চাকার থেকে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার আর কোন আবিষ্কারক করেন নি।

ঘড়ির চাকা থেকে শুরু করে কারখানার চাকা, রিকশগাড়ীর চাকা, মোটরগাড়ীর চাকা, রেলগাড়ীর চাকা ইত্যাদি পৃথিবীর সব জায়গার চলমান চাকা যদি আজ এক মুহূর্তের জন্যেও একসঙ্গে থেমে যায়, তবে দুনিয়াটার কি হাল হবে, তা কল্পনা করলেই আমাদের আধুনিক সভ্যতা চাকার ওপর কতটা নির্ভরশীল তা বোঝা যাবে।

কখন, কিভাবে চাকার আবিষ্কার হল কেউ সেকথা জানে না। তবে এটা ঠিক যে, বিভিন্ন যুগে ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চাকার আজকের রূপটি এসেছে।

পাঁচ হাজার বছর আগেও মিশরীয়রা তাঁদের নিজেদের জীবনকাহিনী নিয়ে সমাধির দেওয়ালে যেসব ছবি এঁকেছিলেন, তাতেও চাকাওয়ালা গাড়ীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তারও বহু আগে নীল নদের উপত্যকায় অথবা টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস নদীর তীরে চাকার প্রথম ব্যবহার হয়েছিল।

অনুমান করা যেতে পারে যে, আমাদের কোন এক পূর্বপুরুষ হয়ত একদিন একটি কাঠের গুঁড়িকে গড়িয়ে যেতে দেখেছিলেন। তাই দেখে হয়ত তাঁর মনে হয়েছিল যে, কোন ভারী জিনিস যা তিনি বয়ে নিয়ে যেতে চান, তার তলায় যদি ওই রকম গুঁড়ি রেখে দেওয়া যায়, তবে তা টেনে নিয়ে যাওয়া আরও অল্প কষ্টসাধ্য ব্যাপার হবে। সেই বোধকরি শুরু।



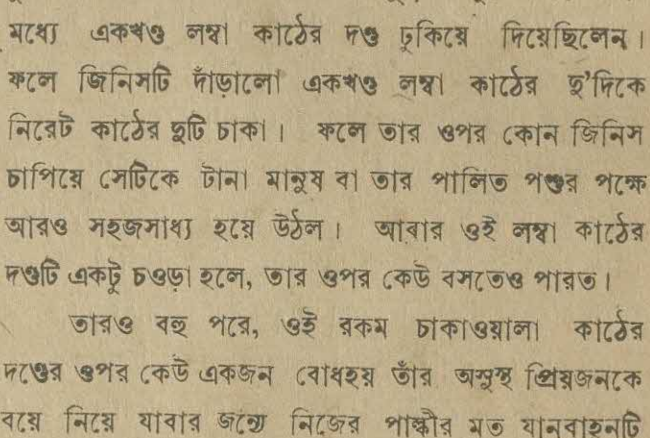
চাকার ক্রমবিকাশ

তার বহু পরে, গড়ানোটাকে আরও দ্রুততর করবার জন্যে কেউ একজন হয়ত দুখণ্ড গোল নিরেট কাঠের টুকরোর মাঝখানে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফুটো করে তার মধ্যে একখণ্ড লম্বা কাঠের দণ্ড ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে জিনিসটি দাঁড়ালো একখণ্ড লম্বা কাঠের দু'দিকে নিরেট কাঠের দুটি চাকা। ফলে তার ওপর কোন জিনিস চাপিয়ে সেটিকে টানা মানুষ বা তার পালিত পশুর পক্ষে আরও সহজসাধ্য হয়ে উঠল। আবার ওই লম্বা কাঠের দণ্ডটি একটু চওড়া হলে, তার ওপর কেউ বসতেও পারত।

তারও বহু পরে, ওই রকম চাকাওয়ালা কাঠের দণ্ডের ওপর কেউ একজন বোধহয় তাঁর অসুস্থ প্রিয়জনকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে নিজের পাল্কীর মত যানবাহনটি বসিয়ে দিয়েছিলেন।

এবং চাকাওয়ালা গাড়ীর সেই বোধকরি প্রথম শুরু।

আদিমতম গাড়ী



গাড়ী



রোমান আমলের একটি গাড়ী

ক্রমে মানুষ তার সৃষ্টি এই গাড়ীটির উন্নতিসাধনে মন দিল। দেখা গেল চাকার নিরেট কাঠের গোল টুকরোর মাঝখানের খানিকটা কাঠ যদি কেটে বাদ দেওয়া হয় তবে চাকাটির কোন ক্ষতি হয় না, অথচ সেটি বেশ হাল্কা হয় এবং তা টানাও বেশ সহজসাধ্য। চাকাটিকে হাল্কা করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে মজবুত রাখতে গিয়ে ক্রমে তাতে 'স্পোক' লাগানো হল। তারও পরে চাকার বেড়টিকে মজবুত করার জন্যে সেখানে ধাতুর ব্যবহার করা হল।

নিরেট চাকার কেন্দ্র থেকে স্পোকগুলি কাটা হল; স্পোকগুলি বিস্তৃত থাকল চাকার বেড় অবধি। চাকার কেন্দ্র, যেখান থেকে স্পোকগুলি শুরু হয়েছে সেখানকার নিরেট অংশটুকুই আজ উন্নতরূপ নিয়ে অ্যাক্সল নামে পরিচিত হয়েছে। দুটি চাকার অ্যাক্সলে গর্ত করে তার মধ্যে দিয়ে একটি দণ্ড ঢুকিয়ে দুটি চাকাকে যুক্ত করা হল।

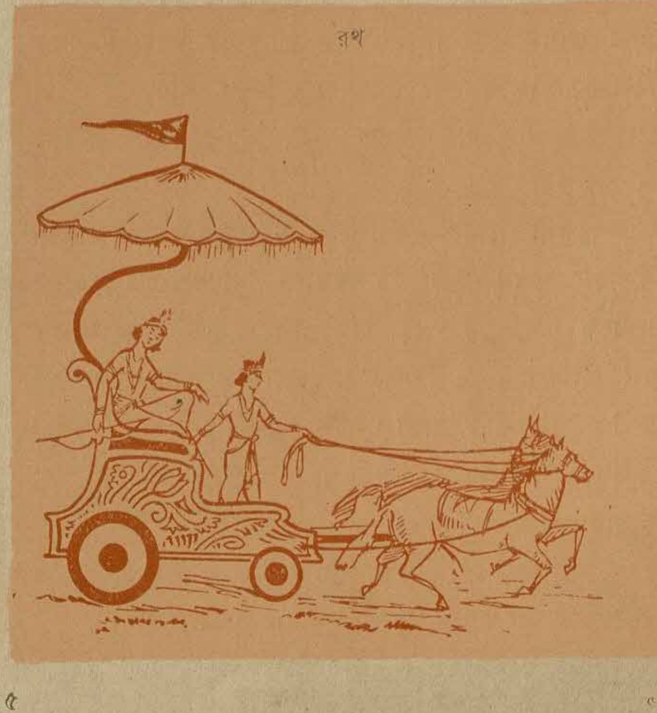
ইরাণের সুসা শহরে যে আদিম গাড়ীটি পাওয়া গেছে তা খৃষ্টপূর্ব চার হাজার বছর আগেকার বলে অনুমিত হয়। এই গাড়ীটিতে দুটি কাঠের চাকার ওপর একজনের বসবার মত জায়গা স্থাপিত আছে।

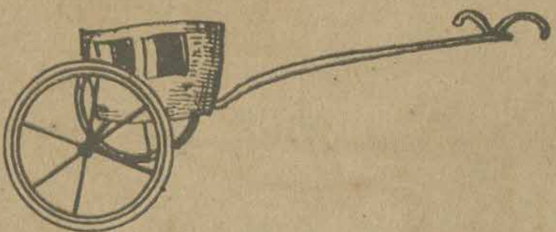
তার অন্ততঃ ২,৫০০ বছর পরে এশিয়ার কয়েকজন মেষপালক মিশরে চাকা নিয়ে আসেন। খৃষ্টপূর্ব ১৫৮০ অব্দে মিশরে নির্মিত গাড়ীগুলি সাধারণ চলাচলের জন্যে এবং যুদ্ধের সময় আক্রমণ করার জন্যে ব্যবহৃত হত। সে গাড়ীগুলিতে মাত্র দুজন লোক বসতে পারত। গাড়ীগুলি ছিল কাঠের তৈরী এবং সেগুলিকে মজবুত করার জন্যে চামড়া ও দড়ি ব্যবহার করা হত। তার মেঝেতে তুলার আঁশ বিছিয়ে দেওয়া হত ফলে গাড়ী চললে তাতে ঝাঁকুনি কম লাগত।

সম্রাট দ্বিতীয় রামেসিস প্রায় তিন হাজার বছর আগে মিশরে রাজত্ব করতেন। তাঁর সমাধিতে যেসব ছবি খোদিত আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তিনি এবং তাঁর সেনাদল যুদ্ধের সময় যেসব রথ ব্যবহার করতেন, সেগুলির প্রতিমূর্তি। সেসব রথে দুটি চাকা থাকত। চাকাগুলিতে খুব মোটা মোটা 'স্পোক' থাকত। তার অক্ষদণ্ড এবং চাকার বেড়ে ধাতু ব্যবহার করা হত। আবার ওই সমাধিতেই সম্রাটের শত্রুদের রথও দেখানো হয়েছে। তাদের চাকাগুলি ছিল নিরেট কাঠের। অনুমান করা যেতে পারে যে, ওই সব ভারী গাড়ী নিয়ে দ্বিতীয় রামেসিসের শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি।

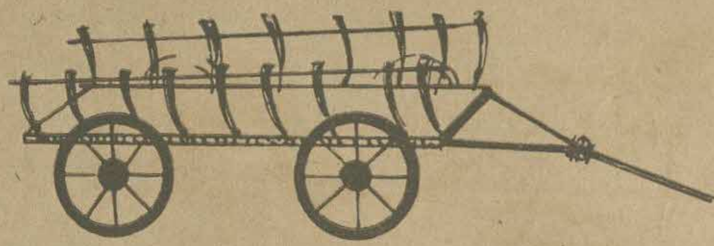
আমাদের পৌরাণিক কাহিনীগুলিতেও রথের ব্যবহারের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে আর্যগণ যখন

রথ





রোমানদের নির্মিত আর একটি গাড়ী



রোমানদের নির্মিত মালগাড়ী

ভারতে প্রবেশ করেন তখন তাঁরা অশ্ব এবং রথ ব্যবহার করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁদের রথে ছুটি চাকা থাকত এবং সেই রথ ছুটি অশ্বে টানত। সেই আমলের ভারতীয় অধিবাসীদের কাছে রথের ব্যবহার অজানা ছিল বলে অনুমিত হয়। সেইজন্যে তাঁদের পরাজিত করে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করতে আর্যদের বিশেষ বেগ পেতে হয় নি।

মিশরীয়দের মত অ্যাসিরীয় এবং পারসীয়রাও ছু চাকার গাড়ীতে চেপে যুদ্ধ করতেন।

রোমানদের নির্মিত ঢাকা গাড়ীগুলি বেশ ভারী হত। কারণ তাঁদের অনেক দূরপথ পাড়ি দিতে হত। এই গাড়ীগুলির নাম ছিল 'ক্যারুকা ডরমিটারিয়া'।

খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে রোমানরা তাঁদের চার চাকার গাড়ীগুলির সামনের ছুটি চাকাকে একটি ঘূর্ণমান অক্ষের ওপর স্থাপন করবার কৌশল আবিষ্কার করেন। এর ফলে গাড়ীগুলি সহজেই বাঁক নিতে পারত। ভারী মাল বহন করবার জন্যে এই ধরনের গাড়ীগুলিকে ব্যবহার করা হত।

বিজয়ী রোমান সেনাপতিরা যখন যুদ্ধ জয় করে দেশে ফিরতেন তখন তাঁরা বিশেষভাবে নির্মিত এক ধরনের গাড়ীতে চড়তেন। এই গাড়ীগুলিতে ছুটি চাকা থাকত এবং তার সামনের দিকটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হত। বিজয়ের প্রতীক নানা ছবি গাড়ীগুলিতে আঁকা থাকত। বিজয়ী সেনাপতি সামনের ওই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি স্থানে দাঁড়িয়ে স্বয়ং ঘোড়ার রাশ ধরে থাকতেন।

'সিসিয়াম' নামে ছু'চাকার আর এক ধরনের কাঠের গাড়ী রোমানরা ডাকগাড়ী হিসাবে ব্যবহার করতেন।

৭৯ খৃষ্টাব্দে ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে ধ্বংসীভূত পম্পেই নগরীর ধ্বংসাবশেষ থেকে ছু'চাকার গাড়ীর নিদর্শন পাওয়া গেছে।

বলা বাহুল্য, তারও বহু আগে চার চাকার গাড়ী ব্যবহৃত হত।

খৃষ্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে আলেকজাণ্ডারের মৃতদেহ ব্যাবিলন থেকে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় এক সুসজ্জিত চার চাকার গাড়ীতে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর গাড়ী এবং রথের ব্যবহার ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে। এর প্রধান কারণ হল রাস্তার দুরবস্থা এবং পথে ডাকাতের উপদ্রব।

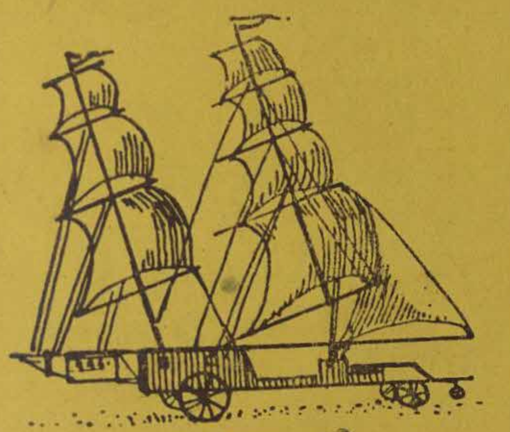
১২০০ খৃষ্টাব্দের আগে আর গাড়ীর তেমন চল ছিল না। ওই শতাব্দীতে আবার গাড়ী নির্মিত হতে থাকে। কিন্তু তা কেবল ধনীরাই ব্যবহার করতেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এক নতুন ধরনের গাড়ী নির্মিত হয়। তার নাম কোচ। এগুলি ছিল চার চাকার ঢাকা গাড়ী। প্রথমে এটি ছিল যেন একটি বড় কাঠের বাক্স চাকার ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেকে বলেন এই ধরনের গাড়ীর প্রথম পরিকল্পনা করেন রোমান সম্রাট তৃতীয় ফ্রেডারিক। আবার অনেকের বিশ্বাস এগুলি প্রথম নির্মিত হয় হাঙ্গেরীর কক্স্ শহরে। সেখানে এর নাম ছিল কোচি (Kocsi)। এই দ্বিতীয় মতের সমর্থকরা বলেন যে, ওই কোচি শব্দ থেকেই কোচ কথাটি এসেছে।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে আরও উন্নত ধরনের এক নতুন গাড়ী নির্মিত হল। এ গাড়ীগুলি চাকার অক্ষের ওপর স্থাপিত থাকত না। স্প্রিং এবং ফিতার মত বস্তুর সাহায্যে ঝোলানো থাকত। এর ফলে রাস্তায় চলতে গিয়ে ঝাঁকুনি লাগলে

আরোহীর তেমন কিছু বেদনাদায়ক অবস্থা হত না এবং ভ্রমণেও মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্য এল।

১৮৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্যারিসের রাস্তায় এক ভদ্রলোক অদ্ভুত এক গাড়ী চালালেন। সে গাড়ীতে পাল ছিল। পালে বাতাস লাগলে সে গাড়ী চলত। বলা বাহুল্য, সে গাড়ীর মেয়াদ ছিল মাত্র কয়েকদিন।



পাল লাগানো গাড়ী

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু উন্নত এবং সুসজ্জিত ও আরামদায়ক ঘোড়ার গাড়ী তৈরী করা হয়। এই সময় ধাতু তৈরীর ব্যাপারে বিরাট উন্নতি সাধিত হয়। ফলে গাড়ীতে আগে যে সব অংশ কাঠ দিয়ে তৈরী হত তার অনেক অংশই এখন থেকে ধাতু দিয়ে তৈরী করা শুরু হল। গাড়ীতে উন্নত ধরনের স্প্রিং এবং আরও নানারকমের মালমশলা ব্যবহার করার ফলে গাড়ী নির্মাণক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি দেখা দিল।

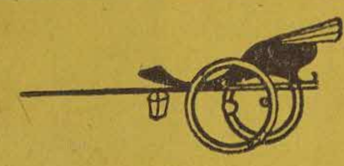
উনবিংশ শতাব্দীতে গাড়ী নির্মাণক্ষেত্রে আরও উন্নতি দেখা দিল এবং আরও উন্নত ধরনের স্প্রিং-এর ব্যবহার চালু হল। গাড়ীর অভ্যন্তরভাগও এই সময় অত্যন্ত রুচিসম্মতভাবে সুসজ্জিত করা শুরু হল। গাড়ীতে ব্রেকের ব্যবস্থাও এই সময় করা হয়।

এতদিন পর্যন্ত কেবলমাত্র ধনী ব্যক্তিরাই গাড়ীর মালিক হতেন এবং গাড়ীতে চড়তেন। এই শতাব্দীতে ভাড়া গাড়ীর প্রচলন হল। সাধারণ লোকেরাও ওই সব ভাড়া গাড়ীতে চড়ে স্থানান্তরে যাতায়াত শুরু করলেন। এই রেলগাড়ী-মোটরগাড়ীর যুগে যানবাহন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও এইসব ভাড়া গাড়ীর রেওয়াজ আজও লুপ্ত হয় নি।



ফিটন

তারপর এই উনবিংশ শতাব্দীতেই জাপানে ও চীনে ব্যবহার করবার জন্যে এক মার্কিন ভদ্রলোক রিকশগাড়ী নির্মাণ করেন। এই ধরনের গাড়ীগুলি একজন মানুষ টানে। প্রাচ্যের অনেক দেশে রিকশগাড়ীর প্রচলন এখনও আছে। কলকাতায় এই ধরনের রিকশ এখনও একটি অত্যাবশ্যক যানবাহন।



রিকশ

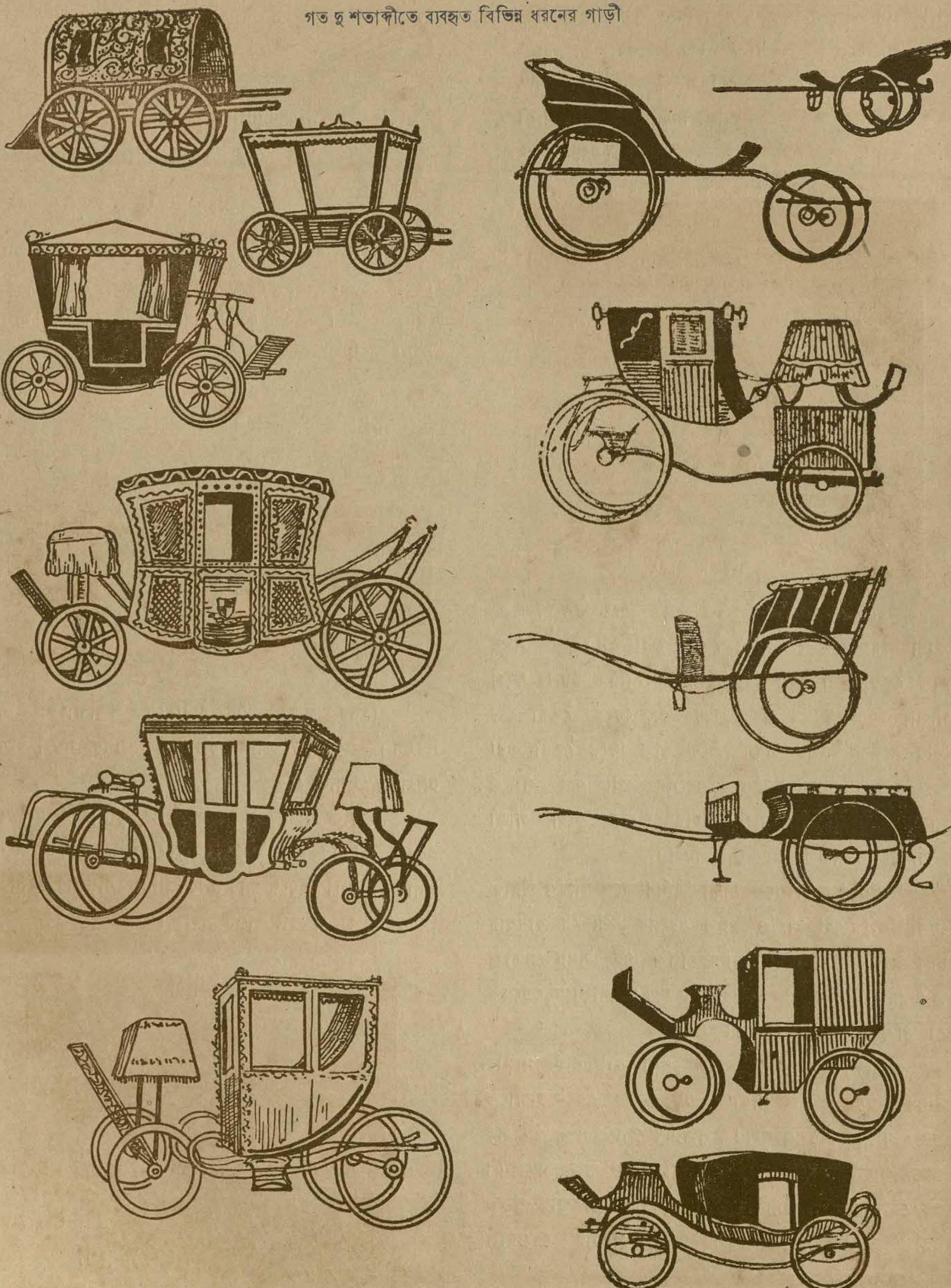
তারপর আবার এই উনবিংশ শতাব্দীতেই এল নবযুগ। জর্জ স্টিফেনসন চালালেন প্রথম সফল বাষ্প-চালিত রেলগাড়ী।

মানুষকে এখন বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে হবে। হাজার হাজার মণ মাল নিয়ে যেতে হবে নিমেষে। সনাতন গাড়ীকে দিয়ে আর চলবে না। মানুষের প্রয়োজন মিটবে না। সুতরাং তাকে বিদায়।

গরুর গাড়ী



গত দু শতাব্দীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের গাড়ী



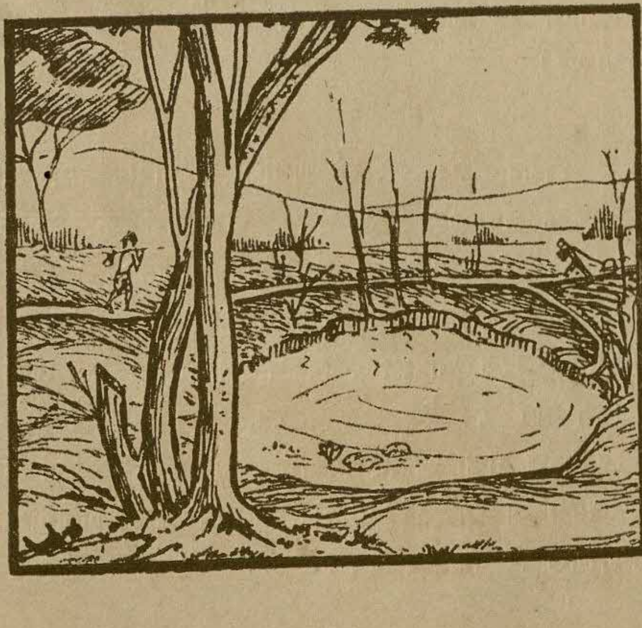
রাস্তা

এই পৃথিবীতে মানুষের যেদিন প্রথম আবির্ভাব হয়েছে, সেদিন থেকেই বোধকরি সে চলাচল শুরু করেছে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা যাবার এই প্রবণতা মানুষের মনে না থাকলে, সম্ভবতঃ আজকের এই সভ্যতার অভ্যুদয় হত না। এবং স্বভাবতঃই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা যেতে হলে রাস্তার প্রয়োজন।

কবে, কেমন করে প্রথম রাস্তা তৈরী হয়েছিল তার ইতিহাস অনুমানসাপেক্ষ। তবে আধুনিক রাস্তার উন্নতির শুরু উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। কিন্তু সেকথা পরে।

প্রথমে রাস্তা বলতে ছিল শুধু পদচিহ্ন। জন্তু-জানোয়ারেরা নিকটবর্তী জলাশয়ে জল খেতে যেত। রোজ একই পথে যাওয়ার ফলে বনভূমির ওপর তাদের পায়ের চাপে ক্রমে সেখানে সরু একফালি রাস্তা তৈরী হত। মানুষ ওই রাস্তা অনুসরণ করে জলাশয়ে নিজের পানীয় জল আনতে যেত। এইভাবেই বোধকরি রাস্তার সূচনা হল। আজও বনাঞ্চলে এইভাবেই পায়ে চলার পথ তৈরী হয়।

পদচিহ্ন



তারপর মানুষ যখন পশুর পিঠে নিজের মালপত্র তুলে দিল, তখন এইসব পদচিহ্ন আর একটু চওড়া হল। তারও পরে চাকার আবিষ্কারের ফলে গাড়ীর আবির্ভাব হল। তখন এইসব পদচিহ্নগুলি স্বাভাবিক কারণেই আরও চওড়া হল। তার পেছনে মানুষের কোন চেষ্টা ছিল না। এগুলিকে ঠিক রাস্তা বলা যায় না। বরং চিহ্ন বলা যায়। কারণ রাস্তা বলতে আমরা বুঝি যা পরিকল্পনা অনুসারে তৈরী করা হয়েছে। তাই এইসব চিহ্ন বা যে রাস্তা অনুসরণ করে প্রাচীনকালের মানুষেরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা যাতায়াত করতেন অথবা তাঁদের গাড়ীগুলি ইউরোপ, মিশর, আরব, ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করত, সেগুলিকে রাস্তা বলা যায় না।

রোমান রাস্তা

মানুষের তৈরী প্রথম যে রাস্তার কথা আমরা জানি, তা রোমানদের তৈরী। স্থায়ীভাবে নির্মিত এই রাস্তাগুলি এমন মজবুত করে তৈরী করা হয়েছিল যে, তার দু হাজার বছর পরে এবং বহু শতাব্দীর অবহেলা সত্ত্বেও তার অনেকগুলি আজও ব্যবহারযোগ্য।

একের পর এক দেশ জয় করে রোমানরা এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। যে দেশেই তাঁরা তাঁদের বিজয় অভিযান চালিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সেই বিজিত দেশে রাস্তা তৈরী করেছেন। এবং সেই সব রাস্তাই এসে মিশেছিল রোমে। তাঁদের এই রাস্তা তৈরীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যাতে সহজে দ্রুত সেনাবাহিনী চলাচল করতে পারে। ক্রমে এই সমস্ত রাস্তায় গমনাগমনের সুবিধার ফলে বাণিজ্য, যোগাযোগব্যবস্থা ও ভাবের আদানপ্রদানের প্রভূত উন্নতি হয়। এগুলি শুধুমাত্র সামরিক শাসনে সম্ভব নয়। এই সমস্ত রাস্তা তৈরী করবার জন্যে স্থানীয় শ্রমিক ও যুদ্ধবন্দীদের নিয়োগ করা হত। অনেক ক্ষেত্রে রোমান সৈন্যরাও রাস্তা তৈরীর কাজে নিযুক্ত হতেন।

খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে ৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রোমানরা ৫০,০০০ মাইল রাস্তা তৈরী করেছিলেন বলে জানা যায়। রোমান সাম্রাজ্যের চরম উন্নতির সময় তাঁদের নির্মিত রাস্তা ইটালীয় উপদ্বীপ থেকে এখন যা স্পেন, ফ্রান্স এবং জার্মানী নামে পরিচিত ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইংল্যাণ্ডেও সে রাস্তা বিস্তৃত হয়েছিল। ক্যালেডোনিয়া (আধুনা স্কটল্যাণ্ড) থেকে দক্ষিণ ইটালী অবধি রাস্তায় যাওয়া সম্ভব ছিল। অবশ্য মাঝখানে ইংলিশ চ্যানেল নৌকায় পার হতে হত। অন্যান্য রাস্তা এশিয়া মাইনর (দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া) পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। মিশরীয় রাস্তাটি রোম থেকে ম্যাসেডোনিয়ার মধ্যে দিয়ে হেলেস্পণ্ট (ডারডানেলেস) পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

আপ্পিয়ান ওয়ে

রোমানদের নির্মিত রাস্তাগুলির মধ্যে আপ্পিয়ান ওয়ে রাস্তাটি সমধিক প্রসিদ্ধ। পর্যটকদের কাছে এই রাস্তাটি সবিশেষ পরিচিত। খৃষ্টপূর্ব ৩১২ অব্দে আপ্পিয়াস ক্লডিয়াস এই রাস্তাটির নির্মাণকার্য শুরু করেন। এই রাস্তাটি চৌদ্দ ফুট চওড়া। এর দুপাশে দূরত্ব নির্দেশক চিহ্ন স্থাপন করা হয়েছিল। এ ছাড়াও ঘোড়সওয়ারদের ঘোড়ার পিঠে ওঠা সহজ করবার জন্যে রাস্তার দুপাশে কিছু দূর দূর উঁচু বেদী স্থাপন করা হয়েছিল। রোম থেকে শুরু হয়ে আপ্পিয়ান ওয়ে ৩৫০ মাইল দূরে ব্রুন্ডিসিয়াম পর্যন্ত এবং তারপর আবার অ্যাড্রিয়াটিক-এর অপর দিক থেকে শুরু হয়ে গ্রীস অতিক্রম করে কনস্ট্যান্টিনোপল্ পর্যন্ত প্রসারিত। আপ্পিয়ান ওয়ে আজও অবধি ব্যবহৃত হচ্ছে। মানুষের তৈরী আর কোন জিনিস এত দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে না।

রোমানদের রাস্তা নির্মাণ প্রণালী

রোমানদের নির্মিত রাস্তাগুলি বেশী চওড়া হত না। সেগুলি সাধারণতঃ পনেরো ফুট চওড়া হত ও তার দুধারে নালা থাকত। অধিকাংশ রোমান রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট মূল কৌশল অনুসরণ করা হত। প্রথমে মাটিতে অগভীর চওড়া একটি পরিখা খনন করা হত। তারপর সেই পরিখাকে পিটিয়ে শক্ত করা হত যাতে রাস্তা নির্মাণের পর তা নীচে থেকে বসে না যায়। এরপর চওড়া পাথরের অনেকগুলি স্তর থাকে থাকে সাজিয়ে ওই পরিখাটিকে ভর্তি করা হত। তাদের ওপরে টুকরো টুকরো আলগা পাথর বা কনক্রীটের (সে আমলে চুণ, জল, বালু এবং পাথরের মিশ্রণ দিয়ে কনক্রীট তৈরী করা হত) আস্তরণ দেওয়া হত। এই স্তরের ওপর আবার আর এক দফা কনক্রীটের আস্তরণ দেওয়া হত। সর্বশেষ আস্তরণটি নির্মিত হত বড় বড় পাথরের চাঁই সাবধানতাসহকারে ঠিক ভাবে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া দিয়ে বসিয়ে। এই স্তরটি সাধারণতঃ প্রায় এক গজ পুরু হত। এই ধরনের রাস্তার দুপাশে পথচারীদের চলাচল করবার জন্যে অপেক্ষাকৃত উঁচু রাস্তা (ফুটপাথ থাকত।

খৃষ্টীয় পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর এই সমস্ত সুন্দর রাস্তাগুলি ক্রমে যত্নের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। তারপর দীর্ঘ তেরশ বছর ধরে ইউরোপের রাস্তাগুলি ক্রমে খারাপ হতে খারাপতর হতে থাকে। সে আমলে কোন শক্তিশালী জাতীয় সরকার ছিল না। কেউই ভাবত না যে, নতুন রাস্তা তৈরী বা যে সমস্ত রাস্তা রয়েছে সেগুলি মেরামত করা প্রয়োজন। কখনও কখনও মঠের সন্ন্যাসীরা নিজেদের মঠের চারিপাশের রাস্তাগুলির যত্ন নিতেন। একসময় এঁদের নাম হয়েছিল

'সেতুনির্মাণকারী সন্ন্যাসীর দল।' এঁরা রাস্তা ও সেতু নির্মাণে এবং সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ যত্নশীল ছিলেন।

এই সময় ইংল্যাণ্ডের রাস্তার এমন হাল ছিল যে, তদানীন্তন রাণী এলিজাবেথ তাঁর জন্যে নবনির্মিত সুসজ্জিত রাজকীয় গাড়ীতে চড়ে লণ্ডনের রাজপথে গমনাগমন করতে অস্বীকার করেছিলেন। কারণ তাঁর ভয় ছিল যে, গাড়ীতে চড়ে রাস্তায় বেরোলে তাঁর মাথা থেকে পা অবধি বেদনায় টন টন করবে। তাই তিনি অন্যান্যদের মত ঘোড়ায় চড়েই বেরোতেন।

মধ্যযুগে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল স্বনির্ভর, স্বয়ংশাসিত এবং পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। সেইজন্যে ভ্রমণের সুযোগও ছিল অল্প এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ধারাও ছিল মন্দগতি। সুতরাং রাস্তা নির্মাণের ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহও ছিল অল্প। স্থানীয় রাস্তাগুলি গৃহপালিত পশুদের যাতায়াতের জন্যেই ব্যবহৃত হত বেশী। এবং সেই কারণে বেশীর ভাগ রাস্তাই ছিল কাঁচা মাটির পথ।

সে আমলে স্থলপথে ভ্রমণ ছিল অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। রাস্তা যে শুধু খারাপ ছিল তাই নয়, তার দুপাশে ওৎ পেতে থাকত দুর্বৃত্তেরা পথচারীকে আক্রমণ করে তার সর্বস্ব লুঠ করে নেবার মতলবে। তাই স্থলপথে স্থানান্তরে যাওয়াটা যখন আর এড়ানো যেত না, তখন ভ্রমণকারীর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁর মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করতে বসতেন।

আর রাস্তারই বা কি হাল ছিল! কাদায় ভর্তি। বিরাট বিরাট গর্ত। ইংল্যাণ্ডের সাসেক্স অঞ্চলের অধিবাসীদের কথা উঠলে লোকে তখন বলে উঠত, 'ও, সেখানকার লোকজনদের তো কাদা থেকে পা টেনে তোলার জন্যে পাগুলো বেশ বড় বড়।' তৃতীয় এডওয়ার্ডের আমলে তো রাস্তার দুরবস্থার ফলে সদস্যরা সময়মত এসে পৌঁছতে পারেন নি বলে পার্লামেন্টের অধিবেশনই একদিন স্থগিত রাখতে হল।

তবু এই দীর্ঘ সময় ধরে এইসব রাস্তাই ছিল বর্ণাঢ্য। তার ওপর দিয়ে বণিক যেত দূরদূরান্তরে ব্যবসা করতে, পর্যটক যেত ভ্রমণে, রাজা-মহারাজা-জমিদাররা যেতেন দেশবিজয়ে বা প্রমোদভ্রমণে, ভিক্ষুক যেত ভিক্ষা করতে। আর অভাব ছিল না তার ওপর সাধারণ পথচারীর।

আধুনিক রাস্তা নির্মাণের শুরু

রাস্তা নির্মাণের সত্যিকার শুরু হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে। জন লাউডন ম্যাকঅ্যাডাম (১৭৫৬-১৮৩৬) এবং টমাস টেলফোর্ড (১৭৫৭-১৮৩৪) নামে স্কটল্যাণ্ডের দুজন অধিবাসী আধুনিক রাস্তা নির্মাণের পথিকৃত।

ম্যাকঅ্যাডামই প্রথম বলেন যে, রাস্তা তৈরীর জন্যে পাথরের ভিত্তির খুব বেশী প্রয়োজন নেই। তিনি দেখান যে, এক ফুট বা তার একটু বেশী গভীর করে পাথরের ছোট ছোট টুকরো ছড়িয়ে দিলে বেশ ভাল, মসৃণ, শক্ত তল তৈরী করা সম্ভব। ওই পাথরের আলগা টুকরোগুলি ক্রমে বসে যাবে এবং তার ওপর দিয়ে ভারী গাড়ী ক্রমাগত যাতায়াত করতে থাকলে ওইসব পাথরের কিছু গুঁড়িয়ে ধুলা হয়ে যাবে ও বৃষ্টি পড়লে তা পাথরের অন্যান্য টুকরোগুলিকে জমাট করে দেবে। কালক্রমে এইভাবে জমাট পাথরগুলি মসৃণ, শক্ত ও মজবুত রাস্তা তৈরী করবে।

টেলফোর্ড ম্যাকঅ্যাডামের প্রদর্শিত পদ্ধতির একটু রকমফের করে রাস্তা নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। তিনি বড় বড় পাথর দিয়ে রাস্তার ভিত্তি স্থাপন করেন। ওইসব পাথরের মধ্যে জল নিষ্কাশনের জন্যে বেশ একটু ফাঁক রাখা হত। তারপর পাথরের ওই শক্ত ভিত্তির ওপর প্রথমে পাথরের ছোট ছোট টুকরো ছড়িয়ে দিয়ে তার ওপর পাথরকুচি ছড়িয়ে দেওয়া হত।

মোটরগাড়ীর প্রচলন হলে এইভাবে রাস্তা তৈরী করা আর সম্ভব হল না। কারণ দ্রুতগতি মোটরগাড়ীর রবারের চাকা এই ধরনের রাস্তায় চলাচলের উপযোগী নয়। তাছাড়া রবারের চাকা পাথর গুঁড়িয়ে যথেষ্ট পরিমাণ ধুলা সৃষ্টি করার অনুপযোগী। সর্বোপরি, যেটুকু ধুলা উৎপন্ন হয়, তা-ও দ্রুত চলমান চাকার দাপটে উড়ে যায়। ফলে আলগা পাথরের টুকরোগুলিই শুধু পড়ে থাকে।

তবু এইভাবে রাস্তা নির্মাণের পদ্ধতি পৃথিবীর বহুলাংশে আজও অব্যাহত আছে। অনেক সময় অবশ্য এই সমস্ত রাস্তা নির্মাণের সময় বিশেষ এক ধরনের পদার্থ ব্যবহার করা হয় যা রাস্তাগুলিকে জল দ্বারা অভেদ্য করে এবং মাটি বা পাথরের টুকরোগুলিকে দৃঢ়ভাবে পরস্পরের সঙ্গে আটকে থাকতে সাহায্য করে।





রাস্তা তৈরী

পীচের রাস্তা

সাধারণ পীচের রাস্তার ভিত্তি খুব দৃঢ় না হলে তার ওপর দিয়ে সাধারণ যানবাহন, মোটরগাড়ী ও কিছু কিছু লরী স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারে। ভিত্তি যদি দৃঢ় হয় তবে তার ওপর দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল করতে পারে।

এই ধরনের রাস্তা তৈরী করবার জন্যে প্রথমে পাথরের ছোট টুকরো ছড়িয়ে দিয়ে তারপর তার ওপর উত্তপ্ত তরল পীচ বা আলকাতরা জাতীয় পদার্থ ঢেলে দিলে, তা পাথরের টুকরোগুলির ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে তার ওপর একটি আস্তরণ ফেলে এবং সেগুলিকে জমাট বাঁধিয়ে দেয় ও তাকে জল দ্বারা অভেদ্য করে। এই সময় তার ওপর রোলার চালাতে হয়। ফলে রাস্তাটি ক্রমে মসৃণ হয়।

রাস্তা নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়

প্রথমে যেখানে রাস্তা তৈরী হবে সে স্থানটি জরিপ করা হয়। তারপর তার নক্সা তৈরী করা হয়। এ সমস্ত কাজ হয়ে গেলে পথের অন্তরায় হিসাবে যেসব গাছপালা বা অন্যান্য জঞ্জাল থাকে সেগুলিকে কুড়ুল দিয়ে অথবা বুলডোজার দিয়ে কেটে ফেলে ওই স্থানটিকে পরিষ্কার করা হয়।

অ্যাসফাল্টের রাস্তা

অ্যাসফাল্টের রাস্তাও ভারী যানবাহন চলাচলের উপযোগী। এই ধরনের রাস্তা বেশ মসৃণ হয় এবং সহজেই তা পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়। এই রাস্তার ওপরের তলটি বালু এবং অ্যাসফাল্ট-সিমেন্টের মিশ্রণ দ্বারা তৈরী করা হয়। এই ধরনের রাস্তা সাধারণতঃ ছয় থেকে নয় ইঞ্চি গভীর কন্‌ক্রীটের ভিত্তির ওপর নির্মিত হয় ফলে এর ভিত্তি খুব দৃঢ় হয়।

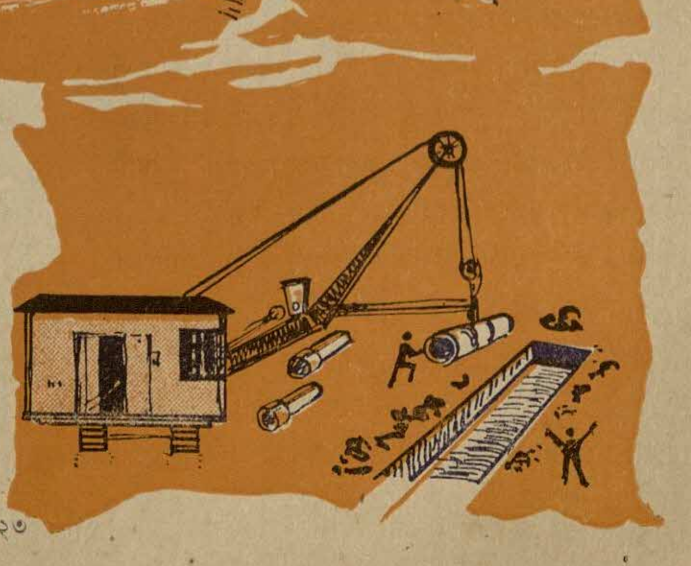
স্বাভাবিক তাপমাত্রায় অ্যাসফাল্ট শক্ত জমাট বেঁধে থাকে। তাকে প্রথমে যেখানে রাস্তা তৈরী হবে সেখানে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়; তারপর তাকে গরম করে গলিয়ে নেওয়া হয় যাতে সহজেই তাকে রাস্তায় ছড়িয়ে দেওয়া যায়। ওই তরল অ্যাসফাল্ট রাস্তায় ছড়িয়ে দেবার পর তা গরম থাকতে থাকতেই তার ওপর রোলার চালানো হয়।

হাইওয়ে

হাইওয়ে সাধারণতঃ সিমেন্ট দিয়ে তৈরী করা হয়। সিমেন্ট দিয়ে তৈরী রাস্তা বহুদিন টেঁকে, সহজেই তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায় এবং তার ওপর গাড়ী পিছলে দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা কম। এই ধরনের রাস্তা তৈরী করতে প্রথমে বেশ খরচ পড়ে, কিন্তু অন্যান্য রাস্তার তুলনায় এর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ অনেক কম। ভারী যানবাহন চলাচলের উপযোগী এই ধরনের কন্‌ক্রীটের রাস্তার মধ্যিখান প্রায় সাত-আট ইঞ্চি পুরু হয়। রাস্তার দু ধারে দু ফুট মত জায়গা যেখানে চাপ বেশী পড়ার ফলে বাড়তি শক্তির প্রয়োজন হয়, সেখানে তা আরও বেশী পুরু।



তারপর কম্প্রেসার দিয়ে চালিত ড্রিলের সাহায্যে বিস্ফোরক পদার্থ স্থাপন করবার জন্যে গর্ত করা হয়। ওই বিস্ফোরক সাধারণতঃ পাহাড় ইত্যাদি ফাটাবার জন্যে ব্যবহার করা হয়। বিস্ফোরকের সাহায্যে পাহাড় ফাটিয়ে সামনের রাস্তা পরিষ্কার করা হলে প্রয়োজনমত আবার বুলডোজারের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। রাস্তা নির্মাণে পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই সে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করবার জন্যে নির্মীয়মান রাস্তার পাশে গর্ত করে ক্রেনের সাহায্যে তার মধ্যে পাইপ স্থাপন করা হয়।





বড় বড় পাথরের চাঁই টুকরো করা হচ্ছে

ভারতীয় রাস্তা

পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে যেভাবে রাস্তার শুরু হয়েছে, ারতবর্ষেও সেইভাবে রাস্তার শুরু হয়েছে। কবে যে ারতবর্ষে প্রথম উন্নত ধরনের রাস্তা নির্মাণ শুরু হয়েছে া অনুমানসাপেক্ষ। তবে সিন্ধু সভ্যতার আমলে খৃষ্টপূর্ব ৫০০ বছর আগেও মহেঞ্জোদাড়ো (অধুনা সিন্ধু) এবং রপ্পায় (অধুনা পাঞ্জাব) ইঁটের ছোট ছোট রাস্তা ও লনিষ্কাশন ব্যবস্থা ছিল বলে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই মস্ত রাস্তার অধিকাংশই ত্রিশ ফুট চওড়া হত। সম্রাট শোকের আমলেও যে ভারতবর্ষে উন্নত ধরনের রাস্তা ল সেকথা বলা যায়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সম্রাটের মলে ভারতবর্ষে রাস্তার ক্রমোন্নতি হয়। ভারতবর্ষের ীর্ঘ ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে এক কটি রাজকীয় শক্তির আবির্ভাব হয়, সুতরাং সে সময় রতীয় রাস্তা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড

প্রথম যে উন্নতমানের দীর্ঘ রাস্তার কথা আমরা ইতিহাসে পাই তা হচ্ছে সম্রাট শের শাহ নির্মিত অধুনা পরিচিত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। যতদূর জানা যায় সাসারাম থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত এই রাস্তা বিস্তৃত ছিল। তারপর মুঘল সম্রাটেরা সৈন্যবাহিনী চলাচলের সুবিধার জন্যে এর ক্রমোন্নতি করেন। ইংরেজরা যখন ভারতবর্ষে তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু করলেন তখন তাঁরাও সৈন্যবাহিনী চলাচলের সুবিধার জন্যে রাস্তার ক্রমোন্নতির দিকে মনোনিবেশ করলেন। এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে যে, পৃথিবীর সর্বত্রই যখনই কোন শক্তি কোন অঞ্চলে তার সামরিক প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছে তখনই সে দ্রুত সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করার জন্যে ওই অঞ্চলে উন্নত রাস্তা তৈরী করার দিকে মনোনিবেশ করেছে। সাধারণ মানুষ তার সুযোগ নিয়েছে মাত্র। যাইহোক, শের শাহ যে রাস্তা শুরু করেছিলেন, মুঘল সম্রাটরা যে রাস্তার সযত্ন রক্ষণাবেক্ষন করেছেন, ইংরেজরা ভারতবর্ষে তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তার করবার জন্যে দ্রুত সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতে গিয়ে প্রথমেই সেই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উন্নতির দিকে তাঁদের

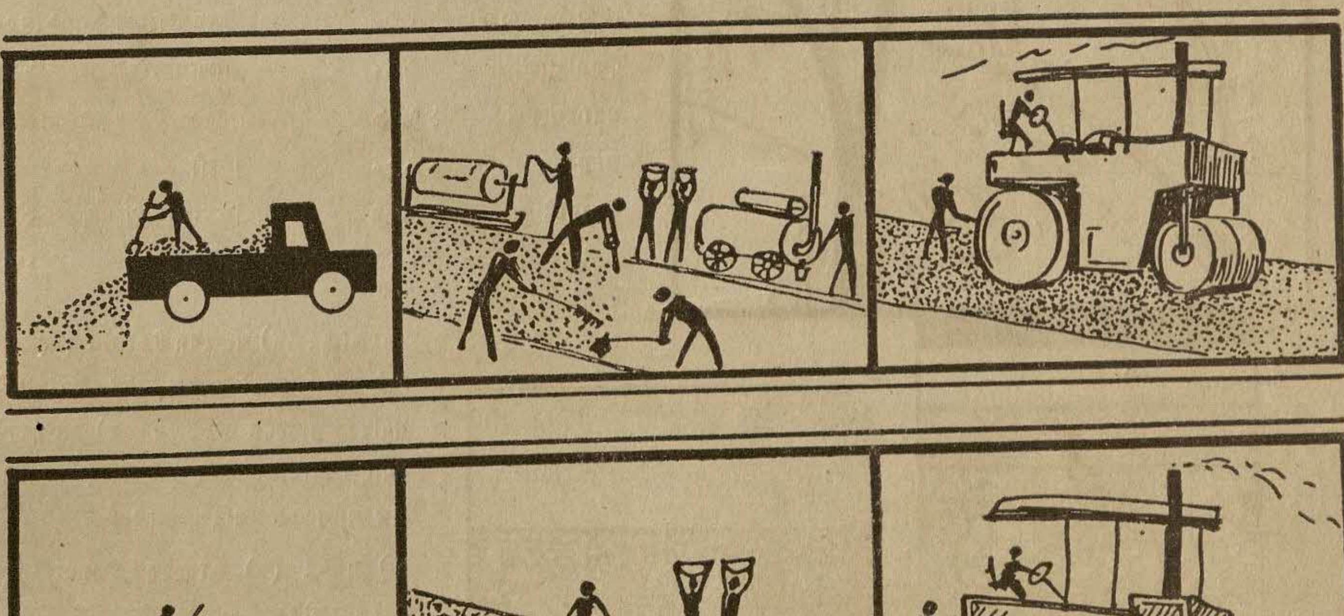
দৃষ্টি ফেরালেন। ১৮৩৯ সালে কলিকাতা থেকে দিল্লী অবধি গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের অংশটুকুকে উন্নত করা হল। তারপর লর্ড ডালহৌসীর আমলে লাহোর থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের অংশটুকুকে উন্নত করা হল। এর ফলে কলিকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ মাইল রাস্তা সৈন্যবাহিনীর দ্রুত চলাচলের জন্যে উন্মুক্ত হল। বস্তুতঃ এরপর ইংরেজরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব রাস্তা নির্মাণ করেছেন, তা পুরনো মুঘল আমলের রাস্তার উন্নতিকরণ মাত্র। নতুন রাস্তা তাঁরা বিশেষ কিছু তৈরী করেন নি।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ইংরেজরা ভারতীয় রাস্তার ক্রমোন্নতির দিকে নজর দেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় উন্নত ধরনের রাস্তার অভাবের ফলে সৈন্যবাহিনী চলাচলের যে বিঘ্ন ঘটে, সেই অভিজ্ঞতাই তাঁদের এদিকে দৃষ্টি ফেরাতে বাধ্য করে। কিন্তু এর কিছু পরেই আরেকটি ঘটনা আবার রাস্তার উন্নতির বাধা হয়ে দাঁড়ায়—তা হচ্ছে রেলগাড়ীর আবিষ্কার। ইংল্যাণ্ডে রেলগাড়ীর আবিষ্কার হলে ইংরেজরা ভারতবর্ষেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে রেলগাড়ী চলাচলের বন্দোবস্ত করতে থাকেন। কারণ রেলগাড়ীতে আরও দ্রুত সেনাদল পাঠানো যায়। সুতরাং রাস্তার ক্রমোন্নতি আবার ব্যাহত হল।

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষে মোটরগাড়ীর বহুল প্রচলন হলে আবার উন্নতমানের রাস্তার প্রয়োজন হল। কিছু কিছু রাস্তা নির্মাণও হল। কিন্তু সে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করলে সামরিক দিক দিয়ে ভারতবর্ষের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ল। ভারতবর্ষের মধ্যে দিয়েই মিত্র পক্ষের সৈন্যবাহিনী চলাচল শুরু করল। রণাঙ্গনে রসদ সম্ভার পাঠাবার জন্যে রাস্তার প্রয়োজনটা রাতারাতি বেড়ে গেল। সামরিক প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে রাস্তাও নির্মিত হতে থাকল দ্রুত।

ওইসব পাথরের টুকরো যেখানে রাস্তা তৈরী হচ্ছে সেখানে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তা রাস্তায় ছড়িয়ে (ওপরের ছবি) তার ওপর উত্তপ্ত তরল অ্যাসফাল্ট বা পীচ ঢেলে তার ওপর রোলার চালানো হয়। কন্‌ক্রীটের রাস্তা তৈরী করতে হলে (নীচের ছবি) ওই পাথরের টুকরোগুলিকে মেশিনের মধ্যে সিমেন্ট ইত্যাদির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে রাস্তায় ফেলা হয় এবং তার ওপর রোলার চালানো হয়।





যুদ্ধোত্তরকালেও রাস্তা নির্মাণের কাজ অথবা যে রাস্তাগুলি ছিল সেগুলিকে মেরামত করার কাজ বন্ধ রাখা হল না।

তারপর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল। নীচের তালিকাটি স্বাধীনতার পর থেকে ভারতীয় রাস্তার ক্রমোন্নতির রূপটি স্পষ্ট করে ঃ


রাস্তার ভিত্তি

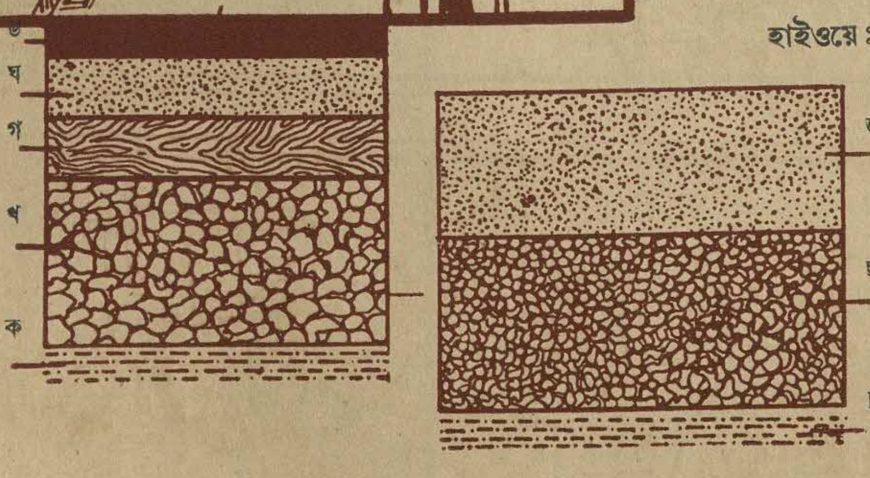
	১৯৪৭	১৯৫১	১৯৫৬	১৯৬১
পাকা রাস্তা	৯০,৬৩০ মাইল	৯৭,৫৬৭ মাইল	১,১৩,৭২৫ মাইল	১,৪৬,৫১৩ মাইল
কাঁচা রাস্তা	১,৫০,৬০২ "	১,৫০,৯৪৫ "	১,৯৫,৯৩১ "	২,৯৪,১১৩ "
মোট	২,৪১,২৩২ "	২,৪৮,৫১২ "	৩,০৯,৬৫৬ "	৪,৪০,৬২৬ "

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৬১-৬৬) আরও ১৮,৮০০ মাইল (২৫,০০০ মাইলের মধ্যে) পাকা রাস্তা এবং ৭০,০০০ মাইল কাঁচা রাস্তা নির্মিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৬ সালে এক আইন পাশ করে জাতীয় সড়ক নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। বর্তমানে ভারতবর্ষে ১৪,৯২৫ মাইল জাতীয় সড়ক আছে—

রাজ্য	মাইল	রাজ্য	মাইল
অন্ধ্র প্রদেশ	১,৪১২	উড়িষ্যা	৮৫২
আসাম	৮৩৭	নাগাল্যাণ্ড	৬৯
বিহার	১,১৬৭	পাঞ্জাব	৭৮৪
গুজরাট	৬৭৬	রাজস্থান	৭৮২
জম্মু ও কাশ্মীর	৩৩৮	উত্তর প্রদেশ	১,৪৫৫
কেরালা	২৬০	পশ্চিম বঙ্গ	৮৯৪
মধ্য প্রদেশ	১,৬৬৯	কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	
মাদ্রাজ	১,০৫০	দিল্লী	৪৫
মহারাষ্ট্র	১,৪৮৭	হিমাচল প্রদেশ	২০০
মহীশূর	৮১৬	মণিপুর	১৩২





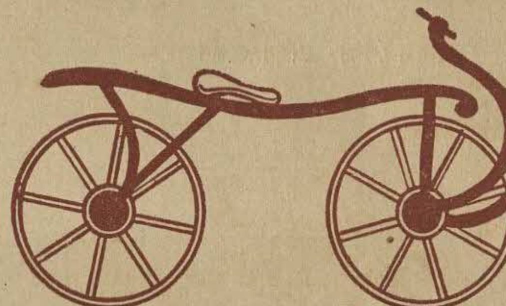
হাইওয়েঃ (ক) মাটি ; (খ) পাথরের টুকরো ; (গ) আধ ইঞ্চি পুরু পাথরকুচির সঙ্গে মিশ্রিত অ্যাসফাল্ট সমন্বিত পাথরের টুকরো ; (ঘ) অ্যাসফাল্ট সমন্বিত পাথরের টুকরো এবং (ঙ) দ্বিতীয় প্রস্থ অ্যাসফাল্ট সমন্বিত তল।

(চ) মাটি ; (ছ) পাথরের টুকরো এবং (জ) কনক্রীট।



আধুনিক সাইকেল

সাইকেল



ড্যাণ্ডী হর্স



হবি হর্স ১৮৪০

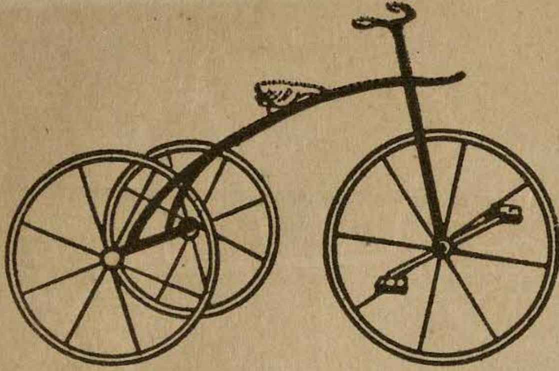
এ পর্যন্ত সমস্ত রকম গাড়ীতেই দুটি চাকা পাশাপাশি লাগানো হত। মানুষ সেইভাবেই গাড়ী তৈরী করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। একটি চাকার পেছনে আর একটি চাকা লাগিয়ে যে গাড়ী তৈরী করা সম্ভব, সে কথা তখনও তার মাথায় আসে নি। এল ফরাসী বিপ্লবের সমসাময়িককালে।

ফরাসী বিপ্লবের সময় ১৭৯০ সাল নাগাদ দুটি ভারী চাকার একটিকে আর একটির পেছনে রেখে তাদের ওপর একটি কাঠের দণ্ড স্থাপন করে পৃথিবীর প্রথমতম সাইকেলটি তৈরী করা হয়। এই ধরনের সাইকেলগুলিতে কোন ব্রেকের বন্দোবস্ত ছিল না, কোন স্টিয়ারিং ছিল না এবং কোন প্যাডেল ছিল না। আরোহীকে মাটিতে পায়ের চাপ দিয়ে এটিকে ঠেলে নিয়ে যেতে হত। নতুন ধরনের এই গাড়ীটি ধনী যুবকদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং তাঁরাই এটি বেশী ব্যবহার করতেন বলে ড্যাণ্ডী হর্স নামে এটি পরিচিত হয়।

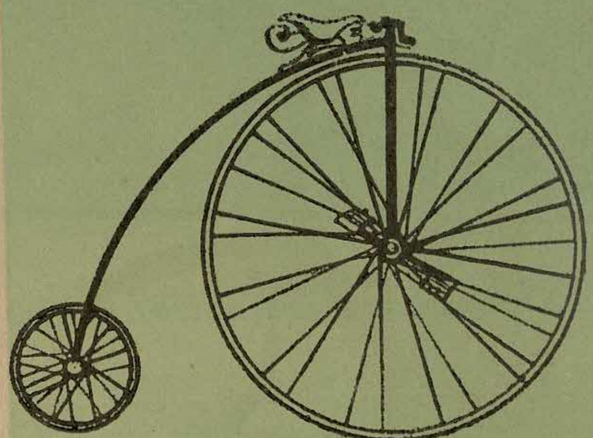
১৮১৬ সালে জার্মানীর ব্যারণ কার্ল ড্রেইস ভন সয়্যেরব্রন সর্বপ্রথম উন্নত ধরনের একটি ড্যাণ্ডী হর্স তৈরী করেন। তিনি ছিলেন একজন বন-আধিকারিক। বনের রাস্তায় এই গাড়ী চালিয়ে বন পরিদর্শন করাটা তাঁর পক্ষে বেশ সহজসাধ্য হয়েছিল। তাঁর নামানুসারে এই ধরনের গাড়ীগুলির নামকরণ করা হয় ড্রেইসাইন।



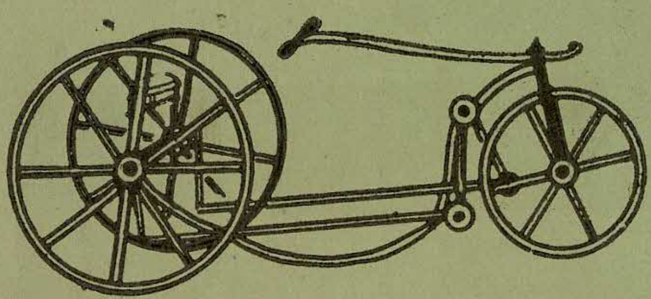
বোন শেকার ১৮৬০



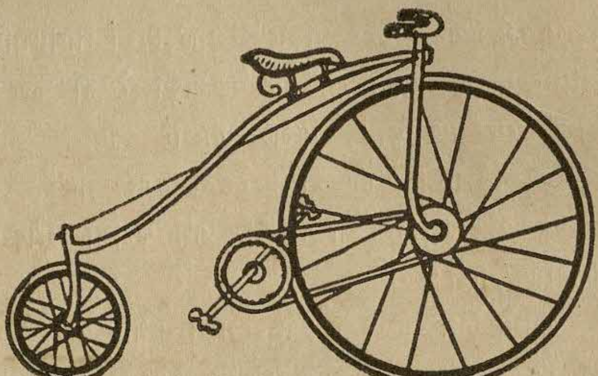
বোন শেকার ট্রাইসাইকেল ১৮৬৯



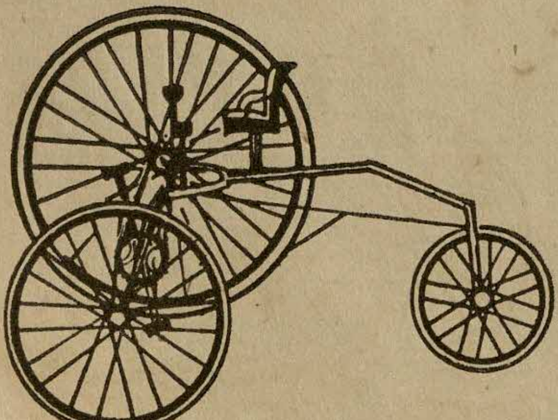
পেনিফার্দিং ১৮৮০



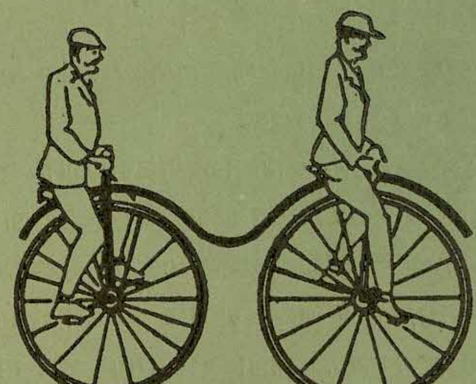
ডাব্‌ল্‌ ড্রিভেন ট্রাইসাইকেল ১৮৭০



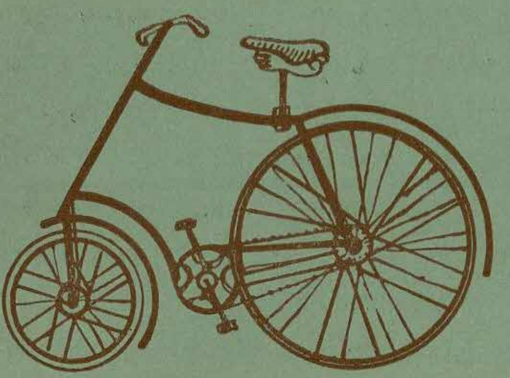
অ্যাড্‌জাস্ট্যাব্‌ল্‌ সেফ্‌টি ১৮৮৪



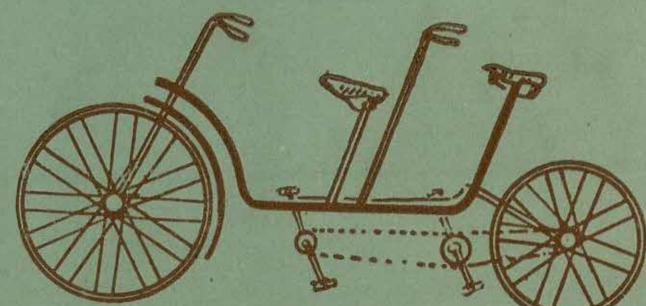
রিয়ার স্টিয়ারিং ট্রাইসাইকেল ১৮৮০



ব্লাকার টানডেম ১৮৮৪

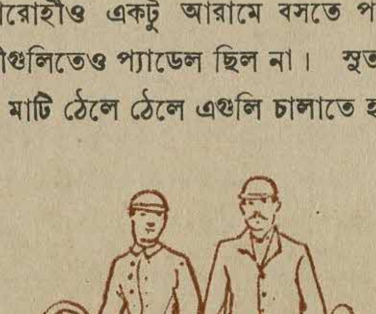


হাম্বার সেফ্‌টি ১৮৮৫



ইনভিন্‌সিব্‌ল্ ট্যানডেম ১৮৮৮

এতে একটি হ্যাণ্ডেল এবং বসবার জন্যে আসন ছিল। ফলে এই ধরনের গাড়ীগুলিকে ইচ্ছামত চালানো যেত এবং আরোহীও একটু আরামে বসতে পারতেন। কিন্তু এই গাড়ীগুলিতেও প্যাডেল ছিল না। সুতরাং আরোহীকে পা দিয়ে মাটি ঠেলে ঠেলে এগুলি চালাতে হত।



সোসিয়্যাবল্ ট্রাইসাইকেল ১৮৮৭

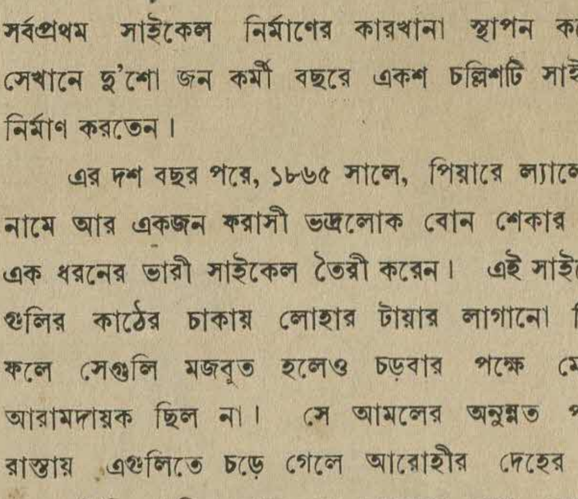


কভেন্ট্রি রোটারী ট্যান্‌ডেম ১৮৮৭

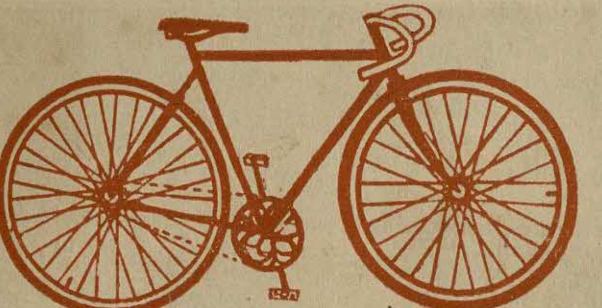
১৮৩৯ সালে কার্কপ্যাট্রিক ম্যাকমিলান নামে স্কট-ল্যাণ্ডের এক কর্মকার সর্বপ্রথম উন্নত ধরনের একটি ভারী সাইকেল তৈরী করেন। এতে প্যাডেল ছিল এবং ইচ্ছামত চাকা ঘোরাবার জন্যে হ্যাণ্ডেলের বন্দোবস্তও ছিল।

এরপর ১৮৫৫ সালে ফ্রান্সের আর্নেস্ট মিচক্স আরও উন্নত ধরনের একটি সাইকেল তৈরী করেন যাতে প্যাডেলটি সামনের চাকার বাঁটে লাগানো ছিল। তিনিই সর্বপ্রথম সাইকেল নির্মাণের কারখানা স্থাপন করেন। সেখানে দু'শো জন কর্মী বছরে একশ চল্লিশটি সাইকেল নির্মাণ করতেন।

এর দশ বছর পরে, ১৮৬৫ সালে, পিয়ারে ল্যালেমেণ্ট নামে আর একজন ফরাসী ভদ্রলোক বোন শেকার নামে এক ধরনের ভারী সাইকেল তৈরী করেন। এই সাইকেল-গুলির কাঠের চাকায় লোহার টায়ার লাগানো ছিল। ফলে সেগুলি মজবুত হলেও চড়বার পক্ষে মোটেই আরামদায়ক ছিল না। সে আমলের অনুন্নত পাথুরে রাস্তায় এগুলিতে চড়ে গেলে আরোহীর দেহের হাড় শুদ্ধ কাঁপিয়ে দিত বলে এর নামকরণ করা হয়েছিল বোন শেকার।



সাইকেলের চেন
(ক) পিন; (খ) রোলার;
(গ) কানেকটিং প্লেট এবং
(ঘ) জোড়া দেওয়া আংটা



মডার্ন সেফ্‌টি

এতদিন পর্যন্ত যত নতুন নতুন উন্নততর ধরনের সাইকেল তৈরী হয়েছিল, তাতে প্যাডেলটি সামনের চাকায় লাগানো থাকত। অর্থাৎ প্যাডেলটি একবার ঘোরালে সামনের চাকাটিও একবার ঘুরত। সুতরাং সামনের চাকাটি যত বড় হত, সাইকেলটিও তত দ্রুত চলত। ফলে সামনের চাকাটি ক্রমে বড় হতে হতে এমন অবস্থায় পৌঁছল যে, তার উচ্চতা দাঁড়াল প্রায় পাঁচ ফুট।

আরোহীকে এই ধরনের সাইকেলে চাপতে হলে রাস্তার পাশে কোন ল্যাম্প পোস্টের গায়ে সাইকেলটিকে হেলান দিয়ে রেখে তবে তাতে চাপতে হত। আবার এই সমস্ত সাইকেলে ব্রেকের তেমন বন্দোবস্ত ছিল না; সুতরাং দুর্ঘটনা এড়াতে হলে আরোহীকে সাইকেলের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়তে হত—এবং অত ওপর থেকে ঝাঁপ দেওয়াটাও মুখের কথা নয়।

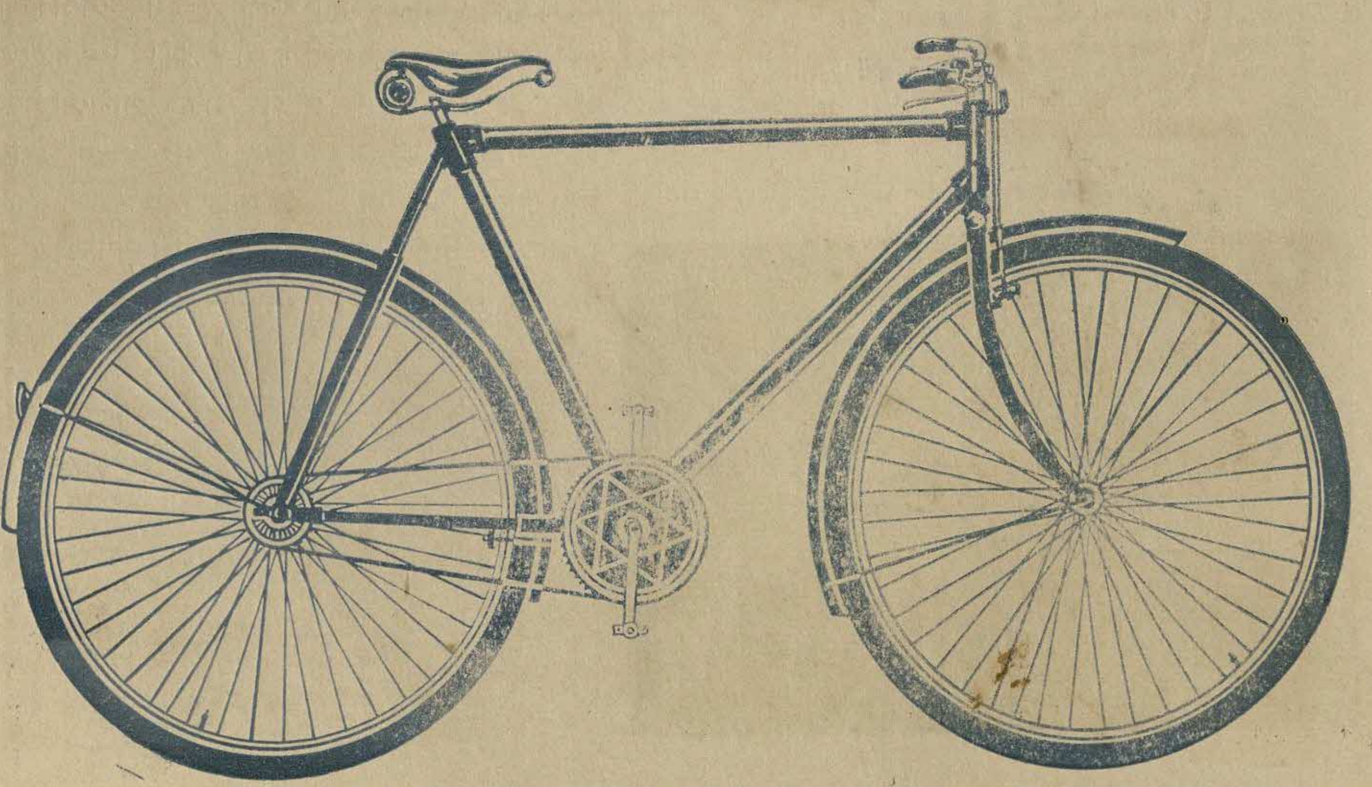
অবশেষে এই সমস্ত অসুবিধার অবসান হল সাইকেলে শিকল বা চেন ব্যবহার করে। এই চেনটি প্যাডেলের হুইলকে পিছনের চাকার অ্যাক্সেলের ওপর স্থাপিত দাঁতওয়ালা চাকার সঙ্গে সংযুক্ত করল। এখন প্যাডেলটিকে একবার ঘোরালেই পিছনের চাকাটি বেশ কয়েকবার পাক খেতে শুরু করল। সুতরাং সামনের চাকাটিকে আর অতিকায় করবার প্রয়োজন রইল না।

ক্রমে ১৮৭৬ সালে ইংরেজ আবিষ্কারক এইচ. জে. লসন-এর হাতে সাইকেল আধুনিক সাইকেলের রূপ নিতে লাগল।

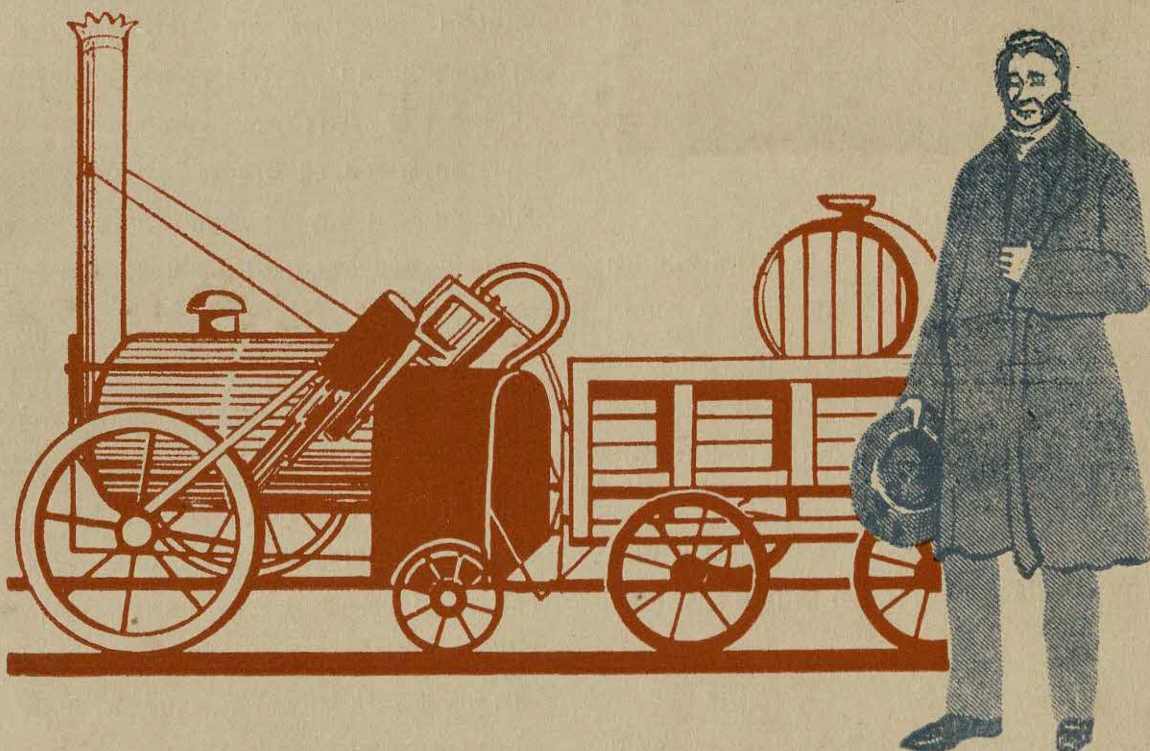
১৮৮৫ সালে ইংল্যাণ্ডে নির্মিত সেফ্‌টি বাই-সাইকেলে একটি চেন এবং এক মাপের দুটি চাকা লাগানো হল।

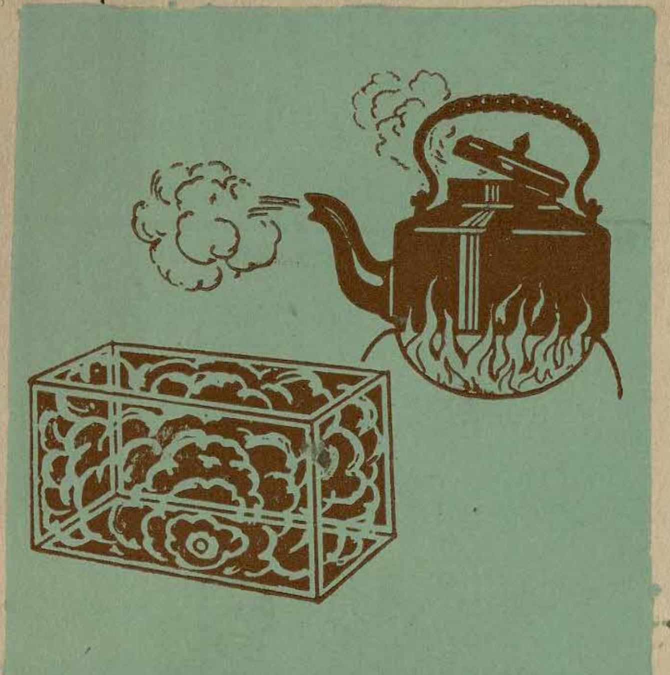
১৮৮৯ সালে ইংল্যাণ্ডের জন ডানলপ সাইকেলের চাকায় রবারের টায়ার লাগালে সাইকেলের আধুনিক রূপটি সম্পূর্ণ হল।

আধুনিক সাইকেল



রেলগাড়ী





বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের আবিষ্কার

অন্যান্য সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মত বাষ্পচালিত যানবাহন আবিষ্কারের কৃতিত্বের অংশীদারও মিলিতভাবে অনেকে। প্রত্যেকেই তাঁর পূর্বসূরীর পরিশ্রমের ফল ব্যবহার করেছেন। এবং তাঁদের সবাইর পরিশ্রমের মিলিত যোগফল হচ্ছে রেলের ওপর চলমান চাকা।

তাপশক্তিকে যে মানুষের কাজে লাগানো যেতে পারে সে তথ্য সম্ভবতঃ প্রথম আবিষ্কার করেন খৃষ্টপূর্ব দু হাজার বছর আগে গ্রীক গণিতজ্ঞ এবং পদার্থবিজ্ঞানী আলেকজান্দ্রিয়ার হিরো। তারপর বহু শতাব্দী গত হয়েছে, এ নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামান নি। ১৫৪৩ সালে একজন স্পেনীয় একটি বাষ্পচালিত নৌকা তৈরী করে সেটিকে বার্সিলোনা উপসাগরে চালিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। ১৬২৯ সালে গিওভানী ব্রান্‌কা নামে একজন ইটালীয় ইঞ্জিনীয়ার একটি নলের ভিতর দিয়ে বাষ্প এনে সেই বাষ্প একটি হুইলের ওপর ফেলে হুইলটিকে আধুনিক টারবাইনের মত ঘুরিয়েছিলেন। অবশেষে, ১৬৯৮ সাল নাগাদ টমাস স্যাভেরী নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক বাষ্পকে কাজে লাগান।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পাপিন নামে একজন ফরাসী এবং টমাস নিউকমেন নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক স্যাভেরীর ইঞ্জিনের বহু উন্নতি সাধন করেন। তাঁরাই ইঞ্জিনে সিলিণ্ডার এবং পিস্টনের ব্যবহার চালু করেন। এই ব্যবস্থায় বাষ্প সিলিণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করে পিস্টনটিকে ধাক্কা দিয়ে সামনে-পিছনে চালায় এবং ফলে ইঞ্জিনটি কাজ করে। আজও অবধি প্রতিটি বাষ্পচালিত ইঞ্জিনেরই এ দুটি অত্যন্ত অপরিহার্য অংশ। সে আমলে খনি থেকে জল তুলে ফেলবার জন্যে ইংল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডে এই ইঞ্জিনের বহুল প্রচলন ছিল।

গল্পটা আমরা সবাই জানি।

জেমস ওয়াটের ছেলেবেলার কথা। জলভর্তি কেটলি উনুনে চাপিয়ে মা গেছেন ওদিকে অন্য কি এক কাজে। এদিকে জল ফুটে উঠেছে। গরম বাষ্পের ঠেলা খেয়ে কেটলির ঢাকনিটা ওঠা-নামা করছে। আর সেই শব্দ গানের সুর হয়ে বালক ওয়াটের কানে বাজল যেন। বিস্ময়ে-চিন্তায় তন্ময় হয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন সেদিকে।

মা বোঝেন নি। বাবা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ওয়াট দেখেছিলেন তার মধ্যে আধুনিক যন্ত্রযুগের জন্মলক্ষণ।

* * *

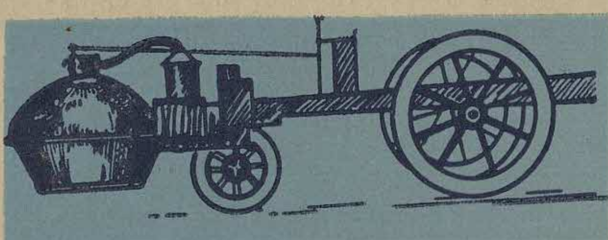
এক পেয়ালা জল দিয়ে বিশ মণ ওজনের একটা পাথর তোলা সম্ভব—এ কথাটা তিনশ বছর আগে বললে বক্তাকে হয়ত পাগলা গারদে রাখা হত। কিন্তু ওয়াটের অনুসন্ধিৎসার ফলে তাই সম্ভব হয়েছে আজ।

জলকে ফুটলে যে গ্যাস হয়, তাই হচ্ছে বাষ্প। তার শক্তির উৎস হচ্ছে যে, বাষ্প প্রায় ষোল শ গুণ বেশী প্রসারিত হয় অর্থাৎ যে পরিমাণ জল থেকে বাষ্পের উৎপত্তি তার চেয়ে ষোল শ গুণ বেশী জায়গা তার প্রয়োজন হয়।

সাধারণ অবস্থায় অবশ্য জল ফুটলে বাষ্প হয়ে তা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। কিন্তু বদ্ধ প্রকোষ্ঠে উৎপন্ন করে যদি বাষ্পের চাপকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা যায়, তবে তা অসাধ্য সাধন করতে পারে।

এইটাই মূল কথা।

১৭৬৪ সালে জেমস ওয়াট নামে গ্ল্যাসগোর এক যন্ত্রপাতিনির্মাতাকে এই রকম একটি ইঞ্জিন মেরামত করবার জন্যে ডাকা হয়। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার সেটি ছিল এক পরম শুভদিন। ওয়াট অনায়াসেই ইঞ্জিনটিকে সারিয়ে দেন, কিন্তু ইঞ্জিনটির যান্ত্রিক কলাকৌশল তাঁকে আকৃষ্ট করে। গভীরভাবে পরীক্ষা করে তিনি দেখেন যে, ইঞ্জিনটির নির্মাণে বহু গলদ আছে। ফলে অনেক জ্বালানীর অপচয় হচ্ছে। তার থেকে আরও ভাল একটি ইঞ্জিন তৈরী করতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। পাঁচ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৭৬৯ সালে তিনি প্রথম সফল বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। তাঁর ইঞ্জিনও কয়লার খনি থেকে জল তোলার কাজে ব্যবহৃত হত।



স্বয়ংচালিত গাড়ীর শুরু: ক্যনিও-র বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের সাহায্যে চালিত গাড়ী

১৭৭০ সালে ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার নিকোলাস জোসেফ ক্যনিও সর্বপ্রথম একটি তিন চাকার গাড়ীতে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ব্যবহার করে স্বয়ংচালিত গাড়ীর সূচনা করেন।

এখন ক্যনিওর সেই গাড়ীটি প্যারিসের এক যাদুঘরে রক্ষিত আছে। রেলগাড়ী, মোটর গাড়ী, ইলেকট্রিক ট্রেন, এ সবেরই বৃদ্ধ প্রপিতামহ হচ্ছে ক্যনিওর সেই গাড়ীটি।

তারপরের ইতিহাস দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এক ভাগে রয়েছে মোটরগাড়ীর ক্রমোন্নতি, আরেক ভাগে রয়েছে রেলগাড়ীর ক্রমবর্ধমান উন্নতি এবং জনপ্রিয়তা ও তার ফলে যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি।

এ পর্যন্ত বাষ্পচালিত ইঞ্জিন দ্বারা চালিত সমস্ত গাড়ীই রাস্তার ওপর দিয়ে যেত; রেলের ওপর দিয়ে নয়। সুতরাং সেগুলিকে রেলগাড়ী বলা যায় না। সেগুলি সম্বন্ধে 'মোটরগাড়ী' পর্যায়ে আমরা বিশদ আলোচনা করব।

সে আমলে কয়লাখনি থেকে কয়লা নিকটতম বন্দরে নিয়ে আসবার জন্যে সমস্ত রাস্তাটার ওপর কাঠের রেল পাতা থাকত। এই রেলের ওপর দিয়ে তখন ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে করে কয়লা বওয়া অনেক সহজসাধ্য ছিল।

১৭৬৭ সালে ইংল্যাণ্ডের কোলব্রুকডেল আয়রণ ওয়ার্কস সর্বপ্রথম লোহার রেল তৈরী করেন।

১৮০৪ সালে ইংল্যাণ্ডের রিচার্ড ট্রেভিথিক লোহার রেলের ওপর দিয়ে সর্বপ্রথম বাষ্পচালিত রেলগাড়ী নিয়ে যান। তাঁর নির্মিত বাষ্পচালিত ইঞ্জিনটি ওয়েলসের এক কয়লাখনি থেকে কুড়ি টন ওজনের ভার বয়েছিল।

১৮১১ সালে জন ব্লেনকিন্‌সপ তাঁর নির্মিত গাড়ীটিতে খাঁজকাটা দাঁতওয়ালা চাকা ব্যবহার করেন; যে রেলের ওপর দিয়ে এই গাড়ীটি যেত তাতে ছোট ছোট গর্ত থাকত যাতে চাকার দাঁতগুলি ওই সব গর্তের মধ্যে খাপে খাপে ঢুকে যেতে পারে। এই ব্যবস্থার ফলে গাড়ী লাইনচ্যুত হবার সম্ভাবনা থাকত না। আজও খাড়া পাহাড়ে যে সব রেললাইন পাতা হয়, সেখানে এই কৌশল প্রয়োগ করা হয় যাতে এই লাইনের ওপর দিয়ে উঠতে গিয়ে গাড়ী গড়িয়ে নীচে না পড়ে যায়।

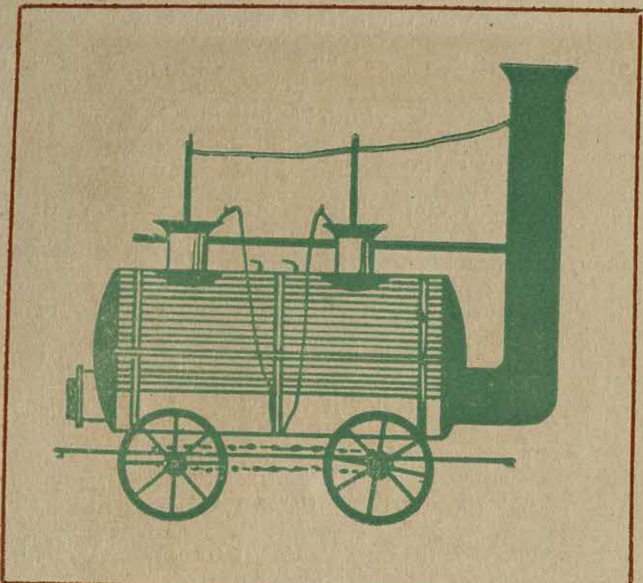
জর্জ স্টিফেনসন

কিন্তু রেলগাড়ীর জনক বলতে আমরা জর্জ স্টিফেনসনকেই বুঝি। স্কটল্যাণ্ড সীমান্তের কাছে ওয়াইল্যাম নামে কয়লাখনি অঞ্চলে ১৭৮১ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত দরিদ্রের সংসারে তাঁর জন্ম। চৌদ্দ বছর যখন তাঁর বয়স তখনই তাঁকে রোজগার শুরু করতে হয়। ছেলেবেলা থেকেই তিনি বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের ছোট ছোট মডেল তৈরী করতে থাকেন। সেই ছিল তাঁর অবসর সময়ের কাজ। ইতোমধ্যে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন সম্বন্ধে অনেক পুস্তিকা বেরিয়েছে। কিন্তু স্টিফেনসন তো পড়তে পারেন না! সুতরাং তিনি সপ্তাহে তিন পেনি দিয়ে

এক শিক্ষক রাখলেন। এইভাবে ক্যনিও, মার্ডক এবং ট্রেভিথিকের আবিষ্কার সম্বন্ধে তিনি ক্রমে ক্রমে জানলেন। আর সেই সঙ্গে চলতে লাগল বাষ্পচালিত ইঞ্জিন নিয়ে তাঁর নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

অবশেষে ১৮১৪ সালে স্টিফেনসন তাঁর প্রথম বাষ্প-চালিত রেলগাড়ীটি তৈরী করেন (৩১ পৃষ্ঠার ছবি দ্রষ্টব্য)। এইসময় কয়েকজন ধনী খনিমালিক স্টকটন এবং ডারলিংটনের মধ্যে অশ্বচালিত গাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে রাস্তার ওপর রেলপথ পাতার পরিকল্পনা করছিলেন। স্টিফেনসন তখন মিঃ পীস নামে একজন খনিমালিকের কাছে গিয়ে নিজের আবিষ্কৃত বাষ্পচালিত গাড়ীটি ওই রেলপথের ওপর চালাবার প্রস্তাব করেন। মিঃ পীস স্টিফেনসনের প্রস্তাবে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং অন্যান্য অংশীদারদেরও প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে সম্মত করান। ফলে বেশ কয়েক বছর পরিশ্রমের পর ১৮২৫ সালে ইংল্যাণ্ডের ওই দুটি শহর স্টকটন এবং ডারলিংটনের মধ্যে রেলপথ স্থাপিত হয়। এই রেলপথ ছিল আটত্রিশ মাইল দীর্ঘ এবং এই রেলপথেই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যাত্রী বাহিত হয়। ১৮২৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর এই রেলপথে প্রথম গাড়ী "লোকোমোশন" চলাচল শুরু করে। প্রথম দিন স্টিফেনসন স্বয়ং গাড়ী চালিয়েছিলেন। সে গাড়ীতে চৌত্রিশটি ওয়াগন এবং কোম্পানীর মালিকগণ-সহ প্রায় ছ শ যাত্রী ছিলেন। সেদিন গাড়ীর সামনে একজন অশ্বারোহী একটি পতাকা উড়িয়ে পথচারীদের গাড়ীর আগমন বার্তা জানিয়ে সাবধান করতে করতে ছুটেছিল।

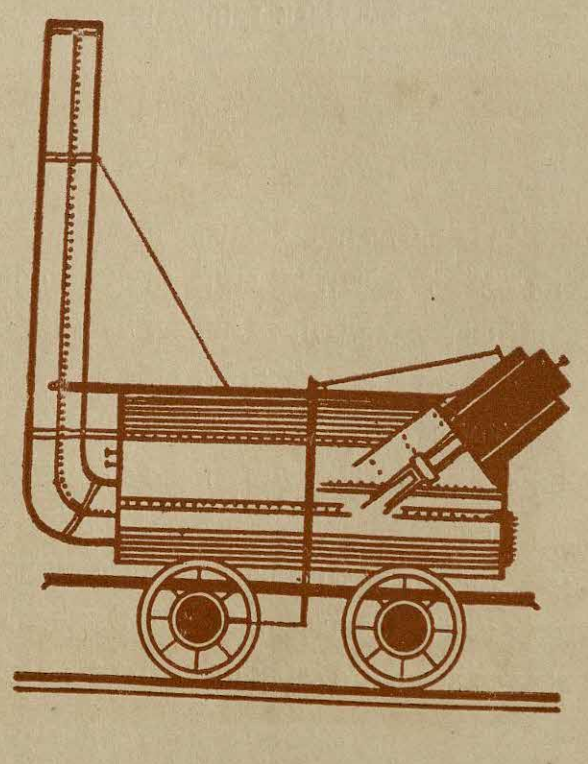
এবং সেই ছিল এক নবযুগের সূচনা।

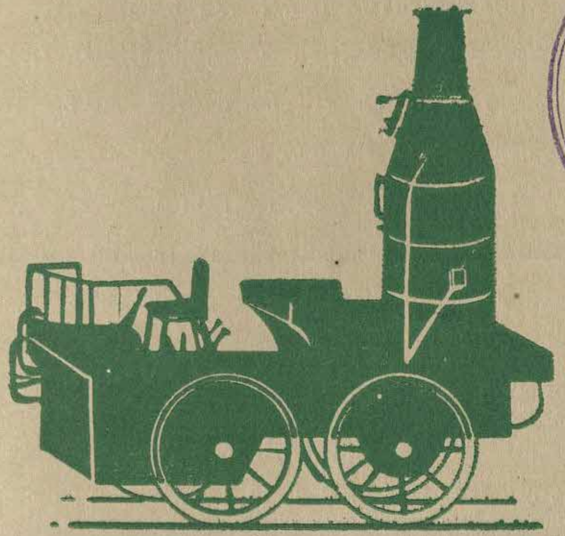


জর্জ স্টিফেনসন নির্মিত প্রথম আমলের একটি ইঞ্জিন। ১৮১৫ সালে এই ধরনের ইনঞ্জিগুলি কয়লা বইবার জন্যে ব্যবহৃত হত।

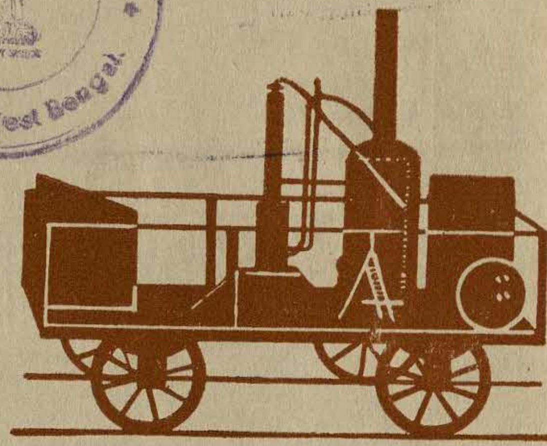
সমগ্র বিশ্বে আজ রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৭৭৪,২২১ মাইল। উত্তর আমেরিকায় ২৮৫,০৩১ মাইল, ইউরোপে ২৫৩,৫০০ মাইল, এশিয়ায় ৯৭,৩৪৯ মাইল, দক্ষিণ আমেরিকায় ৬৩,৯৭৩ মাইল, আফ্রিকায় ৪৪,৩১৭ মাইল এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে ৩০,০৫১ মাইল রেলপথ আছে।

স্টিফেনসনের পুত্র রবার্ট ১৮২৮ সালে আরও উন্নত ধরনের একটি ইঞ্জিন নির্মাণ করেন





১৮৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে 'বেস্ট ফ্রেণ্ড অফ্ চার্লসটন' গাড়ীটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়মিত রেলগাড়ী চলাচলের স্থচনা করে



নিউইয়র্কের এক কর্মকার পিটার কুপার নির্মিত 'টম থাম্ব' ১৮৩০

ভারতীয় রেলপথ

ইংল্যাণ্ডে রেলগাড়ীর প্রচলন হলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ ভারতবর্ষেও রেলগাড়ী প্রচলনের জন্যে সচেষ্ট হন। ভারতবর্ষের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

১৮৪৪ সালে ভারতবর্ষে রেলপথ স্থাপনের প্রথম পরিকল্পনা করা হয়।

১৮৫৩ সালের ১৬ই এপ্রিল ভারতীয় রেলপথে প্রথম রেলগাড়ী চলে। ওইদিন বোম্বাই-এর তদানীন্তন গভর্ণর, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের যাত্রী হিসাবে বহন করে ভারতীয় রেলপথের প্রথম রেলগাড়ী 'সুলতান' ভারতীয় রেলপথের শুভ স্চনা করে। বোম্বাই এবং থানার মধ্যবর্তী এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল তেরো মাইল।

এরপর ১৮৫৪ সালের অগাস্ট মাসে কলিকাতা থেকে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় রেলপথ স্থাপিত হয়।

তারপর ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে মাদ্রাজ থেকে আরকোনাম পর্যন্ত তৃতীয় রেলপথ স্থাপিত হয়।

প্রথম আমলে ভারতীয় রেলপথগুলি বেসরকারী মালিকানায় পরিচালিত হত। ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে এক বিশেষ আইন বলে সরকার পূর্ব ভারতীয় রেলপথের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে প্রায় সব রেলপথই সরকারের কর্তৃত্বাধীনে আসে। অবশেষে ১৯৪৭ সালের অগাস্ট মাসে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর রেলপথগুলিকে জাতীয়করণ করা হয়।

ভারতবর্ষে আজ মোট ৫৮,২৭২'৯৯ কিলোমিটার রেলপথ আছে। সমগ্র এশিয়ায় ভারতীয় রেলপথের স্থান প্রথম এবং সমগ্র পৃথিবীতে তার স্থান চতুর্থ।

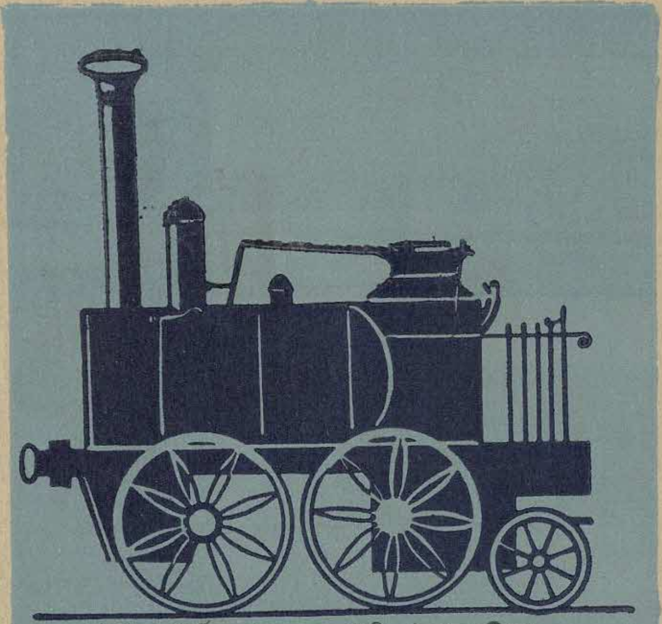
ভারতবর্ষে বর্তমানে ৬,৮৫৪টি রেলওয়ে স্টেশন আছে।

প্রায় ৫৮ লক্ষ আরোহী প্রত্যেকদিন ভারতীয় রেলপথে ভ্রমণ করেন।

ভারতবর্ষের সমস্ত রেলগাড়ীর যাত্রীবাহী কামরাগুলিকে যদি সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো যায় তবে তার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ১২৫ মাইলেরও বেশী।

১৯২৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী বোম্বাইর ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশন থেকে কুর্লা পর্যন্ত রেলপথে প্রথম বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী যায়।

ভারতবর্ষে বর্তমানে ১,২৮৫.৫৫ কিলোমিটার রেলপথে বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী চলাচল করে।



জার্মানীতে নির্মিত প্রথম রেলগাড়ী 'স্যাক্সোনিয়া'

ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে শোনপুর রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মটি, তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২,৪১৫ ফুট।

১০,০৫২ ফুট দীর্ঘ শোন ব্রীজ হচ্ছে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ রেলওয়ে সেতু।

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রেলগাড়ীর ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস পশ্চিমবঙ্গের চিত্তরঞ্জন সহরে স্থাপিত হয়। ওই বছরের ১লা নভেম্বর ওই কারখানায় নির্মিত প্রথম ইঞ্জিনটি ভারতীয় রেলপথের সেবায় যোগদান করে।

১৯৫৫ সালের ২রা অক্টোবর মাদ্রাজের অন্তর্গত পেরামবুরে ইন্‌টিগ্র্যাল কোচ ফ্যাক্টরী স্থাপন করা হয়। ভারতীয় রেলপথের জন্যে যাত্রীবাহী কামরা তৈরী করাই এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য।

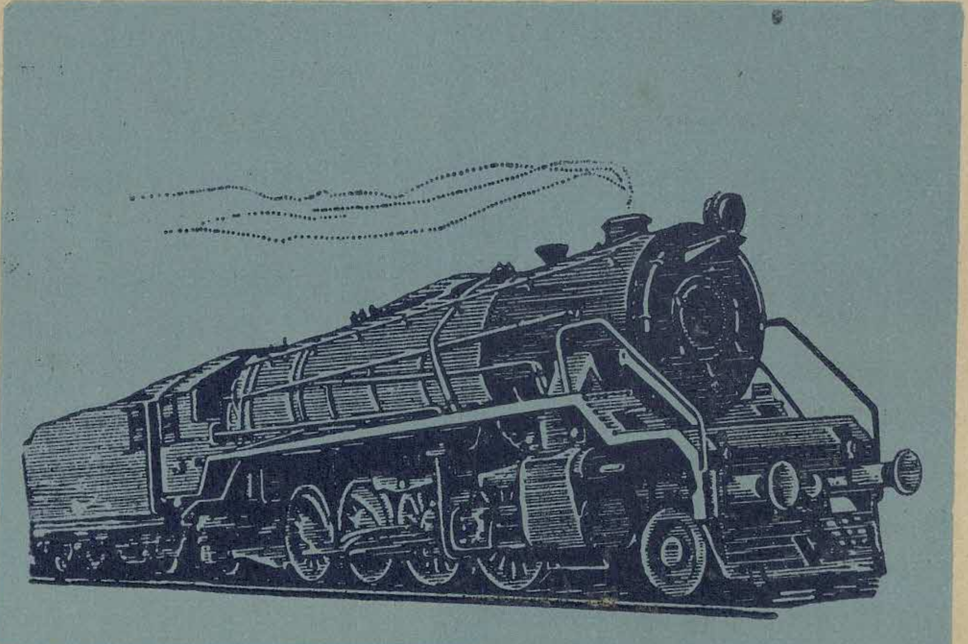
১৯৬১ সালের অগাস্ট মাসে ভারতবর্ষে ডিজেল ইঞ্জিন তৈরী করবার জন্যে বারাণসীতে ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্কস চালু করা হয়। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে এখানকার নির্মিত প্রথম ডিজেল ইঞ্জিনটি ভারতীয় রেলপথে যোগদান করে।

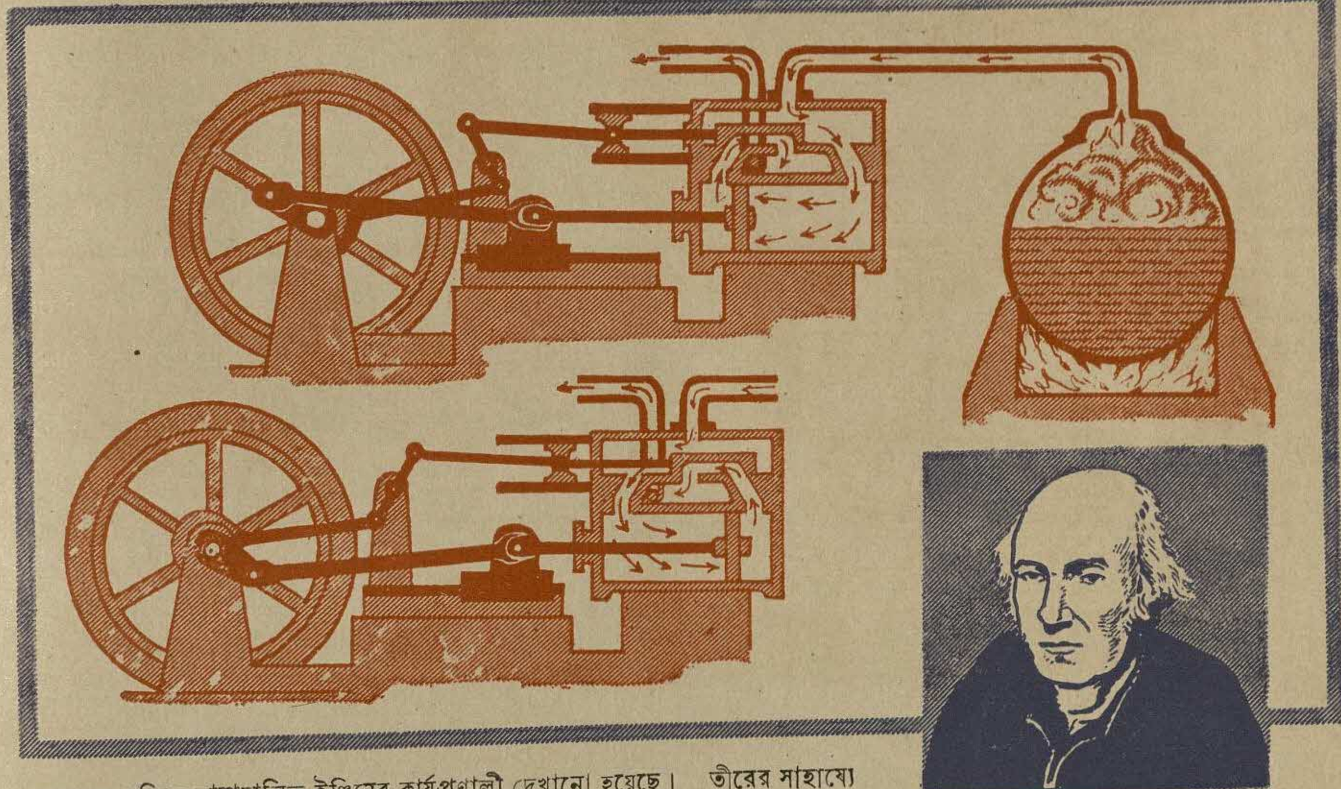
ভারতবর্ষে বর্তমানে ৪৫৪টি ডিজেল ইঞ্জিন চালিত রেলগাড়ী আছে।

প্রায় পৌনে এক মাইল লম্বা টোরসি সুড়ঙ্গপথটি হচ্ছে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ রেলওয়ে সুড়ঙ্গপথ।

ভারতবর্ষের উড়িষ্যায় ঝাড়সুগুদা এবং ব্রজরাজনগরের মধ্যবর্তী "IB" নামে স্টেশনটি হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অল্প অক্ষরযুক্ত নামের স্টেশন।

আধুনিক বাষ্পচালিত ইঞ্জিন





ওপরের ছবিতে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী দেখানো হয়েছে। তীরের সাহায্যে বয়লার থেকে সিলিণ্ডারের মধ্যে বাষ্পের গমনপথ এবং নির্গমনপথ দেখানো হয়েছে।

জেমস ওয়াট (১৭৩৬-১৮১৯)

বাষ্পচালিত ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে

বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী ওপরের ছবিতে সহজভাবে দেখানো হয়েছে। জলপূর্ণ বয়লারের মধ্যে দিয়ে যে টিউবগুলি গেছে সেগুলিই আগুন থেকে তাপ বয়ে আনে এবং জলকে স্ফুটনাংকে রাখে। বয়লারের মধ্যে বাষ্প জমা হতে থাকে। তার চাপ অত্যন্ত প্রবল। বয়লার থেকে বাষ্প স্টীম লাইনের ভিতরদিয়ে স্টীম চেস্টে প্রবাহিত হয়। স্টীম চেস্ট হচ্ছে অনেকটা চৌবাচ্চার মত যেখানে সিলিণ্ডারে ঢোকবার আগে বাষ্প এসে জমা হয়। তারপর যখন পাইপের একটি কলের মুখ খুলে যায় তখন বাষ্প পাইপের মধ্যে দিয়ে সিলিণ্ডারে সবেগে প্রবেশ করে। প্রসারিত বাষ্পের চাপ পিস্টন নামে একটি ধাতব চাকতির ঢাকনিকে সিলিণ্ডারের ডানদিকে ঠেলে দেয়। পিস্টনের সঙ্গে যুক্ত পিস্টন রডটি চাকার সাথে যুক্ত একটি ধাতব দণ্ডকে বাইরে ঠেলে দেয়। ফলে চাকাটি ঘুরে যায়। পিস্টনের অন্যদিকে ব্যবহৃত বাষ্পকে তখন এগ্‌জস্ট্‌ পাইপের মধ্যে দিয়ে বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়। পিস্টনটিকে যখন তার স্ট্রোকের শেষ সীমায় ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয় সেই একই সময় সিলিণ্ডারের বাঁদিকের প্রবেশপথের আড়াআড়ি হয়ে একটি স্লাইড ভাল্‌ভ্‌ আপনাআপনি বাঁদিকে খুলে যায়। সিলিণ্ডারের ডানদিকের পথটি তখন খুলে যায় এবং সেখান দিয়ে বাষ্প প্রবেশ করতে থাকে। পিস্টনটি এখন ঠেলা খেয়ে সিলিণ্ডারের বাঁদিকে সরে আসতে থাকে। ফেরবার পথে পিস্টনটি ব্যবহৃত গ্যাসকে স্লাইড ভাল্‌ভের মাঝখানে একটি পথ দিয়ে সিলিণ্ডারের বাইরে বের করে দেয়। এইভাবে স্টীম চেস্টের মধ্যে যতক্ষণ বাষ্প ঢুকতে দেওয়া হয় ততক্ষণ পিস্টনটি সামনে-পিছনে চলাচল করতে থাকে।

বয়লারের ওপরে একটি সেফ্‌টি ভাল্‌ভ্‌ থাকে। বয়লারের ভিতরে বাষ্পের চাপ যদি নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায় তবে ওই ভাল্‌ভের সাহায্যে বাষ্প বের করে দেওয়া হয়।

আধুনিক বাষ্পচালিত ইঞ্জিন

আধুনিক বাষ্পচালিত রেলগাড়ীর ইঞ্জিন আগেকার আমলের ইঞ্জিনের মতই কাজ করে। তবে অবশ্যই সে আমলের ইঞ্জিনের তুলনায় আধুনিক ইঞ্জিন সব দিক দিয়েই অনেক বেশী উন্নত ধরনের।

বাষ্পের প্রসারিত গুণকে কাজে লাগিয়ে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন চক্রাকার গতি অর্জন করে। এই গতি চাকাগুলিকে ঘোরায় এবং ইঞ্জিনকে—এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত গাড়ীগুলি নিয়ে—রেলের ওপর দিয়ে চালায়। ইঞ্জিনের প্রধান ছুটি অংশের প্রথমটি দিয়ে বাষ্প উৎপন্ন করা হয় এবং দ্বিতীয় অংশটি জল ও কয়লা বহন করে। জল এবং কয়লা ইঞ্জিনের পিছনে সংযুক্ত একটি গাড়ীতে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

বয়লার

রেলগাড়ীর ইঞ্জিনে এটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশী জমকালো অংশ। ইঞ্জিনে জ্বালানী যে তাপশক্তি উৎপন্ন করে বয়লারের মধ্যে তাকে জলে প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে যে বাষ্প উৎপন্ন হয় তাই দিয়েই ইঞ্জিন কাজ করে এবং চাকাকে ঘোরায়। ছবিতে বয়লারের কার্যপদ্ধতি সহজভাবে দেখানো হয়েছে।

একটি আধুনিক বয়লারকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: (১) ফায়ারবক্স, (২) বয়লার ব্যারেল এবং (৩) স্মোকবক্স।

(১) ফায়ারবক্স—ফায়ারবক্স বয়লার ব্যারেলের তলদেশ অবধি প্রসারিত। এর একটি বাইরের আবরণও আছে। সুতরাং এর ছুটি অংশ—ভিতরের ফায়ারবক্স এবং বাইরের ফায়ারবক্স। এই ছুটিকে পরস্পরের সঙ্গে ধরে রেখেছে 'স্টে'। এদের মধ্যেকার শূন্যস্থান জল দিয়ে ভর্তি। এই জল ভিতরের ফায়ারবক্সের অধিকাংশ অংশই ঘিরে রাখে।

ফায়ারবক্সের তলদেশে রয়েছে ফায়ারগ্রেট। এখানে ফায়ারবারগুলির ওপর আগুন জ্বালানো হয়। ফায়ারহোলের দরজা দিয়ে ফায়ারম্যান ফায়ারবক্সের মধ্যে বেলচার সাহায্যে কয়লা ঠেলে দেয়।

ফায়ারগ্রেটের সামনের অংশটিকে বলে ড্রপগ্রেট। এখান দিয়ে ছাই এবং চুল্লীর মধ্যবর্তী আবর্জনা ফেলে দেওয়া হয়। ছুটন্ত গাড়ী থেকে ছাই ও অন্যান্য আবর্জনা ফেলে আগুন পরিষ্কার করবার জন্যে অনেকসময় রকিং গ্রেট ব্যবহার করা হয়। এই ব্যবস্থায় লিভারের সাহায্যে এটিকে দোলানো হয়, ফলে ছাই ও আবর্জনা নীচে পড়ে যায়।

গ্রেটের মধ্যে দিয়ে ছুটন্ত গাড়ী থেকে যে ছাই ও আবর্জনা পড়ে তা এসে জমা হয় অ্যাশ্ প্যান নামে একটি পাত্রে। এটিকে পরিষ্কার করবার জন্যে ড্যাম্পার লাগানো থাকে। ড্যাম্পার আবার আরও একটি কাজে লাগে। এর সাহায্যে ড্রাইভার কয়লা ঠিকমত জ্বালাবার জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ বাতাস ঢোকাতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে গাড়ী চলবার যে কোন সময়ে ড্যাম্পারটিকে খোলা বা বন্ধ করা যায়।

বলা বাহুল্য, বাষ্প উৎপন্ন করবার জন্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ হচ্ছে ফায়ারবক্স। সেইজন্যে এর চারিদিক দিয়ে জল যাতে স্বচ্ছন্দে চলাচল করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে যে কটি যন্ত্র কাজ করে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ফায়ারবক্সের সঙ্গে সংলগ্ন থারমিক সাইফন। এই নলটি বয়লার ব্যারেলের তলদেশ থেকে ক্রাউন প্লেটকে যুক্ত করে ভিতরের ফায়ারবক্সের মধ্যে দিয়ে প্রসারিত। জল এই নলের মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হতে পারে।

ফায়ারবক্সের মধ্যে আছে একটি ব্রিক আর্চ। এই খিলানটি অগ্নিনিরোধক মাটি দিয়ে সংযুক্ত অগ্নিনিরোধক ইঁট দিয়ে তৈরী। এই ব্রিক আর্চ আগুনের তাপকে

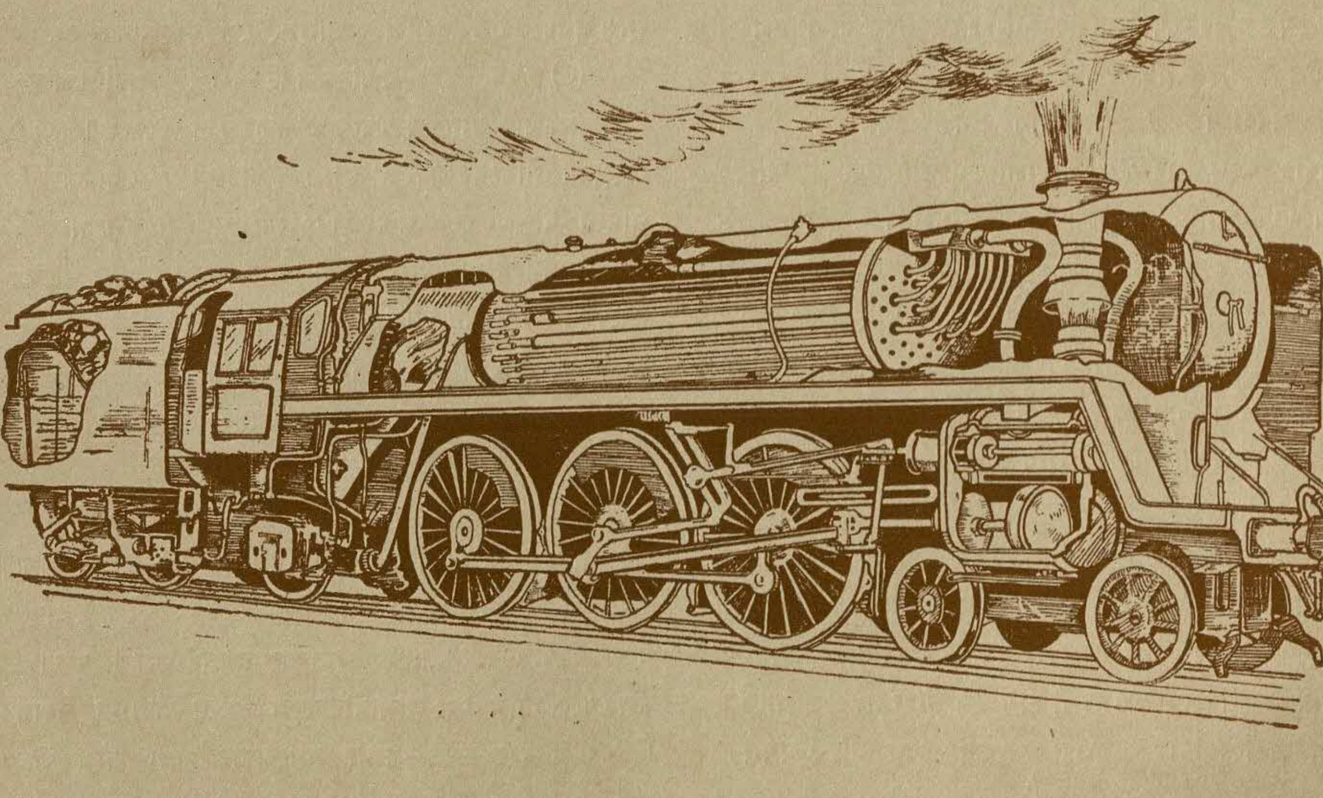
ফায়ারবক্সের পাশে এবং পিছনে প্রতিসরিত করে। এইভাবে ফায়ারহোলের মধ্যে দিয়ে যে বাতাস ভিতরে প্রবেশ করে তা টিউব প্লেটে পৌঁছবার আগেই উত্তপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে টিউব এবং ক্রাউন প্লেটগুলি তাপমাত্রার আকস্মিক হ্রাস-বৃদ্ধির ফলাফলের হাত থেকে রক্ষা পায়। কয়লাকে উপযুক্তভাবে জ্বলতেও এ সাহায্য করে।

(২) বয়লার ব্যারেল—ফায়ারবক্স টিউব প্লেট নামে একটি প্লেট বয়লার ব্যারেলকে ফায়ারবক্স থেকে পৃথক

একটি আধুনিক বয়লারকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। সামনে রয়েছে স্মোকবক্স, তার থেকে চিমনী বেরিয়েছে। তারপর রয়েছে সিলিণ্ডারের নল। এবং একেবারে পিছনের দিকটি চৌকা কোণবিশিষ্ট যেটি নীচে চাকার দিকে পৌঁছেছে, সেটি হচ্ছে ফায়ারবক্সের বাইরের দিককার খোলটি। নলের সামনের দিকটি একটি গোল চাকতি দিয়ে বন্ধ। মূল ফায়ারবক্সটি তার বাইরের খোলের মত অত লম্বা-চওড়া নয়, ফলে ওই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে জল থাকতে পারে। ফায়ার-বক্স এবং তার খোল প্রায় তিন ইঞ্চি গভীর একটি লোহার আংটি দিয়ে নীচের দিকে সংযুক্ত থাকে। ফায়ারহোল অর্থাৎ যে মুখ দিয়ে কয়লা আগুনে ফেলা হয়, সেখানে আর একটি আংটি থাকে। ফায়ারবক্স এবং তার খোল বহু বল্টু দিয়ে যুক্ত থাকে যাতে একে অপরকে বাষ্পের চাপ প্রতিহত করতে সাহায্য করতে পারে।

ফায়ারবক্স এক বিরাট ব্যাপার। নলের কাছে তার পাশে এবং নলের বহুদূরে গোল চাকতিটি, উভয়েরই বহুসংখ্যক ছিদ্র আছে। এগুলির মধ্যে টিউব ঢুকিয়ে শেষ অবধি টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই সব টিউবের মধ্যে দিয়েই ফার্নেস থেকে গরম বাষ্প স্মোকবক্স এবং সেখান থেকে চিমনীতে যায়।

প্রত্যেকটি বয়লারের চারটি অংশ থাকবেই। প্রথমটি হচ্ছে সেফ্‌টি ভাল্‌ভ্‌। বাষ্পের চাপ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেলে এই সেফ্‌টি ভাল্‌ভ্‌ তখন বাষ্প বের করে দেয়। দ্বিতীয় অংশটি হচ্ছে স্টীম গজ। এর কাঁটাটি ঘুরে ঘুরে বাষ্পের চাপ নির্দেশ করে। তৃতীয় অংশটি হচ্ছে ওয়াটার গজ। এই সোজা কাচের টিউবটির দুটি প্রান্তই বয়লারের ভিতরের সঙ্গে সংযুক্ত। বয়লারের ভিতরের জলের উচ্চতা এবং এই টিউবের মধ্যেকার জলের উচ্চতা সবসময় একই থাকে। সুতরাং এর দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে, বয়লারে কতটা জল আছে বা তাতে আর জল লাগবে কিনা। এবং চতুর্থ অংশটিকে বলে ইনজেক্টর। এর সাহায্যে বয়লারের মধ্যে জল পাঠানো হয়।



রেখেছে। বয়লারের প্রধান অংশই হচ্ছে এই বয়লার ব্যারেল। এতে জোড় দেওয়া দেওয়া অনেকগুলি নলাকার অংশ আছে। অনেকগুলি নল, তার কোনটির ব্যাসের সঙ্গে কোনটির ব্যাসের মিল নেই, ব্যারেলের মধ্যে দিয়ে গেছে। এই নলগুলির শেষ প্রান্ত যুক্ত থাকে ফায়ার-বক্স টিউব প্লেটের সঙ্গে আর সামনের প্রান্ত যুক্ত থাকে স্মোকবক্স টিউব প্লেটের সঙ্গে। এই টিউবগুলির মধ্যে দিয়ে যায় জ্বালানীর ফলে উৎপন্ন পদার্থগুলি যেমন বাষ্প, ধোঁয়া এবং ফায়ারগ্রেট থেকে কয়লার কুচি। এই টিউবগুলি দুই ধরনের হয়—স্মোক টিউব এবং ফ্লু টিউব। ব্যারেলের নীচের দিকে থাকে স্মোক টিউব-গুলি। এগুলির সংখ্যা ফ্লু টিউবের থেকে বেশী; কিন্তু ফ্লু টিউবগুলির ব্যাসের পরিমাণ স্মোক টিউবগুলির থেকে বেশী। স্মোক টিউবগুলির মত ফ্লু টিউবগুলিও জ্বালানী থেকে উৎপন্ন তাপকে সরবরাহ করার কাজে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

বয়লার পুরোপুরি জল দিয়ে ভর্তি থাকে না। জলের ওপরে খানিকটা স্থান শূন্য থাকে। কারণ জল ফুটে বাষ্প হলে তার আরও বেশী স্থানের প্রয়োজন হয় এবং এই শূন্যস্থানটি তখন সেই প্রসারিত বাষ্পের কাজে লাগে।

ভিতরের ফায়ারবক্সের ওপরের প্লেটটিকে বলে ক্রাউন প্লেট। এই প্লেটটি সর্বদাই জল দিয়ে ঢাকা থাকে। দুটি অথবা তিনটি লেড প্লাগ ক্রাউন প্লেটটিকে রক্ষা করবার জন্যে তার সঙ্গে লাগানো থাকে। ক্রাউন প্লেটের ওপরের জল কমে গেলে লেড প্লাগগুলি বেরিয়ে পড়ে এবং ফিউজ হয়ে যায়। এই সময় জল এবং বাষ্প ফায়ারবক্সের মধ্যে ঢুকতে থাকে। এটি ড্রাইভারের প্রতি সতর্কতার ইঙ্গিত। ড্রাইভার তখন ক্রাউন প্লেটটি যাতে নষ্ট হয়ে না যায় তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এইভাবে লেড প্লাগ বয়লারের নিরাপত্তা রক্ষা করে।

বয়লারের ওপরে আর একটি যে যন্ত্র বয়লারের নিরাপত্তা বজায় রাখে সেটি হচ্ছে সেফ্‌টি ভাল্‌ভ্‌। বয়লার নির্মাণ করবার সময় সর্বদাই নজর রাখা হয় যাতে সাধারণ চাপের থেকেও বেশী চাপ সে সহ্য করতে পারে। কিন্তু এভাবে নির্মিত হওয়া সত্ত্বেও এমন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক যাতে অত্যধিক চাপের ফলে বয়লার বিদীর্ণ হয়ে না যায়। এই উদ্দেশ্যে বয়লার ব্যারেলের ওপরে দুটি সেফ্‌টি ভাল্‌ভ্‌ লাগানো থাকে। সাধারণ অবস্থায় অত্যন্ত শক্তিশালী স্প্রিং ভাল্‌ভ্‌গুলিকে চেপে ধরে রাখে; কিন্তু বাষ্পের চাপ সাধারণ অবস্থার থেকে অত্যধিক বেড়ে গেলে ভাল্‌ভ্‌গুলি আপনাআপনি উঠে যায় এবং বাষ্পের চাপ তখন ওই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তারপর বাষ্পের চাপ সাধারণ অবস্থায় ফিরে এলে সেফ্‌টি ভাল্‌ভ্‌গুলি স্প্রিং-এর চাপে আবার স্বস্থানে ফিরে আসে।

বয়লারের মধ্যে বাষ্পের চাপ নির্দেশ করবার জন্যে আছে স্টীম গজ। এর কাঁটাটি ঘুরে ঘুরে বাষ্পের চাপ নির্দেশ করে।

বয়লার ব্যারেলের মাথায় বসানো থাকে ডোম। এর কাজ হচ্ছে বাষ্প স্টীম পাইপে যাবার আগে তাকে বেশ ভালভাবে শুকিয়ে দেওয়া। প্রধান স্টীম পাইপের গোড়াটি ডোমের মধ্যে থাকে। ডোমের মধ্যে আবার আছে রেগুলেটর ভাল্‌ভ্‌। এই ভাল্‌ভ্‌টির কাজ হচ্ছে প্রধান স্টীম পাইপের মধ্যে প্রবাহিত বাষ্পের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা। কোন কোন ইঞ্জিনে অবশ্য রেগুলেটর ভাল্‌ভ্‌টি স্মোকবক্সের হেডারে লাগানো থাকে। রেগুলেটর হ্যাণ্ডল্‌ দিয়ে এই রেগুলেটর ভাল্‌ভ্‌টিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

(৩) স্মোকবক্স—স্মোকবক্স টিউব প্লেট দ্বারা স্মোক-বক্সকে বয়লার ব্যারেল থেকে পৃথক করা হয়েছে। এটি ইঞ্জিনের সামনের দিকে স্থাপিত থাকে। স্মোকবক্সের সামনে থাকে স্মোকবক্স দরজা এবং পিছনে থাকে স্মোকবক্স টিউব প্লেট। স্মোকবক্সের মধ্যে বহু বিভিন্ন যন্ত্রপাতি থাকে, তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে ব্লাস্ট পাইপ এবং চিমনী।

সিলিণ্ডারগুলির মধ্যে দিয়ে গিয়ে বাষ্প ব্লাস্ট পাইপের মধ্যে নিঃশেষিত হয়। এই বাষ্প ব্লাস্ট পাইপের ভিতর থেকে তীব্র গতিবিশিষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর তা চিমনী দিয়ে বাইরের মুক্ত বাতাসে মিলিয়ে যায়।

ব্লাস্ট পাইপ থেকে চিমনীর মধ্যে যখন বাষ্প যায় তখন তা নিজের সঙ্গে বাতাস নিয়ে যায় এবং ফলে স্মোক-বক্সের মধ্যে একটি আংশিক শূন্যস্থানের সৃষ্টি করে। ফায়ার-বক্স থেকে গ্যাস এবং জ্বালানীর ফলে উৎপন্ন অন্যান্য পদার্থ টিউবগুলি দিয়ে দ্রুত বয়লার ব্যারেলের মধ্যে দিয়ে যায়

এবং স্মোকবক্সের মধ্যেকার ওই শূন্যস্থান পূর্ণ করবার চেষ্টা করে। ব্লাস্ট পাইপ এগুলিকে আকর্ষণ করে এবং চিমনী দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। এইভাবে একটি কৃত্রিম আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়।

ইঞ্জিন যখন দাঁড়িয়ে থাকে তখন কোন নিঃশেষিত বাষ্প থাকে না এবং ফলে ফায়ারবক্সের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ তাপ অর্জন করবার জন্যে কৃত্রিম আকর্ষণও থাকে না। এই বাধা দূর করবার জন্যে ব্লাস্ট পাইপের ওপরে ব্লোয়ার নামে একটি আংটার মত পাইপ লাগানো থাকে। ড্রাইভার বয়লার থেকে বাষ্পকে এই পাইপের মধ্যে পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে।

বাষ্প যখন প্রথম গঠিত হয় তখন তা সংপৃক্ত এবং তাতে বহু পরিমাণ জলীয় কণা থাকে। এই বাষ্পকে গরম করলে তার ঘনফল আরও বাড়বে। সংপৃক্ত বাষ্পকে এইভাবে অতিউত্তপ্ত বাষ্পে পরিণত করা হয়। বয়লার ব্যারেলে যে পাইপগুলি বাষ্পকে সংগ্রহ করে সেখান থেকে এই সংপৃক্ত বাষ্প যায় স্মোকবক্সের সুপারহিট হেডারে।

এই হেডারে 'আর্দ্র' এবং 'শুষ্ক' কামরা আছে। বাষ্প প্রথমে যায় 'আর্দ্র' কামরায়। এখান থেকে তা যায় বয়লার ব্যারেলের অপেক্ষাকৃত বড় ধূমনালীর মধ্যে অবস্থিত সুপারহিটার এলিমেন্ট টিউবগুলিতে। সেখান থেকে ওই বাষ্প আবার যায় সুপারহিটার হেডারের 'শুষ্ক' কামরায় এবং তারপর বাষ্প প্রবাহিত হবার জন্যে স্মোকবক্সের মধ্যে দিয়ে যে পাইপগুলি গেছে সেগুলির মধ্যে দিয়ে যায় স্টীম চেস্ট এবং সিলিণ্ডারগুলিতে।

অশ্বশক্তি

ইঞ্জিনের শক্তি বোঝাতে আমরা সাধারণতঃ হর্স পাওয়ার বা অশ্বশক্তি শব্দটি ব্যবহার করি। আগেকার দিনে লোকে যখন ইঞ্জিন কিনতে আসত, তখন প্রথমেই খোঁজ নিত ওই ইঞ্জিনটি কেনার ফলে তার কটি ঘোড়ার খরচ বাঁচবে। সেই থেকেই শব্দটি ইঞ্জিনের শক্তি পরিমাপক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এক অশ্বশক্তি বিশিষ্ট ইঞ্জিন প্রতি মিনিটে ৩৩,০০০ পাউণ্ড ওজন এক ফুট তোলার মত শক্তি সরবরাহ করে।

বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী

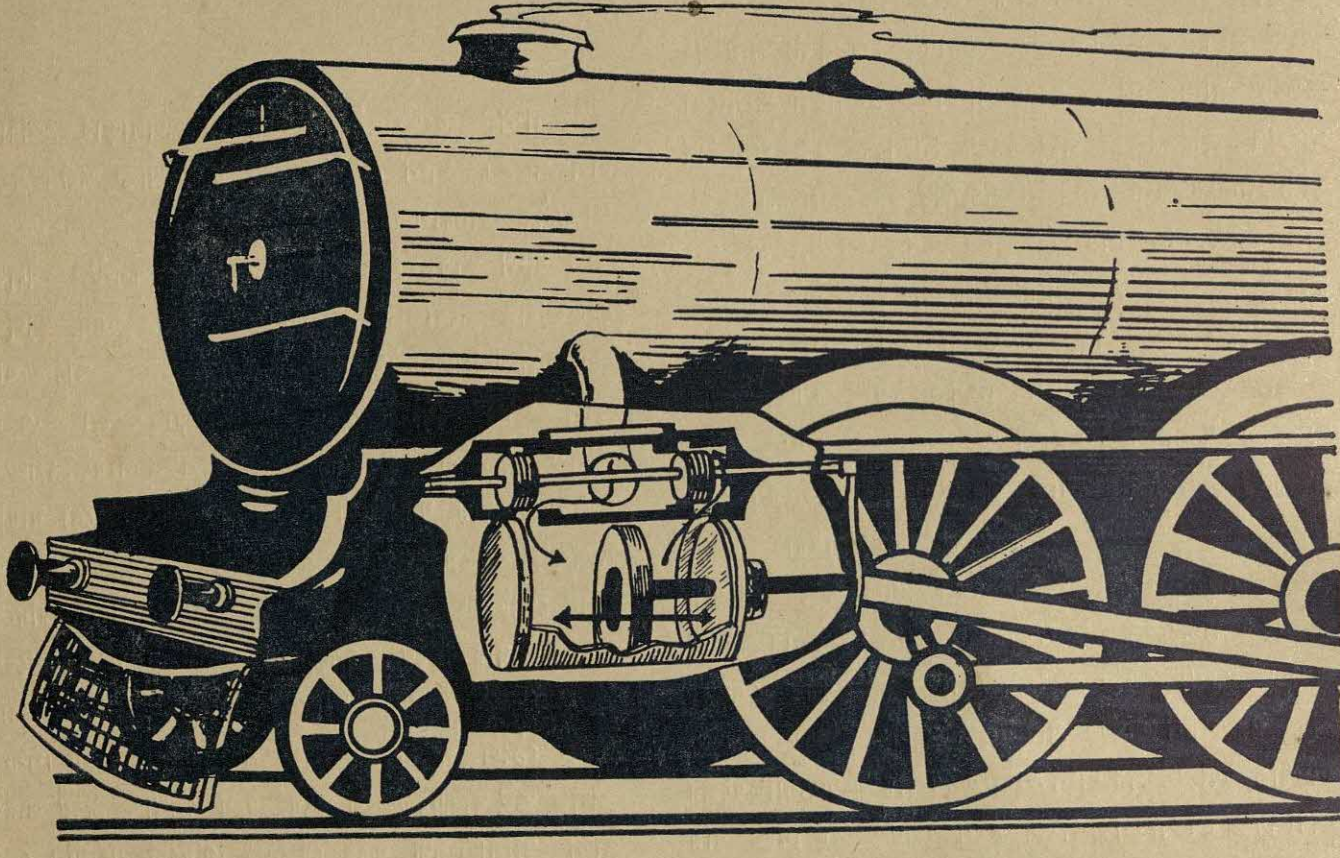
বাষ্পই হচ্ছে ইঞ্জিন এবং রেলগাড়ীর প্রধান চালকশক্তি। বাষ্প যেভাবে এই চালকশক্তি অর্জন করে তা কৌতূহলোদ্দীপক।

বাষ্প শাখা স্টীম পাইপগুলি দিয়ে পিস্টন ভাল্‌ভ্‌ হেডগুলির মধ্যেকার শূন্যস্থানে যায়। এই ভাল্‌ভ্‌ হেডগুলি একটি দণ্ডের দ্বারা দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে যার ফলে তারা সর্বদাই একসঙ্গে নড়াচড়া করে। একটি ভাল্‌ভ্‌ স্পিণ্ড্‌ল্‌ এই ভাল্‌ভ্‌ হেডগুলিকে সামনে-পিছনে নড়াচড়া করায় যার ফলে সেগুলি সিলিণ্ডারের মধ্যে যাবার ছিদ্রগুলিকে খোলে ও বন্ধ করে। এই ছিদ্রগুলিকে বলে স্টীম পোর্টস। পিস্টন হেডের একদিক বা অপরদিকে অবস্থিত দ্বার দিয়ে বাষ্পকে সিলিণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। ফলে বাষ্প পিস্টনকে ওই দ্বার থেকে ঠেলে অপরদিকে নিয়ে যায়। এই সময় পিস্টন ভাল্‌ভ্‌ ওই দ্বারটিকে বন্ধ করে দিয়ে সেখান দিয়ে আরও বাষ্প আসা বন্ধ করে দেয়। এদিকে পিস্টন হেড সিলিণ্ডারের অপর প্রান্তে পৌঁছবার আগেই সেদিককার দ্বার খুলে গিয়ে সেখান দিয়ে বাষ্প প্রবেশ করে। এর ফলে সেদিক থেকে ধাক্কা খেয়ে পিস্টন আবার এদিকে চলে আসে।

ইতোমধ্যে প্রথম দ্বারটি আবার খুলে যায়। মূল সিলিণ্ডারের মধ্যে পিস্টন যখন নড়াচড়া করতে থাকে তখন তা ব্যবহৃত অনাবশ্যক বাষ্প স্টীম পোর্ট এবং একটি এগ্‌জস্ট্‌ চেম্বারের মধ্যে দিয়ে ব্লাস্ট পাইপে পাঠিয়ে দেয়।

বিপরীত দিকেও এই একই প্রক্রিয়ায় কাজ চলতে থাকে।

পিস্টন ভাল্‌ভ্‌ হেডগুলিকে ভাল্‌ভ্‌ গিয়ারের (সাধারণতঃ ওয়াল্‌স্‌চার্টস্‌ গিয়ার) সাহায্যে সামনে-পিছনে নড়াচড়া করানো হয়।



রেলগাড়ীর ইঞ্জিনের জ্বালানী ইঞ্জিনের পিছনে সংযুক্ত গাড়ীটিতে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত কয়লা ফায়ারবক্স নামে একটি দহন প্রকোষ্ঠে জ্বালানো হয়। সেখান থেকে তাপ এবং ধোঁয়া ফায়ার টিউব নামে পাইপগুলির মধ্যে দিয়ে যায়। সেগুলি বয়লারের লম্বালম্বি স্থাপন করা থাকে। দহনক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন দ্রব্য তখন বয়লারের সামনে স্মোকবক্সে প্রবেশ করে এবং স্মোক স্ট্যাকের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যায়।

বয়লারের মধ্যে জল ক্রমশঃ গরম হয়ে বাষ্পে পরিণত হয়। সেই বাষ্প তখন একটি পাইপের মধ্যে দিয়ে হেডার নামে একটি প্রকোষ্ঠে যায়। সেখান থেকে সেটি ফায়ার টিউবগুলির সঙ্গে সংলগ্ন কতকগুলি ছোট ছোট পাইপ দিয়ে তৈরী একটি সুপারহিটিং ইউনিটে যায়। এই সময় বাষ্পের তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায়। ফলে আগের তুলনায় বিস্তৃত হওয়ার শক্তি এখন তার অনেক বেশী হয়। এটি আবার হেডারে চলে যায় এবং সেখান থেকে স্টীম চেস্ট হয়ে সিলিণ্ডারে যায়।

বাষ্প সিলিণ্ডারে ঢুকলে তার চাপে পিস্টনটি সিলিণ্ডারের মধ্যে সামনে পিছনে যাওয়া আসা করে। একটি দণ্ডের সাহায্যে পিস্টনটি ক্রসহেড নামে একটি খাড়া দণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত। ফলে ক্রসহেডও পিস্টনের মত সামনে পিছনে চলাচল করতে পারে। একটি মূল দণ্ড ক্রসহেডকে চাকার মধ্যে একটি ক্র্যাংক পিনের সঙ্গে যুক্ত করেছে। পিস্টনের সামনে-পিছনে গতি তখন ঘূর্ণমান গতিতে পরিবর্তিত হয়ে চাকা ঘোরায়।

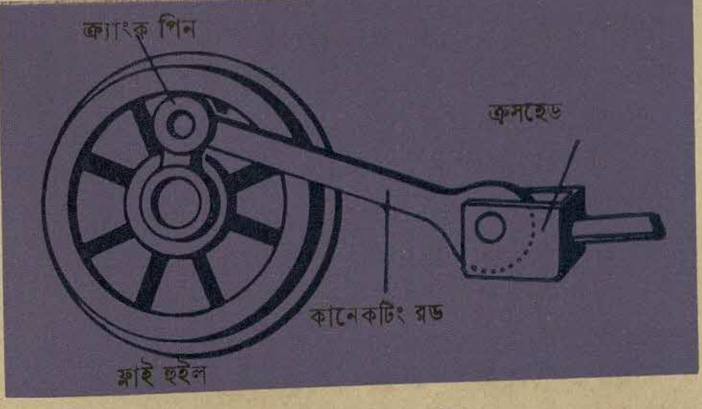
ওয়াল্‌স্‌চার্টস্‌ ভাল্‌ভ্‌ গিয়ারে পিস্টন ভাল্‌ভ্‌ হেডগুলি দুটি পৃথক অবস্থান-পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তাদের গতি অর্জন করে।

একটি অবস্থান-পরিবর্তন উৎপন্ন হয় ক্র্যাংক পিনের সঙ্গে সংযুক্ত একটি অদ্ভুত রিটার্ণ ক্র্যাংক থেকে।

অপর অবস্থান-পরিবর্তন উৎপন্ন হয় ক্রসহেড থেকে। সিলিণ্ডারের মধ্যে পিস্টন ক্রসহেড এবং একটি দীর্ঘ সংযোগকারী দণ্ডের মাধ্যমে ইঞ্জিনকে ঠেলা দেয়। এই দণ্ডটি ক্রসহেডকে চাকার ক্র্যাংক পিনের সঙ্গে যুক্ত করেছে। ক্রসহেড একটি স্লাইড বারের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায়।

ক্রসহেডের সঙ্গে একটি ছোট খাড়া দণ্ড সংযুক্ত আছে। এটিকে বলে ক্রসহেড আর্ম। এই ক্রসহেড আর্মের তলদেশের সঙ্গে সংযুক্ত আছে আবার একটি ছোট দণ্ড, তার নাম ইউনিয়ন লিংক। এই লিঙ্কের অপর প্রান্ত সংযুক্ত আছে কম্বিনেশন লিভার নামে একটি লিভারের তলদেশের সঙ্গে। কম্বিনেশন লিভারের ওপরে আছে দুটি পিনের সন্ধি। এর একটি সন্ধি হচ্ছে রেডিয়াস রডের শেষ প্রান্তের সঙ্গে এবং অপরটি হচ্ছে ভাল্‌ভ্‌ স্পিণ্ড্‌ল্‌-এর সঙ্গে।

রেডিয়াস রড পিছন দিকে চলে গেছে। তার শেষ প্রান্তে রয়েছে দুটি সংযোগ। একটি সংযোগ হচ্ছে রিভারসিং লিভারের সঙ্গে যার ফলে ড্রাইভার রিভারসিং লিভারের বাহুকে প্রয়োজনমত ওঠাতে-নামাতে পারেন। এবং রেডিয়াস রডের দ্বিতীয় সংযোগ হচ্ছে এক্সপ্যানশন্‌ ডাই ব্লকের সঙ্গে। ইঞ্জিনকে পিছনদিকে ফিরানোর জন্যে ডাই ব্লককে ব্যবহার করা হয়।



ফ্লাই হুইল

পিস্টন এবং তার কানেকটিং রড ক্র্যাংক শ্যাফ্‌টের সাহায্যে একটি বিরাট চাকাকে ঘোরায়, ওই চাকাটির নাম ফ্লাই হুইল। তার বিরাট জড়তার জন্যে ফ্লাই হুইল ইঞ্জিনকে স্বচ্ছন্দভাবে চালাতে পারে এবং স্লাইড ভাল্‌ভ্‌ যখন সিলিণ্ডারের মধ্যে বাষ্পের প্রবাহের গতি পরিবর্তিত করে, তখনও ইঞ্জিনকে চালু রাখে। ক্র্যাংক শ্যাফ্‌টের ওপর স্থাপিত একটি ক্যাম দিয়ে স্লাইড ভাল্‌ভ্‌ চালিত হয়। ক্র্যাংক শ্যাফ্‌ট যখন ঘোরে সেই সঙ্গে স্লাইড ভাল্‌ভের দণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত ক্যামটিও স্লাইড ভাল্‌ভ্‌কে সামনে পিছনে নড়াতে থাকে। তার ফলে সেটি সঠিক সময়ে খোলে এবং বন্ধ হয়।

স্প্রিং

যদিও সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, কিন্তু স্প্রিং হচ্ছে রেলগাড়ীতে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। গাড়ীর চাকাগুলি, অ্যাক্সেল, সংযোগকারী দণ্ড এবং আর কয়েকটি নামমাত্র অংশ ছাড়া গাড়ীর সমস্ত ওজনটাই স্প্রিংয়ের সাহায্যে চাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। স্প্রিং যে কোন রকম ধাক্কার আঘাত সহ্য করে এবং ইঞ্জিনকে বেশ স্বচ্ছন্দে চলতে সাহায্য করে। বস্তুতঃ স্প্রিং ব্যবহৃত না হলে বেশী জোরে রেলগাড়ী চালানো বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াত।

কাপ্‌লিং

রেলগাড়ীর বগীগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করবার জন্যে শিকলের আংটা এবং গোঁজ ব্যবহার করা হয়। এই ব্যবস্থায় একটি বগীর পিছনে অবস্থিত আংটায় পরের গাড়ীর পিছনে অবস্থিত গোঁজটি হাতে করে পরিয়ে দিতে হয়। আবার বগীগুলিকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করবার সময় আংটা থেকে গোঁজটিকে হাতে করে খুলে দিতে হয়।

আজকাল বিভিন্ন দেশে দুটি বগীকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করবার জন্যে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আছে। ১৮৮৭ সালে মেজর এলি এইচ. জেনী এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন।

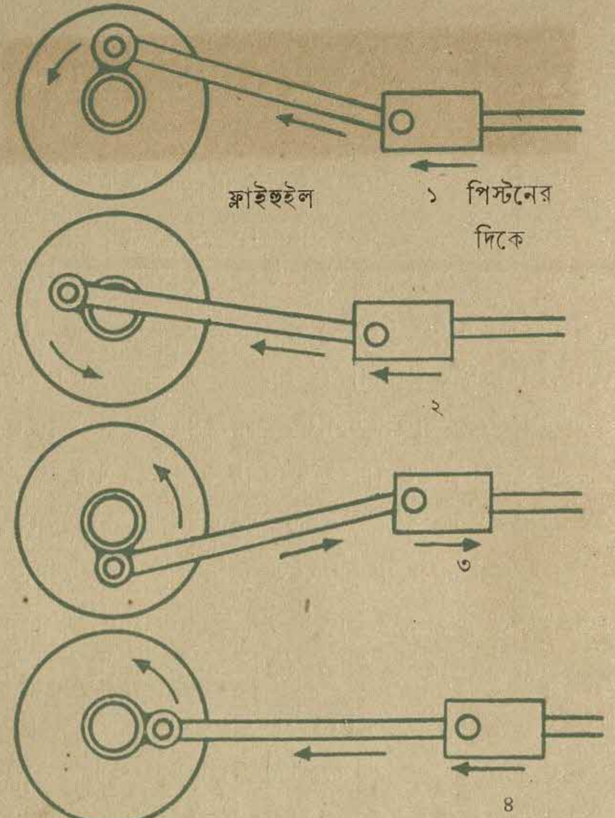
রেলগাড়ী রেলের ওপর দিয়ে চলে। কিন্তু তার কথা জানতে হলে আগে আমাদের ব্যালাস্ট এবং স্লিপার-এর কথা জানতে হবে।

ব্যালাস্ট

পাথর কুচি, নুড়ি পাথর প্রভৃতিকে বলে ব্যালাস্ট। এগুলি রেলপথের ওপর স্লিপারের নীচে ও চারিপাশে ছড়ানো থাকে। এরা জল নিকাশে সাহায্য করে। রেলপথের ওপর এগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে রেলপথের শক্তি এবং স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি পায়।

স্লিপার

সুন্দরভাবে ছড়ানো ব্যালাস্টের ওপর কাঠের স্লিপারগুলি পাতা হয়। এদের দিয়ে দুটি কাজ হয়—প্রথমতঃ, এরা রেলগুলিকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে এবং দ্বিতীয়তঃ, দুটি রেলের মধ্যবর্তী সঠিক দূরত্বটিকে এরা বজায় রাখে। সাধারণতঃ এগুলি নয় ফুট লম্বা, দশ ইঞ্চি চওড়া এবং পাঁচ ইঞ্চি পুরু হয়। এগুলিকে ত্রিশ ইঞ্চি দূরে দূরে স্থাপন করা হয়। এক মাইলে এদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় তিন হাজার খণ্ড। এক বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগুলিকে জলবায়ু প্রতিরোধে সক্ষম করে নেওয়া হয়। তার ফলে রোদ জল সহ্য করেও বহু বৎসর ধরে এরা ভাল অবস্থাতেই থাকে।



পিস্টনের সোজা গতিকে কিভাবে চক্রাকার গতিতে পরিবর্তিত করা হয় তাই ওপরের ছবিতে দেখানো হয়েছে।

পিস্টনের সঙ্গে একটি দণ্ড লাগানো আছে। এই দণ্ডটি সিলিণ্ডারের ভিতরে একটি গর্তের ভিতর দিয়ে গিয়েছে। ফলে পিস্টনের সামনে-পিছনে যাওয়া-আসার সঙ্গে সঙ্গে এটিও ওই গর্তের ভিতর ঢোকে এবং বেরোয়।

পিস্টনের এই দণ্ডটি ক্রসহেড নামে একটি আড়াআড়িভাবে লাগানো চৌকা ধাতব জিনিসের সঙ্গে জোড়া। এটি আর একটি ধাতব ফ্রেমে লাগানো থাকে। তার মধ্যেই এটি যাওয়া-আসা করে। ক্রসহেডটি কানেকটিং শ্যাফ্‌ট নামে আর একটি দণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। ক্র্যাংক পিন লাগানো একটি দণ্ডের (শ্যাফ্‌ট) সঙ্গে কানেকটিং শ্যাফ্‌টটি জোড়া দেওয়া থাকে। এই শ্যাফ্‌টের গায়ে একটি গিয়ার লাগানো থাকে।

বাষ্পের ঠেলায় পিস্টনটি ডানদিকে সরে গেলে ক্রসহেডও ডাইনে সরে আসে। এই ক্রসহেড এখন কানেকটিং রডে ঠেলা দেয় এবং তার ধাক্কা পড়ে ক্র্যাংক পিনের ওপর। এর ফলে শ্যাফ্‌টটি ১ নং ছবির তীরের পথে ঘুরে যায়। পিস্টন ডানদিকে সরে এলে ২ নং ছবির মত অবস্থায় ইঞ্জিনের ভাল্‌ভ্‌ সিলিণ্ডারের বাঁদিকের বাষ্পের পথ বন্ধ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সিলিণ্ডারের ডানদিকের ভাল্‌ভ্‌ খুলে গিয়ে বাষ্প ঢুকে পড়ে। ফলে ৩ নং ছবির মত পিস্টন বাঁদিকে সরে আসে। তারপর পিস্টন আবার ৪ নং ছবির মত ডান দিকে যেতে আরম্ভ করে।

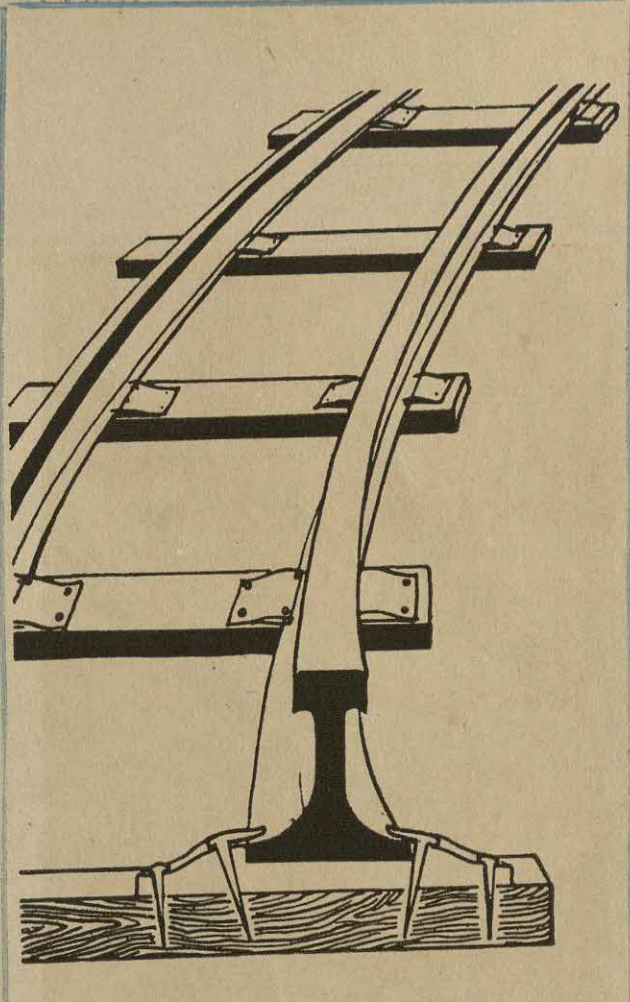
এইভাবে পিস্টনের সামনে-পিছনে যাওয়া-আসার ফলে কানেকটিং রডে টান এবং ঠেলা পড়ে। তার ফলে ক্র্যাংক পিনটি গোল হয়ে ঘুরতে থাকে ফলে শ্যাফ্‌টটিও ঘুরে যায়।

পিস্টনের সোজা গতি এইভাবে চক্রাকার গতিতে পরিবর্তিত হয়।

রেল

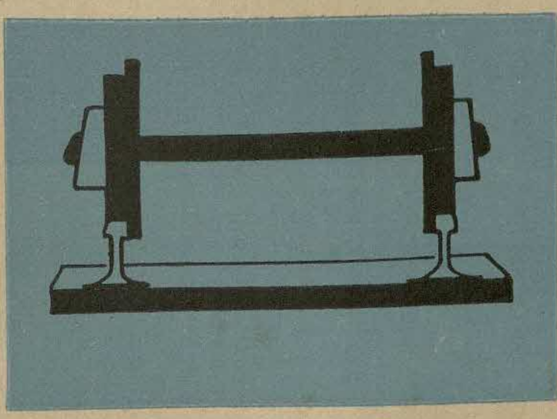
রেলের প্রস্থচ্ছেদটি একটি প্রশস্ত ভিত্তির ওপর স্থাপিত থাকে, তাকে বলে ফ্ল্যাঞ্জ। রেলের সমকোণে স্থাপিত কাঠের স্লিপারের ওপর রক্ষিত রেলের ভার বহন করে টাই প্লেট নামে এক রকমের পাতলা লোহার পাত। টাই প্লেটের ছিদ্রের মধ্যে বড় বড় পেরেক ঢুকিয়ে সেগুলি স্লিপারে মেরে রেলগুলিকে যথাস্থানে রাখা হয়। এক গজ রেলের ওজন হয় প্রায় ৯০ থেকে ১৫৫ পাউণ্ডের মধ্যে। সাধারণ একটি রেলের দৈর্ঘ্য ৩৯ ফুট। কাছাকাছি দুটি রেলকে প্রায় দু ফুট লম্বা একজোড়া ফিস প্লেট দিয়ে যুক্ত করা হয়। প্রত্যেক দিকে একটি করে ফিস প্লেট স্থাপন করা হয়, তাদের কেন্দ্র থাকে জোড়ের মুখের বিপরীত দিকে। রেল এবং তাদের মধ্যে দিয়ে চারটি করে বল্টু চালিয়ে দিয়ে রেলের সঙ্গে তাদের জোরে এঁটে দেওয়া হয়। পাশের দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে গিয়ে ফিস প্লেটগুলি রেলের ওপরের ও নীচের মাঝখানে জোর করে এঁটে ধরে।

রেল লাইনে দুটি রেলের খণ্ডের মাঝখানে সব সময়েই সামান্য একটু ফাঁক রাখা হয়। গরমকালে সূর্যের উত্তাপে রেলগুলি একটু বড় হয়ে যায় আবার শীতকালে ঠাণ্ডার সংস্পর্শে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। সেইজন্যে দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে মাপমত একটু ফাঁক দুটি রেলের মাঝখানে সর্বদাই রাখা হয়।



রেলগুলি এইভাবে কাঠের স্লিপারের ওপর আঁটা থাকে

গাড়ীর চাকাগুলি এইভাবে রেলের ওপর স্থাপিত থাকে বলে কখনও বাইরে ছিটকে পড়ে না



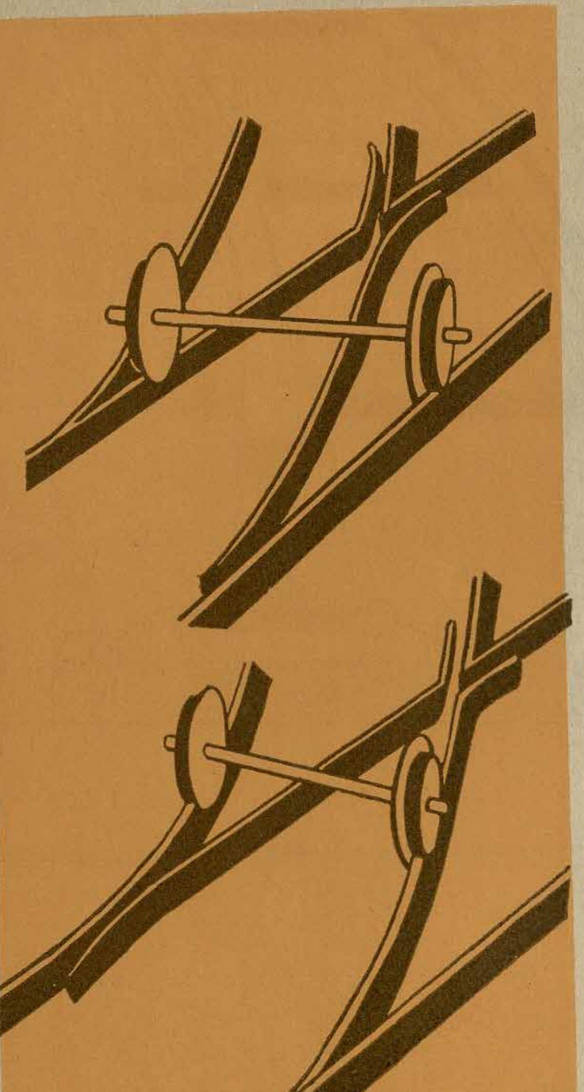
কয়েকটি দেশের রেলপথের দৈর্ঘ্য ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	...	...	২২১,৬৭০ মাইল
সোভিয়েত রাশিয়া	...	...	৭৪,৭৫৩ ,,
কানাডা	...	...	৪৩,১৩২ ,,
ভারতবর্ষ	...	...	৫৮,২৭২.৯৯ কিমি
জার্মানী	...	...	৩২,৮৫৮ মাইল
আর্জেন্টিনা	...	...	২৭,২৭৩ ,,
অস্ট্রেলিয়া	...	...	২৬,৫৬২ ,,
ফ্রান্স	...	...	২৫,২২৩ ,,
ব্রেজিল	...	...	২৩,১০০ ,,
গ্রেট ব্রিটেন	...	...	১৯,৪৭০ ,,

সিগন্যাল দেবার ব্যবস্থা

মানব দেহের স্নায়ুমণ্ডলীর কার্যপদ্ধতির সঙ্গে রেলপথের সিগন্যাল বা সংকেত ব্যবস্থার তুলনা করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থা না থাকলে রেলগাড়ী কখনই নিরাপদে, সবেগে, সময়মত তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারত না। ট্রেনের গতিবিধি পরিচালনা করবার জন্যে বিভিন্ন ধরনের সিগন্যাল ব্যবস্থা আছে।

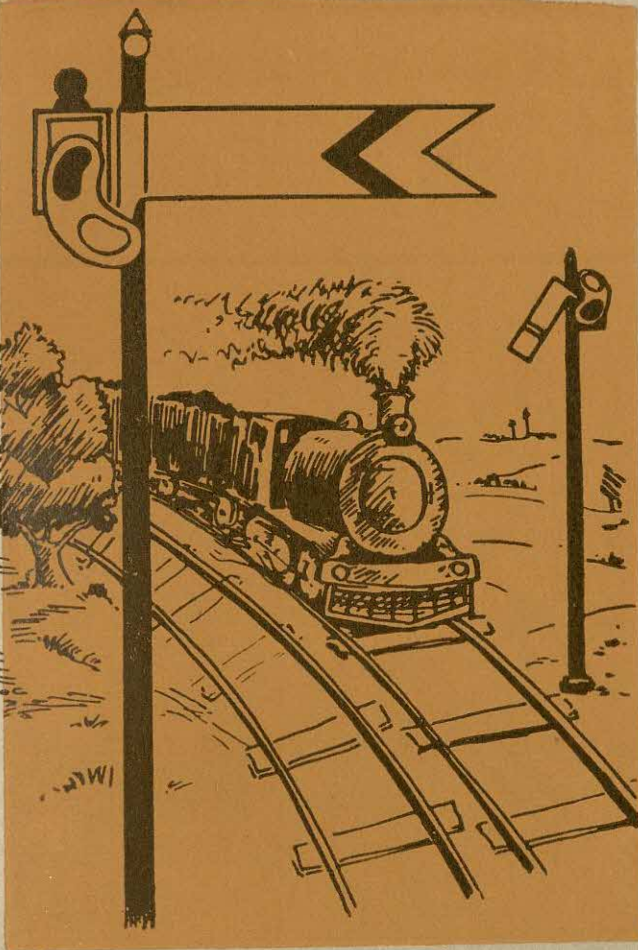
আজকালকার দিনে লেভেল ক্রসিং-এ একজন লোক যেমন রঙীন পতাকা বা লণ্ঠন নিয়ে সংকেত দেয় আগেকার দিনে তেমনিভাবে রেলওয়ে পুলিশ ট্রেনটি আর এগুবে না থেমে যাবে সে বিষয়ে সংকেত দিত।



ছবি দুটিতে দেখা যাচ্ছে রেলগাড়ীর চাকা কিভাবে একটি রেললাইন থেকে আরেকটি রেললাইনে সরে আসে। ওপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, চাকাগুলি ডানদিকে মোড় নিচ্ছে। নীচের ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, চাকাগুলি বাঁদিকে মোড় নিচ্ছে।

সেমাফোর

তারপর এল সেমাফোর-এর সাহায্যে সিগন্যাল দেবার ব্যবস্থা। আজও প্রায় সব রেলপথেই এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সংকেত দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় রেলপথের ধারে উঁচু লম্বা কাঠের খণ্ডের ওপর রঙীন আলো বসানো থাকে। এর হাতটি যখন উঁচু হয়ে থাকে তখন তার অর্থ হচ্ছে 'বিপদ—থাম' আর সেটি নীচের দিকে ঝোলানো থাকলে তার অর্থ বুঝতে হয় 'নিরাপদ—যেতে পার'। দিনের বেলায় এই ব্যবস্থা কার্যকরী হয়, কিন্তু রাত্রে সিগন্যাল দেবার জন্যে সিগন্যালের এই বাহুটির গোড়ার দিকে যেখানে সেটি কাঠের খুঁটিটির সঙ্গে পেরেক দিয়ে লাগানো রয়েছে সেখানে কাচ বসাবার একটি ফ্রেম রয়েছে। তার ওপরের দিকে রয়েছে একটি লাল কাচ এবং তলার দিকে রয়েছে একটি সবুজ কাচ। খুঁটির মাথায় একটি আলো জ্বলে। সুতরাং 'বিপদ—থাম' বোঝাবার সময় বাহুটি যখন উঁচু হয়ে থাকে তখন রাত্রে দূর থেকে লাল কাচের মধ্যে দিয়ে লাল আলোই দেখা যায় এবং 'নিরাপদ—যেতে পার' বোঝাবার সময় বাহুটি নীচে ঝুলে পড়লে সবুজ কাচের মধ্যে দিয়ে সবুজ আলো দেখা যায়।



সেমাফোর সিগন্যাল

রেলগাড়ী কিভাবে থামে

আগেকার দিনে রেলগাড়ী থামাতে হলে হাত দিয়ে ব্রেক কষে গাড়ী থামাতে হত। যতদিন গতিবেগ কম ছিল ততদিন এ ব্যবস্থা বেশ কার্যকরী ছিল। গতিবেগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যবস্থা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল। সন্তোষজনক ব্রেকের ব্যবস্থা যতদিন না আবিষ্কৃত হয় ততদিন পর্যন্ত এ নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। আজকাল গাড়ীতে ভ্যাকুয়াম এবং কম্প্রেস্‌ড্ এয়ার, এই দু ধরনের স্বয়ংক্রিয় ব্রেকের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। জর্জ ওয়েস্টিংহাউস কম্প্রেস্‌ড এয়ার ব্রেক ব্যবস্থার আবিষ্কার করেন এবং ১৮৬৮ সালে গাড়ীতে এর প্রথম ব্যবহার করা হয়।

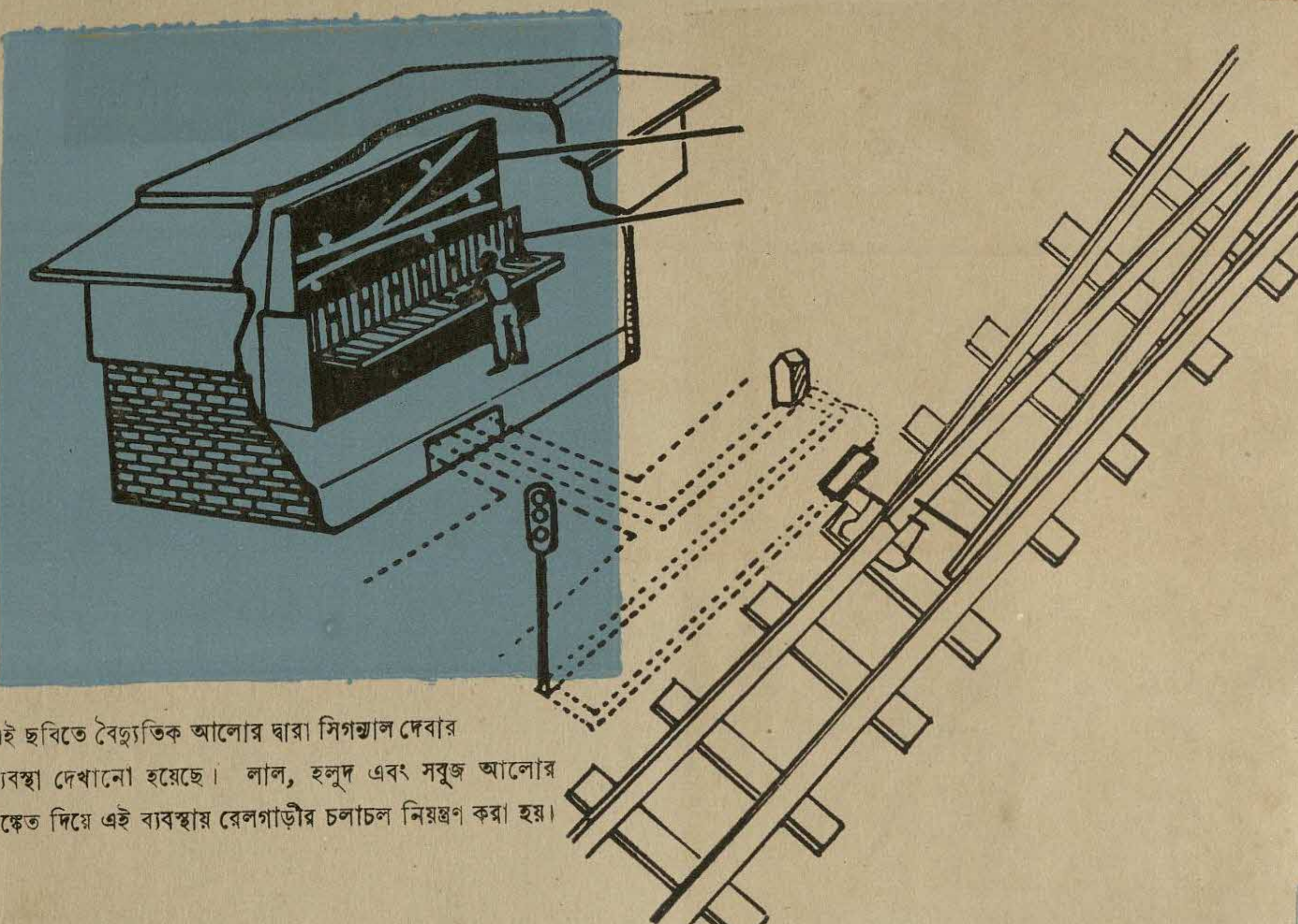
ভ্যাকুয়াম ব্রেক

আজকাল যে সমস্ত রেলগাড়ীতে ভ্যাকুয়াম ব্রেকের ব্যবস্থা আছে সেগুলির তলায় একটি বিরাট সিলিণ্ডার ঝোলানো থাকে। সেটি দুদিকে দুটি গোঁজ দিয়ে আটকান থাকে যাতে সেটি একটু দুলতে পারে। সিলিণ্ডারের ভিতরে থাকে বিরাট একটি পিস্টন। সিলিণ্ডারের তলা দিয়ে বেরিয়ে পিস্টন রডটি পিস্টনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। পিস্টন রডের তলার দিকটি একটি লিভারের সঙ্গে যুক্ত থাকে। লিভারটি এই পিস্টন রডের মধ্যে দিয়ে ব্রেকে শক্তি সঞ্চারিত করে। পিস্টনটি যখন নীচু হয়ে থাকে, তখন ব্রেক "বন্ধ" থাকে। পিস্টনটিকে যদি জোর করে ওপরে তোলা যায় তবে ব্রেক তার কাজ করে।

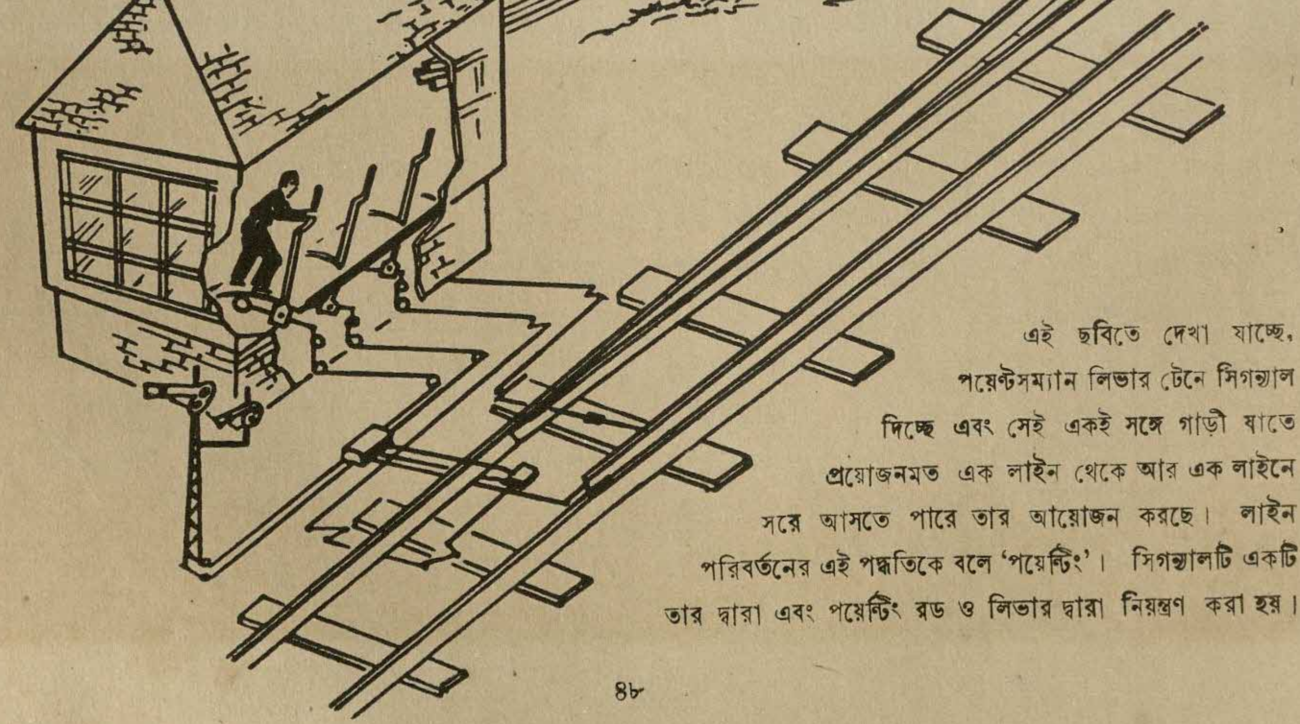
পিস্টনটি সিলিণ্ডারের মধ্যে বেশ সহজভাবেই ঢুকে থাকে। তার তলার দিকে যুক্ত একটি রবারের পটি ছাড়া তার দুদিক দিয়েই বাতাস বেশ সহজে যেতে পারে। প্রত্যেকটি সিলিণ্ডারের তলার দিক একটি শাখা পাইপ দ্বারা মূল পাইপে পরিণত হয়েছে। এই মূল পাইপটি গাড়ীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। দুটি কামরাকে সংযুক্ত করার মত বন্দোবস্ত এতে

ইণ্টারলকিং

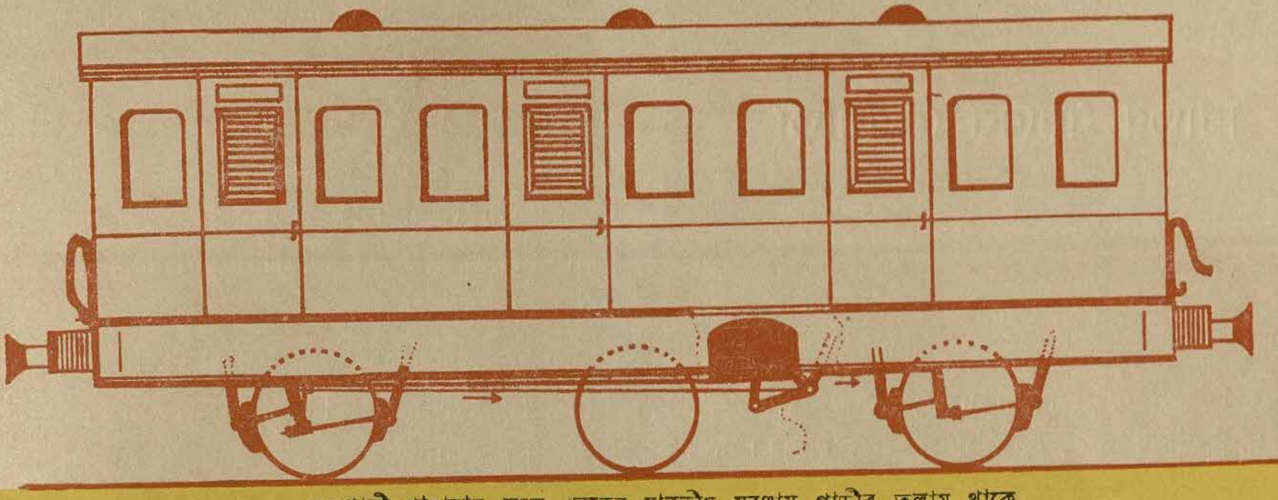
ইণ্টারলকিং সিগন্যাল ব্যবস্থায় এমন বন্দোবস্ত আছে যে, সিগন্যাল একটি বিশেষ এলাকায় দেওয়া হয় এবং একসঙ্গে একটি ট্রেন যেতে পারে। বাকী রেলপথগুলি রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি সিগন্যালবক্সে মেঝের তলায় একটি করে 'ইণ্টারলকিং ফ্রেম' থাকে। সিগন্যালবক্সের একদিক বরাবর থাকে লিভার ফ্রেম। প্রত্যেকটি লিভারের হাতলের পিছনে থাকে একটি ট্রিগার। লিভারটিকে সরাবার আগে এই ট্রিগারটিকে জোরে হাতলের সঙ্গে চেপে ধরতে হয়। সিগন্যাল লিভার যখন পিছনে থাকে তখন 'বিপদ' জ্ঞাপক সংকেত এবং যখন সামনে থাকে তখন 'নিরাপদ' জ্ঞাপক সংকেত জ্ঞাপন করে।



এই ছবিতে বৈদ্যুতিক আলোর দ্বারা সিগন্যাল দেবার ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে। লাল, হলুদ এবং সবুজ আলোর সঙ্কেত দিয়ে এই ব্যবস্থায় রেলগাড়ীর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়।



এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে, পয়েন্টসম্যান লিভার টেনে সিগন্যাল দিচ্ছে এবং সেই একই সঙ্গে গাড়ী যাতে প্রয়োজনমত এক লাইন থেকে আর এক লাইনে সরে আসতে পারে তার আয়োজন করছে। লাইন পরিবর্তনের এই পদ্ধতিকে বলে 'পয়েন্টিং'। সিগন্যালটি একটি তার দ্বারা এবং পয়েন্টিং রড ও লিভার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

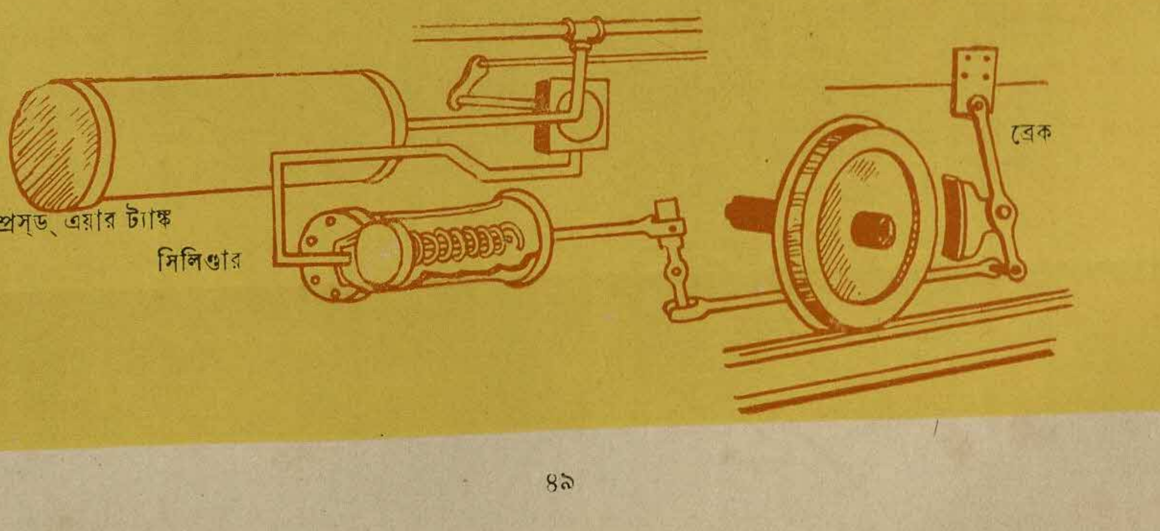


রেলগাড়ী থামাবার জন্যে ব্রেকের যাবতীয় সরঞ্জাম গাড়ীর তলায় থাকে

আছে। অন্য গাড়ীর পাইপের সঙ্গে এটিকে যুক্ত করা যেতে পারে। সমস্ত মূল পাইপগুলি একসঙ্গে ট্রেন পাইপ গঠন করে। সেগুলি ইঞ্জিন থেকে গাড়ীর শেষ প্রান্তে গার্ডের গাড়ী অবধি প্রসারিত। একটি ফানেলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তীব্রগতি বাষ্প উভয় পাইপ এবং সিলিণ্ডারগুলির থেকে একটি নির্দিষ্ট সীমার বাতাস বের করে দেয়।

ড্রাইভার যখন গাড়ী থামাবার জন্যে ব্রেক দেয় তখন সে একটি ভাল্‌ভ্‌ খোলে যাতে বাতাস ট্রেন পাইপের মধ্যে ঢুকে ভ্যাকুয়াম বা শূন্য স্থানটিকে নষ্ট করে ফেলতে পারে। বাতাস প্রত্যেকটি ব্রেক পিস্টনের তলার দিকে চাপ দেয়, কিন্তু রবারের পটিটি তাকে ওপরের দিকে পৌঁছতে বাধা দেয়। তার ফলে পিস্টনটি ঠেলা খেয়ে ওপরের দিকে ওঠে এবং ব্রেকগুলি তার সঙ্গে যুক্ত হয়। পিস্টনের যে প্রচণ্ড টান সেটি পিস্টন রডের সঙ্গে ব্রেক শু-র সংযোগকারী গিয়ারের দ্বারা বহুগুণে বেড়ে যায়, এরা দুজনে তখন প্রত্যেকটি চাকাকে চেপে ধরে গাড়ীর গতিবেগ কমিয়ে দেয়।

ছবিতে সহজভাবে ব্রেকের যান্ত্রিক ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে। এই অবস্থায় ব্রেক চাকা থেকে আলগা রয়েছে। গাড়ী থামাবার জন্যে ব্রেক কষলে উচ্চচাপবিশিষ্ট বায়ু সিলিণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করে ব্রেকের ওপর চাপ দেয়; ফলে ব্রেকের ঘসায় গাড়ীর চাকা থেমে যায়।

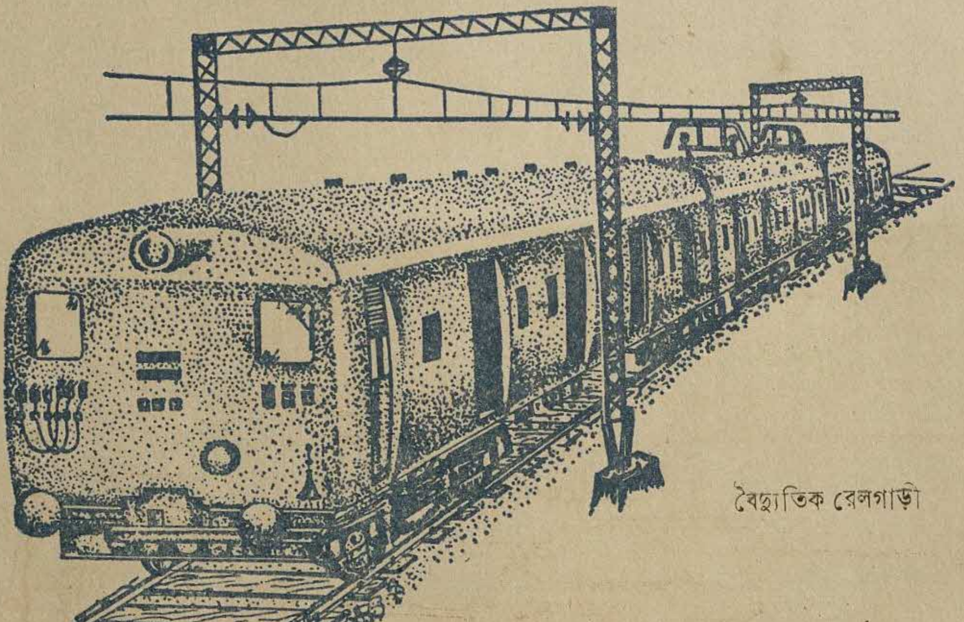


বিভিন্ন ধরনের রেলগাড়ী

প্যাসেঞ্জার—অথবা লোক্যাল ট্রেন তার যাবার রাস্তায় যতগুলি স্টেশন পড়ে, তার প্রত্যেকটিতে দাঁড়ায়। এর গতিবেগও তেমন বেশী হয় না।

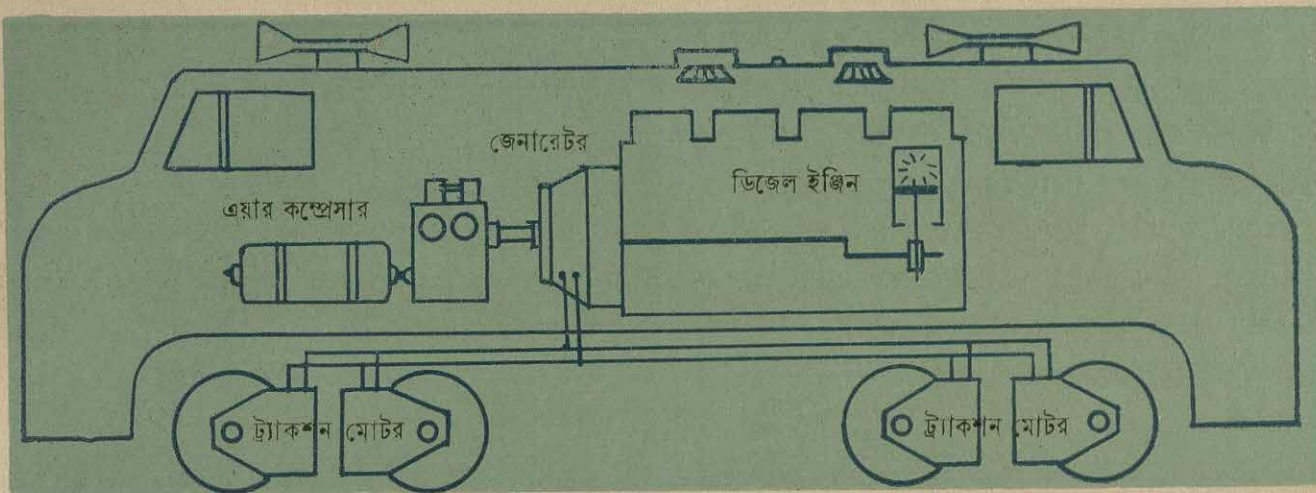
এক্সপ্রেস—বা মেল ট্রেন তার যাবার রাস্তায় যত স্টেশন পড়ে, তার মধ্যে যেগুলি বড় বড় শহর শুধুমাত্র সেখানেই দাঁড়ায়। যাত্রী বহন করবার জন্যে কামরা ভিন্ন এতে নানারকমের গাড়ী থাকে। এতে ব্যাগেজ কার থাকে, তাতে যাত্রীদের মালপত্র, কুকুর ইত্যাদি পোষা জন্তু-জানোয়ার নিয়ে যাওয়া হয়। এর ডাইনিং কারে খাবার পাওয়া যায়। দূরের যাত্রীরা এখানে খেয়ে নিতে পারেন। তাছাড়া থাকে ডাক নিয়ে যাবার গাড়ী। সে গাড়ীতে পোস্ট অফিসের মতই চিঠি বাছাই করবার বন্দোবস্ত থাকে। তাছাড়া মণি অর্ডার, রেজেস্ট্রী, পার্শেল ইত্যাদি সব রকমের ডাকই এই গাড়ীতে যায়। যে স্টেশনে গাড়ী দাঁড়াবার কথা নয়, সেখানকার ডাক তুলে নেবার জন্যে এর কামরার দুপাশে দুটি লোহার আংটা মতো থাকে।

মালগাড়ী—এর অনেকগুলি গাড়ী ঢাকা থাকে আবার অনেকগুলি খোলা থাকে। এতে গরু, ঘোড়া, ছাগল, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি গৃহপালিত ও হিংস্র জন্তু-জানোয়ার বইবার জন্যে উপযুক্তভাবে তৈরী কামরা থাকে। পেট্রল বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এতে বিরাট বড় বড় ট্যাঙ্ক থাকে। চাকার সাহায্যে সেগুলিও টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। খোলা গাড়ীগুলিতে বড় বড় লোহার রড, কাঠ ইত্যাদি নিয়ে যাওয়া হয়। গাড়ীর সবচেয়ে পিছনে থাকে গার্ডের গাড়ী। তাতে থাকে একটি কামরা এবং বাইরের দিকে রেলিং দিয়ে ঘেরা একটু বারান্দামত জায়গা। ঘরের মধ্যে সিন্দুকে থাকে মূল্যবান কাগজপত্র।



বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী

আধুনিক রেলগাড়ী



ডিজেল-ইলেকট্রিক রেলগাড়ীর ইঞ্জিন

ডিজেল-ইলেকট্রিক রেলগাড়ী

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বাষ্পচালিত রেলগাড়ীর কথাই আলোচনা করেছি। এই ব্যবস্থায় বাষ্পের চাপ রেলগাড়ীর চাকাগুলিতে শক্তি সঞ্চারিত করে। কিন্তু আজ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আমাদের এই অতিপরিচিত বাষ্পচালিত রেলগাড়ীর স্থান দখল করে নিচ্ছে ডিজেল-ইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রিক ট্রেন।

এই ধরনের রেলগাড়ীর একটি সহজ নক্সা এখানে দেওয়া হয়েছে। এর ইঞ্জিনের প্রধানতম দুটি অংশ হচ্ছে একটি ডিজেল ইঞ্জিন এবং একটি ইলেকট্রিক জেনারেটর। বাতাসের সঙ্গে ডিজেল তেলের মিশ্রণের ফলে যে দহনক্রিয়া হয়, তাই দিয়েই ডিজেল ইঞ্জিনটি কাজ করে। অত্যধিক উত্তপ্ত, অতিশয় সংনমিত বায়ুর মধ্যে জ্বালানী পাঠিয়ে তাকে জ্বালানো হয়। দহনক্রিয়ার ফলে যে চাপ সৃষ্টি হয় তা সিলিণ্ডারের মধ্যে পিস্টনটিকে সামনে-পিছনে চলাচল করায়। পিস্টনের সঙ্গে বাঁধা কানেকটিং রড ক্র্যাংক শ্যাফ্টের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই চলমান পিস্টন আবার কানেকটিং রড এবং ক্র্যাংক শ্যাফ্টের মাধ্যমে একটি ফ্লাই হুইলকে চালায়। এইভাবে যে যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদিত হয় তাকে রেলগাড়ীর চাকা ঘোরাবার জন্যে সরাসরি প্রয়োগ করা হয় না; তাকে ডিজেল ইঞ্জিনের সামনে স্থাপিত ইলেকট্রিক জেনারেটরটিকে চালাবার কাজে ব্যবহৃত হয়। এইভাবে যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয় তাকে তারের সাহায্যে ট্র্যাকশন মোটরগুলিতে পাঠিয়ে সেগুলিকে চালাবার জন্যে কাজে লাগানো হয়। এই ট্র্যাকশন মোটরগুলিই গাড়ীর চাকাগুলিকে ঘোরায়। এই বিদ্যুৎশক্তি আলো জ্বালাবার জন্যে এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবার জন্যেও ব্যবহৃত হয়।

একটি এয়ার কম্প্রেসার এয়ার ব্রেকের জন্যে উচ্চচাপ-বিশিষ্ট বায়ু সরবরাহ করে।

ইলেকট্রিক ট্রেন

ডিজেল-ইলেকট্রিক রেলগাড়ী যে পদ্ধতিতে কাজ করে ইলেকট্রিক ট্রেনও সেই একই পদ্ধতিতে কাজ করে। উভয়ের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যে, ইলেকট্রিক ট্রেন চলবার জন্যে যে বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োজন তা পাওয়ার স্টেশন থেকে সরবরাহ করা হয়। রেলের ওপরে টাঙ্গানো তারের মাধ্যমে এই বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা হয়। ট্রেন যখন চলে তখন ট্রেনের ওপরে স্থাপিত একটি বিশেষ যন্ত্র ওই তারকে ছুঁয়ে থাকে এবং এইভাবে ট্র্যাকশন মোটরগুলিতে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ হয়।

—কয়েকটি স্মরণীয় তারিখ—

খৃষ্টপূর্ব

২০০০ আলেকজান্দ্রিয়ার হিরো প্রথম দেখিয়েছিলেন যে, তাপশক্তিকে মানুষের কাজে লাগানো যায়।

খৃষ্টাব্দ

১৬২৯ গিওভানী ব্রানকা বাষ্পের সাহায্যে একটি চাকাকে টারবাইনের মত ঘুরিয়েছিলেন।

১৬৯৮ টমাস স্যাভেরী বাষ্পকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

১৭৬৯ জেমস ওয়াট সর্বপ্রথম সফল বাষ্পচালিত ইঞ্জিন তৈরী করেন।

১৭৭০ নিকোলাস জোসেফ ক্যানিও-কে প্যারিসের রাস্তায় নিজের নির্মিত বাষ্পচালিত গাড়ী চালিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল।

১৭৮৪ উইলিয়াম মার্ডক একটি বাষ্পচালিত ইঞ্জিন তৈরী করে সেটিকে চাকার ওপর বসিয়েছিলেন।

১৮০৪ রিচার্ড ট্রেভিথিক প্রথম রেলের ওপর দিয়ে বাষ্প-চালিত রেলগাড়ী চালিয়ে নিয়ে যান।

১৮১৪ জর্জ স্টিফেনসন তাঁর প্রথম রেলগাড়ী তৈরী করেন।

১৮২৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর, জর্জ স্টিফেনসন কর্তৃক প্রথম রেলগাড়ীতে যাত্রী বহন।

১৮৫৩ সালের ১৬ই এপ্রিল বোম্বাই থেকে থানা অবধি তেরো মাইল রাস্তায় ভারতীয় রেলপথের প্রথম সূচনা।

ভারতীয় রেলপথের পরিচালনব্যবস্থা

ভারতীয় রেলপথের সামগ্রিক কর্তৃত্ব এবং পরিচালন-ব্যবস্থা রেলওয়ে বোর্ডের ওপর ন্যস্ত। এই বোর্ড ১৯০৫ সালে স্থাপিত হয়েছিল।

পরিচালনের সুবিধার জন্যে ভারতীয় রেলপথকে নিম্নলিখিত নয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ

পূর্ব রেলপথ—এই অঞ্চলটি ১৯৫৫ সালের ১লা অগাস্ট স্থাপিত হয়েছে। এর প্রধান দফতর কলিকাতায় অবস্থিত। পশ্চিম বঙ্গ, বিহার এবং উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। উত্তরে এই রেলপথ মোগলসরাই অবধি প্রসারিত। এই অঞ্চলের রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৪,০৪৯.৪০ কিলোমিটার।

পশ্চিম রেলপথ—এই অঞ্চলটি ১৯৫১ সালের ৫ই নভেম্বর স্থাপিত হয়েছে। এর প্রধান দফতর বোম্বাই-এ অবস্থিত। মহারাষ্ট্র, রাজস্থান এবং মধ্য প্রদেশের কিয়দংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। এই অঞ্চলের রেলপথের দৈর্ঘ্য ১০,০৬৩.৭৪ কিলোমিটার।

উত্তর রেলপথ—এই অঞ্চলটি ১৯৫২ সালের ১৪ই এপ্রিল স্থাপিত হয়েছে। এর প্রধান দফতর দিল্লীতে অবস্থিত। পাঞ্জাব, দিল্লী, উত্তর এবং পূর্ব রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশের বারাণসী অবধি অঞ্চল এই রেলপথের অন্তর্ভূক্ত। এই অঞ্চলের রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ১০,৩৬৪.৫১ কিলোমিটার।

দক্ষিণ রেলপথ—এই অঞ্চলটি ১৯৫১ সালের ১৪ই এপ্রিল স্থাপিত হয়েছে। এর প্রধান দফতর মাদ্রাজে অবস্থিত। মাদ্রাজ এবং কেরালা, প্রায় সমগ্র মহীশূর, অন্ধ্র প্রদেশের কিয়দংশ এবং মহারাষ্ট্রের পুণা অবধি অঞ্চল এই রেলপথের অন্তর্ভূক্ত। এই অঞ্চলের রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ১০,০৬৭.০৮ কিলোমিটার।

মধ্য রেলপথ—এই অঞ্চলটি ১৯৫১ সালের ৫ই নভেম্বর স্থাপিত হয়েছে। এর প্রধান দফতর বোম্বাই-এ অবস্থিত। মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, মহীশূর, রাজস্থান এবং পাঞ্জাবের কিয়দংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৮,৮৪৯.৬৩ কিলোমিটার।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ—এই অঞ্চলটি ১৯৫৫ সালের ১লা অগাস্ট স্থাপিত হয়েছে। এর প্রধান দফতর কলিকাতায় অবস্থিত। পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের কিয়দংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৬,২৭৩.০৬ কিলোমিটার।

উত্তর-পূর্ব রেলপথ—এই অঞ্চলটি ১৯৫২ সালের ১৪ই এপ্রিল স্থাপিত হয়েছে। এর প্রধান দফতর গোরক্ষপুরে অবস্থিত। পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের কিয়দংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৪,৯৬৭.৩০ কিলোমিটার।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ—এই অঞ্চলটি ১৯৫৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী স্থাপিত হয়েছে। এর প্রধান দফতর পাণ্ডুতে অবস্থিত। আসাম এবং পশ্চিম বঙ্গের কিয়দংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ২,৯০৭.০৬ কিলোমিটার।

দক্ষিণ-মধ্য রেলপথ—এই অঞ্চলটি ১৯৬৬ সালের ২রা অক্টোবর স্থাপিত হয়েছে। এর প্রধান দফতর সেকেন্দ্রাবাদে অবস্থিত। অন্ধ্র প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর এবং গোয়ার কিয়দংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৬,০৭৫ কিলোমিটার।

বেসরকারী ভারতীয় রেলপথ

	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
আহ্‌মদপুর—কাটোয়া	৫১.২৫
আরা—সাসারাম	১১৪.৫৪
বাঁকুড়া—দামোদর নদী	১০৭.৯১
বক্তিয়ারপুর—বিহার	৫৩.১১
বর্ধমান—কাটোয়া	৫৯.৫৭
দেহ্‌রী—রোটাস	১০৪.৬১
ফুতওয়া—ইসলামপুর	৪৭.০৯
হাওড়া—আমতা	৮৬.৩৫
হাওড়া—শিয়াখালা	৩১.০৪
শাদারা (দিল্লী)—সাহারানপুর	১৭২.৯৬

সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ রেলপথ …	রিগা থেকে ভ্‌ল্যাডিভস্টক (সোভিয়েত রাশিয়া) … ৬,০০০ মাইল
সর্বাপেক্ষা বড় স্টেশন …	গ্র্যাণ্ড সেন্ট্রাল টার্মিনাল (নিউইয়র্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র); এই স্টেশনে ৪৭টি প্ল্যাটফর্ম এবং ৬৭টি রেলপথ আছে। ৪৮ একর জায়গা নিয়ে এই স্টেশনটি নির্মিত হয়েছে।
সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ প্ল্যাটফর্ম …	স্টরভিক (সুইডেন) … … … ২,৪৭০ ফুট
সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে সুড়ঙ্গপথ	ইস্ট ফিঞ্চলে-মর্ডেন (লণ্ডন) … … ১৭.২৫ মাইল
সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ রেলওয়ে সুড়ঙ্গপথ …	সিম্পলন ২ (সুইজারল্যাণ্ড-ইটালী) … … ১২.২৫ মাইল
সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ রেলওয়ে সেতু …	লোয়ার জাম্বেসি (মোজাম্বিক, আফ্রিকা) … ১১,৬৫০ ফুট

সুড়ঙ্গ পথ

প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যেদিন প্রথম পাহাড় কেটে গুহা তৈরী করে নিজের বাসগৃহ নির্মাণ করেন, সেদিনই বোধকরি সুড়ঙ্গ কাটার শুরু।

প্রাচীন মিশরীয়রা তাঁদের রাজাদের জন্যে ভূগর্ভস্থ সমাধিক্ষেত্র তৈরী করবার উদ্দেশ্যে সুড়ঙ্গ নির্মাণ করতেন। এ বিষয়ে তাঁরা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ভারতবর্ষেও প্রাচীনকালে পাহাড় কেটে গুহামন্দির নির্মাণ করা হত। অজন্তা, ইলোরা, এলিফ্যাণ্টা তার সাক্ষী। যাতায়াতের রাস্তা, নালা এবং নর্দমা হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে অ্যাসিরীয় এবং পারস্য দেশের অধিবাসীরা বহু সুড়ঙ্গ নির্মাণ করেন। খৃষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দে জলসরবরাহের জন্যে জেরুজালেমে একটি সুড়ঙ্গ ছিল বলে বাইবেলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

রোমানরা ছিলেন প্রাচীনকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সুড়ঙ্গ-নির্মাতা। ৫২ খৃষ্টাব্দে রোমান সম্রাট প্রথম ক্লডিয়াসের রাজত্বকালে নির্মিত সাড়ে তিন মাইল দীর্ঘ একটি সুড়ঙ্গ রোমান স্থাপত্যবিদ্যার উৎকর্ষের পরিচয় দেয়।

এছাড়াও রোমানরা বহু সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করেন। খৃষ্টপূর্ব ৩৬ অব্দে সমাপ্ত নেপ্‌ল্‌সের কাছে পসিলিপো সুড়ঙ্গপথ আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সুড়ঙ্গপথ ৩,০০০ ফুট দীর্ঘ, দ্বারপথের কাছে ৭৫ ফুট প্রশস্ত এবং মাঝখানে ২৫ ফুট প্রশস্ত। বহু রোমান সমাধিক্ষেত্রে মাইলের পর মাইল দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথগুলি আজও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে।

মধ্যযুগে নির্মিত বহু দুর্গ, মঠ, মন্দির ও গীর্জায় বিভিন্ন কারণে সুড়ঙ্গ নির্মাণ করা হত।



সুড়ঙ্গ কেটে রেলপথ নিয়ে যাওয়া হয়েছে

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রেলপথ তৈরী করবার সময় সুড়ঙ্গ নির্মাণ করাটা জরুরী হয়ে পড়ল। আধুনিক পদ্ধতিতে সুড়ঙ্গ নির্মাণের সেই শুরু। প্রথম আমলে রেলপথের জন্যে সুড়ঙ্গ নির্মাণ করাটা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। তখন যাঁরা সুড়ঙ্গ কাটতেন তাঁদের যন্ত্রপাতি বলতে সম্বল ছিল কোদাল আর গাঁইতি। তাই নিয়ে ক্ষীণ আলোয় তাঁদের কাজ করতে হত। সুড়ঙ্গ নির্মাণের সময় যেসব বিভিন্ন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়, তা প্রতিরোধ করার কোন ব্যবস্থা তখন ছিল না বললেই চলে।

সিম্পলন সুড়ঙ্গের নির্মাণ কার্য

এক বিশাল পাহাড়ের কঠিন গা কেটে সুড়ঙ্গ নির্মাণ করাটাই যথেষ্ট কঠিন কাজ। কিন্তু শুধু তা করলেই যদি চলত, তবু তা সহজসাধ্য হত। একটি সুড়ঙ্গ নির্মাণ করতে গেলে কত বিভিন্ন রকমের অসুবিধা ও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়, তা আল্পস পর্বতের সিম্পলন সুড়ঙ্গের নির্মাণকার্য পর্যালোচনা করলেই খানিকটা বোঝা যাবে।

এই সুড়ঙ্গের একটি মুখ সুইজারল্যাণ্ডের পর্বতগাত্রে শুরু হয়েছে এবং তার অপর মুখ ইটালীতে বেরিয়ে এসেছে। এটি প্রায় সওয়া বারো মাইল লম্বা। এই দীর্ঘ সুড়ঙ্গের কোন কোন জায়গায় তার ছাদের ওপর সাত হাজার ফুট উঁচু পর্বত রয়েছে। মাথার ওপর এই বিশাল বোঝার কথাও যদি শুধু একবার ভাবা যায়, তবে প্রথমেই যে ঝামেলার কথাটি মনে পড়বে সেটি হচ্ছে কি করে ধ্বসে পড়বার হাত থেকে সুড়ঙ্গটিকে বাঁচানো যায়।

এই সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজ শুরু করা হয় ১৮৯৮ সালে আর তা সমাপ্ত হয় ১৯০৫ সালে। সুইজারল্যাণ্ড এবং ইটালীতে সুড়ঙ্গের দুই মুখেই একই সঙ্গে খননকার্য শুরু করা হয়; দু দলই দীর্ঘ আট বছর পরে মাঝখানে এসে মিলিত হন। সুতরাং দু দলই জানতেন ঠিক কোথায় তাঁরা যাচ্ছেন — এবং সুড়ঙ্গ কখনও নাক বরাবর সোজা করে কাটা হয় না। এই যে দু দল দুদিক থেকে সুড়ঙ্গ কাটতে কাটতে এসে ঠিক মাঝখানে মিলিত হলেন, এটা কম কঠিন কাজ নয়।

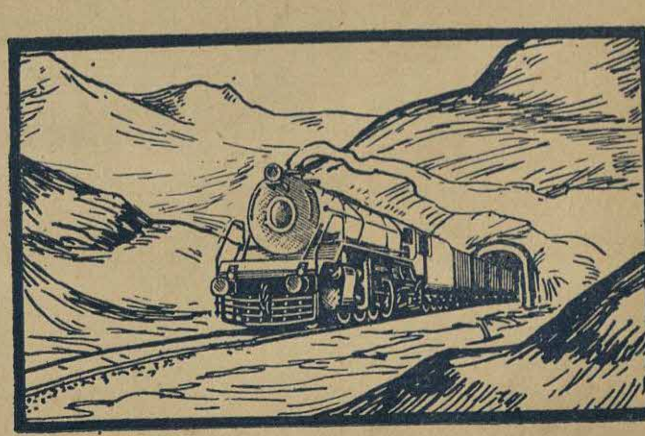
অবশ্য পাথর কাটবার জন্যে ড্রিল, প্রয়োজনমত ব্যবহার করবার জন্যে বিস্ফোরক পদার্থ এবং পাথর-মাটি গর্তের বাইরে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ী তাঁদের সাহায্য করেছে। এগুলির সাহায্যে প্রত্যেকদিন পঁয়ত্রিশ ফুট গর্ত করা যেত। এখানে একদিন মানে কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা—কারণ সব সময়েই কাজ চলত।

পাহাড়ের গায়ে খানিকটা সুড়ঙ্গ কেটে ভিতরে ঢুকে যাবার পর সেখানকার কর্মীদের শ্বাসপ্রশ্বাস নেবার জন্যে বাইরে থেকে প্রচুর পরিমাণ বাতাস পাম্পের সাহায্যে ভিতরে পাঠাতে হত। কারণ মাটির ভিতরকার গভীর গর্তের বাতাস শুধু যে বাসি তাই নয়, মাটি থেকে অনেক সময় এমন গ্যাস বের হয় যা বিষাক্ত। বাইরে থেকে বাতাস না পাঠালে দীর্ঘ সুড়ঙ্গের মধ্যে কেউই বেশীক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে না। সুতরাং পাহাড়ের গায়ে সুড়ঙ্গ কাটতে কাটতে শ্রমিকেরা যত গভীরে যেতে থাকলেন, বাইরে থেকে তাজা বাতাস পাঠানোটা তত জরুরী হয়ে পড়ল। ভিতরে দশ হাজার লোক কাজ করতেন; তাঁদের সবাইর জন্যে বাইরে থেকে বাতাস পাঠাতে হত।

ইটালীর দিকে যে দলটি কাজ করছিলেন, তাঁরা কিছুদূর অগ্রসর হবার পরেই এক নরম জায়গায় আঘাত করলেন—কঠিন শিলার পরিবর্তে তা ছিল আলগা মাটি। সেই নরম মাটির চেয়ে শিলা বরং ছিল ভাল। নরম মাটি কাটা বেশ সহজ; কিন্তু গর্তটা সেখানে কিভাবে বজায় থাকবে? তার ওপরের মাটি সব হুড়মুড় করে গর্তের মধ্যে পড়ে যেতে লাগল—তার ওপরে রয়েছে সমস্ত পর্বতের ভার। সর্বাপেক্ষা মোটা কাঠের গুঁড়ি দিয়েও তা ঠেকানো সম্ভব হল না। দেশলাই-এর কাঠির মত সেসব কাঠ ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। বিরাট ভারী ভারী সব লোহার কড়ি বেঁকে দুমড়ে গেল। আর শুধু ছাদই ভেঙ্গে পড়ল না, তাঁরা যদি বা তা তুলতে চেষ্টা করতে লাগলেন, তবে দু পাশের অসহ্য চাপ যেন তাঁদের পিষে মেরে ফেলতে চাইল। যেসব মানুষ তার হৃদয় বিদীর্ণ করতে চাইছে, পর্বত যেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। অবশেষে মানুষই জয়ী হল। ইস্পাত এবং কনক্রীটের সাহায্যে মানুষ গর্তটাকে খোলা রাখতে সমর্থ হল।

কিন্তু তার পরেই আবার আর এক বিপদ! সুড়ঙ্গ কাটতে কাটতে কিছুদূর এগোবার পর পাহাড়ের গায়ে তাঁরা এমন এক জায়গায় আঘাত করলেন যে, সেখান থেকে বরফগলা জলের এক ঝর্ণা বেরিয়ে পড়ল। সে প্রায় এক ছোট্ট নদীর মত। আর তার জলে সুড়ঙ্গ প্রায় ভেসে যাবার উপক্রম হল। মিনিটে সেখান থেকে জল বেরোতে লাগল প্রায় দশ হাজার গ্যালনেরও বেশী। সুতরাং পাম্পের সাহায্যে সেই জল বের করতে গিয়ে প্রায় ছ মাস কাজ বন্ধ রাখতে হল।

আবার কিছুদূর এগোবার পর ভিতরটা এত অসহ্য উত্তপ্ত হয়ে উঠল যে, সেখানে আবার পাম্পে করে ঠাণ্ডা জল পাঠাতে হল পাহাড়ের গা ভেজাবার জন্যে।



একটি সুড়ঙ্গ কাটতে গেলে যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, এগুলি তার কয়েকটিমাত্র। প্রত্যেকটি সুড়ঙ্গ নির্মাণ করতে গিয়েই কিছু না কিছু লোক অভাবিত দুর্ঘটনার মধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন।

শুধু যে রেলগাড়ী চলাচলের সুবিধার জন্যেই সুড়ঙ্গ নির্মাণের প্রয়োজন হয়, তা নয়। অন্যান্য নানা কারণে সুড়ঙ্গ নির্মাণ করবার প্রয়োজন হয়। অনেক রকমের কাজ আছে যেগুলি মাটির ওপরে না করে তলা দিয়ে করলেই সুবিধা হয়। যেমন, পাহাড়-পর্বতের অপরদিকে যাওয়া, নদীর তলা দিয়ে যাওয়া, শহরে বিদ্যুতের তার নিয়ে যাওয়া, জল সরবরাহ করা, ময়লা নিষ্কাশন করা ইত্যাদি।

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে সুড়ঙ্গপথ হচ্ছে লণ্ডনের ১৭.২৫ মাইল দীর্ঘ ইস্ট ফিঞ্চলে-মর্ডেন সুড়ঙ্গপথ।

সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ রেলওয়ে সুড়ঙ্গপথ হচ্ছে সুইজারল্যাণ্ড এবং ইটালীর মধ্যে প্রসারিত ১২.২৫ মাইল দীর্ঘ সিম্পলন ২ সুড়ঙ্গপথ।

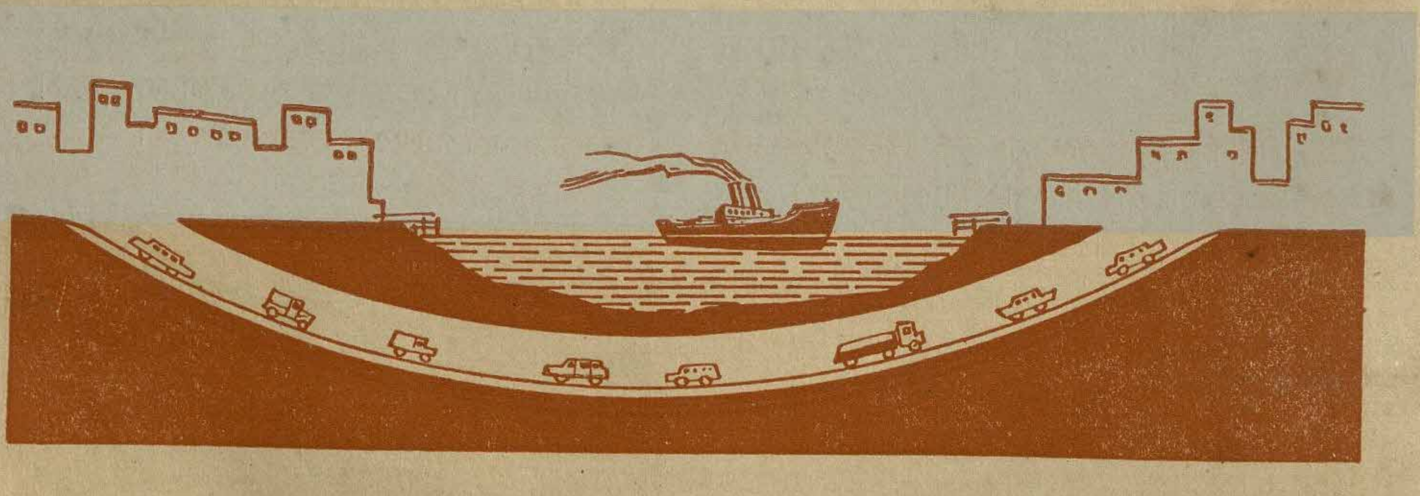
ফ্রান্স এবং ইটালীর মধ্যে প্রসারিত ৭.২ মাইল দীর্ঘ মণ্ট ব্ল্যাঙ্ক সুড়ঙ্গপথটি হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ সাধারণ মোটরগাড়ী, লরী ইত্যাদি যাবার উপযোগী সুড়ঙ্গপথ।

ভারতবর্ষের সুড়ঙ্গপথগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথ হচ্ছে পাঞ্জাব থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত প্রসারিত ১.৭৫ মাইল দীর্ঘ জওহর সুড়ঙ্গপথ।

সুড়ঙ্গ কিভাবে কাটা হয়

কোন পদ্ধতিতে সুড়ঙ্গ কাটা হবে তা নির্ভর করে কোন ধরনের সুড়ঙ্গ নির্মাণ করা হবে এবং সেখানকার মাটি কি ধরনের, তার ওপর। একটি সুড়ঙ্গ কাটা শুরু হলে ইঞ্জিনীয়াররা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। সাধারণতঃ ভূতত্ত্ববিদেরা বলতে পারেন যেখানে সুড়ঙ্গ কাটা হবে সেখানকার মাটির অবস্থা কি। কিন্তু তাঁদের ভবিষদ্বাণীও সবসময় নির্ভুল হয় না। তাঁরা মাটির গভীর স্তর থেকে একটু নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করেন। কিন্তু এ দিয়ে বাস্তবক্ষেত্রের বিপদের সম্ভাবনাকে জানা যায় না। সুড়ঙ্গ নির্মাণ করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে বিপদের সম্মুখীন হতে হয় এবং জীবনহানি ঘটে তা হচ্ছে হঠাৎ ওপরের আলগা মাটি ধ্বসে পড়া এবং মাটির গা থেকে হঠাৎ-বেরিয়ে-আসা প্রবল জলোচ্ছ্বাস। ভূগর্ভস্থ গ্যাসও অত্যন্ত বিপজ্জনক; এর ফলে প্রবল বিস্ফোরণ ঘটবার সম্ভাবনা থাকে।

নদীগর্ভে সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছে



এই সমস্ত বিপদের সম্ভাবনাগুলিকে বিবেচনা করে ইঞ্জিনীয়াররা আগে থেকেই জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্যে সাবধান হন। প্রথমতঃ, বায়ু চলাচলের বন্দোবস্ত রাখা হয়; তাছাড়া জল নিষ্কাশনের জন্যে পাম্পের ব্যবস্থা থাকে। সুড়ঙ্গ নির্মাণকার্য শুরু করার আগে এই সমস্ত এবং অন্যান্য আরও সব পরিকল্পনা তৈরী করা হয় এবং সেই অনুসারে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

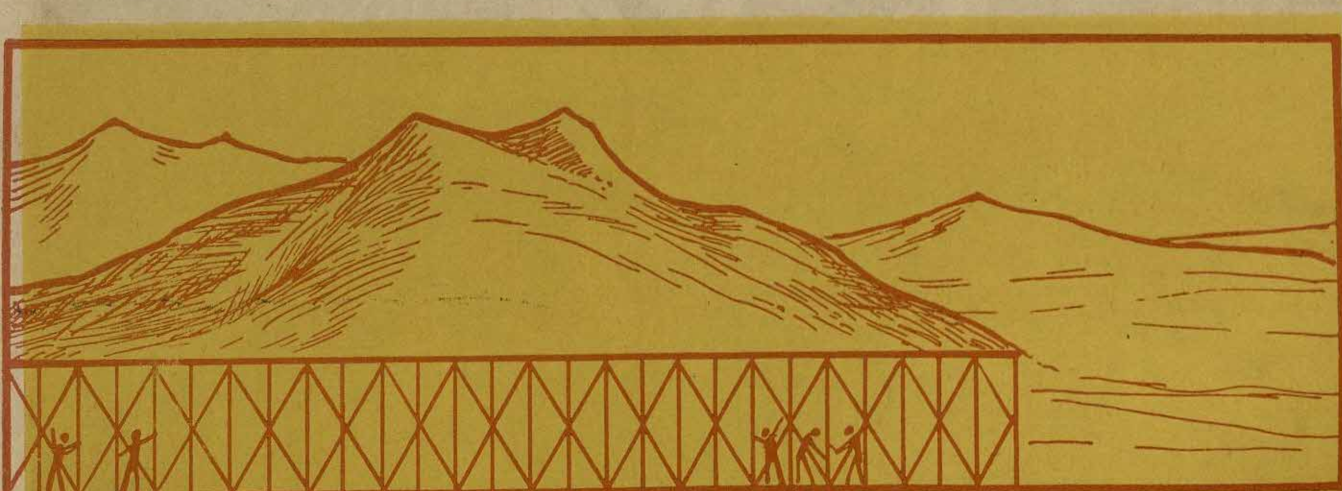
সাধারণতঃ সুড়ঙ্গগুলি কাটার কাজ একই সঙ্গে দুদিক থেকে শুরু করা হয়। দুদিকের দুদল দুদিক থেকে কাটতে কাটতে এসে প্রায় নির্ভুলভাবে মাঝখানে এসে মিলিত হন। ডেলাওয়্যার সুড়ঙ্গ নির্মাণের সময় দুদলকে চব্বিশবার বিভিন্ন জায়গায় মিলিত হতে হয়েছিল; কিন্তু দু ইঞ্চির বেশী কোন ক্ষেত্রে ভুল হয় নি। সিম্পলন সুড়ঙ্গ নির্মাণকারী দুদল একেবারে নির্ভুলভাবে নিজেদের দিকের দেওয়ালকে অপর দলের দেওয়ালের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন।

এই কাজটি কয়েকটি উপায়ে সমাধা করা হয়। সাধারণতঃ একটি তেপায়ার ওপর নিখুঁতভাবে স্থাপিত একটি টেলিস্কোপের সাহায্যে ইঞ্জিনীয়াররা এবিষয়ে সতর্ক লক্ষ্য রাখেন। এই টেলিস্কোপটিকে প্রয়োজনমত সমতলভাবে বা লম্বভাবে ঘোরানো যায়।

মাটি ধ্বসে পড়ে সুড়ঙ্গ যাতে বুঁজে না যায়, সেজন্যে এক ধরনের ইস্পাতের আচ্ছাদন ব্যবহার করা হয়। ১৮১৮ সালে ব্রুনেল নামে একজন ইংরেজ ইঞ্জিনীয়ার এই আচ্ছাদনটির উদ্ভাবন করেন। এই আচ্ছাদনটির ব্যাস হয় সুড়ঙ্গের ব্যাসের প্রায় সমান।

সুড়ঙ্গ নির্মাণ

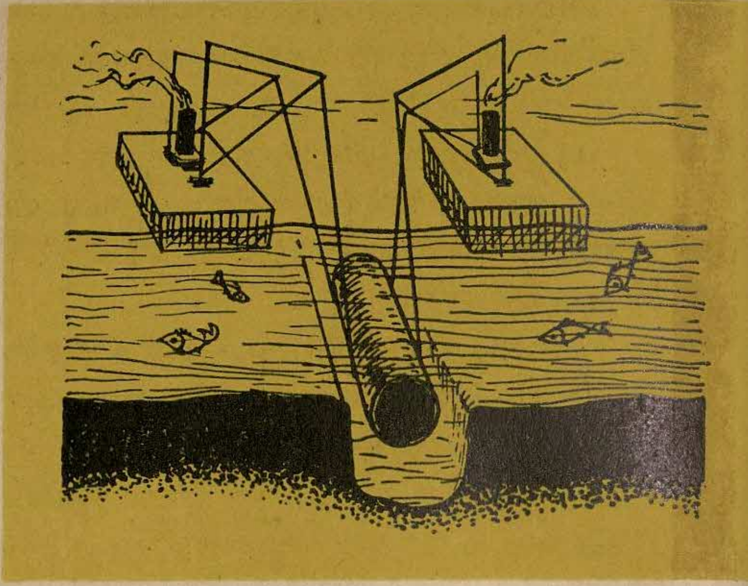




হাইড্রলিক জ্যাকগুলির (ভারী বস্তু উত্তোলনের যন্ত্র) সাহায্যে এই আচ্ছাদনটিকে গর্তের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এই আচ্ছাদনের মধ্যে থেকে শ্রমিকেরা বেশ নিরাপদে কাজ করতে পারেন। অনেক সময় এমন হয় যে, সুড়ঙ্গ কাটতে গিয়ে শিলার চাপ হঠাৎ কমে যাওয়ার ফলে পাথরের টুকরো তীব্রগতিতে ছিটকে এসে শ্রমিকের প্রাণ সংশয় করে। এই ইস্পাতের আচ্ছাদনের ভিতরে থাকার ফলে সেই বিপদের আশঙ্কা আর থাকে না।

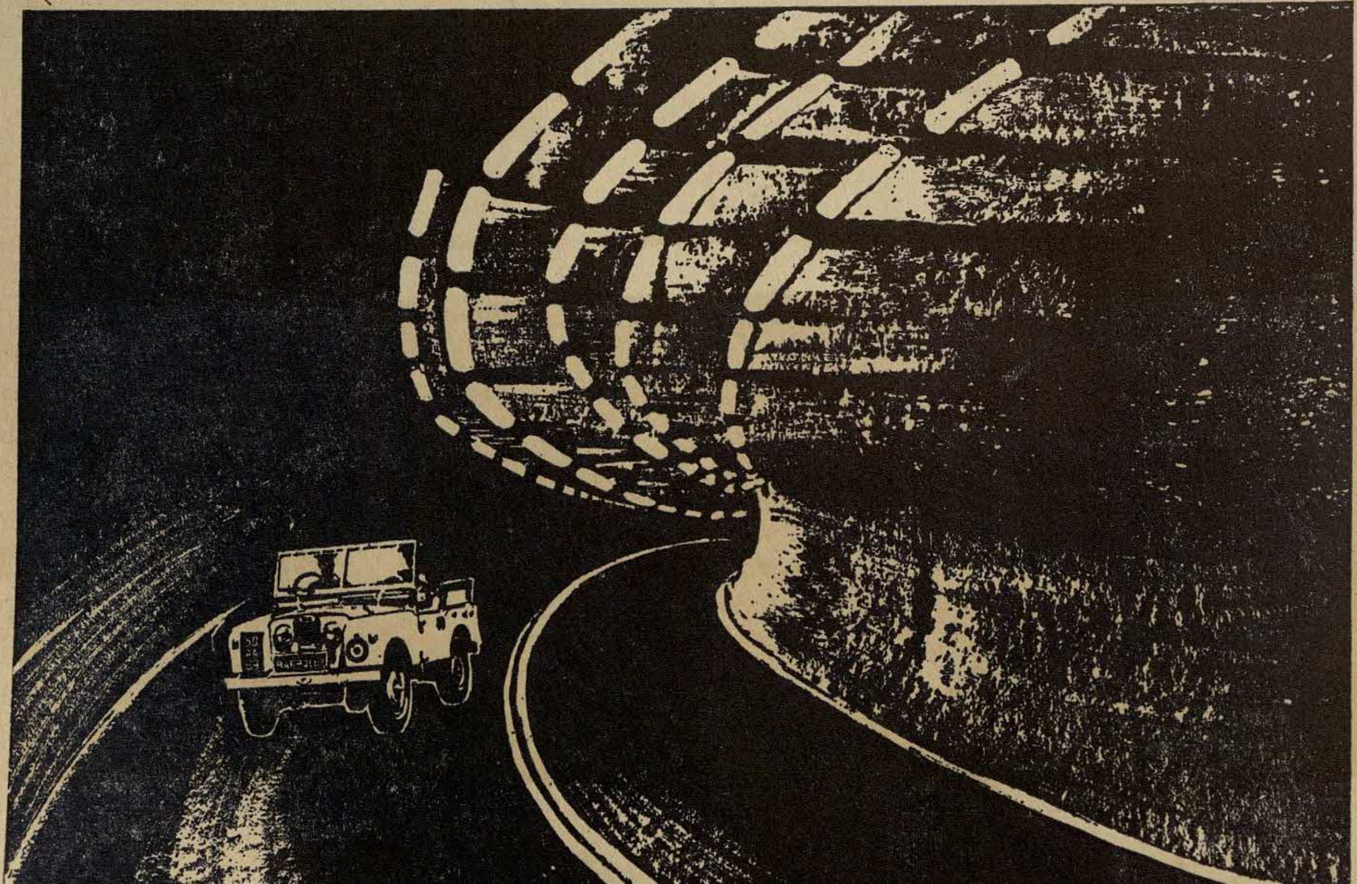
সুড়ঙ্গ কাটতে কাটতে হঠাৎ-বেরিয়ে-আসা প্রবল জলোচ্ছ্বাসকে রোধ করবার জন্যে উপযুক্ত চাপের বাতাস ভিতরে পাঠানো হয়। তা জলকে প্রতিরোধ করে। নদীর তলায় সুড়ঙ্গ কাটার সময় এই উচ্চচাপবিশিষ্ট বায়ুর সাহায্যে কাদা ও জলকে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়া থেকে প্রতিরোধ করা হয়।

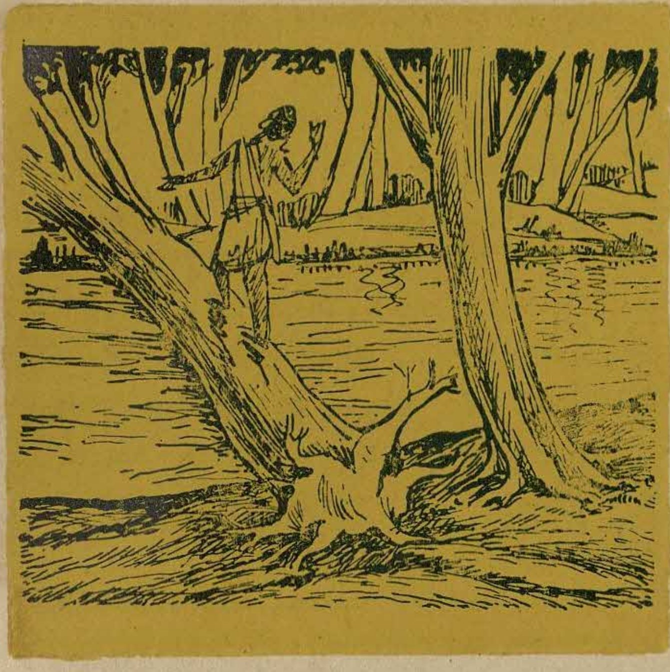
নদীর তলার সুড়ঙ্গগুলি অনেকক্ষেত্রে তীরের ওপরে লোহা এবং কন্‌ক্রীট দিয়ে নির্মাণ করে তারপর নদীগর্ভে নামিয়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে প্রথমে ছোট ছোট ভাগে সুড়ঙ্গগুলিকে তৈরী করা হয়; তারপর সেগুলি জলে নামিয়ে দিলে ডুবুরীরা সেগুলিকে জলের নীচে নিখুঁতভাবে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে দেন। তারপর তার ওপর কন্‌ক্রীটের ঢালাই করা হয়।



লোহা এবং কন্‌ক্রীট দিয়ে নির্মিত সুড়ঙ্গগুলি নদীগর্ভে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে

নদীর তলায় অথবা পাহাড়ের গায়ে যেখানেই সুড়ঙ্গ কাটা হোক না কেন, তার জন্যে প্রয়োজন অসীম দক্ষতা ও প্রভূত অর্থ। প্রত্যেকটি সুড়ঙ্গ নির্মাণের সময় অভূতপূর্ব এক একটি অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্যার সৃষ্টি হয়ে ইঞ্জিনীয়ারদের বিব্রত করে। এবং এইসব সমস্যার কোনটাই আগে থেকে জানান দিয়ে আসে না।





এইভাবেই হয়ত সেতু নির্মাণের কথাটা মানুষের প্রথম মনে আসে

সেতু

মানুষ কবে প্রথম সেতু নির্মাণ করেছে, সেকথা সঠিক বলা মুস্কিল। এমন হতে পারে, আর সেটি হওয়াই সম্ভব যে, ক্ষীণ খরস্রোতা এক নদীর পাড়ের একটি গাছ প্রবল ঝড়ে ভেঙ্গে নদীর ওপর পড়ে গিয়েছিল। নদীটি সরু ছিল, তাই গাছটি নদীর দু পাড়ে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। তারপর আমাদেরই কোন এক পূর্বপুরুষ সেই নদীর অপর পারে যাবার জন্যে সেখানে এসে উপস্থিত হন। গাছটিকে ওইভাবে পড়ে থাকতে দেখে, সাঁতার দিয়ে নদী পার না হয়ে তিনি হয়ত ওই গাছের ওপর দিয়ে হেঁটে নদী পার হন।

তারপর প্রকৃতির প্রদর্শিত পথে মানুষ নিজেই ওইভাবে নদী পারাপারের বন্দোবস্ত করল।

সেতু নির্মাণের বোধকরি সেই শুরু।

খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে মানুষ পাথর দিয়ে সেতু নির্মাণ করত, এমন সাক্ষ্য পাওয়া যায়। চীন, মেসোপটেমিয়া এবং মিশরে বেশ কয়েকটি সুন্দর সেতু নির্মিত হয়েছিল।

আমাদের পৌরাণিক কাহিনীগুলিতেও সেতু নির্মাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, লঙ্কায় যাবার জন্যে রামচন্দ্র সমুদ্রের ওপর সেতু নির্মাণ করেছিলেন।

প্রাচীনকালে রোমানরা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সেতু-নির্মাণকারী। রোমানদের নির্মিত কয়েকটি সেতু আজও ব্যবহৃত হয়। যীশুখৃষ্টের আমলে নির্মিত ফ্রান্সের অন্তর্গত নিম্‌সে পন্ট দ্য গার্ড নামে অ্যাকুইডাক্ট্‌ (কৃত্রিম জল প্রণালী) সেতুটি আজও রোমানদের স্থাপত্যবিদ্যার নিদর্শন-স্বরূপ টিঁকে আছে। রোমানরা বহু কাঠের সেতুও নির্মাণ করেছিলেন।

খৃষ্টপূর্ব ১১৫০ অব্দে ব্যবিলনে ইউফ্রেটিস নদীর ওপর কাঠ ও পাথর দিয়ে তৈরী ৬৬০ ফুট দীর্ঘ একটি সেতু ছিল বলে জানা গেছে।

খৃষ্টপূর্ব ৪৮০ অব্দে পারসীয়রা এক নতুন ধরনের সেতু নির্মাণ করেন। তাঁরা নদীবক্ষের ওপর অনেকগুলি নৌকাকে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে দিতেন। এইভাবে তাঁরা গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যবর্তী জলপথ হেলেসপন্ট অতিক্রম করতেন। এখন এই ধরনের সেতুগুলিকে বলে পন্‌টুন্‌।

রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ৫০০ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম ইউরোপে কয়েকটি নতুন সেতু নির্মাণ করা হয়। উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পুরনো অনেকগুলি সেতু এইসময় অকেজো হয়ে পড়ে বা ধ্বংস হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেতু নির্মাণের কলাকৌশল আরও উন্নতিলাভ করে। ১২০০ সালে সুইজারল্যাণ্ডে রিউস নদীর ওপর পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঝোলান সেতুটি নির্মিত হয়। সেটি কাঠ দিয়ে নির্মিত হয়েছিল। এই সময়ে নির্মিত অন্যান্য সেতুগুলির মধ্যে লণ্ডনের টেমস নদীর



সে আমলের পন্টুন

সেতুটি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ১২০৯ সালে এই সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হয়; তারপর ছশো বছর এটি ব্যবহৃত হয়।

১৭৪৭ সালে পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলটি প্যারিসে স্থাপিত হয়। ফরাসী থেকে বাংলায় অনুবাদ করলে সে বিদ্যালয়ের নাম দাঁড়ায়—সেতু এবং রাস্তা নির্মাণের জন্যে বিদ্যালয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেতু নির্মাণের জন্যে প্রথম লোহা ব্যবহৃত হয়। ১৭৭৭ সালে ইংল্যাণ্ডের কোলব্রুকডেলে সেভের্ণ নদীর ওপর একশ ফুট দীর্ঘ সেতুটি প্রথম সম্পূর্ণ লোহা দিয়ে নির্মাণ করা হয়। এই সেতুটির নক্সা পরিকল্পনা করেন টমাস প্রিটচার্ড এবং এটির নির্মাণকার্য শেষ হয় ১৭৭৯ সালে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেতু নির্মাণের কাজে লোহার বহুল প্রচলন হয়। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে রেলগাড়ীর প্রচলন সেতু নির্মাণে এক সমস্যার সৃষ্টি করে; কারণ তার আগে সেতুর ওপর দিয়ে যাতায়াতকারী গাড়ীগুলি অপেক্ষা রেলগাড়ী অনেক বেশী ভারী। সুতরাং সেতুগুলিকে আরও দৃঢ় করাটা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল।

১৮৮৭ সালে জার্মানীর মূলহাউসে রাইন নদীর ওপর পৃথিবীর সর্বপ্রথম কনক্রীটের সেতুটি নির্মিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সেতু নির্মাণের জন্যে লোহার সঙ্গে সঙ্গে ইস্পাতের ব্যবহারও চালু হল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ থেকে সেতু নির্মাণে লোহা আর ব্যবহৃত হয় না বললেই চলে। এখন খোয়া, চুণ, বালি ও সিমেণ্টের মিশ্রণ লোহা বা ইস্পাতের কাঠামোর ওপর ঢালাই করে (রীইন্‌ফ্যরস্‌ড্ কন্‌ক্রীট) সেতু নির্মাণ করার পদ্ধতি বিশেষ চালু হয়েছে। আজকাল প্রায় সব সেতুর ভিত্তি এবং আলম্বগুলিই এইভাবে রীইন্‌ফ্যরস্‌ড্ কন্‌ক্রীট দিয়ে নির্মাণ করা হয়। তবে লোহা ও ইস্পাতের ব্যবহার এখনও লুপ্ত হয়নি। বরং বলা যায় লোহা বা ইস্পাতের কাঠামোর ওপর রীইনফ্যরস্‌ড্ কন্‌ক্রীটের ঢালাই করে সেতুগুলিকে আরও মজবুত করা হচ্ছে।

পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলওয়ে সেতু আফ্রিকার মোজাম্বিকে অবস্থিত লোয়ার জাম্বেসি সেতু (১১,৬৫০ ফুট)।

পৃথিবীর দীর্ঘতম ক্যান্টিলিভার সেতু কানাডার সেন্ট লরেন্স নদীর ওপর অবস্থিত কুইবেক সেতু (৩,২৩৯ ফুট)।

পৃথিবীর উচ্চতম ঝোলান সেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোলোরাডোয় রয়্যাল গর্জের ওপর অবস্থিত (১,০৫৩ ফুট)।

পৃথিবীর দীর্ঘতম ঝোলান সেতু নিউইয়র্ক বন্দরে অবস্থিত ভেরাজানো—ন্যারোস (১৩,৭০০ ফুট)।

ভারতবর্ষের দীর্ঘতম সেতু হচ্ছে বিহারের শোন সেতু (১০,০৫২ ফুট)।

ভারতবর্ষের দীর্ঘতম এবং পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম ক্যান্টিলিভার সেতু হচ্ছে পশ্চিম বঙ্গের হাওড়া সেতু (২,১৫০ ফুট)।

এ ধরনের সেতুর চল আজও আছে



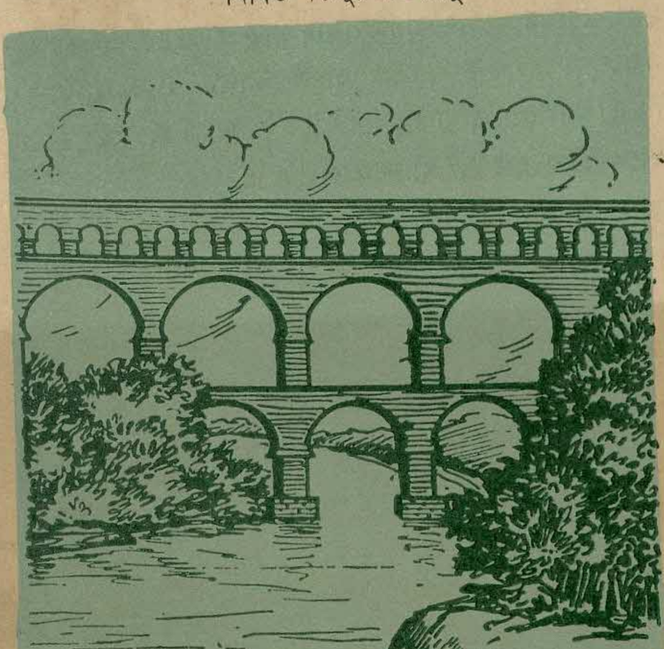
বিভিন্ন ধরনের সেতু

সমস্ত সেতুকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ (১) স্থির সেতু, (২) পরিবর্তনশীল সেতু এবং (৩) ভাসমান সেতু।

স্থির সেতু

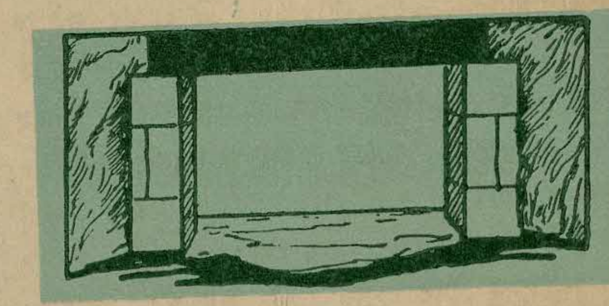
অধিকাংশ সেতুই স্থির। নামকরণ দেখেই বোঝা যায় যে, এগুলিকে নির্মাণই করা হয় যাতে এগুলিকে নড়াচড়া করানো না যায়; যেখানে এগুলিকে নির্মাণ করা হয়, সেখানেই এগুলি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নদীবক্ষে নির্মিত এই ধরনের অনেক সেতুর তলা দিয়ে জাহাজও চলাচল করতে পারে।

খৃষ্টপূর্ব ১৯ অব্দে দক্ষিণ ফ্রান্সে গার্ড নদীর ওপর রোমানগণ কর্তৃক নির্মিত পন্ট দ্যু গার্ড সেতু



এই ধরনের সেতুগুলি ইস্পাত, কন্‌ক্রীট অথবা কাঠ দিয়ে নির্মিত হয়। সেতু খিলানের দুই পিল্লা বা আলম্ব স্তম্ভের মধ্যবর্তী ব্যবধান কতটা হবে সেই অনুসারে উপরোক্ত উপাদানগুলির মধ্যে কোনটি ব্যবহৃত হবে তা স্থির করা হয়। এই ব্যবধান যদি একশ ফুটের বেশী হয় তবে ইস্পাত ব্যবহার করা হয়; যদি একশ ফুটের মধ্যে হয় তবে ইস্পাত অথবা কন্‌ক্রীট ব্যবহার করা যেতে পারে; মাঝে মাঝে, অবস্থা অনুকূল থাকলে, এই ব্যবধান যদি পঁচিশ ফুটের কম হয়, তবে কাঠ ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্থির সেতু আবার চার রকমেরঃ (১) বীম এবং গ্যার্ডার সেতু; (২) ট্রাস সেতু; (৩) আর্চ সেতু এবং (৪) ঝোলান সেতু।



সাধারণ গ্যার্ডার সেতু

বীম এবং গ্যার্ডার সেতু—বীম সেতুগুলিতে একটি কড়ি দুটি আলম্ব বা ঠেক্‌নোর ওপর সমতলভাবে স্থাপিত থাকে। এই কড়িটি কাঠ, কন্‌ক্রীট বা ইস্পাত দিয়ে তৈরী হতে পারে। গ্যার্ডার সেতুগুলিতে গ্যার্ডারটি ইস্পাতের তৈরী হয়। এতে থাকে দুটি সমতল অংশ—তাদের বলে ফ্ল্যাঞ্জ। এই ফ্ল্যাঞ্জ দুটি ওয়েব নামে দুটি খাড়া অবলম্বনের সঙ্গে ঢালাই করে যুক্ত থাকে। গ্যার্ডারগুলি কন্‌ক্রীট দিয়েও তৈরী করা হয়।

সেতু নির্মাণের সময় দুই অথবা ততোধিক সমান্তরাল কড়ি অথবা গ্যার্ডার একই আলম্বের ওপর স্থাপন করা হয় এবং সেগুলিকে আড়াআড়িভাবে স্থাপিত অংশগুলির দ্বারা যুক্ত করা হয়। বলা বাহুল্য, সেতুটি যদি দৈর্ঘ্যে ছোট হয় তবে দুটি আলম্বের ওপরেই সমস্ত সেতুটি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সেতুটি যদি দীর্ঘ করবার প্রয়োজন



আর এক ধরনের গ্যার্ডার সেতু



সাধারণ ক্যান্টিলিভার সেতু

হয় তবে সেই অনুসারে আলম্বের সংখ্যা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কড়ি এবং গ্যার্ডারের সংখ্যাও বাড়বে। অর্থাৎ সেগুলিকে তখন পরস্পরের সঙ্গে জোড়া দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। সাধারণতঃ ইস্পাতের তৈরী কড়িগুলির এক একটির দৈর্ঘ্য হয় প্রায় ১২৫ ফুট। ইস্পাতের গ্যার্ডারগুলি আরও মজবুত হয়।

যুগোশ্লাভিয়ায় সেভ নদীর ওপরে এই ধরনের সেতুটির মূল আলম্ব দুটির মধ্যে ব্যবধান ৮৫৬ ফুট। এই ব্যবধানটিই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই ধরনের বিশাল দূরত্বের ভার বজায় রাখতে গেলে বিশেষভাবে নির্মিত অত্যন্ত শক্তিশালী ইস্পাত ব্যবহার করতে হয়। নতুবা সমগ্র সেতুটিই ভেঙ্গে পড়বার সম্ভাবনা থাকে।

ট্রাস সেতু—ট্রাস হচ্ছে দুটি আলম্বের মাঝখানে প্রসারিত সেতুর ভার রক্ষা করবার জন্যে তৈরী কাঠামো। এগুলি দেখতে হয় অনেকটা পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ ত্রিভুজের মত। এগুলির আকার ত্রিভুজের মত করবার বিশেষ কারণ আছে। সেটি হচ্ছে, একটি নির্দিষ্ট আয়তনের (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের মাপ) তিন-বাহু-আকারের একটি মাত্র আকারই হতে পারে। ফলে ত্রিভুজের আকারে গঠিত কাঠামো অত্যন্ত মজবুত হয়। ট্রাসের ওপরের অংশগুলিকে বলে আপার কর্ড, নীচের অংশগুলিকে বলে লোয়ার কর্ড এবং খাড়া অংশগুলিকে বলে ওয়েব। দুটি সমান্তরাল ট্রাসকে আড়াআড়িভাবে স্থাপিত অংশগুলির দ্বারা যুক্ত করা হয়।

এই ধরনের সেতুগুলির মধ্যে আলম্বের মধ্যে দীর্ঘতম ব্যবধান হচ্ছে আইওয়ার অন্তর্গত দ্যুবাক্-এ অবস্থিত জুলিয়েন-দ্যুবাক্ সেতুটির (৮৪৫ ফুট)।

ট্রাস সেতুগুলিকে একটু রকমফের করে ক্যান্টিলিভার সেতু নির্মাণ করা সম্ভব। এই ব্যবস্থায় আলম্ব থেকে ট্রাসের একটি অংশ বাইরের দিকে ঝুলতে থাকে; এই ঝোলান অংশটিকে বলে ক্যান্টিলিভার বাহু। অপর আলম্ব থেকে অপর ক্যান্টিলিভার বাহুটি এসে প্রথমটির সঙ্গে মিলিত হয়। বিভিন্ন ধরনের ক্যান্টিলিভার সেতু আছে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রচলিত ব্যবস্থায় চারটি আলম্ব বা স্তম্ভ এবং তিনটি আলম্বের মধ্যে ব্যবধান থাকে। চারটি আলম্বের দুটি থাকে তীরে এবং দুটি থাকে জলের ওপর।

আধুনিক ক্যান্টিলিভার সেতু



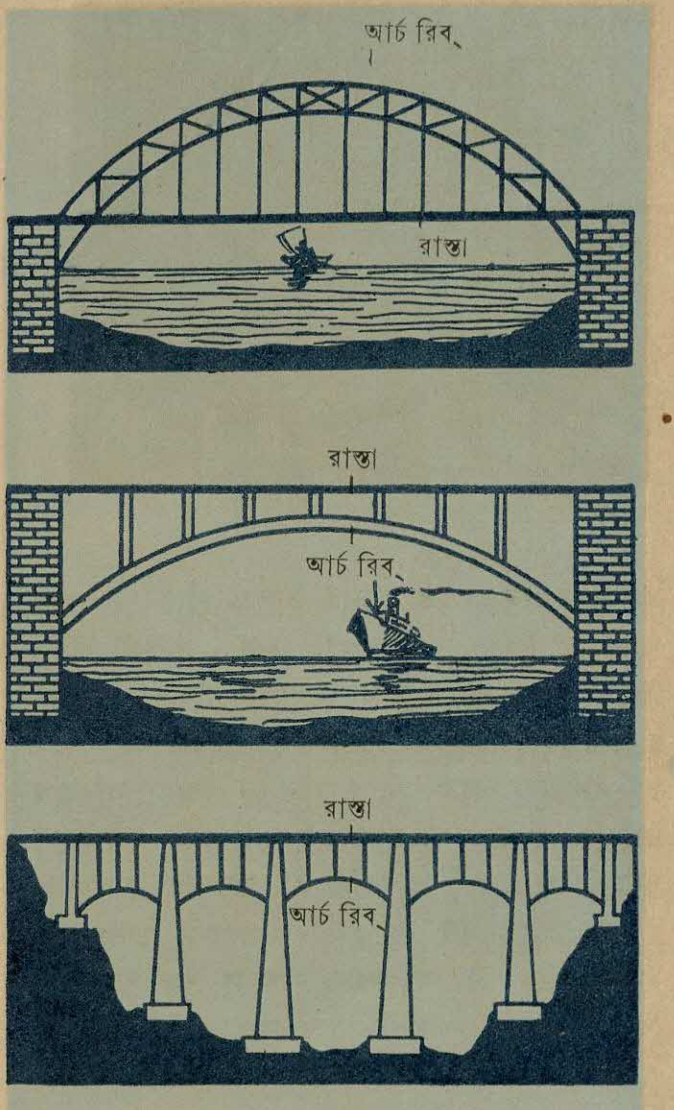
আর্চ সেতু—প্রায় ছ হাজার বছর আগেই এই পদ্ধতিতে সেতু নির্মিত হয়েছে।

এই ধরনের সেতুতে ধনুকের মত বাঁকা ধরনী সেতুর সমস্ত ভার বহন করে। এগুলির নাম আর্চ রিব্। রিব্ আর্চগুলিকে চাপ দিয়ে সঙ্কুচিত করে সেতুর দু পাশের ভিতে ভার ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ধরনের সেতুতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইস্পাত ব্যবহার করা হয়। ইস্পাতের নির্মিত রিব্ আর্চগুলি কঠিন দণ্ডের মত করেও তৈরী করা হয় আবার অনেক সময় কাঠামোর মত করেও তৈরী করা হয়। এই ধরনের সেতুগুলির কোন কোনটিতে রাস্তা থাকে আর্চ রিবের ওপর আবার কোন কোনটিতে রাস্তা থাকে আর্চ রিব্ থেকে ঝোলান।

এই ধরনের সেতুগুলির মধ্যে আলম্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবধান আছে নিউ ইয়র্ক সহরের কিল ভ্যান কুল সেতুটির (১,৬৫২ ফুট)।

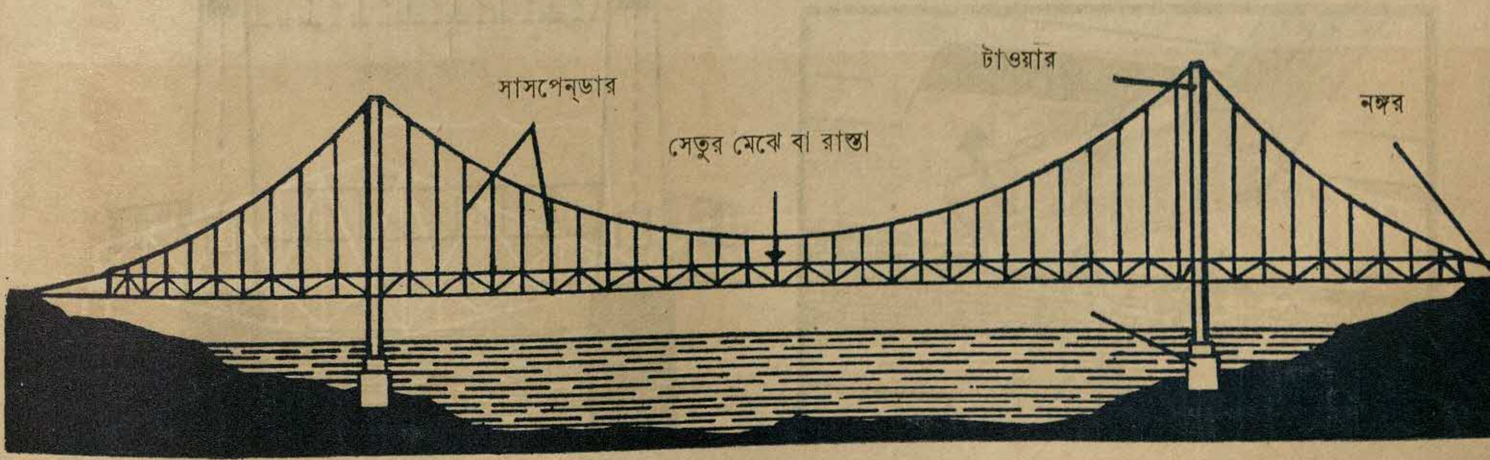
ঝোলান সেতু—এই ধরনের সেতুগুলিতে দুটি আলম্বের মধ্যে ব্যবধান হয় বিশাল। প্রাচীনকালে অনেকগুলি ঝোলান সেতু নির্মিত হয়েছিল। এই ধরনের সেতু নির্মাণের কাজে প্রথম লোহা ব্যবহার করা হয় ১৭৪১ সালে ইংল্যাণ্ডের টীস নদীর ওপর নির্মিত উইঞ্চ সেতুটি নির্মাণের সময়।

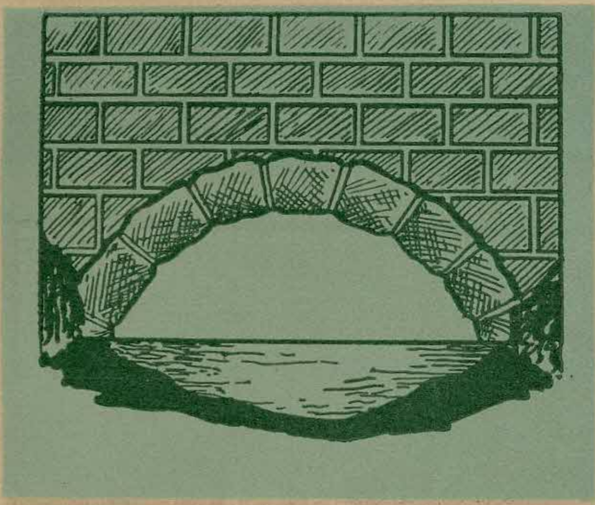
বাড়ীতে জামাকাপড় শুকাবার জন্যে আমরা যে দড়ি টাঙাই, ঝোলান সেতুর নির্মাণ কৌশলটিও অনেকটা সেই ধরনের। এক্ষেত্রে দড়ির পরিবর্তে থাকে অনেকগুলি তার পাকিয়ে পাকিয়ে তৈরী উচ্চ শক্তিসম্পন্ন তারের কাছি বা কেব্‌ল্। তারের দু প্রান্ত নঙ্গরে বাঁধা থাকে।



বিভিন্ন ধরনের আর্চ সেতু

ঝোলান সেতু





পাথরের নির্মিত সাধারণ আর্চ সেতু

এগুলি তারের প্রচণ্ড টানকে সামলে রাখে। এগুলি সাধারণতঃ নির্মিত হয় কন্‌ক্রীট দিয়ে; আবার অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয় যে, দু প্রান্তে পাহাড় থাকায় কেব্‌ল্‌-এর দু প্রান্ত সেই পাহাড়ের গায়েই বেঁধে দেওয়া হয়। এই দুই নঙ্গরের মাঝখানে থাকে দুটি উঁচু স্তম্ভ। এই স্তম্ভ দুটির ওপর থাকে সমস্ত কেব্‌ল্‌ এবং সেই সঙ্গে সমগ্র কাঠামোটির ভার। আজকাল এই স্তম্ভগুলি সাধারণতঃ ইস্পাত দিয়ে তৈরী করা হয় এবং সেগুলি স্থাপন করা হয় কন্‌ক্রীটের ভিতের ওপর। কেব্‌ল্‌ থেকে খাড়াভাবে ঝোলে সেতুর কতকগুলি অংশ আর এই অংশগুলিকে অবলম্বন করেই ঝোলে সেতুর মেঝে। কিছুসংখ্যক ঝোলান সেতুতে বহুসংখ্যক স্তম্ভ থাকে।

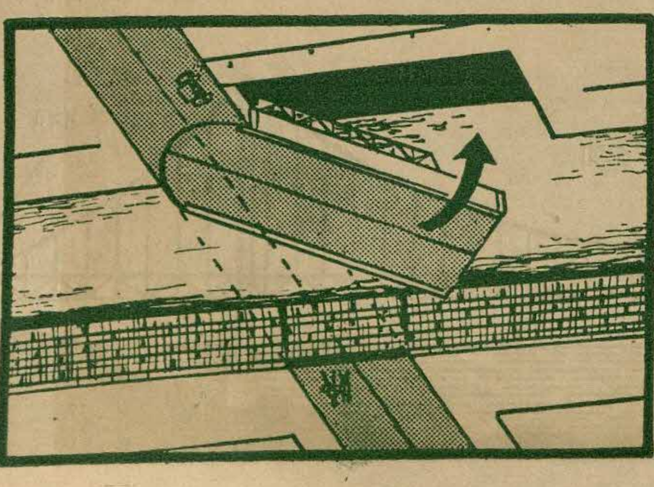
পরিবর্তনশীল সেতু

অনেকসময় নানাকারণে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, নদীর ওপর এমন উঁচু সেতু নির্মাণ করা সম্ভব হয় না যার তলা দিয়ে জাহাজ অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল সেতু নির্মাণ করা হয়ে থাকে।

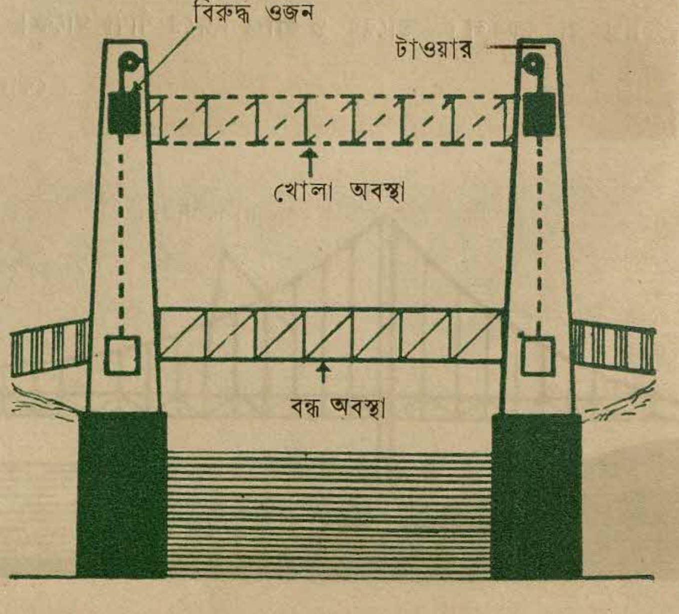
পরিবর্তনশীল সেতু সাধারণতঃ তিন রকমের হয়—(১) স্যুইং, (২) বাসকিউল এবং (৩) লিফ্‌ট্‌।

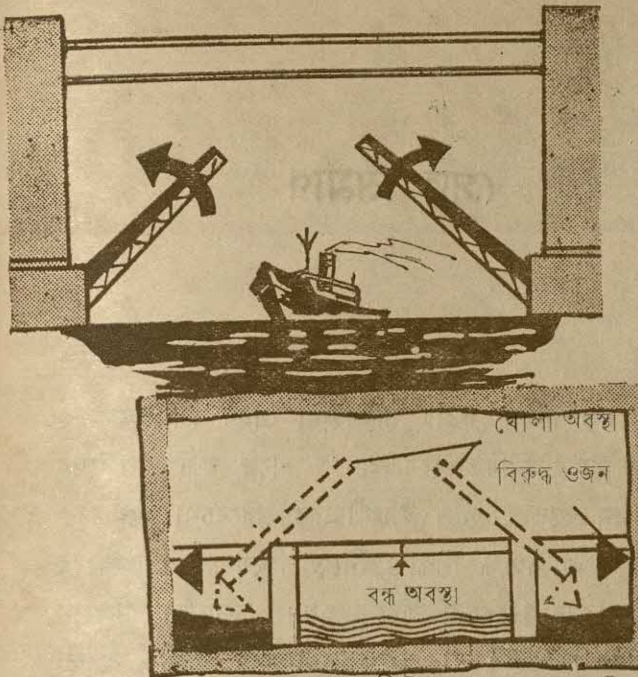
স্যুইং সেতুর দুই আলম্বের মধ্যে পরিবর্তনশীল ব্যবধানটি একটি খাড়া অক্ষের ওপর ঘুরে যায়; বাসকিউল সেতুর ক্ষেত্রে তা মাঝখান থেকে ফাঁক হয়ে দুদিক সমতল অক্ষের ওপর উঠে যায় এবং লিফ্‌ট্‌ সেতুর ক্ষেত্রে তা খাড়াভাবে ওপরে উঠে যায়। বলা বাহুল্য, এই ধরনের সেতুগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে খরচের দিক দিয়ে ওজনের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্যে এই ধরনের সেতুগুলি কন্‌ক্রীট দিয়ে নির্মাণ না করে ইস্পাত দিয়ে নির্মাণ করা হয়। কারণ ইস্পাত কন্‌ক্রীট অপেক্ষা অনেক হাল্কা।

স্যুইং সেতু

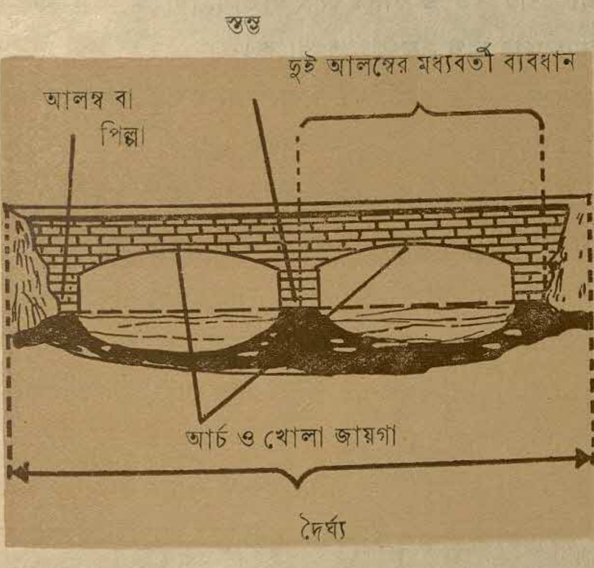


লিফ্‌ট্‌ সেতু





বাসকিউল সেতু



সেতুর বিভিন্ন অংশ

ডানদিকের ছবি দুটিতে দুই রকমের সেতুর মূল পার্থক্যটা বোঝানো হয়েছে। ওপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে সেতুর কাঠামোটি নীচে এবং মেঝে বা চলাচলের রাস্তা ওপরে; আর তলার ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে কাঠামোটি ওপরে এবং রাস্তা নীচে।

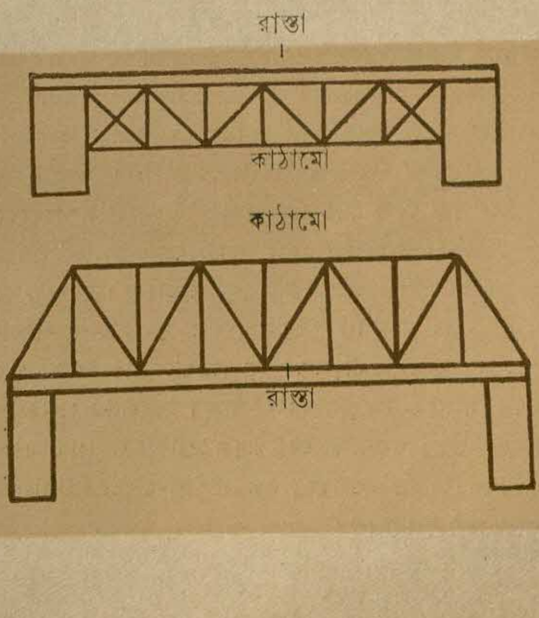
ভাসমান সেতু

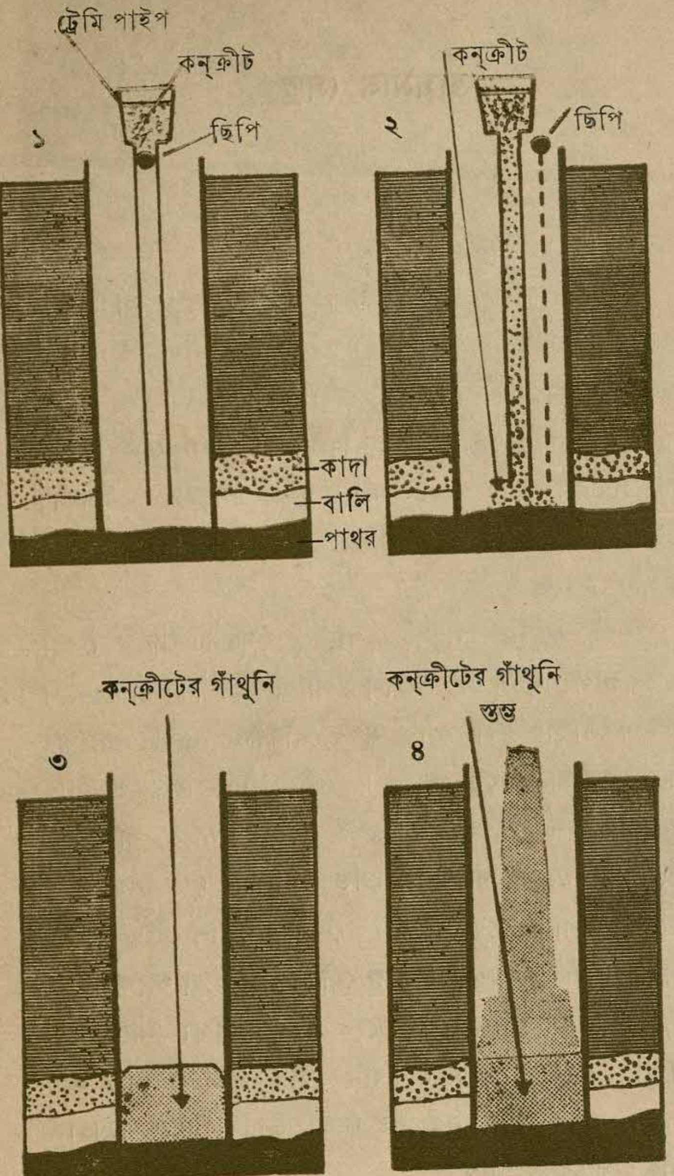
প্রাচীনকাল থেকেই এই ধরনের সেতুগুলি সাধারণতঃ সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এখন অসামরিক উদ্দেশ্যেও অবশ্য এগুলিকে ব্যবহার করা হয়।

এই ধরনের সেতুগুলির মধ্যে লেক ওয়াশিংটন সেতুটি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ৬,৫৬৬ ফুট দীর্ঘ এই সেতুটির নির্মাণকার্য ১৯৩৯ সালে শেষ হয়। এর ওপর দিয়ে খুব ভারী যানবাহন চলাচল করতে পারে।

এই ধরনের সেতুতে থাকে কন্‌ক্রীট দিয়ে তৈরী কতকগুলি পন্‌টুন্‌ বা চেটাল্‌ তলাবিশিষ্ট নৌকা বা ভেলা। এইসব নৌকার একটি প্রান্ত অপর নৌকাটির একটি প্রান্তের সঙ্গে শক্তভাবে যুক্ত থাকে। এই নৌকাগুলির ভাসবার ক্ষমতা এমন যে, জলের ওপর সেগুলি সাড়ে সাত ফুট উঁচু হয়ে ভেসে থাকে। সেতুর খানিক দূরে নঙ্গরগুলি জলের তলায় ডুবে থাকে। নৌকার দুপাশ থেকে তারের সাহায্যে সেই নঙ্গরগুলির সঙ্গে নৌকাগুলি বাঁধা থাকে।

অনেক ভাসমান সেতুতে এমন ব্যবস্থা আছে যে, জাহাজ এলে সেতুটি মাঝখান থেকে দুভাগে ভাগ হয়ে যায়; তখন মাঝখানের সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে জাহাজ পার হয়ে যেতে পারে।





অনেকসময় কফারড্যাম থেকে জল বের করে দেবার আগে সেখানটা কন্‌ক্রীট দিয়ে বন্ধ করে দিতে হয়। এই ব্যবস্থায় ইস্পাতের একটি লম্বা নল—ট্রেমি পাইপ—কফারড্যামের তলা অবধি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওই নলের মাথায় থাকে একটি কাঠের ছিপি। ওই ছিপির ওপরেই কন্‌ক্রীট ঢালতে হয় (১)। কন্‌ক্রীট যখন নলের মধ্যে দিয়ে নীচে যেতে থাকে তখন ওই ছিপিটিই কন্‌ক্রীটকে জলের কোন সংস্পর্শে আসতে দেয় না। কন্‌ক্রীট একেবারে তলায় পোঁছে ছিপিটিকে ঠেলে ওপরে পাঠিয়ে দেয় ; ছিপিটি মাটির ওপরে এলে সেটিকে তুলে নেওয়া হয়। কন্‌ক্রীট ক্রমে গর্তের মধ্যে বসে যেতে থাকে (২)। ট্রেমি পাইপটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভালভাবে কন্‌ক্রীট ঢালা হয়। কন্‌ক্রীটের গাঁথুনি যত উঁচু হতে থাকে পাইপটিও তত ওপরে উঠতে থাকে যদিও সর্বদাই সেটি কন্‌ক্রীটের মধ্যেই থাকে। কন্‌ক্রীটের ঢালাই শেষ হলে কফারড্যামের তলায় কন্‌ক্রীটের একটি গাঁথুনি তৈরী হয়ে যায় (৩)। এরপর পাম্পের সাহায্যে জল বের করে নেওয়া হয় ; এবং সেই গাঁথুনির ওপর রীইন্‌ফ্যরস ড কন্‌ক্রীটের আলম্ব তৈরী করা হয় (৪)।

সেতু নির্মাণ

সেতু নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে কি ধরনের সেতু নির্মিত হবে অথবা তাতে কটি আলম্বের প্রয়োজন হবে সেগুলি ইঞ্জিনীয়াররা বিবেচনা করে ঠিক করেন। এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে ইঞ্জিনীয়ারদের বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করতে হয়। তাছাড়া যেখানে সেতুটির ভিত্তি তৈরী হবে সেখানকার মাটির অবস্থা কি তা বিবেচনা করাও ইঞ্জিনীয়ারদের দায়িত্ব। প্রত্যেকটি সেতু এমনভাবে পরিকল্পিত করা হয় যে, তা যেন বিভিন্ন ওজনের ভার বইতে পারে এবং বাতাস, বিভিন্ন তাপমাত্রা ও ভূমিকম্পের চাপ সহ্য করতে পারে।

সেতুর ভিত্তি নির্মাণের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান হচ্ছে মাটির নীচেকার শক্ত নিরেট পাথর। নদীবক্ষ বা মাটির নীচে মোটামুটি গভীরে যদি এই পাথরের স্তরটি থাকে, তবে আলম্ব বা স্তম্ভগুলি সরাসরি এর ওপর স্থাপন করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন হয় যে, এই স্তরটি বড্ড বেশী গভীরে থাকে। সেসব ক্ষেত্রে প্রায়ই ছুঁচলো কাঠ বা লোহার কড়ি মাটিতে পুঁতে তার ওপর আলম্বগুলির ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

মাটি বা জলের বহু নীচে ভিত্তি স্থাপনের প্রয়োজন হলে কফারড্যাম প্রস্তুত করা হয়। এই কফারড্যাম হচ্ছে সেতু নির্মাণে ব্যবহৃত জলরোধক ফাঁপা আধারবিশেষ। এটির আয়তন ভিতের আয়তনের অনুরূপ হয়।

আকাঙ্খিত গভীরতায় কফারড্যামটিকে ঠেলে পাঠিয়ে দেবার পর, তার ভিতর থেকে মাটি বের করে আনা হয়। তারপর পাম্পের সাহায্যে তার ভিতর থেকে জল বের করে দেওয়া হয় এবং ভিত্তি নির্মাণের জন্যে তার ভিতর কন্‌ক্রীট ঢেলে দেওয়া হয়। ক্রমে ভিত্তির ওপর কন্‌ক্রীটের দণ্ডটি তৈরী হয়ে যায় ; তখন কফারড্যামটিকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

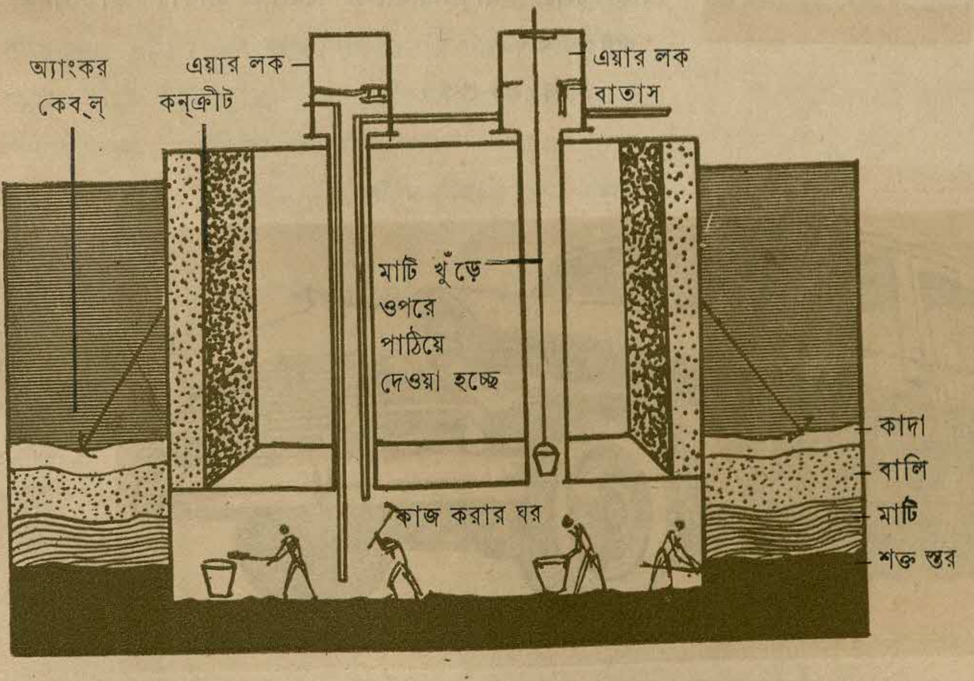
খোলা কফারড্যাম তৈরী করা সম্ভব না হলে, সেক্ষেত্রে কেসন ব্যবহার করা হয়। এগুলিও জলের তলায় কাজ করবার উপযোগী জলনিরোধক বড় ফাঁপা বাক্সের মত। এগুলি কন্‌ক্রীট বা ইস্পাত দিয়ে তৈরী করা হয়। আকাঙ্খিত গভীরতায় ডুবিয়ে দেবার পর এটিকে কন্‌ক্রীট দিয়ে ভর্তি করা হয় এবং তার ওপরেই ভিত্তি করে তখন আলম্বগুলি নির্মাণ করা হয়।

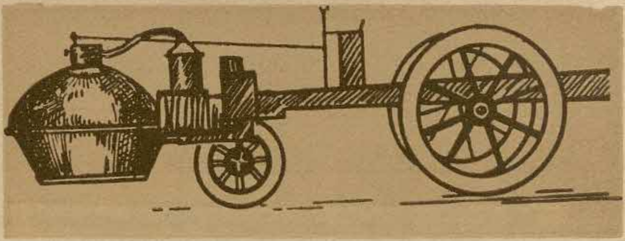
যাইহোক, এইভাবে নানা উপায়ে ভিত্তি নির্মাণের পর তার ওপর যে সেতু নির্মাণ করা হয়, তার জন্যেও বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

আলম্বের মধ্যে ব্যবধানগুলি যদি ছোট হয় এবং তলার মাটি থেকে যদি আলম্বগুলির মাথার নাগাল পাওয়া যায়, তবে ক্রেনের সাহায্যে তাদের আলম্বের ওপর তুলে যথোপযুক্ত জায়গায় বসানো হয়। আর সেগুলি যদি বড় এবং ভারী হয় তবে অস্থায়ী একটি মাচার ওপর সেগুলিকে সঠিকভাবে বসানো হয়, তারপর সেগুলিকে তাদের নিজ নিজ জায়গায় নিয়ে গিয়ে নীচু করে আলম্বগুলির ওপর যথোপযুক্তভাবে স্থাপন করা হয়।

ঝোলান সেতুগুলি নির্মাণের সময় বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এই সেতুগুলি নির্মাণ করবার সময় সেতুর দুপ্রান্তের নঙ্গর দুটি এবং মাঝখানের স্তম্ভগুলি প্রথমে তৈরী করে নেওয়া হয়। সেতুটি ছোট হলে কেব্‌ল্‌গুলি প্রথমে মাপমত কেটে নেওয়া হয় এবং তারপর তার এক প্রান্ত একদিকের নঙ্গরে বেঁধে সেগুলিকে স্তম্ভগুলির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে অপর প্রান্তের নঙ্গরটিতে বেঁধে দেওয়া হয়। সেতুটি যদি বড় হয় তবে সেক্ষেত্রে একটি চলমান পুলি তারগুলিকে বয়ে এক প্রান্তের নঙ্গর থেকে আর এক প্রান্তের নঙ্গর অবধি টেনে নিয়ে যায়। অপর প্রান্তে পৌঁছে সে প্রান্তের নঙ্গরে তারগুলিকে পাক খাইয়ে আবার সেগুলিকে অন্য প্রান্তে নিয়ে আসা হয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত কেব্‌ল্‌গুলি যতটা প্রয়োজন ততটা মোটা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে তারগুলিকে টেনে টেনে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর এই পৃথক তারগুলিকে হাইড্রলিক প্রেসের সাহায্যে পাক খাইয়ে গোল করা হয়।

<u>কেসনের ব্যবহার</u>: কেসনের তলায় ঘরের মত জায়গা আছে, শ্রমিকেরা সেখানে নেমে এসে কাজ করেন। ওই ঘরের ছাদ থেকে দুটি দণ্ড ওপরে উঠে গেছে। ওই দুটিই কেসনের ওপরের সঙ্গে কেসনের নীচের ওই ঘরের সংযোগ স্থাপন করেছে। ওই দণ্ড দুটির একটি শ্রমিকদের ব্যবহার করার জন্যে এবং অপরটি খোঁড়া মাটি ওপরে পাঠাবার জন্যে। কেসনটি জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। ওপর থেকে সংনমিত বায়ু পাঠিয়ে ঘরটিকে জলমুক্ত করে রাখা হয়। শ্রমিকেরা এয়ার লকে এলে সেখানকার বায়ুর চাপ আস্তে আস্তে বাড়ানো হয়; তারপর সেখানকার বায়ুর চাপ কেসনের নীচের ঘরের প্রায় সমান হলে তাঁরা দণ্ডের পাশে স্থাপিত একটি সিঁড়ি বেয়ে নীচে ওই ঘরে চলে আসেন। আবার কাজের শেষে ওই ঘর থেকে শ্রমিকেরা যখন বেরিয়ে আসেন, তখনও শ্রমিকেরা ওই এয়ার লকে এসে অপেক্ষা করেন। এই সময় বায়ুর চাপ আস্তে আস্তে কমিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে এয়ার লকের মধ্যেকার বায়ুর চাপ বাইরের বায়ুর চাপের সমান হলে শ্রমিকেরা এয়ার লক থেকে বাইরের মুক্ত বাতাসে বেরিয়ে আসেন। কাদা, বালি, মাটি ইত্যাদি যত অপসরণ করা হয় এবং কেসনের ফাঁপা দেওয়াল যত কন্‌ক্রীট দিয়ে ভর্তি করা হয়, কেসনটি তত নীচে নামতে থাকে। কেসনটি যখন নদীগর্ভে পৌঁছায়, তখন তার সবটাই কন্‌ক্রীট দিয়ে ভর্তি হয়ে যায়।





প্রথম স্বয়ংচালিত গাড়ী তৈরী করেন জোসেফ ক্যানিও

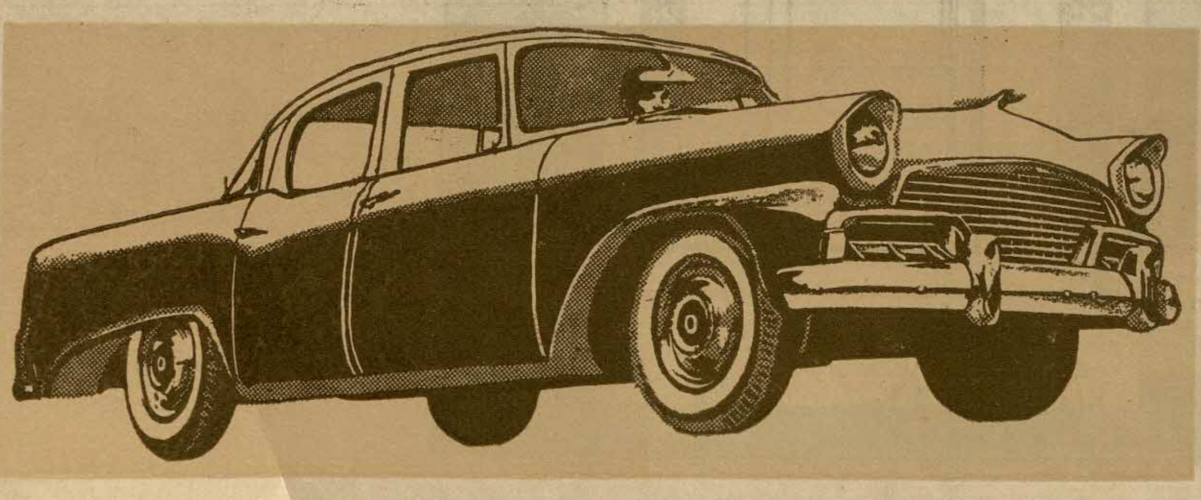
মোটর গাড়ী

১৭৭০ সালের কথা। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের রাজপথ দিয়ে ফরাসী সামরিক বাহিনীর এক ইঞ্জিনীয়ার প্রচণ্ড শব্দে এক কিম্ভুতকিমাকার গাড়ীর ওপর চেপে চলেছেন। গাড়ীটি তাঁর নিজের তৈরী। তিন চাকার সাইকেলের মত। সামনের দিকে এক বিরাট কেটলির মত পাত্র রয়েছে' সেটিই ইঞ্জিন আর তার মধ্যে বাষ্প তৈরী হচ্ছে এবং গাড়ীটি সেই বাষ্পশক্তি দিয়ে স্বয়ং চালিত হচ্ছে।

ভদ্রলোকের নাম নিকোলাস জোসেফ ক্যানিও।

দেখতে দেখতে ভীড় জমে গেল। গাড়ীর গতি ঘণ্টায় প্রায় তিন মাইল। কিছুদূর গিয়ে এক দেয়ালে ধাক্কা লেগে আধুনিককালের মোটর গাড়ীর প্রপিতামহ পঞ্চত্ব পেলেন।

কিন্তু সেই শুরু।



বহুকাল থেকে মানুষের মনে বড় সাধ যে, সে রাস্তার ওপর দিয়ে স্বয়ংচালিত কোন গাড়ীতে করে যায়। একশ বছর আগেও একে পাগলের পাগলামি বলা হত। কিন্তু বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হওয়ার পর মানুষের এই কল্পনা ক্রমে বাস্তব রূপ নিতে শুরু করল। আবিষ্কর্তারা তাকেই মোটর গাড়ীতে ব্যবহার করার চেষ্টা শুরু করলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংল্যাণ্ডের রিচার্ড ট্রেভিথিক, যিনি বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের প্রথম পরিকল্পনা করেছিলেন, একটি গাড়ী তৈরী করেন যাতে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনটি পিছনের চাকা দুটিকে ঘোরাত। স্যার গোল্ডস-ওয়ার্দি গার্নে নামে আরেকজন ইংরেজ ভদ্রলোক একটি বাষ্পচালিত মোটর গাড়ী তৈরী করেন এবং সেটি ঘণ্টায় প্রায় পনেরো মাইল বেগে চলত। তখনকার দিনে সেই গতিবেগ ছিল অবিশ্বাস্য।

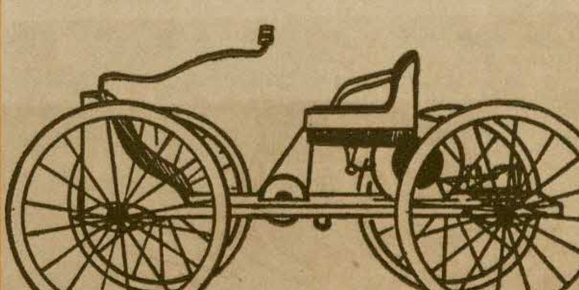
১৮৩০ সাল নাগাদ দেখা গেল ইংল্যাণ্ডে বেশ কয়েকটি কোম্পানী স্থাপিত হয়েছে ঐ ধরনের মোটর গাড়ী তৈরী করবার জন্যে এবং রাস্তাঘাটেও হামেশাই সে সব গাড়ী দেখা যেতে লাগল। ঘোড়ার গাড়ীর মালিকেরা তখন গেল ক্ষেপে এবং তাদের প্ররোচনায় ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট মোটর গাড়ী নির্মাতা এবং আরোহীদের ওপর নানারকম করধার্য এবং বিধিনিষেধ আরোপ করল। যেমন, 'রেড ফ্ল্যাগ অ্যাক্ট'। তখন হত কি, এই গাড়ীগুলি যখন চলত তখন তার থেকে প্রচণ্ড শব্দ হত, ফলে ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে যেত ক্ষেপে এবং দিক্‌বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হয়ে এধার ওধার ছোটাছুটি করত, দোকান পাট ভেঙ্গে ফেলত, মানুষজনের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ত। এই 'রেড ফ্ল্যাগ অ্যাক্ট' চালু হওয়ার পর নিয়ম হল যে, মোটর গাড়ীতে যখনই কেউ যাবে, তখন দিনের বেলা হলে লাল পতাকা এবং রাত্রি বেলা হলে লাল হ্যারিকেন নিয়ে একজন লোককে তার গাড়ীর আগে আগে পথচারীদের সাবধান করতে করতে যেতে হবে।

আমেরিকাও পিছিয়ে ছিল না। সেখানেও ১৮০৫ সালে অলিভার ইভান্স এক বাষ্পচালিত মোটর গাড়ী তৈরী করেন। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এর বহুল প্রচলন হয়। সত্যি কথা বলতে কি, ১৯০২ সাল পর্যন্ত বাষ্পচালিত ইঞ্জিন পেট্রল ইঞ্জিনের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে।

আজকাল যত মোটর গাড়ী আমরা দেখি তাদের সবাইর ইঞ্জিনই পেট্রল দিয়ে চলে। এই ধরনের ইঞ্জিন যাকে ইণ্ট্যার্নাল-কম্বাশ্চন ইঞ্জিন বলে তার প্রথম যে পরিচয়টি আমরা পাই, তার কথা ভাবতে গেলে আজ আমাদের ভয়ে আঁৎকে উঠতে হয়। পেট্রলের বদলে জ্বালানি হিসাবে তাতে ব্যবহৃত হত বারুদ। ১৬৭৮ সালে এই বিপজ্জনক ইঞ্জিনটি তৈরী করেন ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক ক্রিশ্চিয়ান হুইগেন্‌স্। তাতে সিলিণ্ডারের মধ্যে পিস্টনটি ওঠানামা করত বারুদের বিস্ফোরণের সাহায্যে।

তারপর উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এ নিয়ে আর বিশেষ কেউ মাথা ঘামান নি। ১৮৫১ সালে ডব্লিউ. এম. স্টর্ম একটি ইঞ্জিনের নক্‌সা তৈরী করেন যা সিলিণ্ডারের মধ্যে জ্বালানি গ্যাসে চাপ দিয়ে অগ্নি সংযোগ করত। এর নয় বৎসর পরে এটিয়েন লেনয়্যার নামে একজন ফরাসী ভদ্রলোক একটি ইণ্ট্যার্নাল-কম্বাশ্চন ইঞ্জিন তৈরী করেন যা জ্বালানি গ্যাস দিয়ে চালিত হত এবং একটি ইলেকট্রিক স্পার্ক দিয়ে অগ্নি সংযোগ করত।

১৮৯৬



হেনরী ফোর্ডের নির্মিত প্রথম মোটর গাড়ী

আধুনিক মোটর গাড়ীর ইণ্ট্যার্নাল-কম্বাশ্চন ইঞ্জিনগুলি যে চারটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চালু হয় (ইংরেজীতে যাকে বলে ফোর স্ট্রোক এবং পরে যেটি আমরা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করব) কাগজে পেন্সিলে তার প্রথম পরিকল্পনা করেন ওই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিউ ত্য রকাস নামে এক ফরাসী। ১৮৭৬ সালে এন. এইচ. অটো এবং ই. ল্যাংগার নামে দুজন জার্মান ভদ্রলোক প্রথম এই ধরনের ইঞ্জিন তৈরী করতে সক্ষম হন। প্রথমে এটিতে জ্বালানি হিসাবে গ্যাস ব্যবহার করা হত, পরে এটি পেট্রলে চলত।



একটি উন্নততর ফোর্ড গাড়ী

অটোর সহকারী গটলিব ডিমলার এই ধরনের ইঞ্জিনের আরও উন্নতি করেন। ১৮৮৫-৮৬ সালে নির্মিত তাঁর ইঞ্জিনটি আরও হাল্কা ও গতিবেগসম্পন্ন ছিল। প্রায় একই সময়ে কার্ল বেন্জ্ পেট্রল দ্বারা চালিত একটি তিন চাকার গাড়ী তৈরী করেন। তাঁর নির্মিত গাড়ীটি মোটামুটি নিখুঁত ছিল এবং সেই দেখেই ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকা এর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়।

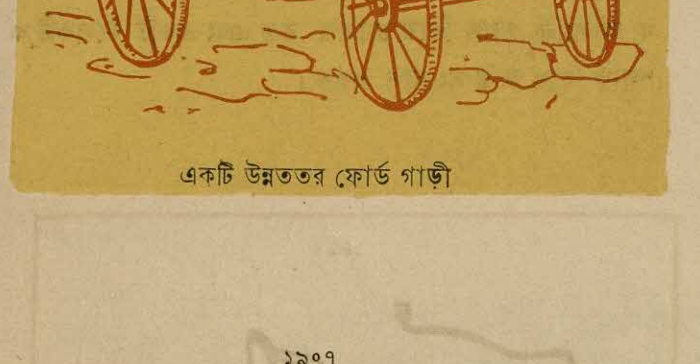
১৮৯১ সালে চার্লস ই. এবং জে. ফ্র্যাঙ্ক ডুরিয়া ভ্রাতৃদ্বয় আমেরিকায় সর্বপ্রথম পেট্রলচালিত গাড়ী তৈরী করেন।

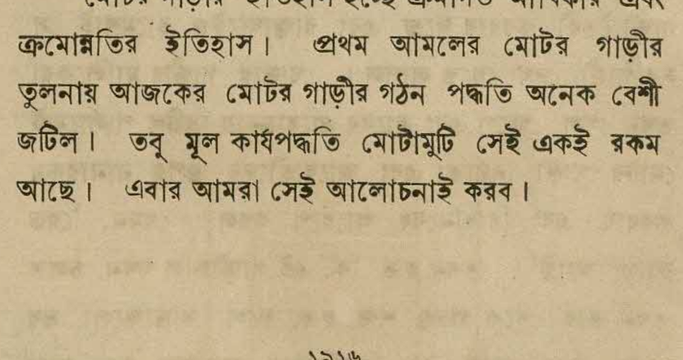
১৮৯৮ সালে ভারতবর্ষে প্রথম মোটরগাড়ী আমদানী করা হয়।

১৯০১ সালে র‍্যানসম ই. ওল্ডস এক বছরে ১৫০০ গাড়ী তৈরী করে একসঙ্গে বিপুল সংখ্যক মোটর গাড়ী তৈরীর গোড়াপত্তন করেন।

হেনরী ফোর্ডের কথা না বললে মোটর গাড়ীর কথা বলা শেষ হয় না। ১৯০৭ সালে বাজারে বেরোয় তাঁর কারখানায় নির্মিত প্রসিদ্ধ 'মডেল টি ফোর্ড' গাড়ী। জনসাধারণ যাতে সস্তায় কিনতে পারে সেইজন্যে বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে অসংখ্য গাড়ী একসঙ্গে তৈরী করার উদ্যমের সেই সফল শুরু। আজও তা অব্যাহত।

মোটর গাড়ীর ইতিহাস হচ্ছে ক্রমাগত আবিষ্কার এবং ক্রমোন্নতির ইতিহাস। প্রথম আমলের মোটর গাড়ীর তুলনায় আজকের মোটর গাড়ীর গঠন পদ্ধতি অনেক বেশী জটিল। তবু মূল কার্যপদ্ধতি মোটামুটি সেই একই রকম আছে। এবার আমরা সেই আলোচনাই করব।



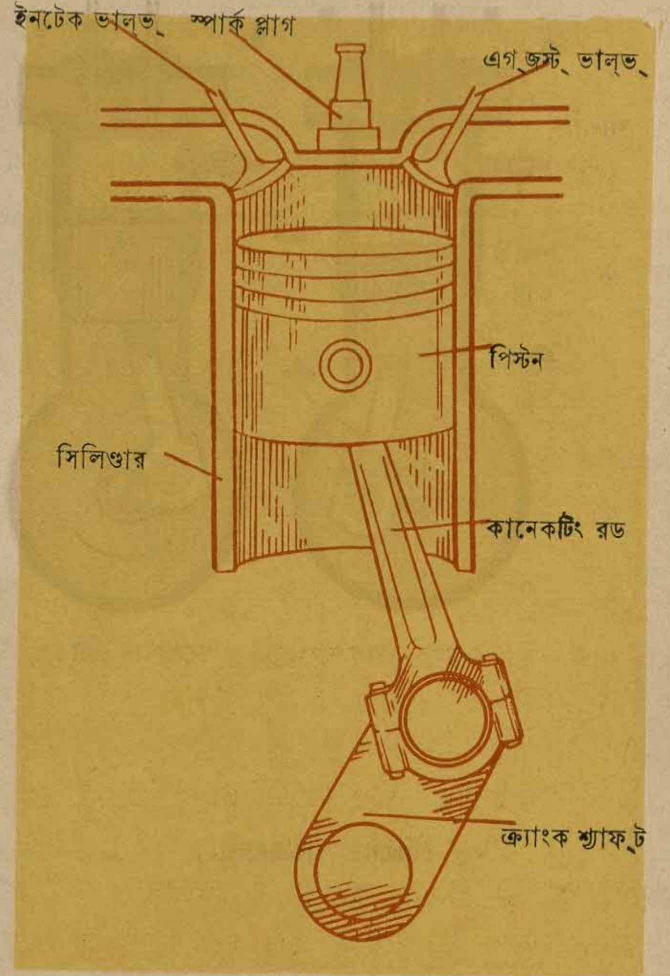


হেনরী ফোর্ডের বিখ্যাত 'টি' মডেল। বলা যায় আধুনিক মোটর গাড়ী তৈরীর সেই সফল শুরু।

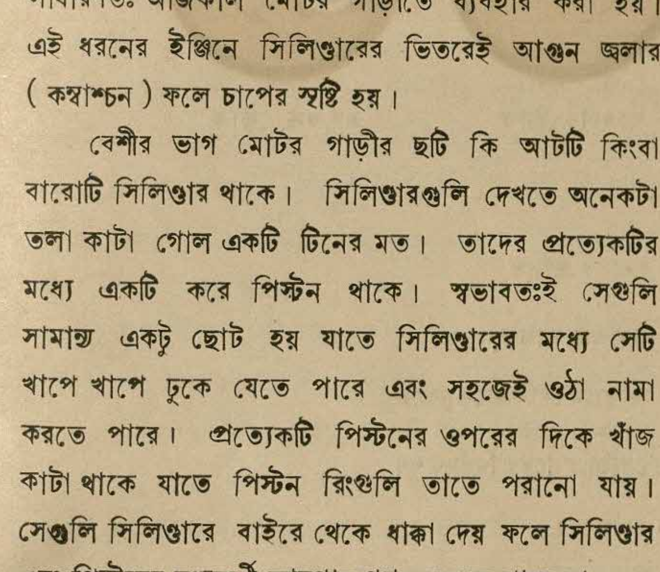
মোটর গাড়ীর ইঞ্জিন

সাধারণতঃ পেট্রলের জ্বালানি থেকে ইঞ্জিন যে শক্তি উৎপাদন করে তার দ্বারাই মোটর গাড়ীর চাকাগুলি ঘোরে এবং গাড়ী চলতে থাকে। ইঞ্জিনটি সাধারণতঃ গাড়ীর সামনে স্থাপন করা থাকে। ইন্ট্যার্নাল-কম্বাশ্চন ইঞ্জিনই সাধারণতঃ আজকাল মোটর গাড়ীতে ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের ইঞ্জিনে সিলিণ্ডারের ভিতরেই আগুন জ্বলার (কম্বাশ্চন) ফলে চাপের সৃষ্টি হয়।

বেশীর ভাগ মোটর গাড়ীর ছটি কি আটটি কিংবা বারোটি সিলিণ্ডার থাকে। সিলিণ্ডারগুলি দেখতে অনেকটা তলা কাটা গোল একটি টিনের মত। তাদের প্রত্যেকটির মধ্যে একটি করে পিস্টন থাকে। স্বভাবতঃই সেগুলি সামান্য একটু ছোট হয় যাতে সিলিণ্ডারের মধ্যে সেটি খাপে খাপে ঢুকে যেতে পারে এবং সহজেই ওঠা নামা করতে পারে। প্রত্যেকটি পিস্টনের ওপরের দিকে খাঁজ কাটা থাকে যাতে পিস্টন রিংগুলি তাতে পরানো যায়। সেগুলি সিলিণ্ডারে বাইরে থেকে ধাক্কা দেয় ফলে সিলিণ্ডার এবং পিস্টনের মধ্যবর্তী জায়গায় গ্যাস ঢুকতে পারে না।

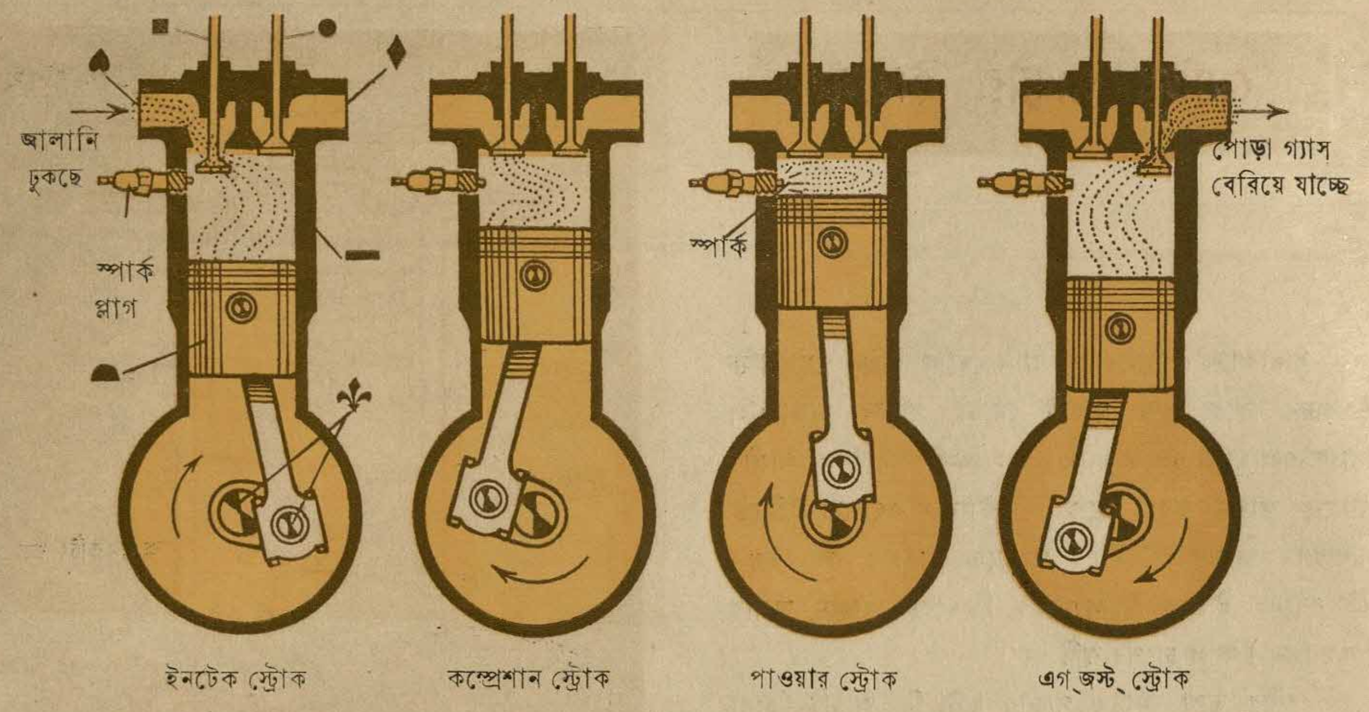


ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ



ভাল্‌ভ্‌ দুটিকে পর্যায়ক্রমে খোলা ও বন্ধ করার যান্ত্রিক কৌশল

সিলিণ্ডারের ভিতরে বিস্ফোরণের ফলে পিস্টনটি সোজা ওঠা নামা করে। পিস্টনটি যখন ঠেলা খেয়ে নীচে নেমে আসে, তখন সেই ধাক্কা গিয়ে পড়ে তার সঙ্গে যুক্ত কানেকটিং রডের উপর। ফলে সেটি বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে এবং সেই গতি তখন সঞ্চারিত হয় তার অন্যদিকে আটকান ক্র্যাংক শ্যাফ্‌টের মধ্যে, ফলে সেটিও ঘুরে যায়। ক্র্যাংক শ্যাফ্‌ট ঘুরতে থাকলে ক্র্যাংক পিনের ধাক্কায় পিস্টন আবার সিলিণ্ডারের মধ্যে সোজা ওপরে উঠে যায়। এইভাবে পিস্টনের সোজা ওঠা নামার গতিকে কানেকটিং রড, ক্র্যাংক শ্যাফ্‌ট এবং ক্র্যাংক পিনের মাধ্যমে রোটারী মোশান বা চক্রাকার গতিতে পরিবর্তিত করা হয়। ইঞ্জিন যখন চলছে তখন সে ক্রমাগত পেট্রল



ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী

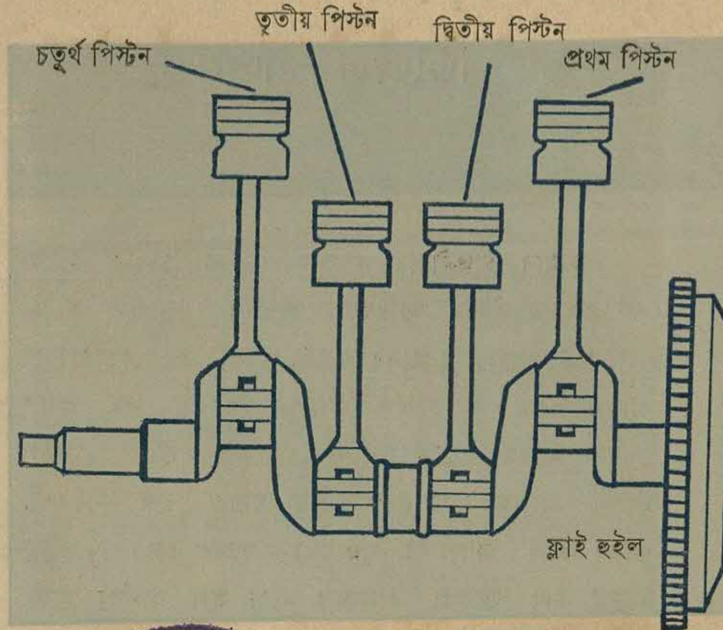
■ ইনটেক ভাল্‌ভ্‌
● এগ্‌জস্ট ভাল্‌ভ্‌
♠ জ্বালানি সিলিণ্ডারে ঢুকছে
♦ পোড়া গ্যাসের নির্গমণ পথ
▬ সিলিণ্ডার
◢ পিস্টন
⚜ ক্র্যাংক শ্যাফ্‌ট ও ক্র্যাংক পিন

এবং বাতাস টেনে নিচ্ছে, সেটি গিয়ে সিলিণ্ডারের মধ্যে স্পার্কের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। এখন বিস্ফোরণের দরুণ পোড়া গ্যাসটিও সিলিণ্ডার থেকে বার করে দেওয়া দরকার। এই দুটি কাজই ভাল্‌ভের সাহায্যে করা হয়।

সিলিণ্ডারের ওপর দুটি ভাল্‌ভ্‌ থাকে—ইনটেক ভাল্‌ভ্‌ এবং এগ্‌জস্ট্‌ ভাল্‌ভ্‌। ইনটেক ভাল্‌ভের কাজ হচ্ছে পেট্রল বাষ্প আর বাতাস ভিতরে ঢোকবার পথ করে দেওয়া এবং এগ্‌জস্ট্‌ ভাল্‌ভের কাজ হচ্ছে পোড়া গ্যাস সিলিণ্ডার থেকে বার করে দেওয়া। ভাল্‌ভ্‌ বন্ধ থাকলে ভাল্‌ভ্‌ স্প্রিং ভাল্‌ভ্‌টি শক্ত করে এঁটে রাখে যাতে কোন গ্যাস বা হাওয়া সিলিণ্ডারের বাইরে বেরোতে না পারে।

একটি বিশেষ যান্ত্রিক উপায়ে এই ভাল্‌ভ্‌ দুটি পর্যায়ক্রমে ঠিক সময়ে খোলে এবং বন্ধ হয়। ক্র্যাংক শ্যাফ্‌টের সমান্তরাল আর একটি লোহার দণ্ড আছে, তাকে বলে ক্যাম শ্যাফ্‌ট। দাঁতওয়ালা একজোড়া চাকা এদের পরস্পরকে সংযুক্ত করেছে। ক্র্যাংক শ্যাফ্‌ট-ই ক্যাম শ্যাফ্‌টকে ঘোরায়। ক্যাম শ্যাফ্‌টে একটি ক্যাম আছে, তার একদিকে রয়েছে একটি 'লোব' বা ঢিপির মত উঁচু জায়গা। ক্যাম শ্যাফ্‌ট যখন ঘোরে তখন সেই সঙ্গে ক্যামগুলিও ঘুরতে থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে 'লোব'টি ভাল্‌ভের স্প্রিং-এর চাপের বিরুদ্ধে ভাল্‌ভের বোঁটাটিতে ঠেলা দিয়ে ভাল্‌ভ্‌টিকে খুলে দেয়। ক্যাম শ্যাফ্‌টের ঘোরা কিন্তু বন্ধ হয় না। সে ঘুরতে থাকে ফলে ভাল্‌ভের বোঁটাটির সঙ্গে ক্যামের আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় ফলে স্প্রিং-এর টানে ভাল্‌ভ্‌টি আবার বন্ধ হয়ে যায়। প্রত্যেকটি সিলিণ্ডারের দুটি করে ক্যাম আছে—একটি ইন্‌টেক এবং অপরটি এগ্‌জস্ট্‌ ভালভের জন্যে।

ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে



চারটি পিস্টনচালিত ইঞ্জিন

অধিকাংশ মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনই "ফোর স্ট্রোক" বা "অটো সাইক্‌ল্" (এর আবিষ্কর্তা জার্মান ইঞ্জিনীয়ার ডাঃ অটোর নামানুসারে) প্রক্রিয়ায় চালিত হয়। "স্ট্রোক" বলতে আমরা সিলিণ্ডারের মধ্যে পিস্টনের ওঠা বা নামাকে বোঝাচ্ছি। সিলিণ্ডারের মধ্যে পিস্টনটি যখন চার বার ওঠা নামা করে তখন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়। এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির ফলেই ইঞ্জিন চালু থাকে। নীচে ধারাবাহিকভাবে এই প্রক্রিয়াটি বলা হয়েছে। যথা ঃ

(১) ইনটেক স্ট্রোক (গ্রহণ)ঃ এই অবস্থায় পিস্টনটি সিলিণ্ডারের মধ্যে নীচের দিকে নামতে থাকে এবং ওপরের দিকে জায়গা খালি পড়ে থাকে। এই সময় বাঁদিকে ইনটেক ভাল্‌ভ্‌টি খোলা থাকার ফলে ওই পথে বাতাসমিশ্রিত পেট্রল ফাঁকা জায়গাটি ভরে ফেলে। এগ্‌জস্ট্‌ ভাল্‌ভ্‌ এই সময় বন্ধ থাকে। পিস্টনটি একেবারে তলায় নেমে গেলে ইনটেক ভাল্‌ভ্‌ বন্ধ হয়ে যায়।

(২) কম্প্রেশান স্ট্রোক (সংকোচন)ঃ এই অবস্থায় পিস্টনটি সিলিণ্ডারের মধ্যে ওপরে উঠতে থাকে। দুটি ভাল্‌ভ্‌ই এই সময় বন্ধ থাকে বলে সিলিণ্ডারের মধ্যে আহরিত পেট্রল এবং বাতাসের মিশ্রণের আর কোন দিকে যাবার পথ থাকে না ; ফলে এর আগে যতটা জায়গা জুড়ে তারা ছিল তার থেকে প্রায় সাত ভাগের এক ভাগ মাত্র জায়গায় তারা সংনমিত হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। এই চাপ বেড়ে তখন প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ১২০ পাউণ্ডে দাঁড়ায়।

(৩) পাওয়ার স্ট্রোক (বিস্ফোরণ)ঃ সিলিণ্ডারের মধ্যে উঠতে উঠতে পিস্টনটি যখন কম্প্রেশান স্ট্রোকের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছায় তখন সিলিণ্ডারের মাথায় বসানো একটি স্পার্ক প্লাগ থেকে ইলেকট্রিক স্পার্ক বা আগুনের ফুলকি দিয়ে পেট্রল বাষ্প এবং বাতাসের মিশ্রণের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। তার ফলে তাপ বেড়ে যায় এবং সেখানকার চাপ গিয়ে দাঁড়ায় প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ৫০০ পাউণ্ড। এই সময়ও ওপরের ভাল্‌ভ্‌ দুটি বন্ধ থাকে, ফলে দহন ক্রিয়ায় উৎপন্ন সেই প্রচণ্ড চাপ তখন পিস্টনের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে তাকে ঠেলে নামিয়ে দেয়। একটি কানেকটিং রড পিস্টনের এই গতিকে ক্র্যাংক শ্যাফ্‌টে সঞ্চারিত করে দেয়; ফলে সেটি ঘুরে যায়। ক্র্যাংক শ্যাফ্‌টটি ড্রাইভ শ্যাফ্‌টের মাধ্যমে গভীর চাকাগুলিকে ঘোরায়।

(৪) এগ্‌জস্ট্‌ স্ট্রোক (নির্গমণ)ঃ এটি হচ্ছে এই প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়। এই অবস্থায় পিস্টনটি কানেকটিং রডের ঠেলায় সিলিণ্ডারের মধ্যে ওপরে উঠতে শুরু করে এবং ডানদিকের এগ্‌জস্ট্‌ ভাল্‌ভ্‌টি খুলে যায়। পিস্টনের ঊর্দ্ধগতির চাপে পোড়া গ্যাস সিলিণ্ডারের বাইরে বেরিয়ে যায়।

পিস্টন একেবারে ওপরে উঠে গেলে এগ্‌জস্ট্‌ ভাল্‌ভ্‌ বন্ধ হয়ে যায় এবং ইনটেক ভাল্‌ভ্‌ খোলে। তারপর আবার পরপর সবগুলি আগের মত ঘটে। ইঞ্জিন যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ পরপর এই চারটি ঘটনা ঘটতে থাকবে।

ডিজেল ইঞ্জিন

জার্মান ইঞ্জিনীয়ার রুডল্ফ্ ডিজেল ১৮৯৫ সালে এই ধরনের ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। ডিজেল ইঞ্জিন মোটামুটি পেট্রল ইঞ্জিনের মতই, কিন্তু এর কার্যপ্রণালী আরও সহজ। ডিজেল ইঞ্জিনে খরচও কম, কারণ পেট্রল অপেক্ষা ডিজেলের দাম অনেক সস্তা। পেট্রল ইঞ্জিন অপেক্ষা ডিজেল ইঞ্জিন আরও বেশী কার্যকরী, কারণ এতে জ্বালানির পূর্ণ দহন সম্ভব হয়। পেট্রল ইঞ্জিন এবং ডিজেল ইঞ্জিনের মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে যে, ডিজেল ইঞ্জিনে জ্বালানিকে প্রজ্বালিত করবার জন্যে স্পার্ক প্লাগ থেকে স্পার্ক উৎপন্ন করবার প্রয়োজন হয় না। ডিজেল ইঞ্জিনে সিলিণ্ডারের মধ্যে সংনমিত বায়ুর উচ্চ তাপমাত্রাই জ্বালানিকে প্রজ্বালিত করে। পেট্রল ইঞ্জিনেও কম্প্রেশান স্ট্রোকে সংনমিত বায়ুর তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায় কিন্তু জ্বালানিকে প্রজ্বালিত করবার মত যথেষ্ট তাপমাত্রা তার থাকে না বলেই সেক্ষেত্রে স্পার্ক প্লাগ থেকে স্পার্ক উৎপন্ন করে জ্বালানিকে প্রজ্বালিত করতে হয়। একটি "ফোর স্ট্রোক" ডিজেল ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী নিম্নরূপ ঃ

(১) **ইনটেক স্ট্রোক**—এই অবস্থায় পিস্টনটি সিলিণ্ডারের মধ্যে নীচের দিকে নামতে থাকে। বাঁদিকে খোলা ইনটেক ভাল্ভ্টি দিয়ে সিলিণ্ডারের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করতে থাকে।

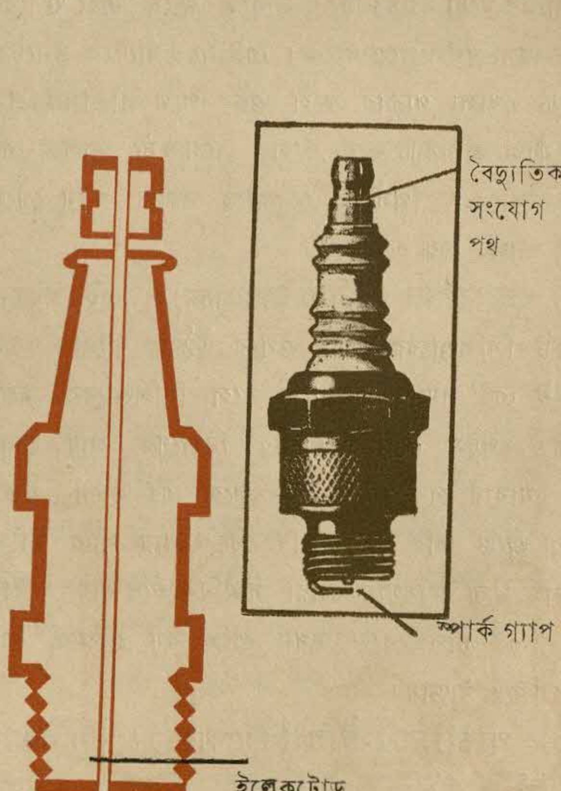
(২) **কম্প্রেশান স্ট্রোক**—এই অবস্থায় পিস্টনটি সিলিণ্ডারের মধ্যে ওপরে উঠতে থাকে। এর ফলে সিলিণ্ডারের মধ্যে বাতাস সংনমিত হতে থাকে। অবশেষে তার চাপ দাঁড়ায় প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ৫০০ পাউণ্ড। ফলে ওই বাতাসের তাপমাত্রা হয় প্রায় ১০০০ ডিগ্রী ফারেনহিট।

(৩) **পাওয়ার স্ট্রোক**—এই অবস্থায় সিলিণ্ডারের মধ্যে জ্বালানি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সংনমনের তাপ তখন জ্বালানিকে প্রজ্বালিত করে। জ্বালানির দহন গ্যাস নির্গত করে এবং তার চাপে পিস্টনটি আবার নীচের দিকে নামতে থাকে।

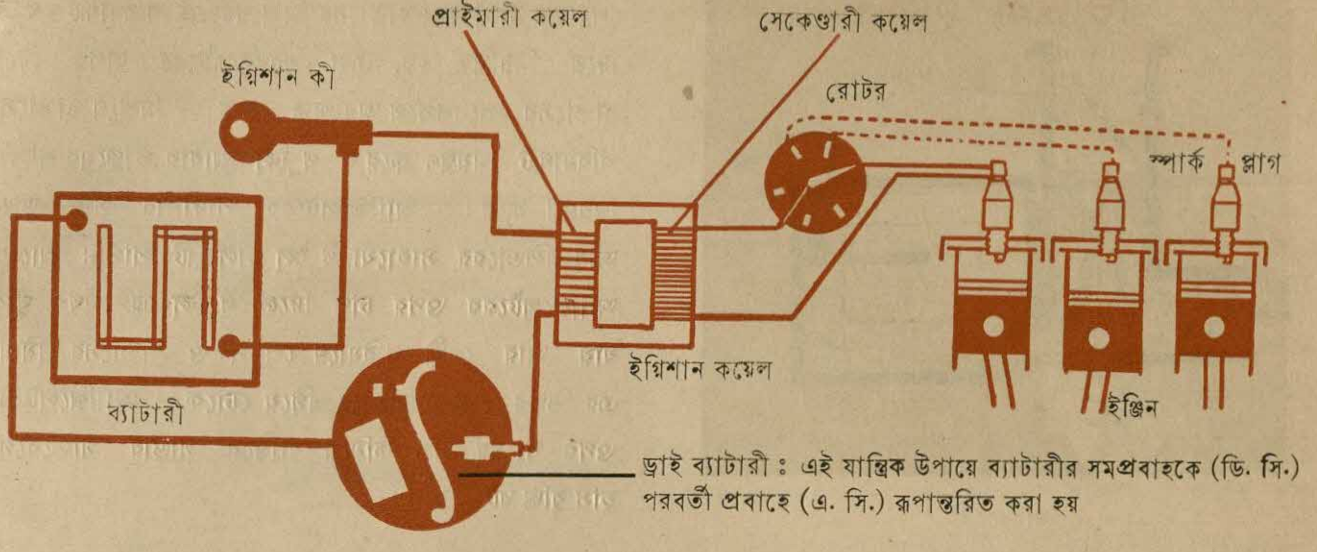
(৪) **এগ্জস্ট্ স্ট্রোক**—এই অবস্থায় পিস্টনটি আবার ওপরে উঠতে থাকে এবং তার ঠেলায় পোড়া গ্যাস ডানদিকে খোলা এগ্জস্ট্ ভাল্ভ্ দিয়ে সিলিণ্ডারের বাইরে চলে যায়। পিস্টনটি সিলিণ্ডারের একেবারে ওপরে উঠলে এই প্রক্রিয়াটি শেষ হয়।

স্পার্ক কিভাবে উৎপন্ন হয়

আগেই বলেছি, সিলিণ্ডারের মধ্যে বাতাস মেশান পেট্রলের বাষ্প একটি স্পার্ক দিয়ে জ্বালান হয়। ইগ্নিশান সিসটেম এই স্পার্ক উৎপন্ন করে। প্রত্যেকটি সিলিণ্ডারের মাথায় স্থাপিত স্পার্ক প্লাগের দুটি ইলেকট্রোডের মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় এই স্পার্ক উৎপন্ন হয়। এই ফাঁকা জায়গাটি, এক ইঞ্চির পঁচিশ হাজার থেকে চল্লিশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই ফাঁকা জায়গাটিতে স্পার্ক



স্পার্ক প্লাগ

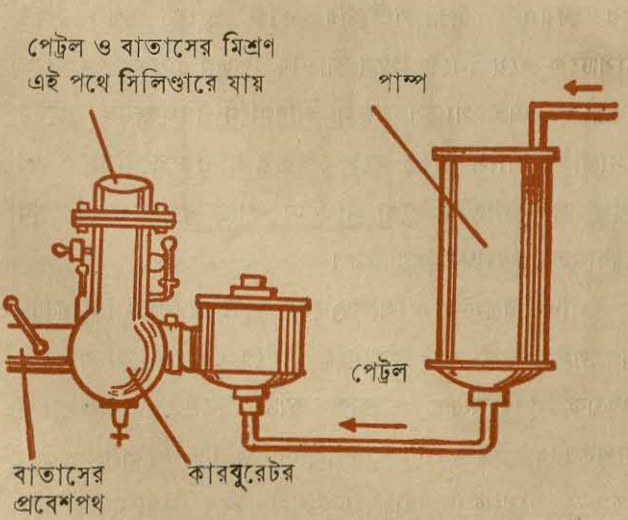


স্পার্ক প্লাগের বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যবস্থা

উৎপন্ন করবার জন্যে অন্ততঃপক্ষে ১০,০০০ ভোল্টের বৈদ্যুতিক চাপ বা ভোল্টেজের প্রয়োজন। এখন গাড়ীর ব্যাটারীর ভোল্টেজ তো মাত্র ছয় অথবা বারো। অথচ গাড়ীর প্রয়োজন এখন ১০,০০০ ভোল্টের। এই শক্তি সে কোথা থেকে পাবে? না পেলে অতি প্রয়োজনীয় স্পার্ক হবে কেমন করে? সেইজন্যে রয়েছে ইগ্নিশান কয়েল। তার মধ্যে বিশেষ যান্ত্রিক উপায়ে ব্যাটারীর ঐ অল্প ভোল্টকে প্রয়োজনমত ভোল্টে বাড়িয়ে নেওয়া যায়।

গাড়ীর প্রত্যেকটি সিলিণ্ডারের মাথায়ই একটি করে স্পার্ক প্লাগ আছে। কিন্তু সব সিলিণ্ডারগুলিতেই একসঙ্গে স্পার্ক হয় না। সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করে একটি ঘূর্ণমান সুইচ, যার নাম রোটর। রোটরের কাজই হচ্ছে ওই উঁচু ভোল্টের বৈদ্যুতিক প্রবাহকে তারের মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকটি স্পার্ক প্লাগে ঠিক সময়মত সরবরাহ করা।

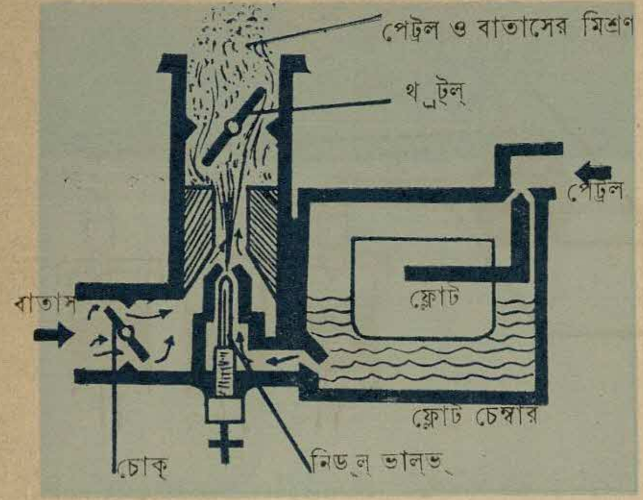
টাঙ্ক থেকে পেট্রল কিভাবে সিলিণ্ডারে যায়



ট্যাঙ্ক থেকে পেট্রল কিভাবে সিলিণ্ডারে যায়

পেট্রল ট্যাঙ্কটি গাড়ীর পিছনে থাকে। এই ব্যবস্থার ফলে উত্তপ্ত ইঞ্জিনের প্রভাবে আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে না। এখন দেখা যাক পেট্রল ট্যাঙ্ক থেকে পেট্রল কিভাবে সিলিণ্ডারে যায়।

আগের আমলে পেট্রল ট্যাঙ্কটি ইঞ্জিনের ওপর বসান থাকত যাতে সেখান থেকে পেট্রল সহজেই কারবুরেটরে গড়িয়ে নেমে আসত। আজকাল কারবুরেটরের গায়ে একটি ক্ষুদ্রতর ট্যাঙ্ক থাকে এবং গাড়ীর পিছনে অবস্থিত মূল ট্যাঙ্ক থেকে পাম্পের সাহায্যে ওইখানে তেল এসে জমা হয়। আজকাল এ দুটি ব্যবস্থা চালু থাকলেও অনেক গাড়ীতে একটি ভ্যাকুয়াম ট্যাঙ্ক থাকে। বস্তুতঃ এটি ঠিক আরেক রকম পাম্পের মতই—ইঞ্জিন নিজেই হচ্ছে সেই পাম্প যা জ্বালানি আহরণ করে।



কারবুরেটর

কারবুরেটর

সিলিণ্ডারের মধ্যে যদি সঠিক পরিমাণ পেট্রল এবং বাতাসের মিশ্রণ না যায়, তবে ইঞ্জিন চলবে না। কারবুরেটরের কাজ হচ্ছে ইঞ্জিনে যে পেট্রল যাচ্ছে তার পরিমাপ ঠিক করে দেওয়া এবং তার সঙ্গে সঠিক পরিমাণ বাতাস মিশিয়ে দেওয়া।

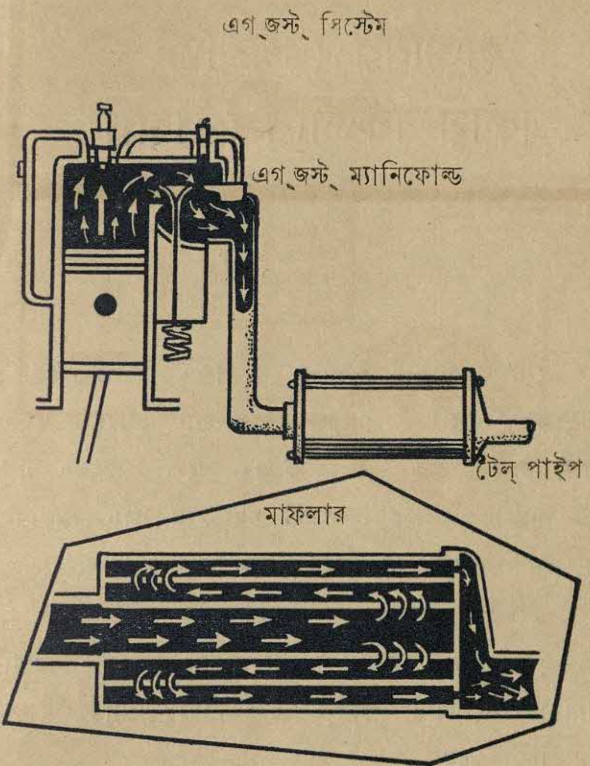
মূল ট্যাঙ্ক থেকে কারবুরেটরে যাবার আগে পেট্রল কারবুরেটরের পাশে একটি ছোট জায়গায় জমা হয়। তার নাম ফ্লোট চেম্বার। এটি পেট্রল দিয়ে যত ভর্তি হতে থাকে সেই সঙ্গে ধাতুর একটি টুকরো বা ফ্লোটও তার সঙ্গে ভেসে উঠতে থাকে। ফ্লোট চেম্বার যখন পরিমাণ-মত ভর্তি হয়ে যায় তখন ভাসমান ফ্লোটটিও একটি ছোট গর্তের মধ্যে সরু একটি নিড্‌ল্ ভাল্‌ভ্ ঢুকিয়ে দেয়, ফলে সেই ফুটোটি বন্ধ হয়ে যায়। তখন ফ্লোট চেম্বার থেকে পেট্রল না বেরোন পর্যন্ত নতুন পেট্রল আর ঢুকতে পারে না। ফ্লোট চেম্বার থেকে পেট্রল একটি ছোট্ট সরু নল বা ফুয়েল নজ্‌ল্ দিয়ে কারবুরেটরের হাওয়া ঢোকার পথে আসে। আমরা আগেই বলেছি যে, ইনটেক স্ট্রোকে পিস্টন যখন নেমে আসে তখন সিলিণ্ডার বাতাস টানে, এখন সেই বাতাস আসার সময় খুব ছোট ছোট ফোঁটা তরল পেট্রল টেনে নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পে পরিণত হয়ে সিলিণ্ডারে প্রবেশ করে।

পেট্রলের বাষ্প এবং বাতাসের মিশ্রণের এই পরিমাণটি থ্রট্‌ল্ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং কারবুরেটরের অপর দিকে বাতাসের প্রবেশপথে অবস্থিত চোক্ এই মিশ্রণে বাতাসের পরিমাণটি নিয়ন্ত্রণ করে। থ্রট্‌ল্ আবার ইঞ্জিনের শক্তিও নিয়ন্ত্রণ করে। অ্যাক্সিলেটরের পাদানীর সঙ্গে ডাণ্ডা আর লিভারের সাহায্যে থ্রট্‌ল্ ভাল্‌ভটি লাগান আছে। অ্যাক্সিলেটরের ওপর চাপ দিলে থ্রট্‌ল্-এর মুখ খুলে যায় আর বেশী পরিমাণে পেট্রল ও বাতাসের মিশ্রণ এর ভিতর দিয়ে সিলিণ্ডারে গিয়ে ঢোকে। অ্যাক্সিলেটরের ওপর পায়ের চাপ কমিয়ে বাড়িয়ে গাড়ীর গতিবেগের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটান যায়।

পোড়া গ্যাসের নির্গমণ ব্যবস্থা

ইঞ্জিনের ভিতর থেকে অনাবশ্যক বাষ্প যেমন, সিলিণ্ডারের মধ্যে পোড়া গ্যাস, বাইরে বের করে দেবার জন্যে ইঞ্জিনের তিনটি অংশ কাজ করে—এগ্‌জস্ট্ ম্যানিফোল্ড, মাফলার এবং টেল পাইপ। এগ্‌জস্ট্ ম্যানিফোল্ডের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন সিলিণ্ডারগুলি থেকে অনাবশ্যক পোড়া গ্যাস আহরণ করা। ম্যানিফোল্ড থেকে মাফলারে যখনই সেই গ্যাস আসে তখন মাফলার তার প্রচণ্ড শব্দটিকে ক্রমে ক্ষীণ করে দেয়। টেল পাইপের কাজ হচ্ছে তখন সেই গ্যাসটিকে বয়ে নিয়ে গিয়ে গাড়ীর পিছন দিয়ে বের করে দেওয়া। এই গ্যাসে বহুল পরিমাণে বিপজ্জনক কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস থাকে বলে বেরিয়ে যাবার পথে যাতে এর কোন অংশ গাড়ীর মধ্যে ঢুকে না পড়ে সেজন্যে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হয়।

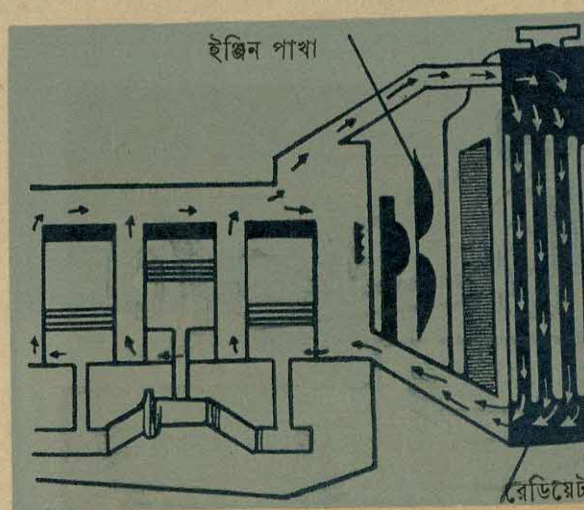
পাওয়ার স্ট্রোকে সিলিণ্ডারের মধ্যে যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয় সেই শব্দটি যদি সরাসরি বাইরে বেরিয়ে আসে তবে তা এক বিরক্তিকর শব্দের সৃষ্টি করে। মাফলারটি গোলকধাঁধার মত। মাফলারের ছবিটি আলাদা করে দেখানো হয়েছে। তীর চিহ্নগুলি দিয়ে দেখানো হয়েছে



গ্যাস কিভাবে গোলকধাঁধা ঘোরার মত ঘুরপাক খাচ্ছে। এর ফলে তার প্রচণ্ড শব্দ করার শক্তি প্রায় উপে যাওয়ার সামিল হয়। সুতরাং তারপর যখন গ্যাস টেল পাইপের মধ্যে দিয়ে বাইরে আসে তখন আর তার সেই প্রচণ্ড অসহ্য শব্দ সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকে না।

ইঞ্জিন কিভাবে ঠাণ্ডা রাখা হয়

সিলিণ্ডারের মধ্যে পেট্রল এবং বাতাসের মিশ্রণ জ্বলার ফলে সেখানে প্রায় ২৭০০ ডিগ্রি ফারেনহিট তাপমাত্রার সৃষ্টি হয়। এই তাপমাত্রা লোহাকেও গলিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তাছাড়া ইঞ্জিন যদি বেশী গরম হয়ে যায়, তবে লুব্রিকেটিং তেলটিও উত্তাপে গলে যাবে। সেইজন্যে ইঞ্জিনকে সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা করবার জন্যে একটি তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। অবশ্য সে ব্যবস্থা এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত যে, ইঞ্জিনকে যতটুকু ঠাণ্ডা করার দরকার ততটুকুই করা হয়। অনেক গাড়ী ইঞ্জিনকে ঠাণ্ডা করার জন্যে এরোপ্লেনের মত কেবলমাত্র বাতাসের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু অধিকাংশ গাড়ী প্রধানতঃ জলকেই ইঞ্জিন ঠাণ্ডা করবার জন্যে ব্যবহার করে এবং সেই জলকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে বাতাস ব্যবহৃত হয়। ইঞ্জিনের সিলিণ্ডার-গুলির চারিপাশে ওয়াটার জ্যাকেট বা জল রাখার ব্যবস্থা আছে। এটি সিলিণ্ডার আর ইঞ্জিনের বাইরের চাকার মধ্যে একটি ফাঁকা জায়গা। এই জায়গার ভিতর জল যাওয়া আসার ব্যবস্থা আছে। এতে সিলিণ্ডার থেকে তাপ শুষে নেওয়া হয়। ওয়াটার জ্যাকেটের মধ্যেকার জল গরম হয়ে গেলে তা ওপরের ট্যাঙ্কে চলে যায়। সেখান থেকে রেডিয়েটরে গিয়ে ঢোকে। রেডিয়েটরের কাজ হচ্ছে বাইরের বাতাসে তাপ বিকিরণ করা। রেডিয়েটরের ভিতরে অনেকগুলি হাওয়া চলাচলের পথ আছে। তার কতক-গুলির ভিতর দিয়ে হাওয়া ঢোকে এবং অন্যগুলির মধ্যে দিয়ে জল ঢোকে। ইঞ্জিনের সামনে ক্র্যাংক শ্যাফ্‌টের সঙ্গে সংযুক্ত বেল্টের সাহায্যে একটি পাখা ঘোরে। সেই পাখা আর গাড়ীর চলবার বেগের জন্যে হাওয়া খুব তাড়াতাড়ি চলাফেরা করে। গরম জল এইভাবে রেডিয়েটরের ভিতর দিয়ে যাবার সময় ঠাণ্ডা হয়ে আবার ওয়াটার জ্যাকেটে ফিরে এসে ইঞ্জিনকে ঠাণ্ডা করে।



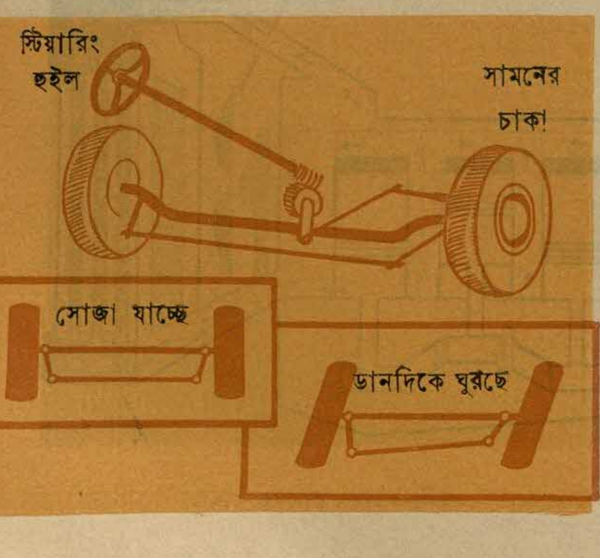
ইঞ্জিন ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা

ফ্লাই হুইল

এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আরও একটি প্রয়োজনীয় সচল অংশ সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে ফ্লাই হুইল অর্থাৎ ইঞ্জিন সংলগ্ন ভারী চাকা যেটি সোজাসুজি ইঞ্জিনের শক্তিতে ঘোরে। তার থেকে পিছনের চাকাগুলিতে কিভাবে শক্তি সঞ্চারিত হয়, সে সম্বন্ধে আমরা এর পরেই বিস্তৃত আলোচনা করেছি। ফ্লাই হুইলটি ক্র্যাংক শ্যাফ্‌টের একদিকে আটকান থাকে। 'পাওয়ার স্ট্রোকে' এটি তার শক্তি লাভ করে। বিস্ফোরণের ফলে পিস্টনটি যতবার নীচে নামে ততবার এই আকস্মিক আঘাতটি ফ্লাই হুইলে এসে পড়ে এবং এও তখন সেই আঘাতজনিত শক্তিকে বিশেষ যান্ত্রিক কৌশলের মাধ্যমে অবিরাম গতিতে গাড়ীর চাকাগুলিকে ঘোরাতে সাহায্য করে। ফ্লাই হুইলের আরও একটি জরুরী কাজ আছে। সেটি হচ্ছে ফোর স্ট্রোকের বাকী তিনটি স্ট্রোক সমাধান করতে এ পিস্টনকে সচল রাখে।

স্টিয়ারিং

চালক স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়ীর গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে। স্টিয়ারিং হুইলটি বিশেষ যান্ত্রিক উপায়ে গাড়ীর সামনের চাকার সাথে যুক্ত থাকে। স্টিয়ারিং ঘোরালে সামনের চাকাও নির্দিষ্ট দিকে ঘুরে যায়। নীচের ছবিতে স্টিয়ারিং হুইল ও সংশ্লিষ্ট যান্ত্রিক ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে।



ইঞ্জিনের বেগশক্তি চাকায় কিভাবে পৌঁছায়

মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তা পিছনের চাকায় সঞ্চারিত হয়ে চাকা ঘুরতে থাকলে গাড়ী চলতে শুরু করে। ইঞ্জিন থেকে পিছনের চাকায় এই শক্তি সরবরাহের কাজটি যথাক্রমে ক্লাচ, গিয়ারবক্স, প্রপেলার শ্যাফ্‌ট এবং রিয়ার অ্যাক্সলের মাধ্যমে ঘটে।

এদের মধ্যে ক্লাচ এবং গিয়ারবক্সের কথা আমরা পরে ৭৯-৮২ পাতায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা প্রপেলার শ্যাফ্‌ট এবং রিয়ার অ্যাক্সলের কথা আলোচনা করব।

প্রপেলার শ্যাফ্‌ট

প্রপেলার শ্যাফ্‌ট হচ্ছে গিয়ারবক্স এবং রিয়ার অ্যাক্সলের মধ্যে সংযোগকারী দণ্ড। প্রপেলার শ্যাফ্‌টের দুই প্রান্তে "ইউনিভার্সাল জয়েন্ট" বা গাঁট আছে। সেগুলি দেখতে অনেকটা শিকলের মত। ইউনিভার্সাল জয়েন্ট মূলতঃ একটি ডবল-কব্জা গাঁট (৮৩ পৃষ্ঠায় ছবিতে দেখানো হয়েছে) যার মধ্যে দিয়ে সহজেই গিয়ারবক্স শ্যাফ্‌ট রিয়ার অ্যাক্সল শ্যাফ্‌টে শক্তি সরবরাহ করতে পারে। ইউনিভার্সাল জয়েন্ট থাকার ফলে সংযোগকারী দণ্ডগুলি যদি এক লাইনে না-ও থাকে তাহলেও শক্তি সরবরাহে কোন বাধার সৃষ্টি হয় না। তাছাড়া, উঁচু-নীচু রাস্তা দিয়ে যাবার সময় ইউনিভার্সাল জয়েন্ট থাকার ফলে প্রপেলার শ্যাফ্‌টের ওপর সরাসরি চাপ পড়ে না। কারণ এই জয়েন্টগুলি সহজেই গাড়ীর গতিমুখের সঙ্গে প্রয়োজনমত নড়াচড়া করতে পারে।

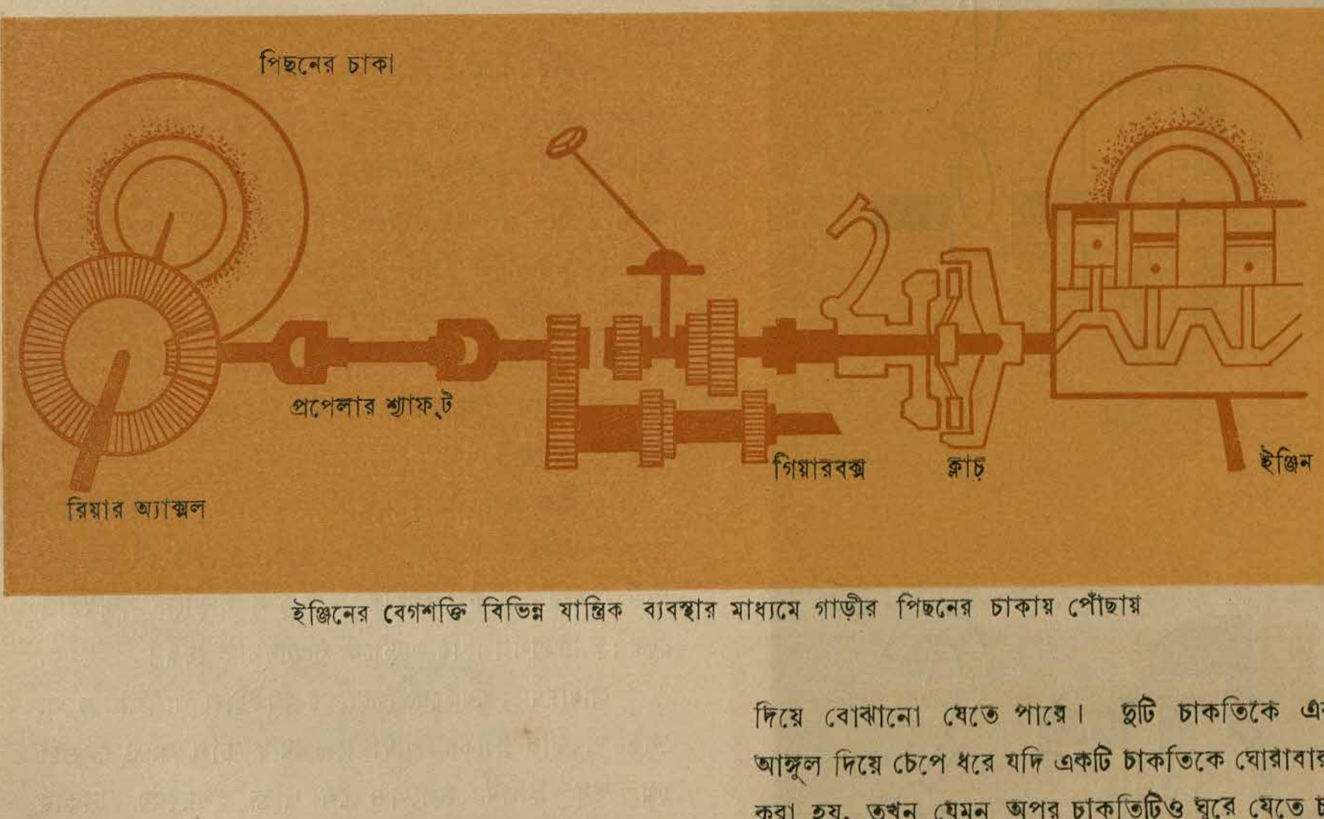
রিয়ার অ্যাক্সল

রিয়ার অ্যাক্সলের কাজ হচ্ছে প্রপেলার শ্যাফ্‌ট থেকে শক্তি সংগ্রহ করে তা পিছনের চাকায় সঞ্চারিত করে দেওয়া এবং গিয়ারবক্সে যেমন যেমন গিয়ার দেওয়া হবে সেইরকম ভাবে চাকার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা। তাছাড়া একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, ইঞ্জিন যেদিকে ঘুরছে চাকা সেদিকে ঘুরছে না। চাকা ঘুরছে ইঞ্জিনের

ক্লাচ কিভাবে কাজ করে

ক্লাচ হচ্ছে একটি প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক ব্যবস্থা যা ইঞ্জিনের যান্ত্রিক বেগশক্তিকে প্রয়োজনমত প্রপেলার শ্যাফ্‌টের সঙ্গে যুক্ত অথবা বিচ্ছিন্ন করে।

এটি হচ্ছে অনেকটা একটি চাকতির মত যেটি নাকি ফ্লাই হুইলের সঙ্গে চেপে ধরা যায়। ফ্লাই হুইলের সংস্পর্শে যখন এটি আসে তখন ঘর্ষণের শক্তিতে এটি ঘুরতে শুরু করে। এর কার্যপ্রণালী একটি সহজ উদাহরণ



ইঞ্জিনের বেগশক্তি বিভিন্ন যান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে গাড়ীর পিছনের চাকায় পৌঁছায়

গতির সমকোণে। এই গতি পরিবর্তনের দায়িত্ব রিয়ার অ্যাক্সলের।

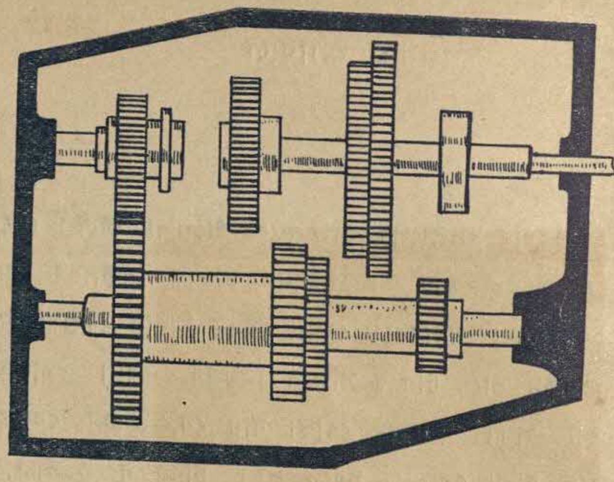
তাছাড়া সব চাকাগুলির ভার বহন করা ও গাড়ীর পিছনের দিকের ভার সামলানও এর কাজ। গাড়ী মোড় নেবার জন্যে বাঁক নিলে বা ঘুরলে পিছনের দুটি চাকাকে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে চলতে সাহায্য করাও রিয়ার অ্যাক্সলের কাজ।

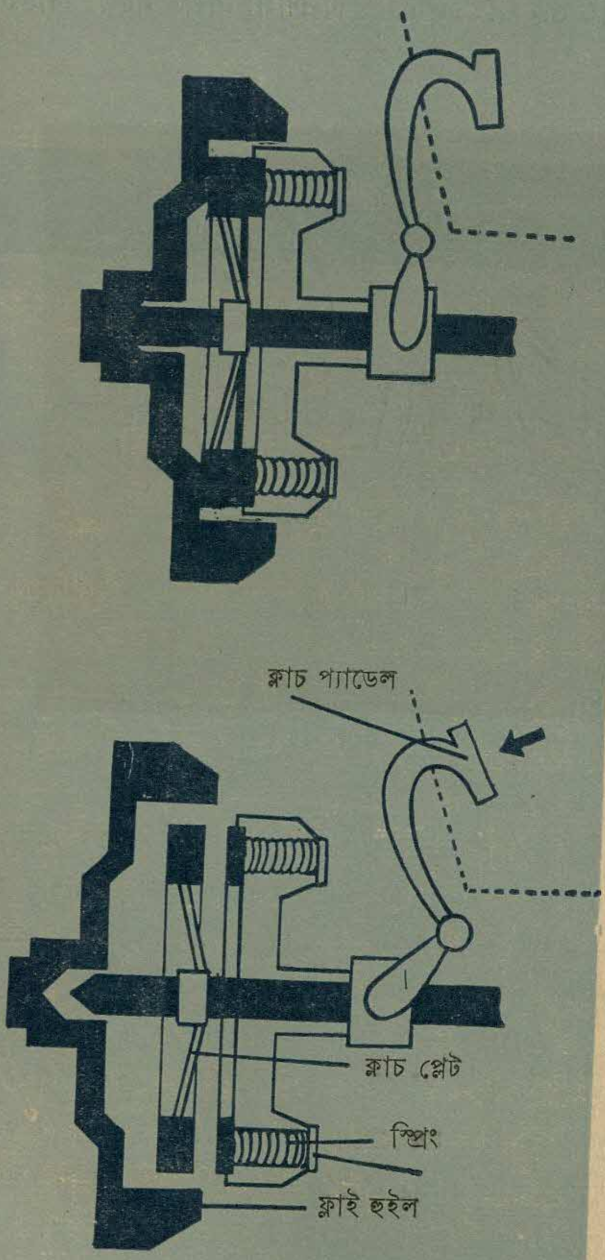
দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। দুটি চাকতিকে একসঙ্গে আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে যদি একটি চাকতিকে ঘোরাবার চেষ্টা করা হয়, তখন যেমন অপর চাকতিটিও ঘুরে যেতে চাইবে, ক্লাচের কার্যপ্রণালীও অনেকটা সেই রকম।

ইঞ্জিনের সঙ্গে গিয়ারবক্সের যোগাযোগ করিয়ে দেবার জন্যে একটি ভারী স্প্রিং বা একগোছা স্প্রিং চাকতিটিকে ফ্লাই হুইলের সঙ্গে চেপে ধরে। গাড়ীর ড্রাইভার যদি এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে চায় তবে তার সামনে গাড়ীর মেঝের ওপর ক্লাচের পাদানীটিকে সে চেপে ধরে। এই পাদানীটি যে লিভারগুলিকে চালায় সেগুলি তখন চাকতির

ওপর থেকে চাপটিকে সরিয়ে নেয়। সুতরাং ফ্লাই হুইলটি ঘুরতে থাকলেও চাকতিটি আর ঘুরতে পারে না।

এইভাবে ক্লাচের পাদানীটিকে চেপে ধরে প্রতিবার গিয়ার বদল করা হয়। গাড়ী যখন প্রথম চলতে শুরু করে তখন তাকে স্বচ্ছন্দ গতি দেওয়াও ক্লাচের কাজ। এই সময় ক্লাচের পাদানী থেকে খুব আস্তে আস্তে চাপ সরিয়ে নেওয়া হয়। ফলে চাকার গতিবেগ ক্রমে ক্রমে দ্রুততর হয়। ব্রেক চেপে গাড়ী থামাবার সময়ও ক্লাচ ব্যবহার করা হয়।





ক্লাচের বিভিন্ন অংশ

গিয়ার বক্স

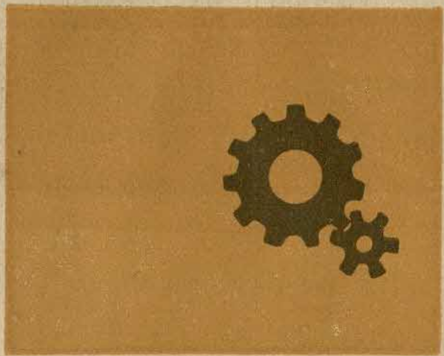
মোটর গাড়ীর গিয়ারবক্স কিভাবে কাজ করে তা জানতে হলে প্রথমে গিয়ার-হুইলের কথা জানা দরকার। দাঁত-কাটা চাকাকে বলে গিয়ার-হুইল। এইরকম অনেক-গুলি চাকার পরস্পর সন্নিবেশকে বলে গিয়ার। ইঞ্জিনের যান্ত্রিক বেগশক্তি স্থির থাকলেও একটি গিয়ার-হুইল ঘুরিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চাকার সংযোগ কমিয়ে-বাড়িয়ে যন্ত্রের সামগ্রিক গতিবেগের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো যায়। ক্লাচের পিছনে গিয়ারবক্সের মধ্যে বিভিন্ন মাপের গিয়ার সন্নিবিষ্ট থাকে।

বেশীর ভাগ আধুনিক গাড়ীর তিন রকমের গিয়ার থাকে—ফার্স্ট গিয়ার বা লো গিয়ার, সেকেণ্ড গিয়ার এবং থার্ড গিয়ার বা টপ গিয়ার। এগুলি গাড়ীকে সম্মুখগতি দেয়। রিভার্স গিয়ার গাড়ীকে পশ্চাদ্‌গতি দেয়।

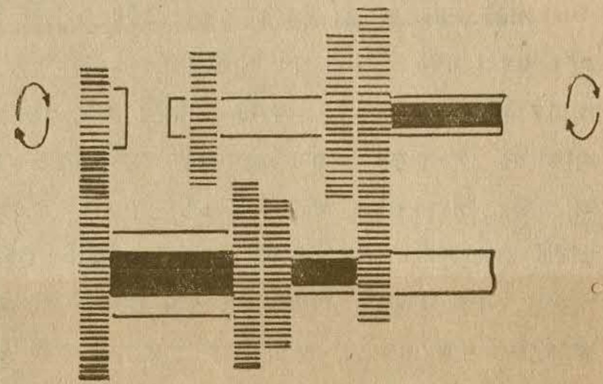
সাধারণতঃ যেটিকে গিয়ারের নিউট্রাল পজিশান বলে, সেই অবস্থায় ক্লাচের পাদানীতে যদি চাপ না-ও দেওয়া হয় তবু ইঞ্জিন চললেও সে শক্তি পিছনের চাকায় সঞ্চারিত হয় না কারণ তখন ইঞ্জিনের সঙ্গে প্রপেলার শ্যাফ্‌টের কোন যোগাযোগ থাকে না।

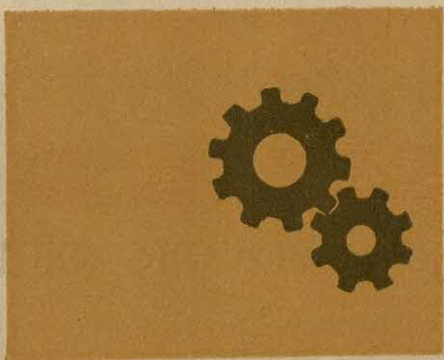
পাশের দুটি ছবির সাহায্যে ক্লাচের কার্যপ্রণালী সহজভাবে দেখানো হয়েছে। সাধারণ অবস্থায় অর্থাৎ যখন গাড়ী চলতে থাকে, ক্লাচ প্যাডেলে কোন চাপ দেওয়া হয় না। প্যাডেলটি চেপে ধরলেই ক্লাচ প্লেট ফ্লাই হুইল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ফলে ইঞ্জিনের বেগশক্তি প্রপেলার শ্যাফ্‌ট-এ পৌঁছায় না।

মোটর গাড়ীর গিয়ার ব্যবস্থা

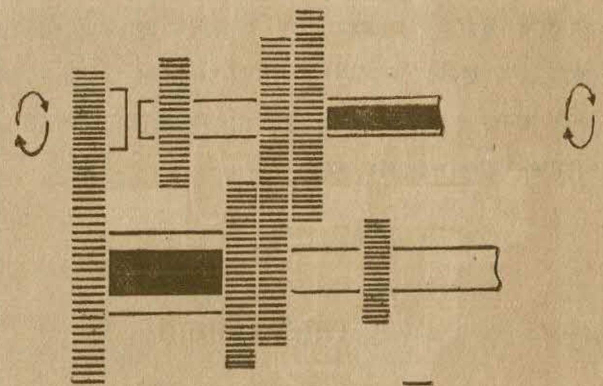


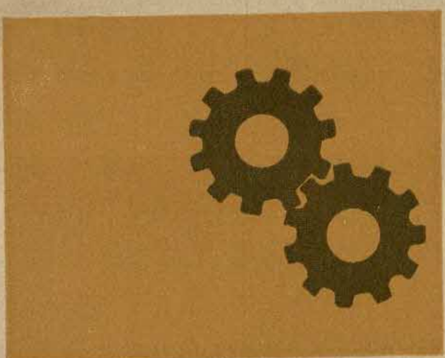
ফার্স্ট গিয়ার



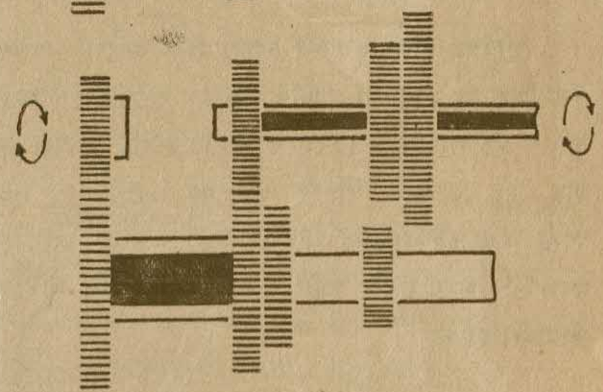


সেকেণ্ড গিয়ার



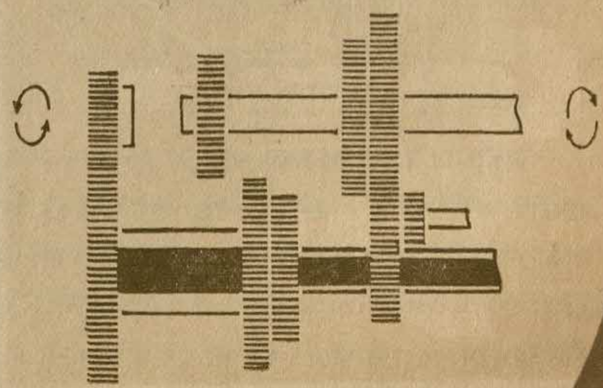


থার্ড গিয়ার





রিভার্স গিয়ার



ফার্স্ট গিয়ার

গাড়ী স্থির অবস্থা থেকে যখন প্রথম চলতে শুরু করে অথবা যখন খাড়াই পথ অতিক্রম করে তখন ফার্স্ট গিয়ার ব্যবহার করা হয়। ফার্স্ট গিয়ারে একজোড়া বড় আকারের গিয়ার-হুইল এবং একজোড়া অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের গিয়ার-হুইল থাকে। ৮১ পাতার ওপরের ছবিটি দেখলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। যে ছোট হুইলটি রয়েছে সেটি ইঞ্জিনের সঙ্গে এবং বড় হুইলটি প্রপেলার শ্যাফ্‌টের সঙ্গে যুক্ত। স্বভাবতঃই ইঞ্জিনের শক্তি দ্বারা চালিত ছোট হুইলটি বড় হুইলটি অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে ঘুরছে। এই সময় ইঞ্জিনের হুইলটি প্রপেলার শ্যাফ্‌টের হুইল অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ বেশী ঘোরে। এই অবস্থায় ইঞ্জিন পিছনের চাকায় সর্বোচ্চ শক্তি এবং ন্যূনতম গতি সরবরাহ করে।

সেকেণ্ড গিয়ার

তারপর একবার গাড়ী চলতে শুরু করলে সেকেণ্ড ও থার্ড গিয়ারের সাহায্যে গাড়ীর গতিবেগ ধাপে ধাপে বাড়ানো হয়। ৮১ পাতার ওপর থেকে দ্বিতীয় ছবিটি দেখলে বোঝা যায় যে, সেকেণ্ড গিয়ারে ইঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত হুইলটি ফার্স্ট গিয়ারের ইঞ্জিনের হুইল অপেক্ষা কিছু বড় আকারের। ফলে এই সময় হুইল দুটির ঘোরার গতিবেগে খুব বেশী তারতম্য হয় না।

থার্ড গিয়ার

গাড়ীর গতিবেগ দ্রুততম করবার জন্যে থার্ড গিয়ার ব্যবহার করা হয়। এই অবস্থায় দুটি হুইলই সমান আকারের হয় বলে এদের ঘোরার গতিবেগও সমান হয়। এই সময় ইঞ্জিন পিছনের চাকায় স্বল্পতম শক্তি এবং তীব্রতম বেগ সরবরাহ করে (৮১ পাতার ছবি দ্রষ্টব্য)।

রিভার্স গিয়ার

প্রয়োজন হলে রিভার্স গিয়ার ব্যবহার করে গাড়ী পিছন দিকে চালান হয়। তার অর্থ এই নয় যে, সেই অবস্থায় ইঞ্জিনটিই উল্টো দিকে ঘোরে। ইঞ্জিন সর্বদাই একই দিকে ঘোরে, কিন্তু রিভার্স গিয়ারের সাহায্যে প্রপেলার শ্যাফ্‌টটিকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় বলে গাড়ীর চাকাও উল্টো দিকে ঘুরে গাড়ীটিকে পিছনে হটিয়ে নিয়ে যায়। ৮১ পাতার সবচেয়ে তলার ছবিটি দেখলেই বোঝা যায় যে, রিভার্স গিয়ারে ইঞ্জিন ও প্রপেলার শ্যাফ্‌টের গিয়ার-হুইলের মাঝখানে আর একটি বাড়তি গিয়ার-হুইল আছে। ওই হুইলটিই প্রপেলার শ্যাফ্‌টটিকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেয়।

আজকাল বহু মোটর গাড়ীতে স্বয়ংক্রিয় গিয়ারবক্সের বন্দোবস্ত আছে।

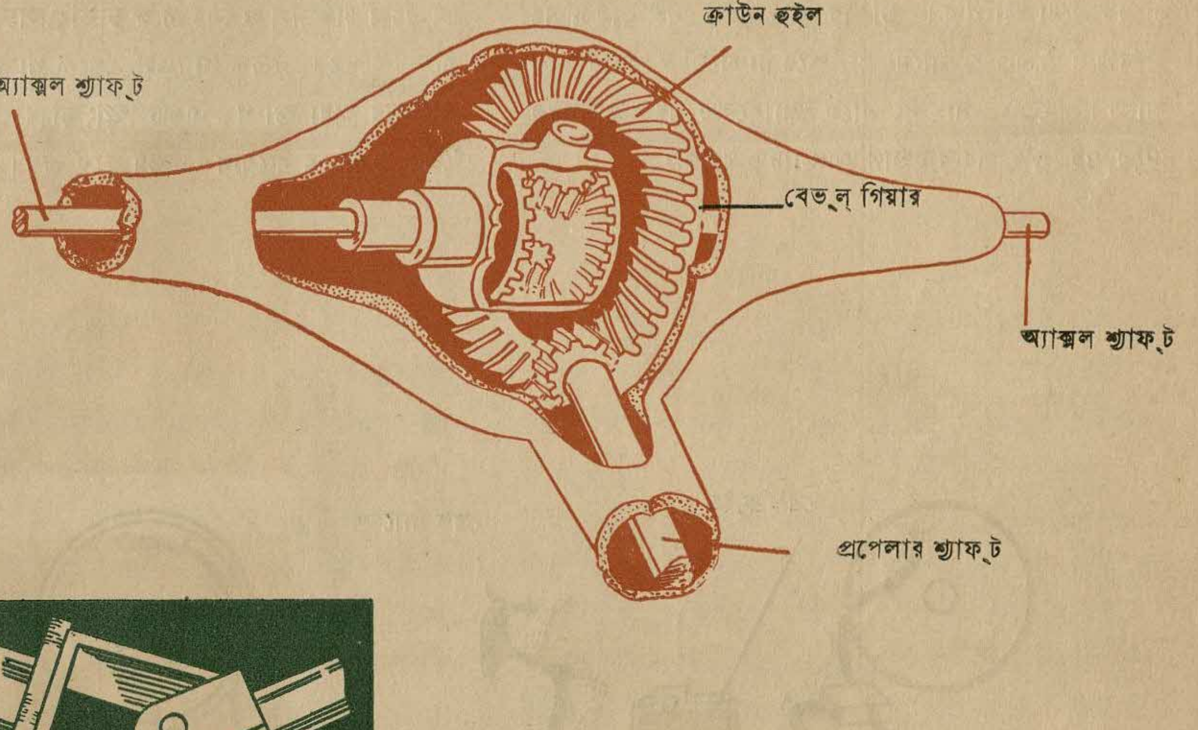
গাড়ী কেমনভাবে মোড় ঘোরে

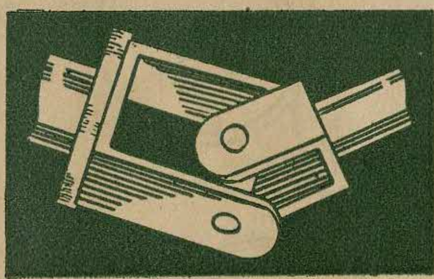
আমরা জানি যে, ড্রাইভার স্টিয়ারিং-এর চাকা ঘোরালেই গাড়ী ঘোরে। মোটর গাড়ী যখন রাস্তার কোন বাঁকে মোড় নেয় অথবা ঘোরে তখন তার বাইরের চাকাগুলি ভিতরের চাকাগুলি অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে ছোটে। কারণ একই সময়ের মধ্যে তার বাইরের চাকাগুলিকে ভিতরের চাকাগুলি অপেক্ষা বেশী দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়।

ডিফারেন্সিয়াল গিয়ার

এইটিকে সম্ভব করবার জন্যে ডিফারেন্সিয়াল গিয়ার নামে আর এক ধরনের গিয়ার ব্যবহার করা হয়। এর প্রথম কাজ হচ্ছে ইঞ্জিনের গতিকে রিয়ার অ্যাক্সলের মাধ্যমে সমকোণে পরিবর্তিত করে চাকায় সঞ্চারিত করে দেওয়া এবং দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে বাঁক নেবার সময় ভিতরের চাকাকে

ডিফারেন্সিয়াল গিয়ার





ইউনিভার্সাল জয়েন্ট

বাইরের চাকা অপেক্ষা স্বল্পতর গতিতে ছোটানো। পিছনের অ্যাক্সল শ্যাফ্‌ট দুটির ভিতরের দিকে ছোট ছোট কয়েকটি বেভ্‌ল্ গিয়ার লাগানো থাকে যাতে তারা পরস্পরের মুখোমুখি থাকে। এদের মাঝখানের ফাঁকে দুটি অথবা চারটি ক্ষুদ্রতর বেভ্‌ল্ গিয়ার থাকে, তাদের বলে ডিফারেন্সিয়াল পিনিয়ন। পিছনের দুটি চাকাই যদি একই গতিতে ছোটে তবে ডিফারেন্সিয়াল পিনিয়নগুলি ঘোরে না। কিন্তু মোড় নেবার সময় বাইরের চাকা যখন ভিতরের চাকা অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে ছুটতে শুরু করে, তখন ডিফারেন্সিয়াল পিনিয়নগুলি তাদের অক্ষের ওপর ঘুরতে শুরু করে। তার ফলে একটি অ্যাক্সল শ্যাফ্‌ট অপরটি অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে ঘোরে।

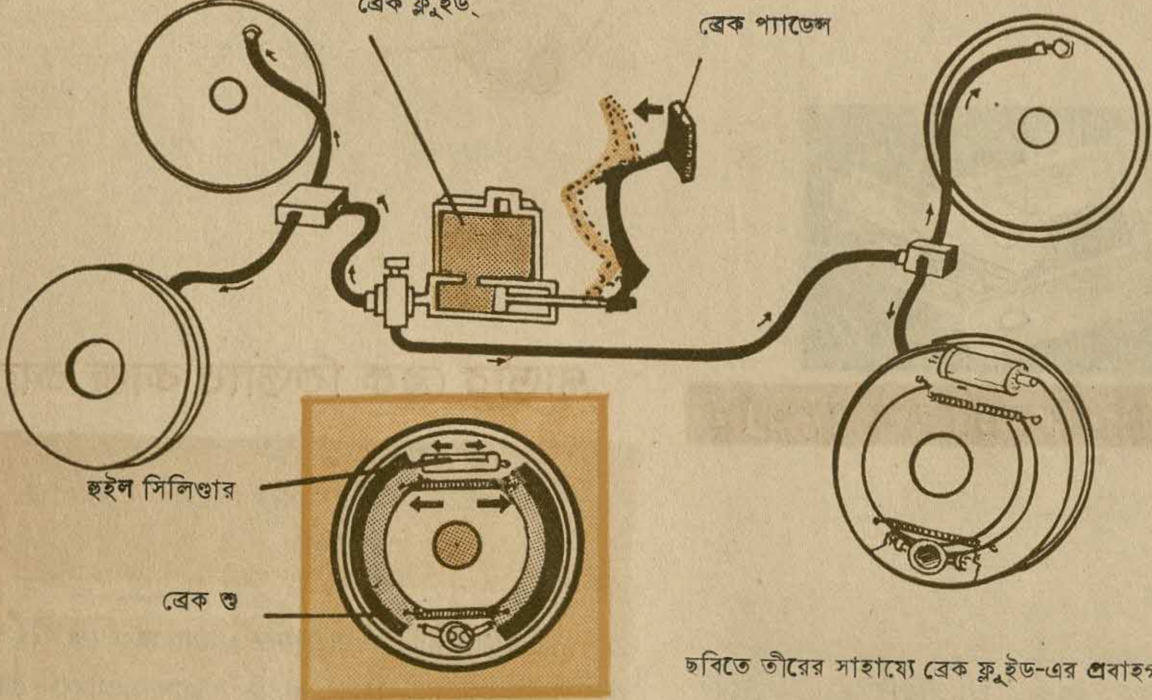
গাড়ীর ব্রেক কিভাবে কাজ করে

ছুটন্ত গাড়ীকে প্রয়োজনমত থামাবার জন্যে মোটর গাড়ীতে ব্রেকের বন্দোবস্ত আছে। প্রথম আমলে ব্রেক দিয়ে পিছনের দুটি চাকাকে থামাবার বন্দোবস্ত ছিল। এখন চারটি চাকাতেই ব্রেকের ব্যবস্থা আছে।

আধুনিক সব গাড়ীতেই হাইড্রলিক ব্রেক ব্যবহার করা হয়। এই ব্যবস্থায় ড্রাইভারের সামনে গাড়ীর মেঝের ওপর ব্রেক প্যাডেল থাকে। সেটির সঙ্গে মাস্টার সিলিণ্ডার নামে বিরাট একটি সিলিণ্ডারের যোগ আছে। ব্রেক লাইন নামে পরিচিত পাইপগুলিকে মাস্টার সিলিণ্ডার থেকে চাকার মধ্যে সিলিণ্ডারগুলিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মাস্টার সিলিণ্ডার, হুইল সিলিণ্ডার এবং ব্রেক লাইনগুলিতে ব্রেক ফ্লুইড নামে এক ধরনের বিশেষ তরল পদার্থ থাকে।

প্রত্যেকটি হুইল সিলিণ্ডারই গাড়ীর চাকার সঙ্গে লাগানো সসপ্যানের মত দেখতে এক একটি লোহার ব্রেক ড্রামের মধ্যে স্থাপিত। চাকার সঙ্গে ঘুরন্ত সেই ড্রামগুলির অভ্যন্তরে 'ব্রেক শু' নামে দুটি করে বাঁকানো লোহার অংশ আছে। ব্রেক লাইনিং নামে অ্যাসবেস্টসের আচ্ছাদন দিয়ে ওই 'শু'গুলির বহির্ভাগ আচ্ছাদিত থাকে।

বাইরের দিকে অগ্রসর হয় এবং 'ব্রেক শু'গুলিকে ড্রামের অভ্যন্তরের দেওয়ালে চেপে ধরে। এর ফলে যে ঘর্ষণ হয় তা ঘুরন্ত ড্রামগুলি ও সেই সঙ্গে চাকাগুলিকে থামিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ব্রেক প্যাডেল থেকে পা তুলে নিলে 'ব্রেক শু'গুলির মধ্যে স্থাপিত একটি স্প্রিং ড্রামের দেওয়ালের সঙ্গে 'ব্রেক শু'গুলির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।



ছবিতে তীরের সাহায্যে ব্রেক ফ্লুইড-এর প্রবাহগতি দেখানো হয়েছে

ড্রাইভার যখন ব্রেক প্যাডেলে চাপ দেয় তখন মাস্টার সিলিণ্ডারের মধ্যেকার একটি পিস্টন ব্রেক লাইনের চারিদিকে ব্রেক ফ্লুইড ছড়িয়ে দেয় ফলে হুইল সিলিণ্ডারগুলির মধ্যে প্রত্যেকটি পিস্টনের ওপর চাপ পড়ে। এই পিস্টনগুলি

জরুরী অবস্থায় গাড়ী থামাবার জন্যে এক ধরনের যান্ত্রিক ব্রেক ব্যবহার করা হয়। এটি হাতে করে চেপে ধরলে প্রপেলার শ্যাফ্‌টটি আর ঘুরতে পারে না সুতরাং পিছনের চাকাগুলিও থেমে যায়।

মোটর গাড়ীর বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা

আধুনিক মোটর গাড়ীর বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাটি অত্যন্ত জটিল। বোঝবার সুবিধের জন্যে এটিকে আমরা দুভাগে ভাগ করে নিতে পারি—ইঞ্জিনের ইগ্নিশান সিস্টেম বা প্রজ্বালন প্রণালী এবং গাড়ীর অন্যান্য অংশকে চালু রাখার জন্যে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা। উভয় ক্ষেত্রেই গাড়ীর মধ্যে স্থাপিত লেড স্টোরেজ ব্যাটারী এবং ইঞ্জিন দ্বারা চালিত জেনারেটর বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করে। গাড়ী চালু করার সময় ব্যাটারী বিদ্যুৎ সরবরাহ করে এবং ইঞ্জিন যখন বন্ধ থাকে তখনও হেড লাইট জ্বালান, গাড়ীর ভিতরের আলো জ্বালান প্রভৃতি কাজে ব্যাটারী ব্যবহৃত হয়। কিন্তু একবার ইঞ্জিন চলতে শুরু করলে তখন জেনারেটরই সমস্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব নেয় এবং একই সঙ্গে স্টোরেজ ব্যাটারীকে চার্জও করে। সাধারণতঃ গাড়ীর ব্যাটারী ছয় অথবা বারো ভোল্টের হয়।

লুব্রিকেশন

ইঞ্জিনের 'লুব্রিকেটিং' প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। লুব্রিকেটিং না করলে ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ, কল-কব্জা, স্ক্রু, বিয়ারিং প্রভৃতি শক্ত হয়ে যাবে। ফলে পরস্পরের ঘর্ষণে সেগুলি ভেঙ্গে গিয়ে বিপজ্জনক দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। লুব্রিকেটিং করলে প্রত্যেকটি কল-কব্জার গায়ে একটি করে তেলের পর্দা পড়ে যায় ফলে কল-কব্জাগুলি পিচ্ছিল থাকে, পরস্পরের মধ্যে সরাসরি ঘর্ষণ হয় না এবং তাদের গতিও স্বচ্ছন্দ হয়। আবার লুব্রিকেটিং-এর ফলে ইঞ্জিনও অনেকাংশে ঠাণ্ডা থাকে।

এই লুব্রিকেটিং তেল ক্র্যাংক কেসের তলায় আটকান একটি পাত্রে ভরে দিতে হয়, তার নাম অয়েল প্যান।

লুব্রিকেটিং প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয়। ইঞ্জিন দ্বারা চালিত একটি পাম্প আছে যেটি ইঞ্জিনের যেখানে যেখানে তেল পাঠান দরকার সেখানে সেখানে তা পাঠিয়ে দেয়। ঘূর্ণমান ক্র্যাংক শ্যাফ্‌টও এ ব্যাপারে সাহায্য করে। তেলের মধ্যে যদি কোন ময়লা থাকে, তবে তাকে ছেঁকে ফেলার জন্যে একটি ছাঁকুনিও আছে।

আধুনিক যুগের গ্যাস-টারবাইন চালিত মোটর গাড়ী

আধুনিক যুগে পিস্টন ইঞ্জিনচালিত মোটর গাড়ীর প্রভূত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা মোটর গাড়ীতে আরও উন্নত ধরনের ইঞ্জিন ব্যবহার করার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। ফলে তৈরী হল গ্যাস-টারবাইন ইঞ্জিন চালিত মোটর গাড়ী। পিস্টন ইঞ্জিনের যান্ত্রিক কলাকৌশলের ব্যাপারটি অত্যন্ত গোলমেলে। এর মধ্যে পিস্টন, কানেকটিং রড, ভাল্‌ভ্‌, ভাল্‌ভ্‌-লিফ্‌টার এইসব আরও অনেক রকম অংশ আছে। সেদিক দিয়ে টারবাইন ইঞ্জিনের গড়ন অনেক সোজা।



গ্যাস-টারবাইন ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী

টারবাইন ইঞ্জিন

টারবাইন ইঞ্জিনের মুখ্য অংশগুলি হল—কম্প্রেসার, কম্বাশ্চন চেম্বার ও টারবাইন।

কম্প্রেসার হচ্ছে একটি ঘূর্ণমান যন্ত্র যা বায়ুর চাপ অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে কম্বাশ্চন চেম্বারে পাঠায়। সেখানে উচ্চচাপবিশিষ্ট বায়ু ও জ্বালানির দহন প্রক্রিয়ার ফলে উত্তপ্ত গ্যাসের সৃষ্টি হয়। কম্বাশ্চন চেম্বার থেকে সেই গ্যাস প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে এসে টারবাইনের ব্লেডগুলির ওপর সজোরে আঘাত করে। ফলে টারবাইনটি ঘুরতে শুরু করে।

টারবাইনের একটি চাকা কম্প্রেসারটিকে ঘোরায় আর অন্যটি চাকার সঙ্গে লাগান কতকগুলি গিয়ার আর শ্যাফ্‌টকে চালায়। এইভাবে টারবাইনের চাকা ঘোরার ফলে গাড়ী চলতে থাকে। গরম এগ্‌জস্ট্‌ গ্যাস টারবাইনের ভিতর দিয়ে যাওয়ার পর সেটি কম্প্রেসার থেকে হাওয়া ঢোকবার পথটির চারিদিকে ঘুরতে থাকে। এই গরম গ্যাসটি ভিতরে ঢোকবার হাওয়াকে গরম করে। এই উচ্চচাপের হাওয়া গরম হলে টারবাইনের কর্মক্ষমতাও বাড়ে।

পিস্টন ইঞ্জিন ও টারবাইন ইঞ্জিন

পিস্টন ইঞ্জিনের অনেকগুলি অসুবিধা আছে। সবচেয়ে বড় কথা, ইঞ্জিনের কর্মশক্তি বাড়াতে হলে তাতে সিলিণ্ডারের সংখ্যা বাড়াতে হবে অর্থাৎ সেই সঙ্গে পিস্টন, স্ক্রু, বিয়ারিং প্রভৃতি হরেক রকমের অংশ তাতে স্থাপন করতে হবে ফলে গাড়ীর ওজন যাবে বেড়ে।

টারবাইন ইঞ্জিনে কিন্তু অত ঝামেলা নেই। টারবাইনের চাকাটি একটি সোজা দণ্ড বা অ্যাক্সলের ওপর ঘোরে এবং অবিরাম স্বচ্ছন্দ শক্তি সরবরাহ করে। পেট্রল ইঞ্জিনের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র টারবাইন ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হয়। তাতে কোন ভাল্‌ভ্‌ গিয়ার নেই, কোন ইলেকট্রিক্যাল ডিস্ট্রিবিউটর নেই। ফলে ইঞ্জিনে যে শক্তি উৎপাদিত হয় তার একটি বড় অংশ শুধুমাত্র ইঞ্জিনের ভার টানতেই চলে যায় না। সবচেয়ে বড় কথা, পিস্টন ইঞ্জিনের এগ্‌জস্ট্‌ বা পোড়া অনাবশ্যক বিপজ্জনক কার্বন মনোক্সাইড মিশ্রিত গ্যাসটিকে বের করে দিতে হয়। টারবাইন ইঞ্জিনে তা করবার দরকার তো হয়-ই না উপরন্তু আবার সেটিকে গাড়ীর মধ্যে কাজে লাগান হয়।

টারবাইন ইঞ্জিনের যান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা রিজেনারেটর-গুলির সাহায্যে এই গ্যাস বাইরে থেকে আগত হাওয়াকে কম্বাশ্চন চেম্বারে যাবার আগেই অনেকখানি গরম করে দেয়। তার ফলে সেটি আরও সহজে জ্বলে ওঠে।

তাছাড়া, এতে কোন ক্লাচের প্রয়োজন নেই। পিস্টন ইঞ্জিন গরম হতে যতটা সময় লাগে এতে ততটা সময়ের দরকার হয় না। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ইন্ধনটি স্থিরভাবে জ্বলতে থাকে ফলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এ তার পূর্ণ শক্তি লাভ করে। ইঞ্জিন ঠাণ্ডা করবার জন্যে এতে রেডিয়েটরের প্রয়োজন হয় না। তার জন্যে এতে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আছে। ইঞ্জিনের মধ্যে দিয়ে অবিরাম প্রবাহিত বাতাসের বেগ অতিরিক্ত তাপটিকে টেনে নেয় এবং রিজেনারেটরগুলি তখন সেই তাপকে বাইরে থেকে আগত হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে কম্বাশ্চন চেম্বারে যাবার আগে তাকে অনেকখানি গরম করে তাড়াতাড়ি জ্বলতে সাহায্য করে। ফলে ইঞ্জিন ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে এতে আর আলাদা কোন ব্যবস্থা নেই। লুব্রিকেটিংয়েরও এর বিশেষ প্রয়োজন নেই। গ্যাস-টারবাইনের জ্বালানির কোন বাছ-বিচার নেই। যে কোন জ্বালানি যা পাইপের মধ্যে দিয়ে গড়িয়ে যেতে পারে এবং বাতাসের সংস্পর্শে এলে জ্বলে উঠবে তাই এতে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া, স্পার্ক জ্বলে ওঠবার সঠিক সময়টির কোন বিশেষ তাৎপর্য এতে নেই। একটি প্লাগই বারবার অগ্নি সংযোগ করে।

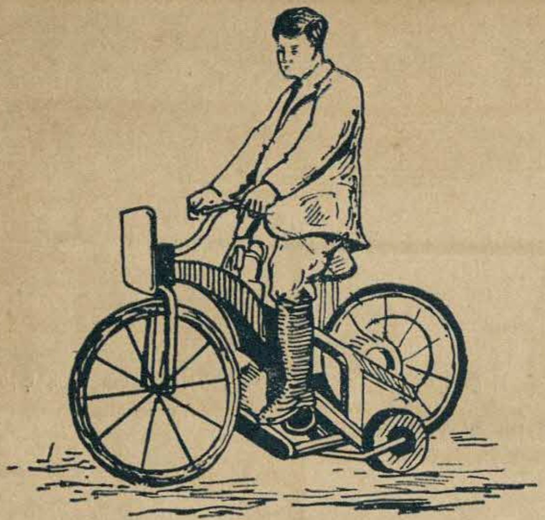
এই সমস্ত এবং আরও অনেক রকম সুযোগ সুবিধা থাকার জন্যে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে পিস্টন ইঞ্জিনের চল ক্রমে উঠে যাবে এবং তার জায়গা দখল করবে গ্যাস-টারবাইন ইঞ্জিন।

আধুনিকতম এই গাড়ীটি দেখে আমাদের এখন ভাবতেও অবাক লাগে যে, এই সেদিনও স্বয়ংচালিত কোন গাড়ীর পরিকল্পনাকে মানুষ পাগলের পাগলামি বলে ভাবত।

১৯৬৬

১৭৭০





প্রথম আমলের একটি মোটর সাইকেল

মোটর সাইকেল

১৮৮৫ সালে জার্মান আবিষ্কারক গটলিব ডিমলার প্রথম সফল মোটর সাইকেল নির্মাণ করেন। কিন্তু ওই ধরনের মোটর সাইকেল সাধারণ লোককে বিক্রি করার জন্যে তৈরী করা হয় নি।

১৮৯৪ সালে উল্ফ্ মুলার এবং গেইসন্হফ নামে আরও দুজন জার্মান আবিষ্কারক আর এক ধরনের মোটর সাইকেল নির্মাণ করেন। এই ধরনের অনেকগুলি মোটর সাইকেল জার্মানী ও ফ্রান্সে বিক্রি করা হয়। তারপর থেকে মোটর সাইকেল নির্মাণশিল্পে প্রভূত উন্নতি হয়।

মোটর সাইকেল ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী

মোটর গাড়ীর ইঞ্জিন ফোর স্ট্রোক প্রক্রিয়ায় কাজ করে; কিন্তু মোটর সাইকেল, স্কুটার প্রভৃতির ইঞ্জিন টু (দুই) স্ট্রোক প্রক্রিয়ায় কাজ করে। ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনে চারটি স্ট্রোক যা করে টু স্ট্রোক ইঞ্জিনে দুটি স্ট্রোক তাই-ই করে। একটি টু স্ট্রোক ইঞ্জিন একই আকারের একটি ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনের দ্বিগুণ শক্তি উৎপন্ন করে।

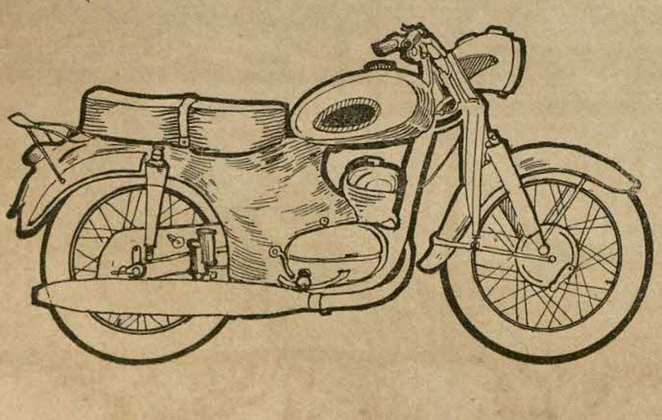
টু স্ট্রোক ইঞ্জিনের পিস্টনটি ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনের ইনটেক এবং এগ্‌জস্ট্ ভাল্‌ভের কাজ করে। টু স্ট্রোক ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারের মধ্যে ওঠা নামা করবার সময় পিস্টনটি ইনটেক এবং এগ্‌জস্ট্ দ্বারগুলি খোলে এবং বন্ধ করে।

একটি টু স্ট্রোক ইঞ্জিন নিম্নলিখিতভাবে কাজ করে:

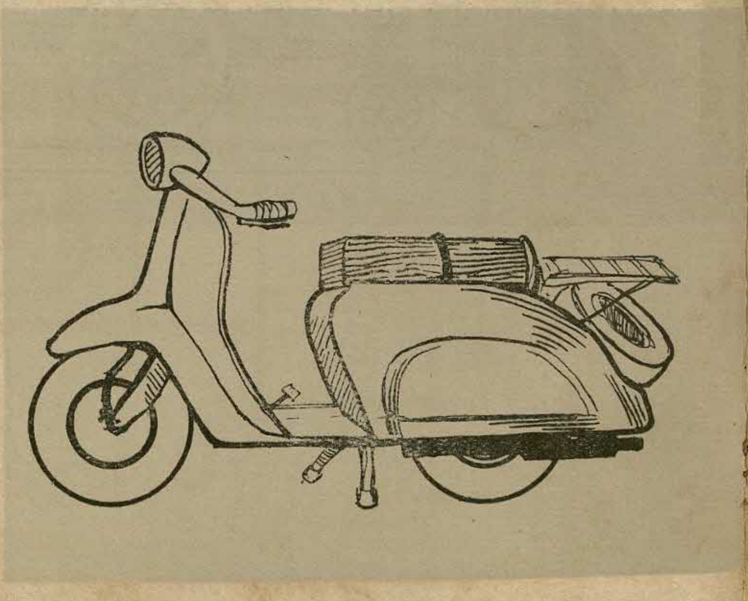
প্রথম স্ট্রোক—ইনটেক (১) এবং কম্প্রেশান (২): এই অবস্থায় পিস্টনটি সিলিণ্ডারের মধ্যে ওপরে ওঠে, ইনটেক দ্বারটি বন্ধ করে দেয় এবং বাতাস ও জ্বালানিকে সংনমন করে। পরবর্তী ইনটেক স্ট্রোকের জন্যে জ্বালানি এবং বাতাস পিস্টনের তলায় প্রবেশ করে।

দ্বিতীয় স্ট্রোক—পাওয়ার (৩) এবং এগ্‌জস্ট্ (৪): এই অবস্থায় স্পার্ক প্লাগ জ্বালানিকে প্রজ্বালিত করে। গ্যাসের প্রসারণ পিস্টনটিকে ঠেলে নামিয়ে দেয়। এই স্ট্রোকের শেষের দিকে পিস্টনটি ইনটেক ও এগ্‌জস্ট্ দ্বার দুটি মুক্ত করে দেয়। পোড়া গ্যাস সিলিণ্ডার থেকে বেরিয়ে যায় এবং বাতাস ও জ্বালানির মিশ্রণ সেখানে প্রবেশ করে। এইবার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হল।

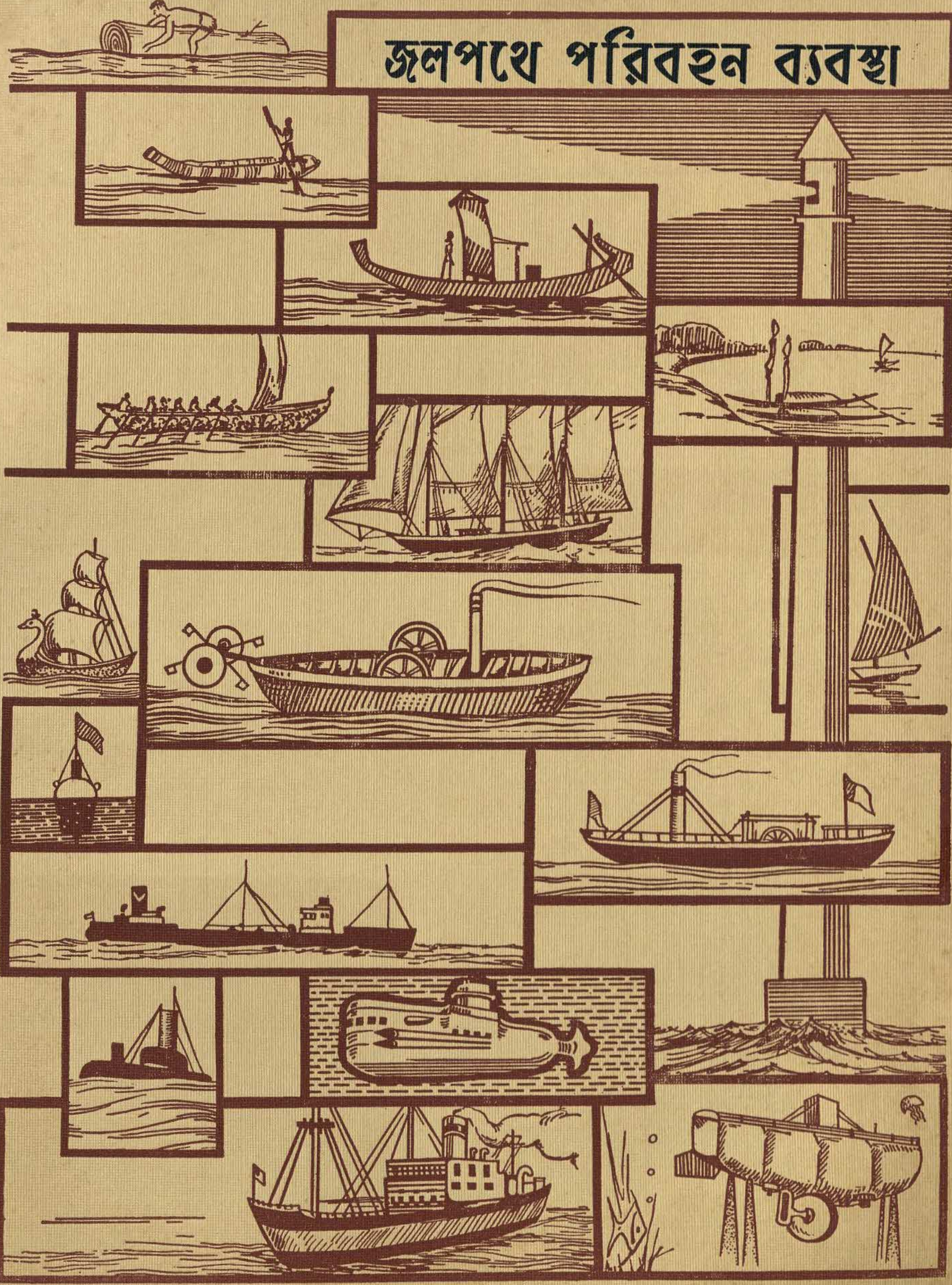
আধুনিক মোটর সাইকেল



স্কুটার



জলপথে পরিবহন ব্যবস্থা

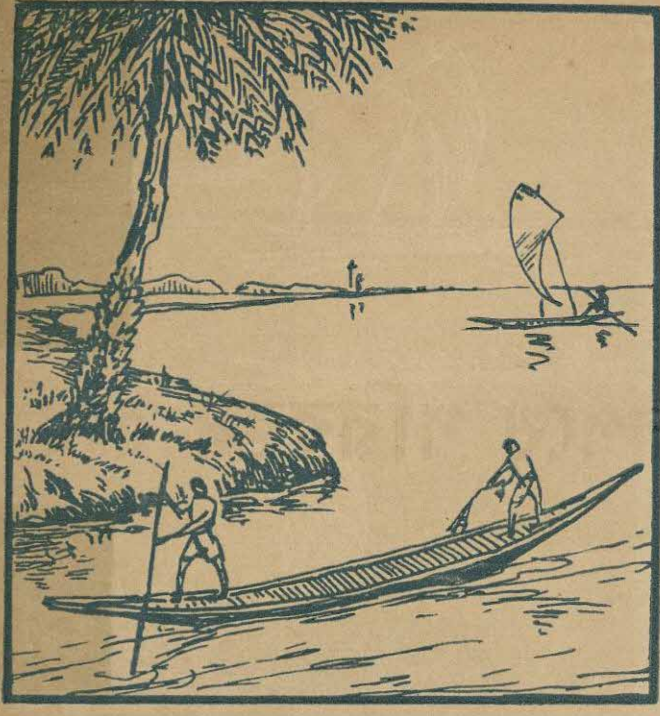


জলপথে পরিবহন ব্যবস্থা

ডাঙ্গার ওপর আদিম মানুষ যেখানে খুশী যেতে পারত। কিন্তু জলে তার গতি রুদ্ধ ছিল। আজকের বিশাল বিশাল সমুদ্রগামী জাহাজগুলি দেখে কল্পনা করা মুস্কিল কত হাস্যকর অথচ দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় প্রকৃতিকে জয় করবার দুর্নিবার নেশায় মানুষ প্রথম অকূলে ভেসেছে।

সম্ভবতঃ হাজার হাজার বছর আগে একদিন আমাদের এক পূর্বপুরুষ বন্যার স্রোতে ভেসে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর হাতে এসে ঠেকেছিল একটি গাছের গুঁড়ি; আর মরিয়া হয়ে তাকেই তিনি আঁকড়ে ধরেছিলেন নিজের প্রাণ বাঁচাবার শেষ চেষ্টায়।





নৌকা এখনও অদৃশ্য হয়নি। গ্রামাঞ্চলের বহু নদীতে এখনও এ ধরনের নৌকা দেখা যায়।

আশ্চর্য, তিনি দেখলেন শুধু সেই গাছের গুঁড়িটিকে দুহাতে জড়িয়েই বিনা আয়াসে তিনি বেশ জলে ভেসে থাকতে পারছেন। এবং ক্রমে স্রোতের মুখে ভেসে নিরাপদে তিনি আবার ডাঙ্গার মাটি স্পর্শ করেছিলেন সেদিন। উদ্ধার পাবার এই নতুন পথটি অন্যান্যেরাও ক্রমে জানল।

দিন যায়। ক্রমে প্রয়োজনের তাগিদে বা বিপদকে ভালবেসে সেদিনকার মানুষ তার বাসার কাছাকাছি নদীনালাগুলি গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে পার হতে লাগল। তার চলার পথে জলপ্রবাহ আর বাধা হয়ে রইল না।

তারপর হয়ত একদিন একজন মানুষের মনের সুপ্ত দুঃসাহসিক-কিছু-করবার নেশায় মাতাল হলেন। আর গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে না ধরে তিনি তার ওপর চেপে বসে স্রোতের টানে ভেসে অপর পারে পৌঁছলেন। কল্পনা করতে দোষ কি যে, সেদিন নদীর পারে হর্ষোৎফুল্ল নরনারী তাঁর সেই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার সাফল্যে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিল?

সুতরাং কৌশলটা বদলাল। এভাবে চললও কিছুদিন। কিন্তু চিরকাল না। তা যদি চলত, তবে আমাদের এই শতাব্দীর সভ্যতায় আমরা কোনদিনই পৌঁছতে পারতাম না। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ তাই সব পুরনোকে বাতিল করেছে। তার মস্তিষ্ক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে।

আর সেই প্রয়োজনটাই বড় হয়ে দেখা দিল যখন বেশ কয়েকজনকে একদিন একই সঙ্গে নদী পারের বন্দোবস্ত করতে হল। কিন্তু উপায় কি? একটি গুঁড়িতে অতজন চেপে বসলে তো সেটি ডুবে যাবে! হয়ত সে চেষ্টা করতে গিয়ে এর আগে কয়েকজনের সলিল সমাধি হয়েছেও। উপায় খুঁজে বের করতে সেদিন বোধহয় বেশী দেরী হয় নি। ওঁদেরই মধ্যে একজন হয়ত ভাবলেন যে, একটি গুঁড়ি যদি জলের ওপর ভেসে থাকে তবে স্থান সঙ্কুলানের জন্যে একাধিক গুঁড়িকেই বা একসঙ্গে বাঁধলে সেগুলি জলের ওপর ভেসে থাকবে না কেন? সুতরাং তাই করা হল। দেখা গেল, পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা সেই গুঁড়িগুলি জলের ওপর স্বচ্ছন্দে ভেসে থাকছে, বেশ কয়েকজন তার ওপর দিব্যি বসতে পারছেন, আবার সেটি ভেসে এগিয়ে যাচ্ছেও দিব্যি স্বচ্ছন্দে, আর এগুলি ভারসাম্য রাখার পক্ষেও বেশ উন্নততর। এইভাবে ভেলার আবিষ্কার হল।

তারপর একদিন এইরকম এক ভেলায় ভাসতে ভাসতে কেউ একজন হয়ত নেহাৎ খেলাচ্ছলেই নিজের একটি হাত ভেলার বাইরে ঝুলিয়ে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর তাঁর হাত জলে হয়ত একটু ঠেলাও

যীশুখৃষ্টের জন্মের বহু আগে নীল নদে এই ধরনের নৌকায় মিশরীয়রা ভ্রমণ করতেন



দিয়েছিল। আর তাঁর হাত যে মুহূর্তে জলে ঠেলা দিল, সেই মুহূর্তেই যেন ভেলার গতি একটু তীব্র হল। লগি দিয়ে ঠেলে ভেলা এবং আরও পরে দাঁড় দিয়ে নৌকা বাওয়ার সেই বোধকরি শুরু।

গাছের গুঁড়িকে জলে ব্যবহার করবার উপযোগী করে তৈরী করার আরও একটি উপায় আদিম মানুষ বের করেছিলেন। সম্ভবতঃ একটি ফাঁপা গাছের গুঁড়িকে জলে ভেসে যেতে দেখে কারুর মনে কৌশলটি প্রয়োগ করার কথা মনে আসে। আর গাছের গুঁড়িটিতে গর্ত করার পর দেখা গেল সেটি বেশ হাল্কা হয়, সহজে জলে ভাসে এবং ওই গর্তের মধ্যে বেশ কয়েকজন একসঙ্গে নিরাপদে বসতে পারেন। আগুন এবং তখনকার দিনে যেসব ধারাল অস্ত্র ব্যবহৃত হত তাদের সাহায্যেই গাছের গুঁড়িগুলিতে গর্ত করা হত।

এইভাবে মানুষ তার প্রথম নৌকা তৈরী করল।



সে আমলের জলপথে যে ধরনের নৌকা চলাচল করত, আজও তাদের গঠনে বিশেষ হেরফের হয় নি

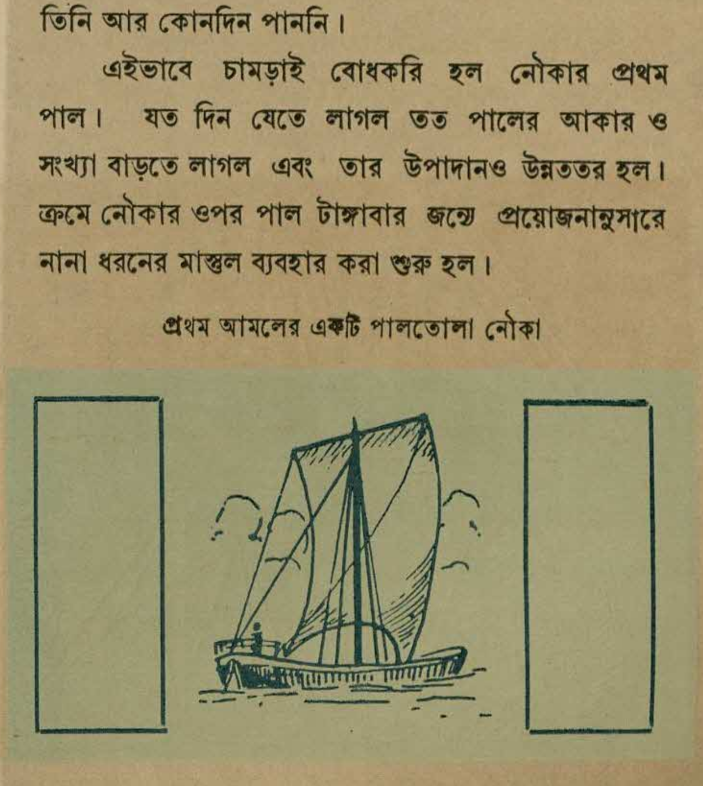
প্রথম পালতোলা নৌকা

আদিম মানুষেরা কিন্তু শুধু কাঠ দিয়েই তাঁদের নৌকা তৈরী করতেন না। গাছের ছাল, চামড়া প্রভৃতিও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত।

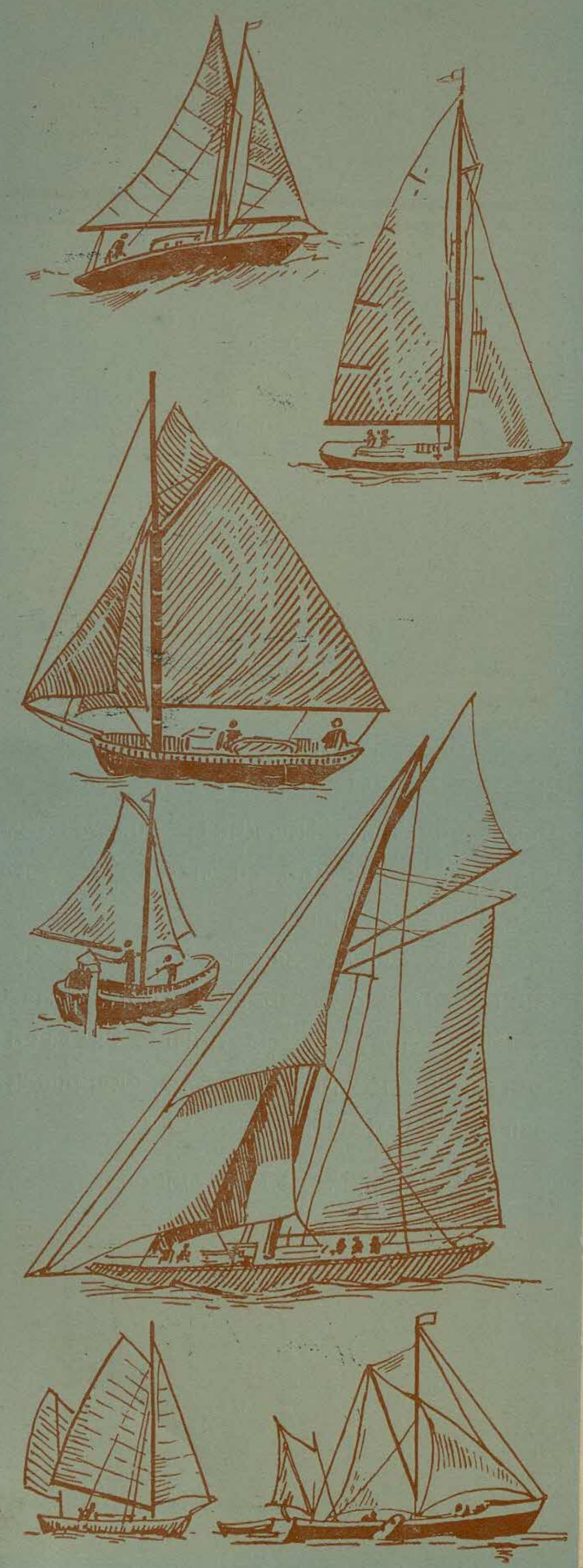
এর পরের বড় আবিষ্কার হচ্ছে পাল। যে অসাধারণ প্রতিভা এর আবিষ্কর্তা তিনি হয়ত লক্ষ্য করেছিলেন যে, বাতাস তাঁর নৌকাকে সামনে অথবা পাশে ঠেলে দিচ্ছে; জলস্রোত এবং তাঁর দাঁড়ের টানেও নৌকা সামনে অথবা পাশে যাচ্ছে। একদিন হয়ত কোন কারণে চলন্ত নৌকার ওপর তাঁর উঠে দাঁড়াবার প্রয়োজন হয়েছিল; আর সেই মুহূর্তেই যেন তাঁর মনে হল যে, বাতাসের বেগ একটু বেড়ে উঠল। বাতাসের সেই অতিরিক্ত ঠেলা খেয়ে তাঁর নৌকা যেন আরও একটু বেশী জোরে এগিয়ে গেল। কৌতূহলী হয়ে তিনি হয়ত একরাশ পাতাওয়ালা ডালপালা নৌকার ওপর রেখেছিলেন এবং লক্ষ্য করেছিলেন যে, বাতাস আরও জোরে নৌকাকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর তিনি হয়ত আর একদিন (সেদিন হয়ত তাঁর হাতের কাছে ছিল না) একটি চামড়াকে কোনক্রমে নৌকার ওপর টাঙ্গিয়ে দিয়েছিলেন। আর তার ফলে তাঁর নৌকা যে গতি পেল, সে গতিবেগ তার আগে তিনি আর কোনদিন পাননি।

এইভাবে চামড়াই বোধকরি হল নৌকার প্রথম পাল। যত দিন যেতে লাগল তত পালের আকার ও সংখ্যা বাড়তে লাগল এবং তার উপাদানও উন্নততর হল। ক্রমে নৌকার ওপর পাল টাঙ্গাবার জন্যে প্রয়োজনানুসারে নানা ধরনের মাস্তুল ব্যবহার করা শুরু হল।

প্রথম আমলের একটি পালতোলা নৌকা



বিভিন্ন ধরনের পালতোলা নৌকা



এরই মাঝে মানুষ তার নৌকাকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে আবিষ্কার করল হাল। আর তার এই দীর্ঘ জলপথ ভ্রমণে মানুষ এর মধ্যে বুঝে নিয়েছে কোন কোন নক্ষত্রকে অনুসরণ করলে তার পথ ভুল হবে না। নির্বিবাদে নির্ভুলভাবে সে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে।

সুতরাং এখন আর বাতাসের মর্জির ওপর নৌকার গতিপথ ও গতিবেগ নির্ভর করে রইল না। এখন ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে দাঁড় ও পাল, নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে হাল এবং সঠিক পথ দেখাবার জন্যে নক্ষত্রের সাহায্যে মানুষ সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দেবার জন্যে প্রস্তুত হল।

পুরাকালের জাহাজ

সঠিক কবে প্রথম জাহাজ নির্মিত হয়েছে বলা মুস্কিল। তবে প্রাচীনতম জাহাজের নিদর্শন পাওয়া গেছে মিশরে একটি পাত্রে আঁকা ছবিতে। অনুমান করা হয়, এটি খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দ আগেকার।

খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ নাগাদ মিশরীয়রা জাহাজ চলাচলের সুবিধার জন্যে নীল নদ থেকে লোহিত সাগর অবধি একটি খাল খনন করেছিলেন, এমন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। ওই সময়ে মিশরের রাণী ছিলেন হাটসেপসুট। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অত্যন্ত প্রগতিশীল ছিল। তিনি পাঁচটি মিশরীয় জাহাজের একটি বহর পার্শ্ববর্তী রাজ্য পুন্ট-এ (সম্ভবতঃ অধুনা দক্ষিণ আরব) প্রেরণ করেন। তাঁর এই প্রথম অভিযান অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল এবং এই ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে তিনি ওই পাঁচটি জাহাজ ও সেগুলির নাবিকদের ছবি এবং এই অভিযানের কাহিনী থিব্‌স-এর একটি মন্দিরগাত্রে খোদাই করে রাখবার আদেশ দেন।

সে আমলের মিশরীয় জাহাজগুলি ষাট ফুট দীর্ঘ হত; এবং সেগুলির প্রত্যেকটিতে পনের জোড়া করে দাঁড় থাকত। দাঁড় ছাড়াও সেগুলিতে বিশাল বিশাল চৌকা আকারের পাল থাকত। এই সমস্ত জলযানের কয়েকটি আবার দুশ থেকে তিনশ ফুট অবধি দীর্ঘ হত।



খৃষ্টপূর্ব ৩৬০০ অব্দের একটি মিশরীয় পালতোলা নৌকা

দৃশ্যতঃ মিশরীয় জাহাজগুলির কোন আভ্যন্তরীণ কাঠামো বা তলদেশ ছিল না। বিভিন্ন মাপের কাঠকে এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা হত যে, জাহাজের সম্মুখভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ বেঁকে জলের অনেক ওপরে উঁচু হয়ে থাকত। পালগুলি জাহাজের দৈর্ঘ্যের সমকোণে মাস্তুলের ওপর টাঙ্গানো থাকত। মিশরীয়দের সমুদ্রগামী জাহাজগুলিও নীলনদে ভ্রাম্যমান এইসব জাহাজের অনুরূপ ছিল।

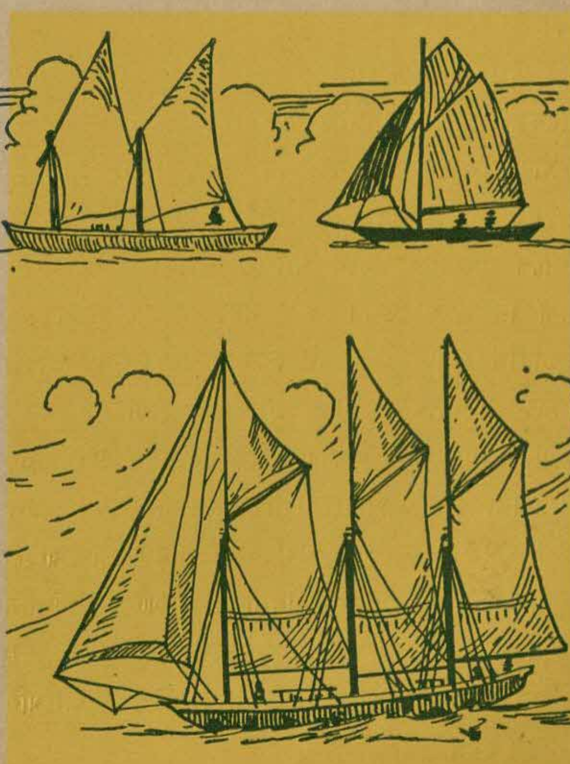
কিন্তু মিশরীয়রা কোনদিনই সুদূর সমুদ্রভ্রমণ করেন নি। প্রাচীনকালের যেসব জাতি সমুদ্রভ্রমণে উৎসাহী ও পারদর্শী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় ক্রেটানদের। আবার ক্রেটানদের থেকেও নাবিক হিসাবে সুদক্ষ ছিলেন ফিনিসীয়রা। ফিনিসীয় নগরীগুলি থেকে তাঁদের জাহাজগুলি মিশর, ভারতবর্ষ, আরবদেশ, সাইপ্রাস, স্পেন, ব্রিটেন, সিরিয়া, জুডিয়া, দামাস্কাস প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মাল নিয়ে যাতায়াত করত। তাঁদের জাহাজগুলিতে পাল এবং দাঁড় দুই-ই থাকত।

ফিনিসীয়দের পর গ্রীক ও রোমানরা সমুদ্রের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। সাধারণতঃ তাঁদের যুদ্ধজাহাজ-গুলিতে দাঁড় ব্যবহৃত হত এবং বাণিজ্যতরীগুলিতে পাল ব্যবহার করা হত। আবার অনেক জাহাজে দুই-ই ব্যবহৃত হত।

রোমানরা তাঁদের বাণিজ্যতরী অপেক্ষা যুদ্ধজাহাজ-গুলির উন্নতির দিকেই বেশী মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁদের যুদ্ধজাহাজগুলিতে দুদিকে দুসারি দাঁড়ের ওপরের তলায় আবার দুসারি দাঁড় থাকত। এইভাবে তিনতলা, চারতলা করে ক্রমে ক্রমে কোন কোন জাহাজে তাঁরা ষোলতলা অবধি দাঁড় বসিয়েছিলেন। অত ওপর থেকে জল স্পর্শ করবার জন্যে দাঁড়গুলিকে কত লম্বা করতে হত তা সহজেই অনুমেয়। এইরকম এক একটি দাঁড় টানতে অনেক সময় তিন-চার জন লোকের প্রয়োজন হত। দাঁড় টানার কাজ রোমানরা সাধারণতঃ যুদ্ধবন্দী, ক্রীতদাস ও অপরাধীদের দিয়ে করাতেন।

যাইহোক, ক্রেটান, ফিনিসীয়, গ্রীক এবং রোমানদের জাহাজগুলি নানা দিক দিয়ে মিশরীয় জাহাজগুলির অনুরূপ ছিল। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে তাদের নতুনত্বও ছিল। গ্রীক এবং রোমানদের জাহাজগুলির আকৃতি সম্বন্ধে আমরা সে আমলের আঁকা খোদাই করা ছবি এবং লেখকদের রচনা থেকে জানতে পারি। এই সমস্ত জাহাজগুলিতে নিঃসন্দেহে আভ্যন্তরীণ কাঠামো এবং তলদেশ ছিল। জাহাজের পশ্চাদ্ভাগ সম্মুখভাগ থেকে একটু আলাদা হত। সম্মুখভাগ একটু নীচুর দিকে ঝুঁকে

বিভিন্ন ধরনের পালতোলা নৌকা





১৬৬৪ সালে আমস্টারডামে নির্মিত 'হল্যাণ্ডিয়া'

ধর্মযুদ্ধের সময় (১১০০-১৩০০ খৃষ্টাব্দ) জাহাজ নির্মাণে অনেক প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। জাহাজের পশ্চাদ্দিকে মাঝখানে একটি হাল লাগানো হল। পাটাতনের ওপর যুধ্যমান ব্যক্তিদের ভালভাবে পা রাখবার মত জায়গা করা হল। প্রত্যেকটি মাস্তুলে পালের ওপর একটি ছোট মাচান করা হল।

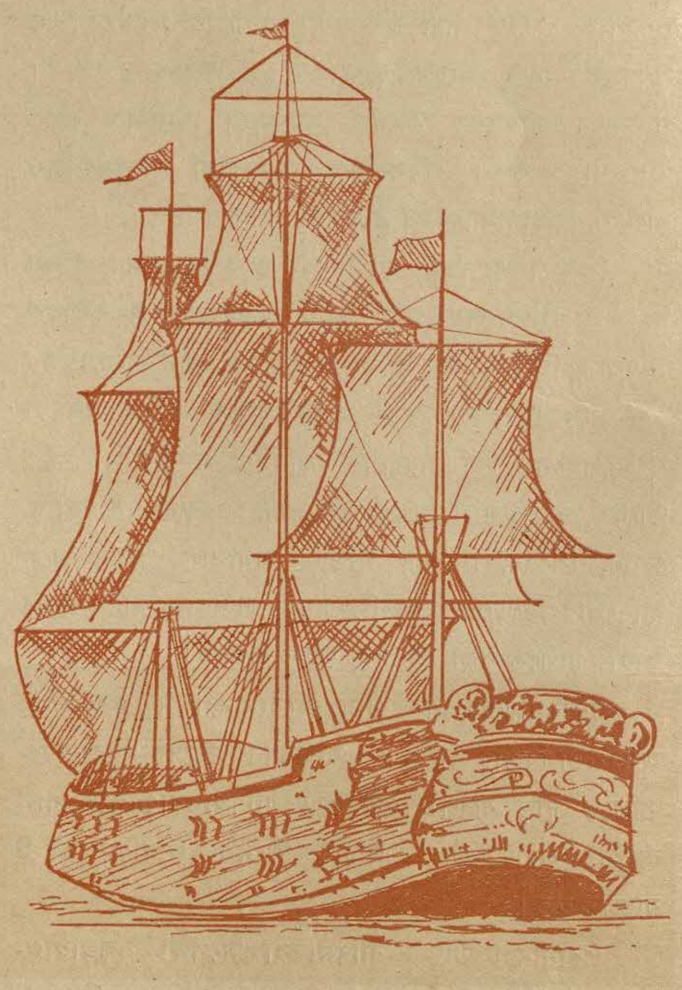
যত দিন যেতে লাগল, পাল ও মাস্তুলের সংখ্যা বাড়তে লাগল। জাহাজের কাঠামোটিকে আরও মজবুত করা হল। এই সমস্ত উন্নততর বৈশিষ্ট্য, চৌম্বক দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র এবং সংশোধিত মানচিত্র সমুদ্রযাত্রাকে আরও নিরাপদ করল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রায় একই ধরনের দুটি সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মিত হল—ক্যারাভেল এবং ক্যারাক। প্রথমটিতে ল্যাটিন নামে পরিচিত ত্রিকোণ পালগুলি জাহাজের

থাকত এবং কখনও কখনও সোজা হত। কাঠামোর বাইরের দিকের তক্তাগুলি পাশাপাশি শক্ত করে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লাগানো থাকত। কাঠামোটি সাধারণতঃ খোলা থাকত আবার কখনও কখনও আংশিক পাটাতন-বিশিষ্ট হত। কখনও কখনও এই কাঠামো বা পাটাতনের ওপর আচ্ছাদন দেওয়া হত। এই সব জাহাজে এক বা একাধিক পাল থাকত।

উত্তর ইউরোপের অধিবাসীরা তাঁদের নিজেদের পরিকল্পনানুযায়ী জাহাজ তৈরী করতেন। ভাইকিংরা ছিলেন সেখানকার সর্বাপেক্ষা নিপুণ নাবিক। তাঁদের জাহাজে একটি চৌকা পাল থাকত; কিন্তু জাহাজের দুপাশে একসারি করে স্থাপিত দাঁড়ের ওপরেই তাঁরা বেশী নির্ভর করতেন। এই সমস্ত জাহাজের সম্মুখ এবং পশ্চাদ্ভাগ মোটামুটি একই রকম দেখতে হত। ভাইকিংরা নাবিক হিসাবে অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও দুঃসাহসী ছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাঁরা সমুদ্রের ওপর নিজেদের একাধিপত্য বজায় রেখেছিলেন। জলপথে তাঁরা কন্স্ট্যান্টিনোপ্‌ল্ অবধি অভিযান চালিয়েছিলেন। তাঁরা আইসল্যাণ্ডে এবং গ্রীনল্যাণ্ডে একটি করে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। লেইফ এরিকসন নামে এঁদেরই একজন ১০০০ খৃষ্টাব্দে জলপথে উত্তর আমেরিকায় উপস্থিত হন।

সপ্তদশ শতাব্দীর একটি ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ 'রয়্যাল সভ্‌রিন'





'সাভানা'—বাষ্পের সাহায্যে প্রথম আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিল

সম্মুখ এবং পশ্চাদ্ভাগে দড়াদড়ি দিয়ে টাঙানো হত। ক্যারাকের পালগুলি প্রায়ই চৌকা হত। দু ধরনের জাহাজেই অনেকগুলি মাস্তুল এবং উঁচু সম্মুখভাগ ও অত্যুচ্চ পশ্চাদ্ভাগসমেত একটি ছোট, স্থূল খোল থাকত। এই ধরনের জাহাজেই ভাস্কো ডা গামা আফ্রিকা ঘুরে ১৪৯৮ সালে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছিলেন এবং ১৪৯২ সালে কলম্বাস আমেরিকায় গিয়ে উপস্থিত হন।

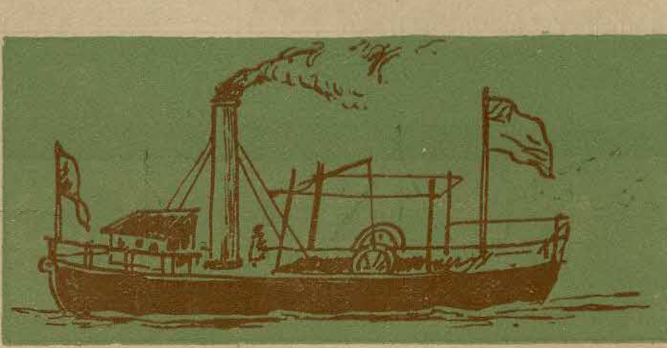
যোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপীয়দের কাছে—বিশেষতঃ পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ড—হাজার হাজার মাইল বিরামহীন সমুদ্রযাত্রায় সমর্থ নির্ভরযোগ্য সমুদ্রগামী জাহাজ ছিল। এর পরের তিন শতাব্দীব্যাপী সময়ে তাঁরা এই সমস্ত জাহাজে করে এই বিশাল পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় নতুন নতুন অঞ্চল আবিষ্কারের জন্যে পাড়ি জমিয়েছেন, বহু অঞ্চল আবিষ্কার করেছেন, জয় করেছেন এবং সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন।

এই দীর্ঘ সময়ে জাহাজ নির্মাণে বিশেষ কিছু উন্নতি সাধিত হয় নি। তার মূল নির্মাণ কৌশল একই ছিল। শুধু পালের সংখ্যা বেড়েছে এবং মাস্তুলের উচ্চতা ও কখনও কখনও তাদের সংখ্যাও বেড়েছে। জাহাজে অনেক কামরা স্থাপন করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চাকা-বিশিষ্ট হালের আরও উন্নতি সাধিত হয়। এই শতাব্দীতেই সেক্সট্যাণ্ট এবং ক্রনোমিটার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'প্যাকেট' নামে পাল-তোলা জাহাজগুলি নিয়মিতভাবে আটল্যান্টিক মহাসাগর পারাপারের সূচনা করে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 'ক্লিপার' জাহাজগুলি 'প্যাকেট' জাহাজগুলি অপেক্ষা আরও দ্রুত আটল্যান্টিক মহাসাগর পার হতে লাগল। ১৮৩০ সাল থেকে ১৮৬০ সাল অবধি সময়ে 'ক্লিপার' জাহাজগুলি সমুদ্রে একাধিপত্য বিস্তার করে। এই ধরনের জাহাজগুলি চীন, ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকার মধ্যে পণ্য, বিশেষতঃ চা, এবং যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পালতোলা জাহাজগুলি প্রধান সমুদ্রপথগুলি থেকে প্রায় অদৃশ্য হল। কিন্তু সেগুলি অতীতের ধ্বংসাবশেষে পরিণত হল না। প্রমোদভ্রমণে এবং দেশের অভ্যন্তরে নদীতে মাল বইবার কাজে সেগুলি আজও ব্যবহৃত হয়।

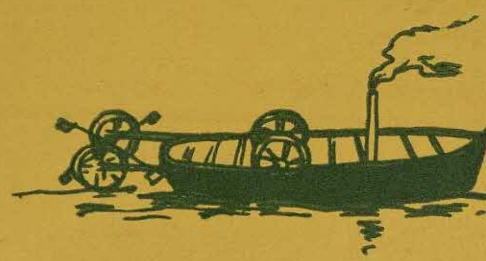
জন ফিচ নির্মিত বাষ্পীয় পোত

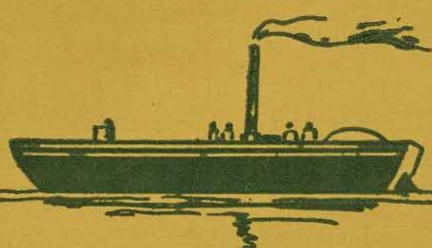


'ক্লেরমণ্ট'



জোনাথান হাল নির্মিত বাষ্পীয় পোত





সিমিংটন নির্মিত 'শার্লোট ডাণ্ডাস'

বাষ্পীয় পোত

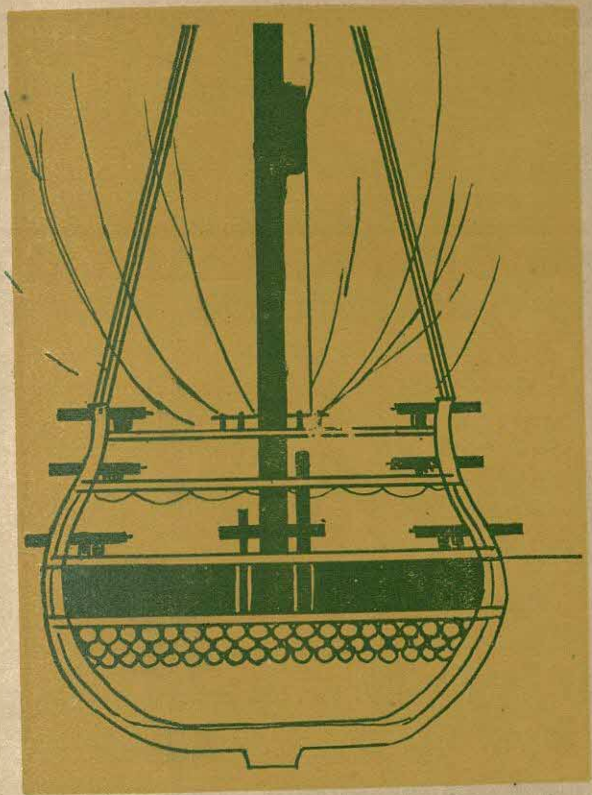
বাষ্পীয় পোত প্রথম কে সাফল্যের সঙ্গে চালিয়েছিলেন, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ১৭৩৬ সালে ইংল্যাণ্ডের জোনাথান হাল বাষ্প দিয়ে চালিত একটি নৌকার কৃতিসত্ব লাভ করেন। ১৭৮৩ সালে মার্কুইস ক্লড দ্য জাউফ্রয় দ্য' অ্যাবান্স্ ফ্রান্সের সেয়ঁা নদীতে আরও উন্নত ধরনের একটি বাষ্পচালিত নৌকা চালিয়েছিলেন। জোনাথান হালের পঞ্চাশ বছর পরে জেমস রামসে পোটোম্যাক নদীতে একটি বাষ্পচালিত নৌকা চালান; তার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় চার মাইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে কনেক্টিকাটের জন ফিচ একটি উন্নত ধরনের বাষ্পীয় পোত আবিষ্কারের জন্যে বিশেষ চেষ্টা করেন। বেশ কয়েক বৎসর পরিশ্রম ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৭৯০ সালে ডেলাওয়্যার নদীতে তিনি একটি বাষ্পীয় পোত চালান। ওই বাষ্পীয় পোতের দাঁড়গুলি বাষ্পের শক্তি দ্বারা চালিত হত এবং তার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় সাত মাইল।

১৮০১ সালে লর্ড ডাণ্ডাসের অর্থানুকূল্যে উইলিয়াম সিমিংটন 'শার্লোট ডাণ্ডাস' নামে একটি বিরাট বাষ্পীয় পোত নির্মাণ করেন। ১৮০২ সালে 'শার্লোট ডাণ্ডাসে'র পরীক্ষামূলক চালনা যাঁরা দেখেন, তাঁদের মধ্যে মার্কিন চিত্রকর এবং আবিষ্কারক রবার্ট ফুলটন ছিলেন অন্যতম।

ফ্রান্সে নিযুক্ত মার্কিন মন্ত্রী রবার্ট লিভিংস্টোনের সক্রিয় সাহায্যে ফুলটন ইংল্যাণ্ডের বুলটন ও ওয়াট কোম্পানীকে একটি ইঞ্জিন সরবরাহের নির্দেশ দেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে দুপাশে দুটি প্যাডেল হুইল সমন্বিত একটি ষ্টীমার নির্মাণ শুরু করেন। ১৮০৭ সালে 'ক্লেরমণ্ট' নামে সেই নৌকাটি হাডসন নদীর ওপর নিউইয়র্ক থেকে অ্যালবেনী পর্যন্ত পথ বত্রিশ ঘণ্টায় অতিক্রম করে। এরপর সাত বৎসর যাত্রীবাহী নৌকা হিসাবে 'ক্লেরমণ্ট' ওই পথে যাতায়াত করে।

সে আমলের কয়েকটি বাষ্পীয় পোত





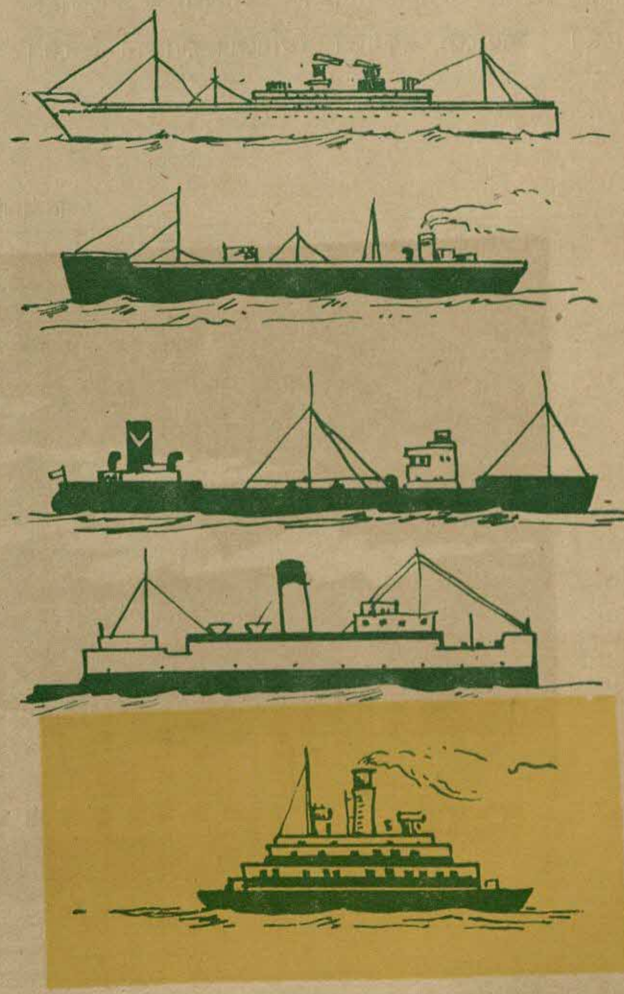
নৌকার অভ্যন্তরভাগের নক্সা

১৮৩৩ সালে কানাডার জাহাজ 'রয়্যাল উইলিয়াম' প্রথম আগাগোড়া বাষ্পের সাহায্যে আটল্যান্টিক পাড়ি দেয়।

এরপর বাষ্পীয় পোতের ক্রমোন্নতি হতে থাকে। শীঘ্রই কাঠের পরিবর্তে জাহাজ নির্মাণে লোহার ব্যবহার চালু হল। তারও পরে ইস্পাত ব্যবহার করা শুরু হল।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের পর ক্রমে ক্রমে উন্নত ধরনের স্ক্রু প্রপেলার, বয়লার, জ্বালানির জন্যে কয়লার পরিবর্তে তেলের ব্যবহার, ডিজেল ইঞ্জিনের আবিষ্কার, স্টীম টারবাইন এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাষ্পীয় পোতের প্রভূত উন্নতি করে।

বাষ্পচালিত জাহাজ ও স্টীমার



১৮১৯ সালের ২৪শে মে মার্কিন জাহাজ 'সাভানা' ক্যাপ্টেন মোসেস রজার্সের পরিচালনায় জর্জিয়ার সাভানা শহর থেকে ইংল্যাণ্ডের লিভারপুল পর্যন্ত পাড়ি দেবার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। এই যাত্রাটিকেই বাষ্পীয় পোতে প্রথম আটল্যান্টিক মহাসাগর অতিক্রম বলে অভিহিত করা হয়। আটল্যান্টিক অতিক্রম করতে 'সাভানা'র সময় লেগেছিল উনত্রিশ দিন; বস্তুতঃ তার মধ্যে মাত্র আশী ঘণ্টা মত সময় তাকে বাষ্পের সাহায্যে চালান হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেরবার সময় 'সাভানা' আগাগোড়াই পালের সাহায্যে আটল্যান্টিক পাড়ি দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এলে তার বাষ্পচালিত ইঞ্জিনটি খুলে নেওয়া হয়।

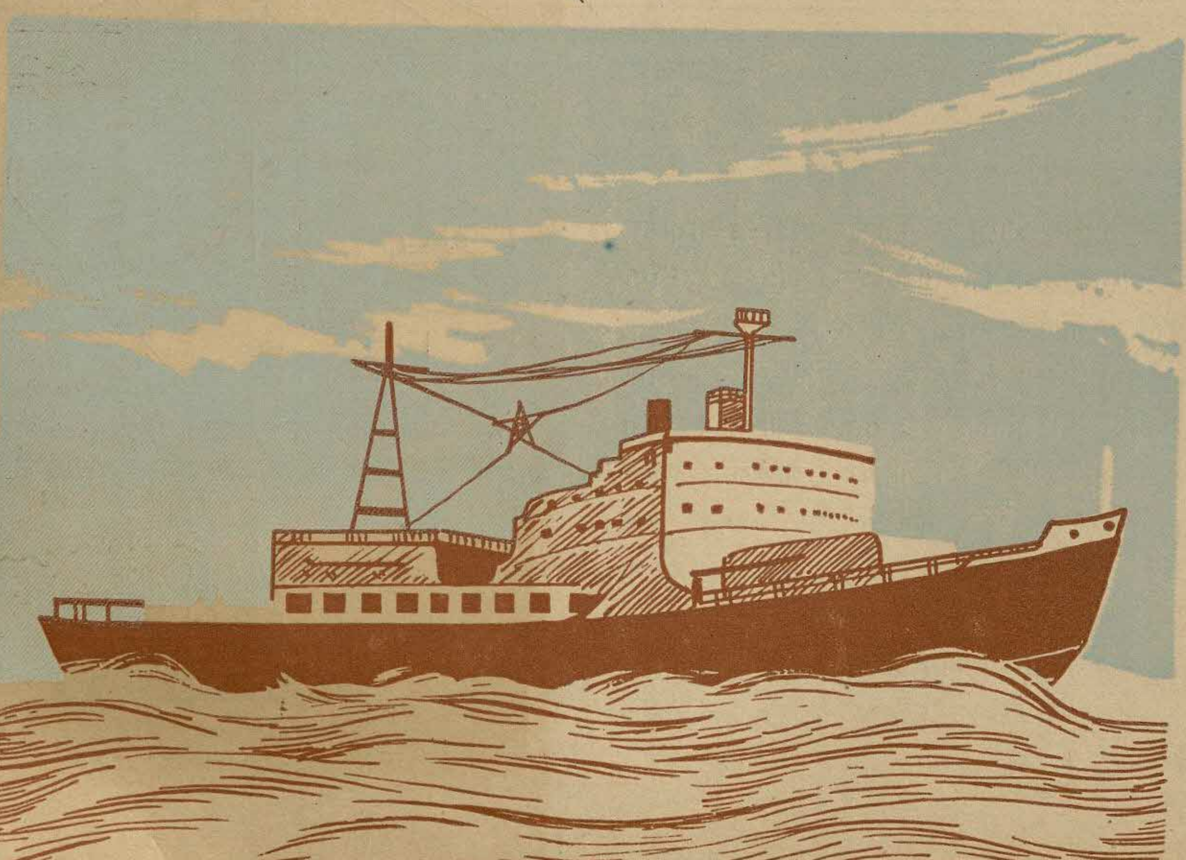
আধুনিক বাষ্পীয় পোত

একটি আধুনিক সমুদ্রগামী জাহাজ খুব আরামদায়ক এবং এর সুবন্দোবস্তের ফলে একে অনেকটা ভাসমান শহরের মত মনে হয়। জাহাজের সুসজ্জিত খাবার ঘরে একজন যাত্রী তীরের ওপর একটি ভাল হোটেলে যে সব খাবার পেতে পারতেন তার প্রায় সবই পাবেন। যাত্রীরা জাহাজ থেকেই তাঁদের বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজনদের চিঠি লিখতে পারেন। ঠিক সময়েই তা তাঁদের হাতে পৌঁছবে; সে বন্দোবস্ত আছে। জাহাজের মধ্যে লাইব্রেরী আছে এবং যাত্রীরা সেখানে নানারকম বই ও পত্রপত্রিকা পড়তে পারেন। জাহাজের মধ্যেই দৈনিক সংবাদপত্র ছাপাবার ও তা যাত্রীদের মধ্যে বিলি করবার বন্দোবস্ত আছে। জাহাজের মধ্যে সাঁতার দেবার সুন্দর জায়গা আছে, আবার টেনিস ইত্যাদি নানারকম খেলাধূলারও সুবন্দোবস্ত আছে। জাহাজে রকমারী জিনিসের দোকান আছে। যাত্রীরা সেখান থেকে তাঁদের প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত জিনিসই কিনতে পারেন। নাপিতের দোকান, রেষ্টুরেন্ট, ফুলের দোকান, মিষ্টির দোকান এ সবই জাহাজের মধ্যে আছে। প্রত্যেক সন্ধ্যায় নাচের ঘরে জলসা হয়।

কুইন এলিজাবেথ

১৯৪০ সালে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় যাত্রীবাহী জাহাজ 'কুইন এলিজাবেথ' তার সমুদ্রযাত্রা শুরু করে। এই জাহাজটির দৈর্ঘ্য ১,০৩০ ফুট, প্রস্থ ১১৮ ফুট এবং মোট টন ৮৩,০০০। ২,৩০০ যাত্রী বহনে এ সক্ষম। এর গতিবেগ ঘণ্টায় ৩২ নট (এক নট হচ্ছে ঘণ্টায় এক সামুদ্রিক মাইলের—৬,০৮০.২০ ফুট—গতিবেগের সমান)। ৭২৪ ফুট লম্বা 'কুইন এলিজাবেথে'র প্রায় সমগ্র ডেকটি কাচে ঢাকা। জাহাজের তলা থেকে সর্বোচ্চ মাস্তুল অবধি এর উচ্চতা ২৩৪ ফুট।

একটি আধুনিক জাহাজ





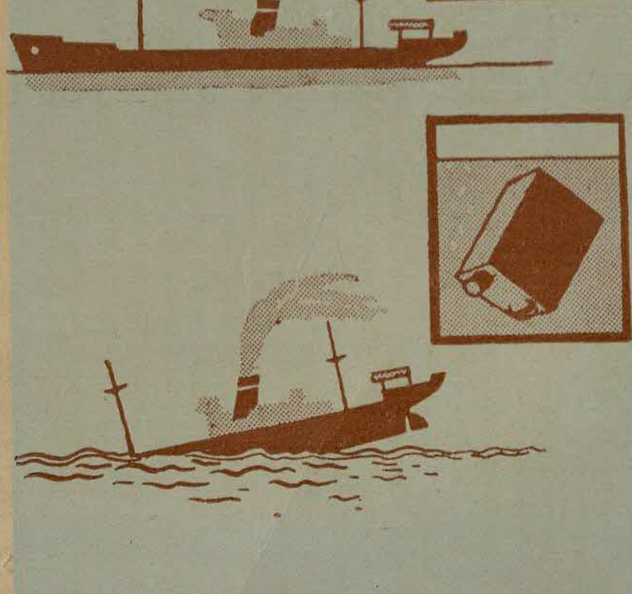
বস্তু কেন জলে ভাসে

এক টুকরো শুকনো কাঠ জলে ফেলে দিলে সেখানা ভাসে। আবার এক টুকরো লোহা কিন্তু ভাসে না। এর কারণ কি ?

জলের চেয়ে শুকনো কাঠের ঘনত্ব কম, তাই তা জলে ভাসে। আবার লোহার ঘনত্ব জলের চেয়ে বেশি, তাই লোহা জলে ডোবে। তবে কোন জিনিস যখন জলে ভাসে তখন তার খানিকটা অংশ জলের ভিতরে থাকে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, যে অংশটি জলের নিচে আছে সেই আয়তনের সমান জলের যা ওজন তা আসলে জিনিসটির পুরো ওজনের সমান। ধরা যাক, একখানা জাহাজের ওজন দু হাজার টন। এ জাহাজখানা জলে ভাসালে জাহাজের তলার দিকটার বেশ খানিকটা জলে ডুববে। কাজে-কাজেই যে অংশটা জলের ভিতরে রয়েছে তার আয়তন যা হবে সেই আয়তনের জলের ওজন দু হাজার টন হতেই হবে।

আর্কিমিডিসের গল্পটি আমরা সবাই জানি। আর্কিমিডিসের যে সূত্রটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় তা হল এই—কোন জিনিস পুরোপুরি বা আংশিকভাবে কোন স্থির তরল পদার্থের ভিতর ডোবালে মনে হবে যে, জিনিসটি যেন তার খানিকটা ওজন হারিয়েছে। আর এই হারানো ওজন হবে জিনিসটি জলে ডোবানোর জন্যে যতটা জল সরে গেছে সেই পরিমাণ জলের ওজনের সমান।

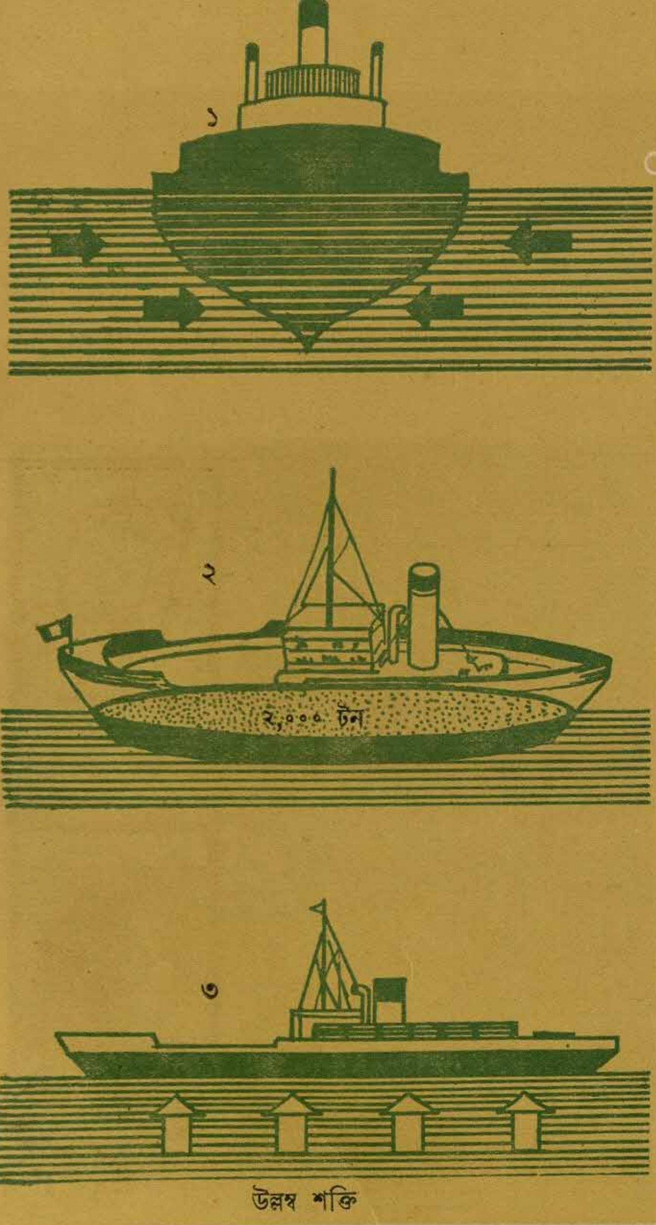
হাওয়া ভর্তি একটি টিনের পাত্র জলে ভাসে, কিন্তু পাত্রটিকে জল দিয়ে ভর্তি করলে সেটি ডুবে যাবে। তেমনই সাধারণ অবস্থায় জাহাজ জলে ভাসে, কিন্তু কোনক্রমে তাতে যদি জল ঢুকতে শুরু করে, তবে সেটি ডুবে যাবে।



১। অনুভূমিক শক্তি যা জাহাজের দুপাশে ঠেলা দেয়, বিলুপ্ত হয়।

২। যে জাহাজের ওজন ২,০০০ টন তা যে পরিমাণ জল সরায়তার ওজনও ২,০০০ টন।

৩। উল্লম্ব শক্তি যখন ভারসাম্য রাখে তখন জাহাজ ভাসে।



উল্লম্ব শক্তি

প্রতিটি জিনিসকে পৃথিবী টানে, আর এইজন্যেই দেখি যে প্রতি জিনিসের ওজন আছে। কাজেই কোন জিনিস জলে ডুবোলে তা জলের উপরে একটা চাপ দেবে, জলও আবার জিনিসটির উপর একটা চাপ দিতে থাকবে, অর্থাৎ জিনিসটির ওজন আর জলের চাপ একই সঙ্গে কাজ করবে যখন কোন জিনিস জলে ডোবানো হবে। এখন, যদি জিনিসটির ওজন বেশি হয় তবে জিনিসটি জলে ডুববে ; আর যদি জলের চাপ বেশি হয় তবে জিনিসটি জলে ভাসবে।

জাহাজ কেন জলে ভাসে

এক টুকরো লোহা জলে ডুবে যায়, কিন্তু লোহার তৈরী জাহাজ তার বিরাট আকৃতি নিয়ে ভাসে। এর কারণ কি?

লোহার টুকরোকে যদি এমন একটা আকার দেওয়া যায়, যাতে টুকরোটি যে পরিমাণ জল অপসারিত করবে তার ওজন টুকরোটির ওজনের চেয়ে বেশী—তা হলেই টুকরোটি জলে ভাসবে। আমরা জানি, লোহার কড়াই জলে ভাসে।

জাহাজ জলে ভাসার কারণ একই। জাহাজের তলা কড়াইয়ের মত এমন বাঁকানো যে তলা দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ জল অপসারিত করতে পারে। ফলে জাহাজ জলে ভাসতে পারে।

নদীর জলের ঘনত্ব সমুদ্রের লবণাক্ত জলের ঘনত্বের চাইতে কম। কাজেই নদীর জলের প্লবতা সমুদ্র জলের প্লবতা অপেক্ষা কম। সেইজন্য কোন জাহাজ সমুদ্র থেকে নদীতে প্রবেশ করলে জাহাজের বেশী অংশ জলে নিমজ্জিত হয়।

জল থেকে ভারী কোন দ্রব্যকে জলে ভাসিয়ে রাখবার আর একটি উপায় আছে—উপযুক্ত সাইজের হাল্কা দ্রব্য তার সঙ্গে যুক্ত করা। এতে বেশী পরিমাণ জল অপসারিত হবে এবং বেশী উর্ধ ঘাত প্রযুক্ত হবে কিন্তু বস্তুর ওজন খুব বেশী বাড়বে না। জীবন-রক্ষী বা বয়া এই নীতিতে কাজ করে। হাল্কা বায়ুপূর্ণ থলি দিয়ে জীবন-রক্ষী নির্মাণ করা হয় এবং তার সাহায্যে মানুষ অনায়াসে জলে ভেসে থাকতে পারে।

জাহাজের ইঞ্জিন

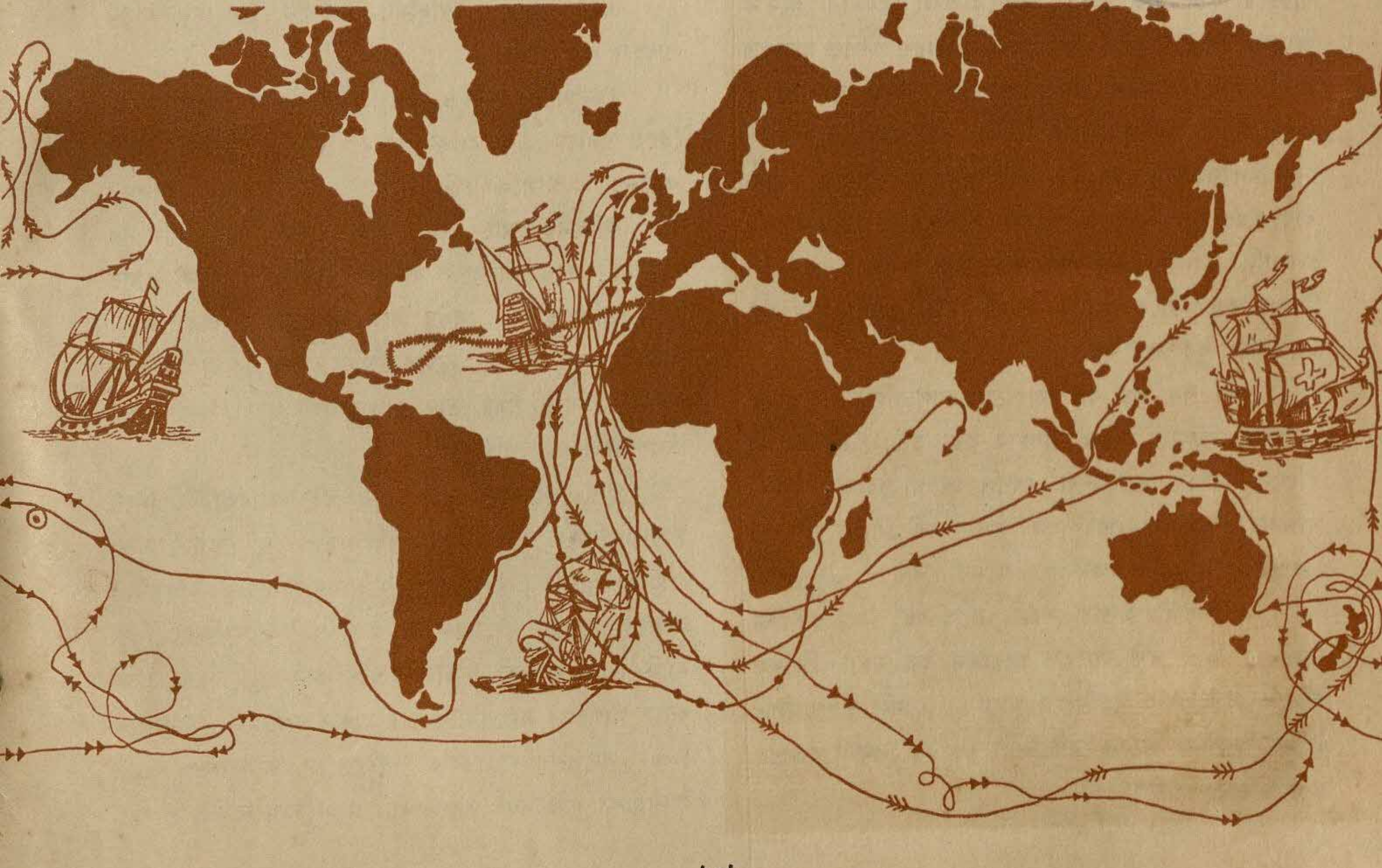
বাষ্পচালিত ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে সে সম্বন্ধে আমরা ৩৭-৪৩ পাতায় বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

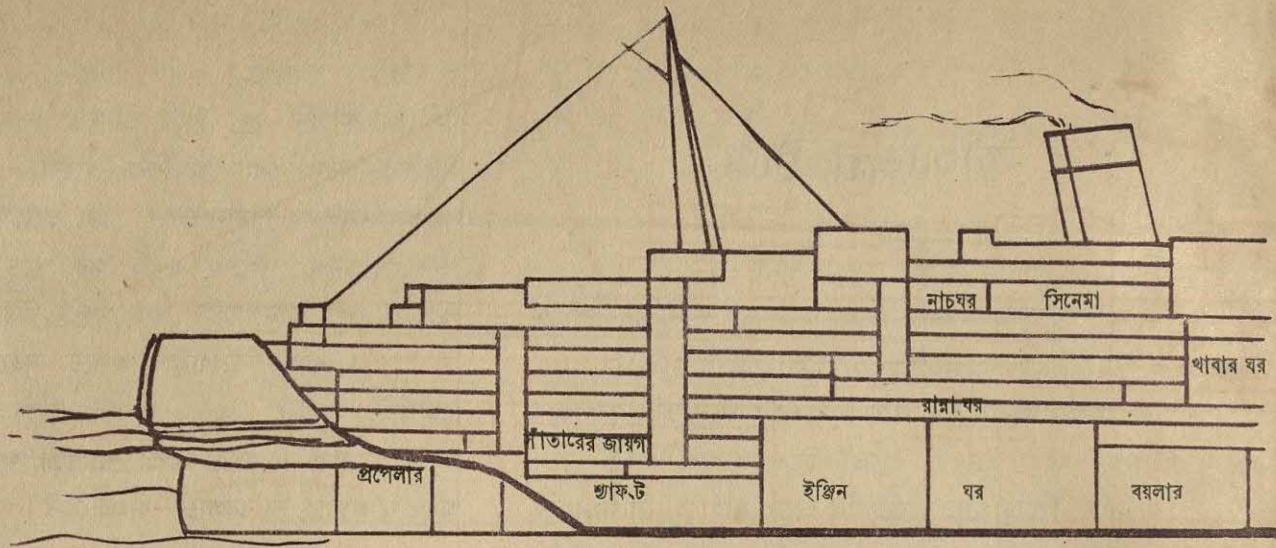
প্রথম আমলের বাষ্পীয় পোতের ইঞ্জিনে ছুটি সিলিণ্ডার থাকত এবং তাদের প্রত্যেকটিতে থাকত একটি করে পিস্টন। পিস্টনগুলি কানেকটিং রডের সাহায্যে সিলিণ্ডারের সমকোণে অবস্থিত ক্র্যাংক শ্যাফ্‌টের সঙ্গে যুক্ত থাকত। পিস্টন ছুটির অগ্র-পশ্চাৎ গতিকে ক্র্যাংক শ্যাফ্‌টে চক্রাকার গতিতে পরিবর্তিত করে তার সাহায্যে স্ক্রু প্রপেলার ঘোরানো হত। ১৮৫৪ সালে ইংল্যাণ্ডের জন এলডার এই ধরনের ইঞ্জিন প্রথম জাহাজে স্থাপন করেন।

১৮৩৪ সালে আর এক ধরনের ইঞ্জিন জাহাজে ব্যবহার করা শুরু হয়। এতে ইঞ্জিনের এগ্‌জস্ট্‌ বাষ্পকে লবণাক্ত সমুদ্রের জল দিয়ে ঘনীভূত করা হত। তারপর আংশিক গরম এবং আংশিক লবণাক্ত জল পাম্পের সাহায্যে বয়লারে পাঠান হত। এর ফলে অবশ্য বয়লারের ভিতরে ক্রমশঃ লবণের একটি স্তর পড়ে যেত। এই লবণাক্ত জল অনেকগুলি ছোট ছোট টিউবের মধ্যে দিয়ে যেত এবং এই টিউবগুলির ওপরে বাইরে দিয়ে যেত এগ্‌জস্ট্‌ বাষ্প। এই এগ্‌জস্ট্‌ বাষ্প ঘনীভূত হবার সময়ে লবণাক্ত সমুদ্রের জলের সংস্পর্শে আসত না; তরল অবস্থায় আবার তা বয়লারে ফেরত যেত।

কয়েকজন আবিষ্কারকের যাত্রাপথ

কলম্বাস ১৪৯২-৯৩
ভাস্কো ডা গামা ১৪৯৭-৯৯
কুকের প্রথম অভিযান ১৭৬৮-৭১
কুকের দ্বিতীয় অভিযান ১৭৭২-৭৫
কুকের তৃতীয় অভিযান ১৭৭৬-৭৯





একটি আধুনিক জাহাজের নক্সা

বলা বাহুল্য, ক্রমে ক্রমে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতা বাড়ানো হল। আরও উন্নত ধরনের বয়লার স্থাপন করে আরও বেশী চাপ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল।

এর পর জ্বালানি হিসাবে কয়লার পরিবর্তে তেল ব্যবহার করা শুরু হল। গুদামে তেল কয়লার অর্ধেক জায়গা জুড়ে থাকে, ফলে সেখানে আরও অন্যান্য মালপত্র রাখা যায়। তেল কয়লা অপেক্ষা সহজে স্থানান্তরিত করা যায়। গুদাম থেকে কয়লা এনে বয়লারে ঢালতে বেশ কয়েকজন লোকের প্রয়োজন। তাছাড়া, তেল ব্যবহারের ফলে জাহাজ আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। জ্বালানি হিসাবে তেল ব্যবহার করলে ফার্নেসে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাকে আরও সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং এতে তাপ খুব অল্পই নষ্ট হয়।

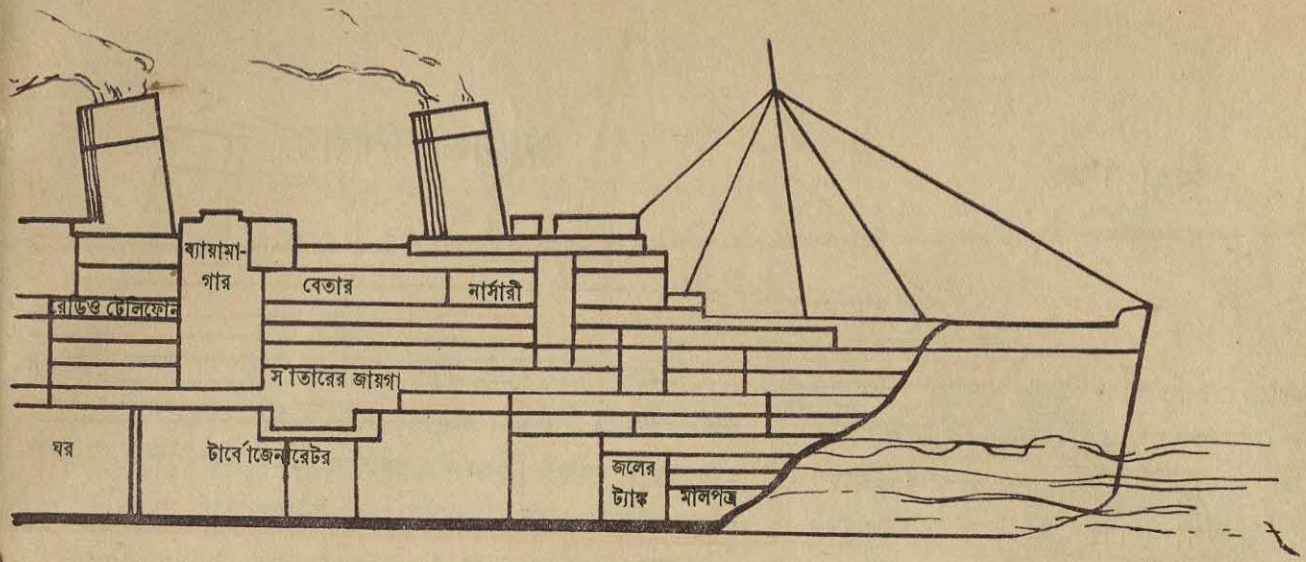
এখন বহু বড় বড় জাহাজে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের পরিবর্তে ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের ইঞ্জিনে বয়লার নেই বলে এগুলি জায়গা খুব কম নেয়—মালবাহী জাহাজগুলির পক্ষে এটি একটি বিরাট সুবিধা। ডিজেল ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতাও অনেক বেশী। এর গড়ন এবং কার্যপ্রণালী অত্যন্ত সরল, ফলে এই ধরনের ইঞ্জিন চালাবার জন্যে বেশী লোকের প্রয়োজন হয় না। ডিজেল ইঞ্জিনের কতকগুলি অসুবিধাও আছে। এগুলি বাষ্পচালিত ইঞ্জিন অপেক্ষা অনেক বেশী ভারী এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের খরচও অনেক বেশী।

স্টীম টারবাইন ইঞ্জিন

এখন অনেক আধুনিক জাহাজে টারবাইন ইঞ্জিন ব্যবহার করা হচ্ছে।

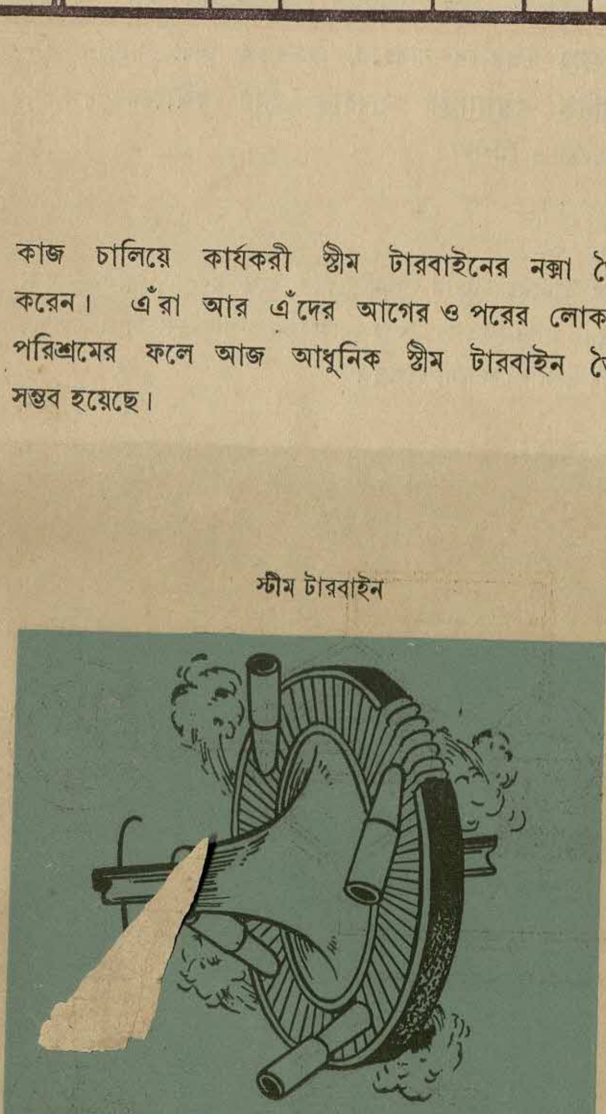
দু'হাজার বছরেরও আগে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় হিরো নামে এক ব্যক্তি প্রথম স্টীম টারবাইন তৈরী করেন। আসলে এটি ছিল একটি ঘূর্ণমান ইঞ্জিন। স্টীম ইঞ্জিনের মত এর কোন পিস্টন আর সিলিণ্ডার ছিল না; তার পরিবর্তে বয়লার থেকে স্টীম একটি বলের মধ্যে ভর্তি হত। সেটির সঙ্গে লাগান ছিল এক জোড়া বাঁকান নল। এই নলের ভিতর দিয়ে বাষ্প সবেগে বেরিয়ে যাবার সময় তার ধাক্কায় দুটি খাড়া করা দণ্ডের ওপর রাখা এই বলটি ঘুরত।

প্রায় দুহাজার বছর ধরে এই আবিষ্কারটি নিয়ে মানুষ কিছুই করেনি। এই যন্ত্র দিয়ে কোন্ কাজ করানো যেতে পারে তা মানুষের ধারণায় আসেনি। তারপর কয়েক শ' বছর আগে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই যন্ত্রটি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। কিন্তু একে কাজে লাগাবার সমস্যাটা তাঁদের মাথায় আসেনি। অবশেষে ১৮৯০ সালের কাছাকাছি সুইডেনের দ্য লাভেল্ এবং ইংল্যাণ্ডের পারসন্স পরস্পরের অজ্ঞাতেই বিভিন্ন রাস্তায়



কাজ চালিয়ে কার্যকরী স্টীম টারবাইনের নক্সা তৈরী করেন। এঁরা আর এঁদের আগের ও পরের লোকদের পরিশ্রমের ফলে আজ আধুনিক স্টীম টারবাইন তৈরী সম্ভব হয়েছে।

স্টীম টারবাইন



স্টীম টারবাইন ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী

এই ব্যবস্থায় রোটরটি (যে চাকাটি ঘোরে) একটি ডাণ্ডার (শ্যাফ্‌ট) গায়ে লাগান থাকে। এর বাইরের চারিদিকে অনেকগুলি ছোট ছোট বাঁকান পাত (ব্লেড) লাগান আছে। ছোট নলের ভিতর দিয়ে বাষ্পের ফোয়ারা এই ব্লেডগুলির গায়ে এসে লাগে ফলে রোটরটি খুব জোরে ঘুরতে থাকে। রোটর শ্যাফ্‌ট থেকে এই ঘোরবার বেগ গিয়ারের সাহায্যে অন্য যন্ত্র বা বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী যন্ত্র চালাবার কাজে লাগান যায়।

আধুনিক টারবাইন রোটরে সাধারণতঃ একটির বদলে এক সারি ব্লেড লাগানো চাকা থাকে। সবগুলিই একটি মাত্র শ্যাফ্‌টের গায়ে বসান। এক জোড়া রোটরের মধ্যে এমন একটি করে চাকা থাকে যার ব্লেডগুলি উল্টোদিকে বাঁকানো। এই চাকাগুলি ঘোরে না (স্টেশনারী রিং)। প্রথম চাকার মধ্যে বাষ্প ঢুকে রোটরটি একটু ঘুরিয়ে দেবার পর বাষ্পের গতিপথ উল্টে যায়। তখন সেটি স্থানু-রিং এর মধ্যে ঢুকলে এর গতি আবার উল্টে গিয়ে তার অন্য পাশের চাকার ব্লেডে আঘাত করে সেটিকে ঘুরিয়ে দেয়। এই ভাবে আঁকাবাঁকা পথে বাষ্প ঢুকে একবার রোটর ব্লেডকে ঘুরিয়ে দিয়ে নিজের পথ বদলায় আবার স্থানু-রিংএ ধাক্কা খেয়ে ফের পথ বদলিয়ে পরের রোটর ব্লেডে ধাক্কা দেয়। এই ভাবে চালানোর ফলে বাষ্পের শক্তিটি পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগানো হয়।

বিদ্যুৎশক্তি

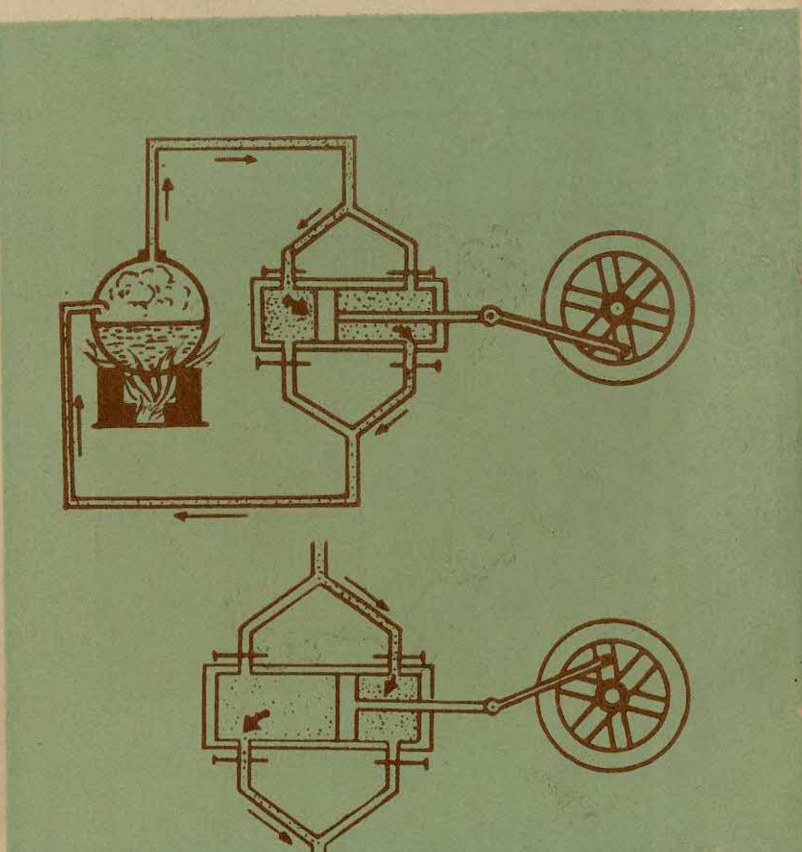
এই ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে প্রপেলার শ্যাফ্‌টটিকে ঘোরান হয়। একটি বৈদ্যুতিক জেনারেটর মোটরটির জন্যে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করে। এই জেনারেটরটি উপরে বর্ণিত যে কোন এক ধরনের ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হয়। এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে যে, এতে প্রপেলারের গতিকে সুনিয়ন্ত্রণ করা যায়। যে ইঞ্জিনটি জেনারেটরকে চালাচ্ছে সেটি সর্বদাই একই গতিতে চলতে পারে; কিন্তু প্রপেলার শ্যাফ্‌টের গতিকে সুইচবোর্ডের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই সুইচবোর্ড থেকেই সঠিক পরিমাণ বিদ্যুৎপ্রবাহ তারের মধ্যে দিয়ে বৈদ্যুতিক মোটরে পৌঁছয়।

সুতরাং জাহাজনির্মাতাকে স্থির করতে হয় কোন বিশেষ ধরনের ইঞ্জিন কোন বিশেষ জাহাজে স্থাপন করা হবে। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে জাহাজনির্মাতাকে নানা বিষয় বিবেচনা করতে হয়। ইঞ্জিনটির কত অশ্বশক্তি থাকা প্রয়োজন তার জন্যে জাহাজনির্মাতাকে জাহাজের ওজন ও গঠনের বিষয় বিবেচনা করতে হয়। জাহাজটি নির্মিত হওয়ার পর কত দূর অবধি তাকে পাড়ি দিতে হবে এবং একবার জ্বালানি নিয়ে কতদূর গেলে তবে সে আবার কোন বন্দরে জ্বালানি সংগ্রহ করতে পারবে ও এই সমস্ত সময় যাতে তার জ্বালানির প্রয়োজন না হয় এই সব বিষয়েও জাহাজনির্মাতাকে বিবেচনা করে তবে সেই ধরনের শক্তিশালী ইঞ্জিন জাহাজে স্থাপন করতে হয়। জাহাজটি কি ধরনের মাল বইবে, ইঞ্জিন এবং জ্বালানি রাখবার জন্যে জাহাজে কতটা জায়গা দেওয়া যাবে, জাহাজটি শুধুই যাত্রীবাহী হবে কিনা, জাহাজটির সর্বোচ্চ গতি কত করতে হবে এ সমস্ত এবং অন্যান্য আরও অনেক বিষয় বিবেচনা করে তবে জাহাজনির্মাতা কোন ধরনের ইঞ্জিন জাহাজে স্থাপন করা হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন।

জাহাজ নির্মাণ

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন জাহাজের আকার ও গঠনের উন্নতি হয়েছে, তেমন জাহাজ নির্মাণ কৌশলেরও উন্নতি হয়েছে। প্রতিটি আধুনিক জাহাজ নির্মাণের পিছনে রয়েছে নতুন নতুন মালমসলা ও কৌশল এবং পুরনো কৌশলের উন্নততর ব্যবহার, উন্নততর এবং আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার আর কর্মীদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য।

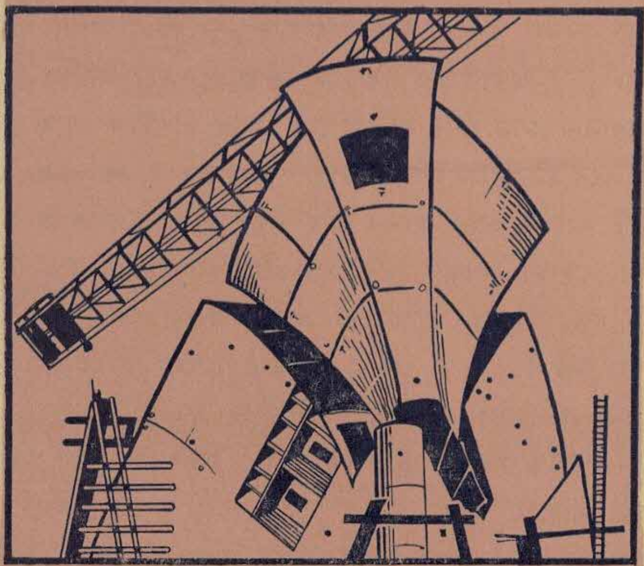
বাষ্পীয় ইঞ্জিনের প্রধান তিনটি অংশ হচ্ছে বয়লার, সিলিণ্ডার এবং পিস্টন। বাষ্প কিভাবে উৎপন্ন হয়ে ইঞ্জিন চালায় এবং চাকা ঘোরায় তা এই ছবিতে দেখানো হয়েছে।



প্রথমে জাহাজের ভাবী মালিক জাহাজনির্মাতাকে নির্দেশ দেন তিনি কি ধরনের জাহাজ কিনতে চান এবং কি উদ্দেশ্যে সেটি ব্যবহৃত হবে—জাহাজটি যাত্রীবাহী হবে কিংবা মালবাহী হবে অথবা তৈলবাহী হবে কিংবা যুদ্ধজাহাজ হবে কি অন্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে।

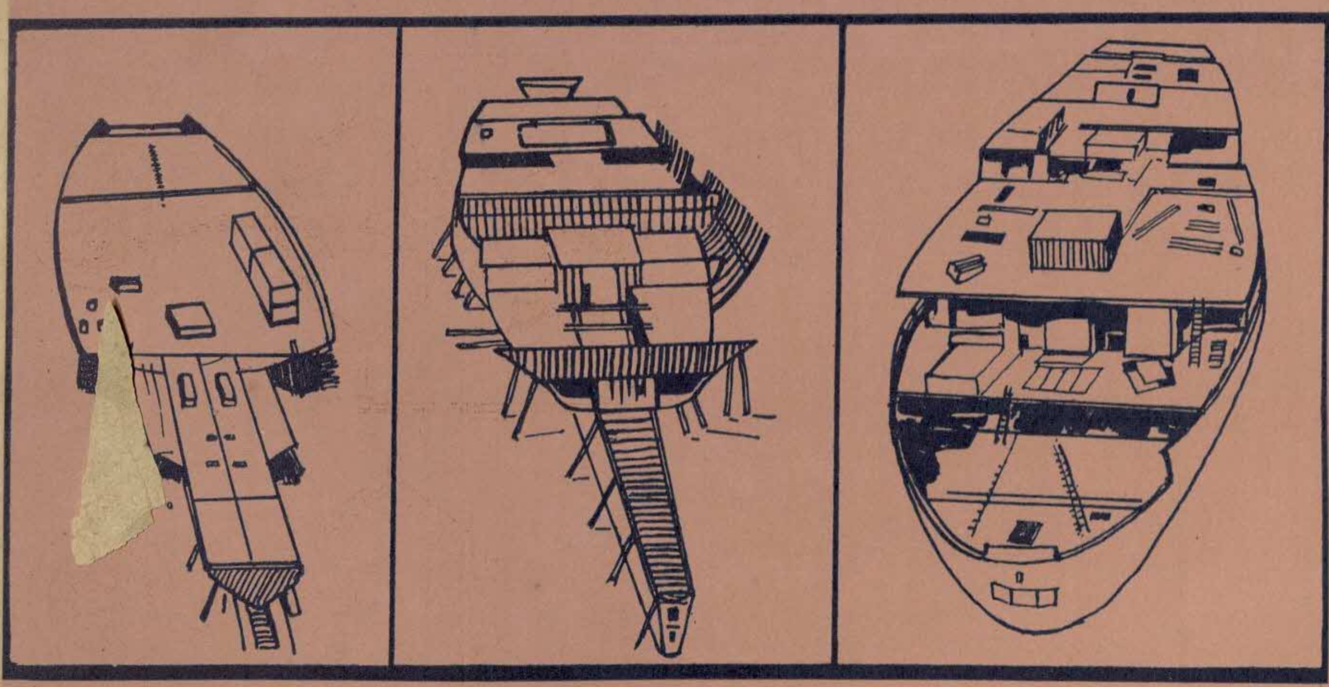
সেই অনুসারে জাহাজের একটি প্রাথমিক নক্সা তৈরী করা হয়। জাহাজের মালিক সেটি অনুমোদন করলে তখন সমগ্র জাহাজের সমস্ত খুঁটিনাটি দেখিয়ে প্রায় এক হাজারেরও বেশী নক্সা তৈরী করা হয়। কিভাবে কাজ এগোবে তার পরিকল্পনা করা হয়। জাহাজটি নির্মাণের জন্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদান সরবরাহ করবার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন সরবরাহকারীদের নির্দেশ পাঠানো হয়। একটি বার্থ বা নঙ্গরস্থান তৈরী করা হয়। তারপর জাহাজ নির্মাণ শুরু করা হয়।

আজকাল জাহাজ নির্মাণে ব্যবহৃত ইস্পাতের পাত-গুলিকে পেরেক দিয়ে জোড়া না দিয়ে ওয়েল্ডিং করে অর্থাৎ চাপ দিয়ে জোড়া দেওয়া হয়। আগে ইস্পাতের



জোড়া দেওয়া জাহাজের একটি বিশেষ অংশ কারখানা থেকে এনে ক্রেনের সাহায্যে সঠিক স্থানে স্থাপন করা হচ্ছে

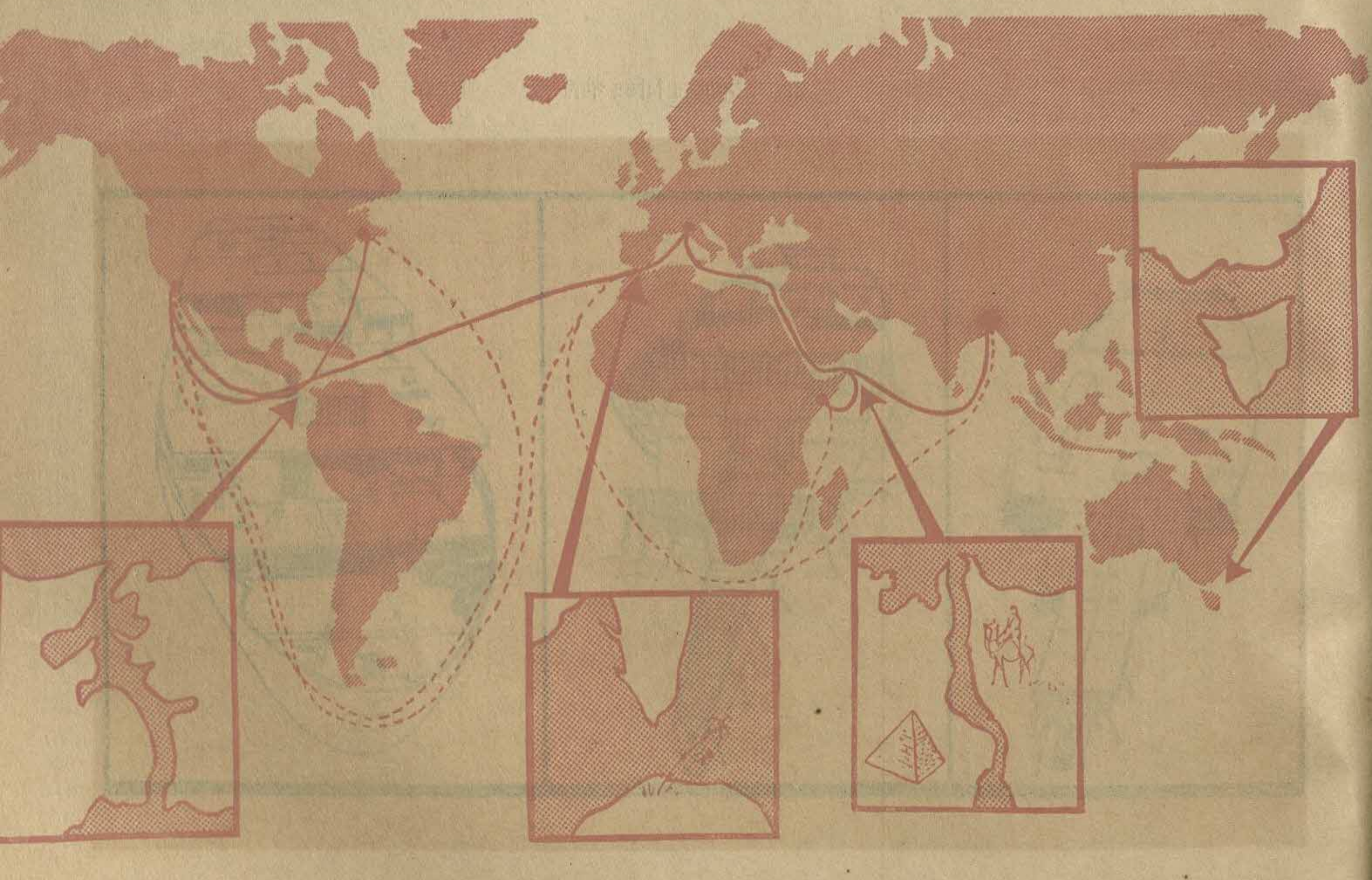
জাহাজ নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়



প্রত্যেকটি পাত বার্থে বয়ে এনে সঠিকস্থানে, অনেকসময় মাটি থেকে অনেক ওপরে, স্থাপন করে তারপর জোড়া লাগান হতো। আজকাল এক একটি বিভিন্ন অংশকে দূরে অবস্থিত কারখানায় জোড়া দিয়ে তারপর সেই সমগ্র অংশটিকে বার্থে বয়ে এনে সঠিকস্থানে বসিয়ে জোড়া দেওয়া হয়। এই এক একটি অংশের ওজন অনেক সময় চল্লিশ টনের কাছাকাছি হয়। জোড়া দেওয়ার এই কাজগুলি কারখানার মধ্যে হয় বলে খারাপ আবহাওয়া কাজের অগ্রগতিতে কোন বাধার সৃষ্টি করে না। জোড়া দেওয়ার কাজের অধিকাংশ অংশই শ্রমিকদের হস্তচালিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে করতে হয়। কিন্তু কিছু কিছু অংশ জোড়া দিতে স্বয়ংচালিত যন্ত্রের সাহায্য পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকটি ইস্পাতের পাতই প্রথমে মাপমত কেটে নেওয়া হয়।

যাই হোক, বার্থে সমস্ত প্রয়োজনীয় কাঠামোটি সঠিকভাবে নির্মিত হয়ে গেলে জাহাজের তলাটি প্রথমে ইস্পাতের পাত জোড়া দিয়ে দিয়ে নির্মাণ করা হয়। তারপর জাহাজের অন্যান্য অংশ, সামনে এবং পিছনের বাঁকানো অংশ ইত্যাদি নির্মাণের জন্যে ইস্পাতের পাতগুলিকে প্রয়োজনীয় আকারে কেটে নিয়ে জোড়া দেওয়া হয়। তারপর জাহাজের কামরাগুলি নির্মাণ করা হয়। ইঞ্জিন বসানো হয়। রং করা হয়। আরও হাজারো রকমের খুঁটিনাটি কাজ ক্রমে একদিন শেষ হয়। এর মধ্যে প্রায় তিন বছর বা তারও বেশী সময় কেটে গেছে। অবশেষে জাহাজটি তার যাত্রা শুরু করার জন্যে প্রস্তুত হয়। জাহাজের গায়ে একটি নারিকেল ভেঙ্গে তার যাত্রার শুভ সূচনা করা হয়।

সুয়েজ খাল ও পানামা খাল খনন করার পর এখন জাহাজগুলিকে কত কম পথ অতিক্রম করতে হয় এবং তার আগে কত বেশী পথ অতিক্রম করতে হত তাই এই ম্যাপের সাহায্যে দেখানো হয়েছে



খাল

প্রণালী এবং খাল হচ্ছে জাহাজ, মালবাহী নৌকা ও নৌকা যাবার জন্যে জলপথ। উভয়েই দুটি জলধারাকে যুক্ত করে। এদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে যে, খাল মনুষ্যনির্মিত এবং প্রণালী তা নয়।

পৃথিবীতে বহু প্রণালী আছে। সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ প্রণালীগুলির অন্যতম হচ্ছে বেরিং প্রণালী। এটি সুমেরু মহাসাগর এবং বেরিং সাগরকে যুক্ত করেছে। বেরিং প্রণালীর একদিকে আছে আলাস্কা এবং অপরদিকে রয়েছে সাইবেরিয়া। ডেভিস প্রণালী গ্রীনল্যাণ্ড এবং কানাডাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এটি আটল্যান্টিক মহাসাগর এবং ব্যাফিন উপসাগরকে যুক্ত করেছে। ম্যাজেলান প্রণালী প্রশান্ত মহাসাগর এবং আটল্যান্টিক মহাসাগরকে যুক্ত করেছে। জিব্রাল্টার প্রণালী আটল্যান্টিক মহাসাগর এবং ভূমধ্য সাগরকে যুক্ত করেছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই অ্যাসিরীয়, মিশরীয়, চীনা এবং হিন্দুদের নৌকা খালপথে চলাচল করত। খৃষ্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দে কিংবা তারও পূর্বে মিশর এবং ব্যাবিলনে খাল ছিল। খৃষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে ব্যাবিলনে একটি রাজকীয় খাল খনন করা হয়। এই খালটি ৭৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। তিন হাজার বছর আগে মিশরে নীল নদ থেকে লোহিত সাগর অবধি একটি ছোট খাল ছিল।

সম্রাট আলেকজাণ্ডার (৩৫৬-৩২৩ খৃঃ পূঃ) এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা মিশরে অনেকগুলি খাল খনন করেন। রোমানরা খাল খননে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ১০২ অব্দে রোমান কনসাল গেইআস ম্যারিয়াস রোন থেকে ভূমধ্য সাগর অবধি একটি খাল খনন করেন।

রোম সম্রাট নীরো ৬৭ খৃষ্টাব্দে করিন্থ এবং স্যারোনিক উপসাগর দুটিকে সংযোগ করবার জন্যে করিন্থ প্রণালী খনন করা শুরু করেন। এটির কাজ তখন শেষ হয় নি। পরে ১৮৯৩ সালে একটি গ্রীক কোম্পানী এটির কাজ শেষ করে।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর বহুদিন আর উল্লেখযোগ্য কোন খাল খনন করা হয় নি। এরপর ফ্রাঙ্কদের রাজা চার্লম্যাগ্‌নে (৭৪২-৮১৪ খৃঃ) ড্যানিয়ুব নদীর সঙ্গে রাইন নদীর সংযোগ স্থাপন করে একটি খাল খনন করেন।

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ দুটি খাল হচ্ছে সুয়েজ খাল এবং পানামা খাল।

সুয়েজ খাল—এটি ৯৮ মাইল লম্বা। এশিয়া এবং আফ্রিকাকে যে যোজকটি যুক্ত করেছে, সুয়েজ খাল তাকে কেটে ভূমধ্য সাগর থেকে লোহিত সাগরে যাবার পথে মিশরের ওপর দিয়ে গেছে। এই খালটি ১০৮ ফুট প্রশস্ত এবং ৪২.৫ ফুট গভীর। খালটি পার হতে বার থেকে পনের ঘণ্টা সময় লাগে। এটি পার হবার জন্যে পাইলটের সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

ভূমধ্য সাগর এবং লোহিত সাগরকে একটি খাল দ্বারা সংযুক্ত করার পরিকল্পনা বহুদিনের। ইউরোপীয়রা যখন দূর-প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু করলেন তখন মিশরের ওপর দিয়ে একটি খাল খনন করবার জন্যে তাঁরা ব্যগ্র হন। লণ্ডন থেকে বোম্বাইয়ে সুয়েজ খালের ওপর দিয়ে এলে প্রায় পাঁচ হাজার মাইল কম পথ অতিক্রম করতে হয়।

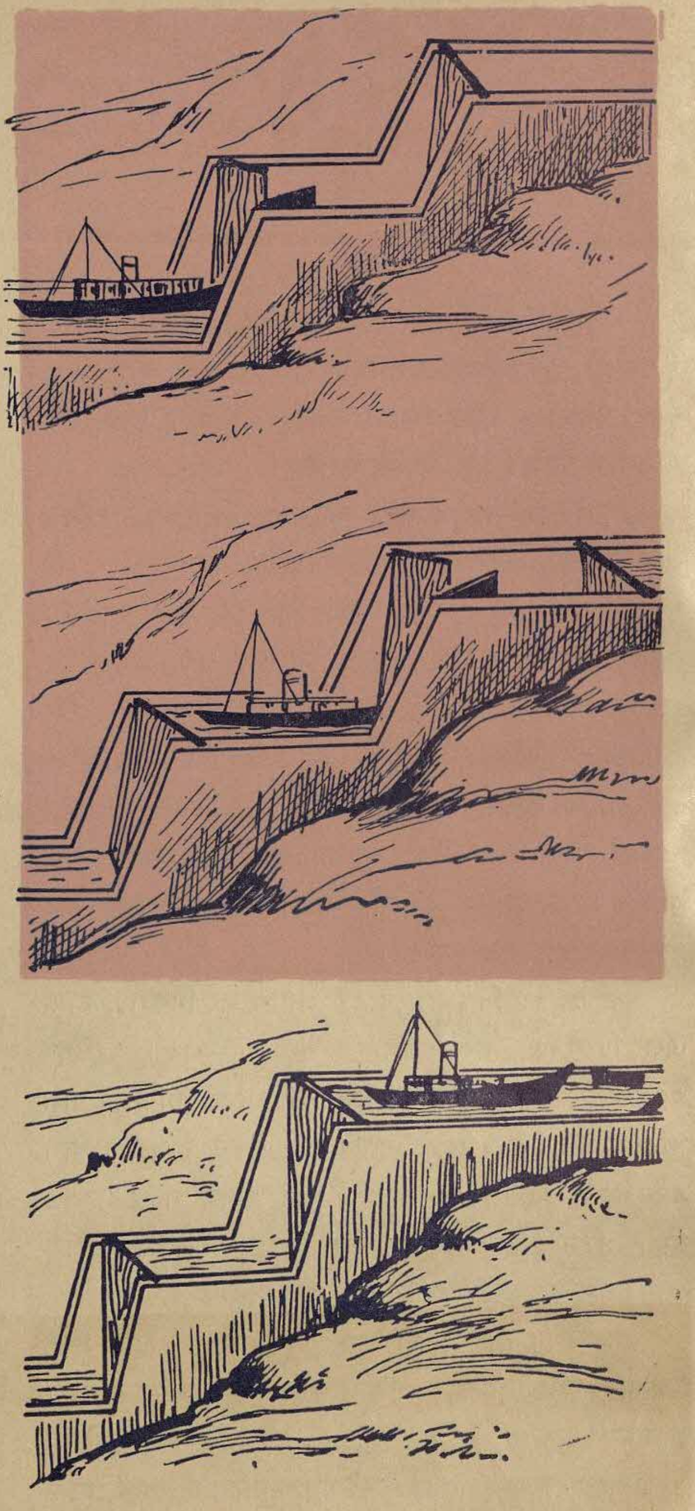
১৮৫৪ সালে ফার্ডিন্যাণ্ড দ্য লেসেপ্স নামে একজন ফরাসী কূটনীতিক ও ইঞ্জিনীয়ার সুয়েজ খাল খনন করবার জন্যে একটি সংস্থা সংগঠনে সক্ষম হন। তিনি এই উদ্দেশ্যে একটি কোম্পানী তৈরী করেন এবং পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ লাভের আশায় তার শেয়ার বিক্রয় শুরু করেন। ফরাসীরা সর্বাধিক শেয়ার কেনেন। এই সময়ে ইংরেজরা কোন শেয়ার কেনেন নি। পরে ডিজরেলী যখন ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী তখন তিনি স্বয়ং এই পরিকল্পনার ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে সুপারিশ করলে ইংল্যাণ্ডের তরফে কিছু শেয়ার কেনা হয়। সুয়েজ খাল খনন করতে ৮৩,০০০,০০০ ডলার ব্যয় হয়।

খাল খননের কাজ ১৮৫৯ সালের এপ্রিলে শুরু হয়। এটি সম্পূর্ণ হতে দশ বৎসর সময় লাগে। ১৮৬৯ সালের নভেম্বর মাসে এই খালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম জাহাজ চলে। ১৯৫৬ সালে মিশর এটি জাতীয়করণ করে নেয়।

পানামা খাল—পানামা খাল খনন করার আগে, পানামার আটল্যান্টিক মহাসাগরের দিক থেকে কোন নৌকা যদি মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে কোন জায়গায় যেতে চাইত, তবে তাকে দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে প্রায় আট হাজার মাইল পথ অতিক্রম করতে হত। পানামা খাল আটল্যান্টিক মহাসাগরের দিকে কোলোন থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে পানামা উপসাগর পর্যন্ত পানামা যোজককে কেটে বিস্তৃত। ১৮৮১ সালে ফার্ডিন্যাণ্ড দ্য লেসেপ্স কর্তৃক এর খননকার্য শুরু হয়। কাজ শুরু করার আট বছর পরে ১৮৮৯ সালে আর্থিক সমস্যার জন্য তাঁকে কাজ বন্ধ করে দিতে হয়।

এর পর নবগঠিত রিপাবলিক অব পানামার কাছ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খাল অঞ্চলটি ইজারা নেন। ১৯০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খাল খননের কাজ শুরু করেন। জেনারেল জর্জ ডব্লিউ. গোথ্যাল্সের কর্তৃত্বাধীনে মার্কিন সামরিক বাহিনীর ওপর ওই কাজের ভার ন্যস্ত করা হয়। ১৯১৪ সালে পানামা খাল খননের কাজ শেষ হয়। এর দৈর্ঘ্য মাত্র পঞ্চাশ মাইল। যে পরিমাণ মাটি এর থেকে খুঁড়ে তোলা হয়েছিল, তার ওজন ৩৬০,০০০,০০০ টন। এই মাটি বহন করবার জন্যে ৩০৭টি রেলগাড়ী এবং ৪,৫৭২টি মোটর গাড়ীর প্রয়োজন হয়েছিল। পাহাড় ফাটাবার জন্যে ৭৭,০০০,০০০ পাউণ্ড বিস্ফোরক পদার্থের প্রয়োজন হয়েছিল। সমস্ত কাজটি সম্পূর্ণ করতে ৩৭৩,০০০,০০০ ডলার ব্যয় হয়।

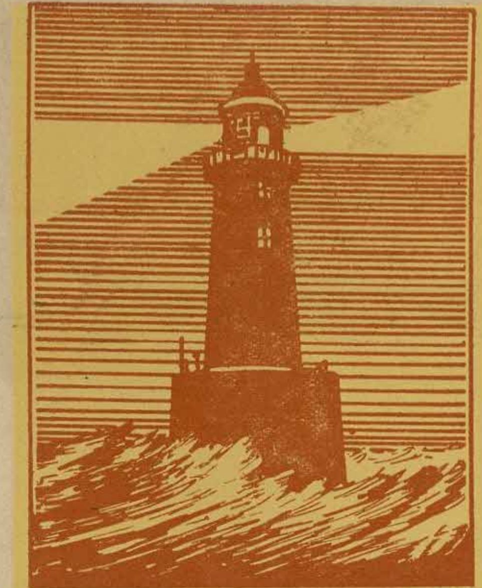
পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ খাল (জাহাজ যাবার উপযোগী) হচ্ছে ১৮৯ মাইল দীর্ঘ সেন্ট লরেন্স সীওয়ে (যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা)।



লক গেট

খালের ভিতর অনেক অংশে জমি উঁচু থাকে। খালের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে জাহাজ যখন ওই অংশে এসে পৌঁছায় তখন তাকে ওপরে তুলতে হয়। তখন লক গেটের সাহায্য নেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় পর পর কয়েকটি লক গেট থাকে। প্রথম লক গেট অতিক্রম করে জাহাজটি ভিতরে এলে জাহাজের পিছনে গেটটি বন্ধ হয়ে যায় এবং ওই লক গেটের মধ্যে জলপ্রবাহ পাঠাতে শুরু করা হয়। ক্রমে জাহাজটি ওজলের ওপরে ভেসে উঁচুতে উঠতে শুরু করে। ক্রমে জলের তল দ্বিতীয় গেটটির সমান উঁচু হলে দ্বিতীয় গেটটি খুলে যায় এবং জাহাজটি সেখানে প্রবেশ করে। আবার ওই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। দ্বিতীয় গেটটি জাহাজের পিছনে বন্ধ হয়ে যায় এবং সেখানে জলপ্রবাহ পাঠিয়ে জাহাজটিকে তৃতীয় গেটের সমান উঁচুতে ওঠানো হয়। তখন আবার তৃতীয় গেটটি খুলে যায় এবং জাহাজটি সেটি অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করে।

এই গেটগুলি বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা খোলা এবং বন্ধ করা হয়। পানামা খালের এক একটি গেটের ওজন প্রায় ৫০০ টন—এগুলি প্রায় ৭ ফুট পুরু, ৬৫ ফুট প্রশস্ত এবংপ্রায় সাততলা বাড়ীর সমান উঁচু।



লাইটহাউস

লাইটহাউস

যবে থেকে মানুষ জাহাজে করে সমুদ্রযাত্রা শুরু করেছে, তবে থেকেই নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে অন্ধকার ও ঝড়ের সঙ্গে তাকে যুদ্ধ শুরু করতে হয়েছে। তাদের এই যুদ্ধে অস্ত্র ছিল নাবিকের নৈপুণ্য, জাহাজের শক্ত গঠন, দিঙ্‌দর্শন যন্ত্র ও মানচিত্রের সাহায্য, হাল এবং তীরভূমি থেকে প্রেরিত সাহায্য। লাইটহাউসগুলি থেকে যদি সঙ্কেত পাঠানো না হত তবে জাহাজ নির্মাণের ক্রমোন্নতি, বাষ্পীয় পোতের আবিষ্কার ও দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র, মানচিত্র এবং নাবিকের নৈপুণ্য সত্ত্বেও বহু জাহাজ সমুদ্রবক্ষে ধ্বংস হয়ে সমুদ্রের গভীরে তলিয়ে যেত।

প্রাচীন মিশরে, ভূমধ্যসাগরের জাহাজগুলিকে সঙ্কেত দেবার জন্যে সেখানকার পুরোহিতরা আগুন জ্বালাতেন। খৃষ্টপূর্ব সপ্তম অব্দে এশিয়া মাইনরে একটি লাইটহাউস ছিল বলে সাক্ষ্য প্রমাণ আছে। খৃষ্টপূর্ব ২৫০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে মিশরে আলেকজান্দ্রিয়ার কাছে ফারোস দ্বীপে একটি বিশাল স্তম্ভ তৈরী করা হয়েছিল এবং তার ওপর থেকে জলের ওপর বহুদূর পর্যন্ত আলো ফেলা হত। এই স্তম্ভটির উচ্চতা ছিল প্রায় ৪০০ ফুট। উজ্জ্বল ধাতব আয়নার সাহায্যে এখান থেকে আলো প্রতিফলিত করা হত এবং তা প্রায় ত্রিশ মাইল দূর থেকে দেখা যেত। ফারোসের এই লাইটহাউসটি এত প্রসিদ্ধ ছিল যে, লোকে পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্যের একটি বলে একে গণ্য করত।

খালের জমি যেখানে উঁচু সেখানে জাহাজকে ওপরে তোলবার জন্যে লক গেট নির্মাণ করা হয়। লক গেটের ভিতর দিয়ে গিয়ে জাহাজ কিভাবে ওই উঁচু অংশ অতিক্রম করে তাই এই ছবিতে দেখানো হয়েছে।





ভাসমান জাহাজের ওপর স্থাপিত লাইটহাউস

খৃষ্টপূর্ব ১০০ অব্দ নাগাদ রোমানরা সিসিলির মেসিনায় একটি লাইটহাউস নির্মাণ করেন। ৪০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ক্যালিগুলা ফ্রান্সে ২০০ ফুট উঁচু একটি লাইটহাউস নির্মাণ করেন।

খৃষ্টীয় ১৮০০ অব্দের আগে অবধি মানুষ প্রাচীন লাইট-হাউসগুলিকে উন্নত করবার কোন উপায় আবিষ্কার করতে পারে নি। তখন কাঠ বা কয়লা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে আলো উৎপন্ন করা হত। এখন ইনক্যান্‌ডেসেন্ট অয়েল বার্ণার বা বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের আলোগুলি দিগন্ত অবধি দেখা যায়—কুড়ি মাইল অবধি উজ্জ্বল আলোকরেখা হিসাবে এবং প্রায় একশ মাইল দূরে আকাশের একটি আলো হিসাবে। বড় বড় আয়না এই আলোকে প্রতিফলিত করে।

যে লাইটহাউসগুলি সমুদ্রে পাহাড়ের ওপর স্থাপন করা হয়, তাদের ভিত্তি জলের ছয় থেকে কুড়ি ফুট নীচে স্থাপন করা হয়। পাথর বা কন্‌ক্রীটের এই গোল স্তম্ভগুলি প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাত সহ্য করার মত করে তৈরী করা হয়।

যে স্তম্ভগুলি পাহাড়ের ওপর স্থাপিত না থেকে চড়া বা বালুর ওপর স্থাপিত থাকে, তাদের এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্মাণ করা হয়। এই ধরনের নরম ভিত্তির অনেক গভীরে কাঠ বা লোহার বহু দণ্ড ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ ইঞ্জিনীয়াররা কেসন ব্যবহার করেন। কেসন হচ্ছে আসলে বড় বড় ধাতব বাক্স যা স্তম্ভের ভিত্তির চারিদিকের জলকে সরিয়ে দিতে পারে। এই ধরনের কেসনগুলি যেখানে স্তম্ভটি নির্মিত হবে সেখানে নঙ্গরবদ্ধ করা হয় এবং ভিত্তিটি তার মধ্যে নির্মিত হয়। সেগুলি বেশ ভারী বলে বালুর বহু গভীরে ঢুকে যায়। পরে সেটিকে কন্‌ক্রীট দিয়ে ভালোভাবে ভর্তি করা হয়। তার ওপর স্তম্ভটি নির্মিত হয়।

এই সমস্ত আলোকস্তম্ভে সমস্তরকম আধুনিক সুযোগ সুবিধা আছে। লাইটহাউসের রক্ষক তার পরিবারবর্গ নিয়ে সেখানে বাস করতে পারে। সমুদ্রবক্ষ থেকে প্রায় ২০০ ফুট ওপরেঅবস্থিত মূল দীপটি একটি বিশাল বৈদ্যুতিক, অ্যাসেটিলীন বা তেলের আলো। এই আলোটি কাচের বিরাট লেন্সের পিছনে বসানো থাকে। লেন্সগুলি কখনও কখনও তিনজন মানুষের সমান উঁচু হয়। লেন্স এবং প্রিজ্‌মের বিশেষ জটিল পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে এই আলোকে কেন্দ্রীভূত করা হয় এবং সঠিক দিকে পাঠানো হয়। এই আলো বিশেষ বিশেষ সঙ্কেত দেবার জন্যে নেবে ও জ্বলে এবং নাবিকেরা তার সংখ্যা ও সময়বিরতি দেখে তার বিশেষ অর্থ বুঝতে পারেন।

অনেক লাইটহাউস আছে যেগুলি তীরভূমিতে উঁচু বাড়ীর ওপর অথবা লোহার কাঠামোর ওপর স্থাপিত।



ভাসমান বয়ার ওপর স্থাপিত লাইটহাউস। বাঁদিকের ছবিটিতে আলোর পরিবর্তে ঘন্টা বাঁধা আছে।

অনেকগুলি আবার নঙ্গরবদ্ধ বয়ার ওপর কিংবা জাহাজের ওপর স্থাপিত থাকে।

কিন্তু সমুদ্রবক্ষে যদি ঘন কুয়াশা থাকে, তবে তীব্রতম আলোও কোন কাজে আসবে না। সেইজন্যে লাইট হাউসগুলি জাহাজগুলিকে শব্দের সঙ্কেতও প্রেরণ করে। আগে এই উদ্দেশ্যে ঘণ্টা বাজানো হত। কিন্তু ঘণ্টার শব্দ বেশীদূর অবধি শোনা যায় না। এখন বন্দুক এবং রকেট, বাঁশী এবং শিঙ্গা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। কয়েক ধরনের সাইরেন এবং ডায়াফোন নামে শব্দ উৎপাদনের যন্ত্র সর্বাপেক্ষা বেশী জোরে শব্দ উৎপাদন করতে পারে।

বেতার নাবিকদের প্রভূত সাহায্যে এসেছে। তীরভূমির সঙ্গে জাহাজের দ্রুত যোগাযোগব্যবস্থা বেতারের সাহায্যে সম্ভব হয়েছে। তীরভূমি থেকে বেতারের সাহায্যে সঙ্কেত পাঠিয়ে জাহাজকে খারাপ আবহাওয়া সম্বন্ধে অবহিত করে সতর্ক করে দেওয়া হয়। বর্তমানে লোরান নামে একটি যন্ত্রের সাহায্যে জাহাজের নাবিকেরা যে কোন সময়ে ঠিক কোথায় তাঁরা রয়েছেন, তা বুঝতে পারেন। অনেক জাহাজে বর্তমানে র‍্যাডার স্থাপিত থাকে। সেটি জাহাজ থেকে সঙ্কেত প্রেরণ করে এবং জাহাজের সামনে হিমশৈল বা অন্য কোন বাধা থাকলে সেই সঙ্কেত প্রতিধ্বনি হয়ে জাহাজে ফিরে আসে। র‍্যাডার সম্বন্ধে আমরা 'আকাশপথে পরিবহন ব্যবস্থা' পর্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

যাই হোক, এই সমস্ত উপায়ে আবহাওয়াকে জয় করা হয়েছে।

বয়া

রাস্তার দুপাশে বোর্ডে নানারকমের সঙ্কেত এঁকে রেখে যেমন গাড়ীর চালককে স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত করে সতর্ক করে দেওয়া হয় জলপথে তেমনি বয়া ভাসিয়ে রেখে নাবিককে জলের গভীরতা ইত্যাদি বিষয়ে সঙ্কেত দিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়। বয়ার ওপরে কোন কিছু লেখা থাকে না; কিন্তু তাদের বিভিন্ন রং ও আকৃতি দেখেই নাবিকেরা তাদের অর্থ বুঝতে পারেন। বিভিন্ন বয়ার ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি হলেও আসলে তাদের রং-ই বেশী অর্থবহ। যেমন কোন বয়ার গায়ে যদি লাল এবং কালো রং-এর ডোরা থাকে তবে নাবিকেরা বুঝতে পারেন যে, ওই বয়ার কাছে যাওয়াটা বিপদসঙ্কুল; হয়ত সেখানে কোন ডুবো পাহাড় আছে বা ওই ধরনের কোন বিপজ্জনক জিনিস আছে।

বিভিন্ন ধরনের বয়ার ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও রং দেখে জাহাজের নাবিকেরা নদীর সেই অংশের গভীরতা বুঝতে পারেন। সেই অনুসারে জাহাজ পরিচালনা করে তাঁরা জাহাজটিকে নিরাপদে বন্দরে নিয়ে আসেন।

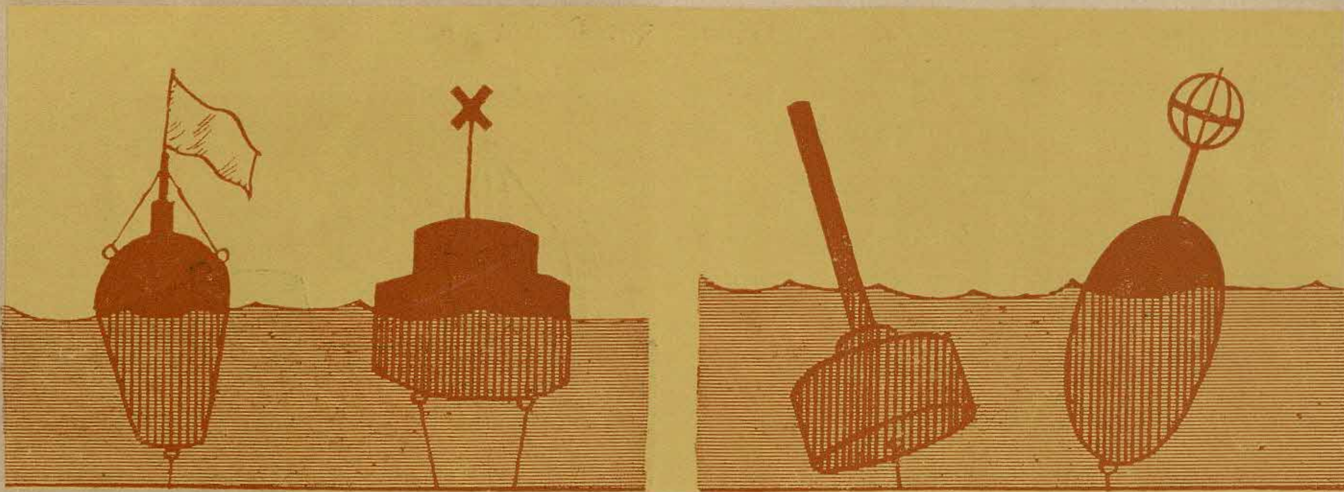


বন্দর

প্রাগৈতিহাসিক যুগে যেমন ছিল, আজও বন্দর ও পোতাশ্রয়গুলি তেমনই প্রয়োজনীয়। পোতাশ্রয়েই নাবিকেরা তাঁদের জাহাজ বাঁধবার জায়গা পেয়েছেন। যে মাল জাহাজে করে তাঁরা বয়ে এনেছেন, তা বিক্রির বাজার পেয়েছেন। বন্দরগুলি হচ্ছে সাধারণতঃ ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল।

ঝড়ের হাত থেকে জাহাজকে আশ্রয় দেওয়াটাই হচ্ছে যে কোন বন্দরের প্রথম প্রয়োজনীয়তা। নদী যেখানে প্রাকৃতিক আশ্রয় দিয়েছে, তাকে বলে প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়গুলির মধ্যে নিউ ইয়র্ক, সান ফ্র্যান্সিসকো, সিডনী এবং হংকং অন্যতম। অন্যান্য অনেক বন্দর আছে যেখানে জাহাজকে নিরাপদে ভেড়াবার জন্যে ইঞ্জিনীয়াররা ব্রেক ওয়াটার বা তরঙ্গের বেগ রোধ করবার জন্যে বাঁধ তৈরী করেন। এই সমস্ত বন্দরের অনেকগুলিতে জোয়ার-ভাটাবিশিষ্ট নদীর অববাহিকা ও জেটি এবং খালের দরজা আছে।

বিভিন্ন ধরনের বয়া



সমুদ্র, হ্রদ অথবা নদী যার তীরেই বন্দর থাকুক না কেন, আসলে সেটি একটি পোতাশ্রয়মাত্র। এর এলাকার মধ্যে পড়ে মাল তোলা এবং খালাস করবার জন্যে জাহাজ যেখানে দাঁড়িয়ে থাকে জলের ওপর সেই এলাকা, এবং তীরের ওপর স্থলভূমিতে যেখানে পরে জাহাজে তোলবার জন্যে কিংবা যে মাল জাহাজে করে বন্দরে আসে তা যতক্ষণ পর্যন্ত না তার গন্তব্যস্থলে পাঠানো হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্থলভূমির ওপর যেসব গুদামে তাদের রাখা হয়, স্থলভূমির সেই এলাকা।

এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলে জোয়ার-ভাটার সময় নদীর জল যখন অল্প থাকে তখন বিশেষ এলাকার জাহাজগুলিকে ভাসিয়ে রাখা যায়। লিভারপুলে এই ধরনের একটি বিরাট ডক আছে। পৃথিবীর কয়েকটি বন্দর 'ওভারসাইড' বন্দর নামে পরিচিত। এই ধরনের বন্দরগুলিতে জাহাজ তার মালগুলিকে হাল্কা ধরনের মালবাহী নৌকায় তুলে দেয় এবং সেগুলি আবার সেই মাল পোতাশ্রয়ে অপেক্ষমাণ অন্য জাহাজে তুলে দিয়ে আসে। এই ধরনের বন্দরগুলির মধ্যে লণ্ডন এবং আমস্টার্ডাম সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

সাবমেরিন



ডেভিড বুশনেল নির্মিত ডিম্বাকৃতি সাবমেরিন

যতদূর জানা যায়, ১৬২০ সালে ডাচ চিকিৎসক কর্ণেলিয়াস ভ্যান ড্রেবেল ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের জন্যে তিনটি ডুবোজাহাজ নির্মাণ করেন। সেই প্রথম। সেই ধরনের প্রত্যেকটি নৌকা ছিল কাঠের বড় জাহাজ। পুরু, ভাল করে চর্বি মাখানো চামড়া দিয়ে তার জল-প্রতিরোধক ডেকটি আচ্ছাদিত ছিল। জলের বারো ফুট নীচে বারো জন দাঁড়ি নৌকাটিকে বাইত। জলের নীচে একাদিক্রমে বারো ঘণ্টা তারা থাকতে পারত।

তারপর আমেরিকার বিপ্লবের সময় ১৭৭৬ সালে ডেভিড বুশনেল নামে ইয়েলের একজন ছাত্র ভারী ওক গাছের কাঠ দিয়ে একটি ডুবোজাহাজ তৈরী করেন এবং সার্জেণ্ট লী নিউ ইয়র্ক বন্দরে সেটি চালনা করেন। লী ইংরেজদের একটি জাহাজকে বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে উড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে তার তলায় যান। কিন্তু তিনি সফল হন নি।

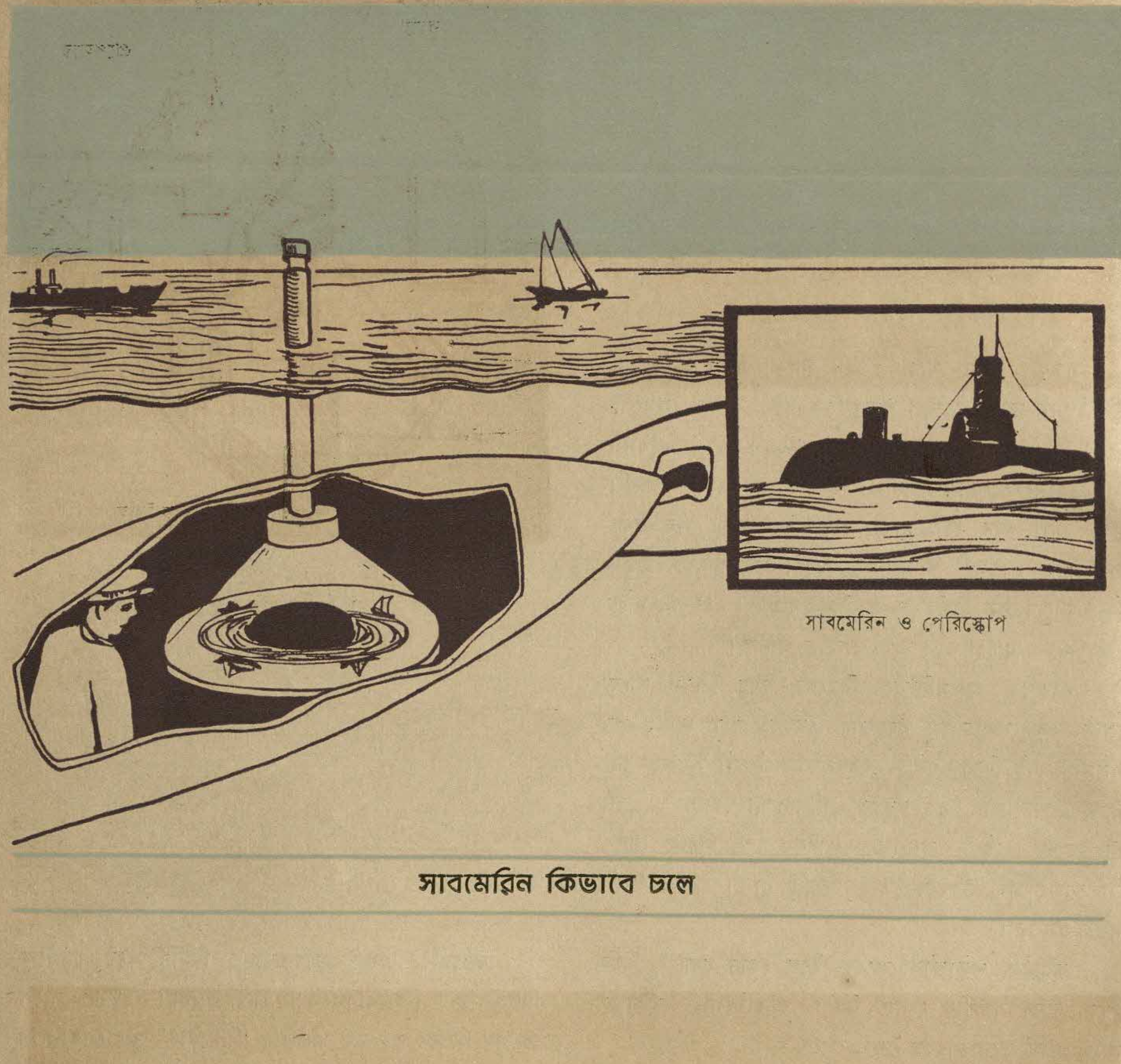
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে রবার্ট ফুলটন, যিনি পরে সফল বাষ্পীয় পোত নির্মাণ করেছিলেন, 'নটিলাস' নামে একটি ডুবোজাহাজ তৈরী করেন।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়, কেন্দ্রীয় সরকারের জাহাজ 'হাউসাটনিক' চার্লসটনে বিদ্রোহীদের একটি ডুবোজাহাজ 'হাণ্ডলী' কর্তৃক বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 'হাণ্ডলী' তার শিকারের সঙ্গেই ধ্বংস হয়। 'হাণ্ডলী' হচ্ছে প্রথম ডুবোজাহাজ যে একটি যুদ্ধ জাহাজকে ডুবিয়ে দেয়।

১৮৮০ সালে রেভারেণ্ড জি. ডব্লিউ. গ্যারেট নামে একজন ইংরেজ পাদ্রী একটি ডুবোজাহাজ নির্মাণ করেন। সেটি বয়লারে কয়লার আগুন থেকে বাষ্প সংগ্রহ করে চালিত হত।

ফরাসীরা একটি ডুবোজাহাজ নির্মাণ করে সেটিকে বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে চালাবার চেষ্টা করেন। ১৮৮৮ সালে তাঁদের নির্মিত ৩০ টন ওজনের 'জিমনোট' ডুবোজাহাজটির প্রপেলার একটি বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে ঘোরানো হয়েছিল।

১৮৭৫ সালে জন পি. হল্যাণ্ড নামে একজন মার্কিন ভদ্রলোক একটি সফল ডুবোজাহাজ নির্মাণ করেন। পরে তিনি আরও কয়েকটি ওই ধরনের ডুবোজাহাজ নির্মাণ করে বিক্রয় করেন। ওই একই সময়ে সাইমন লেক নামে আরেকজন মার্কিন ভদ্রলোক নিজের নক্সা অনুযায়ী ডুবোজাহাজ নির্মাণ করতে শুরু করে হল্যাণ্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেন। লেকের নির্মিত ডুবোজাহাজগুলি শান্তির সময়ে ব্যবহার করবার উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল।



সাবমেরিন ও পেরিস্কোপ

সাবমেরিন কিভাবে চলে

জলের নীচে অবস্থানকালে ডুবোজাহাজের ওপর জলের যে প্রচণ্ড চাপ পড়ে তাকে সহ্য করবার মত শক্তিশালী করে আধুনিক ডুবোজাহাজগুলি নির্মিত হয়। এর দুটি কাঠামো বা খোল থাকে। তাদের মধ্যবর্তী স্থানটি জল-প্রতিরোধক পার্টিশান দিয়ে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে অনেকগুলি অংশে বিভক্ত। এই অংশগুলি জ্বালানি তেল ও জল রাখবার ট্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভিতরের খোলটি অনেকগুলি জল-প্রতিরোধক কক্ষে বিভক্ত।

ডুবোজাহাজের শক্তির প্রাথমিক উৎস হচ্ছে তার ডিজেল ইঞ্জিনগুলি। সাধারণতঃ একটি ডুবোজাহাজে চারটি এই ধরনের ইঞ্জিন বৈদ্যুতিক জেনারেটরগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই জেনারেটরগুলি মোটরগুলির জন্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করে। মোটরগুলি আবার প্রপেলার শ্যাফ্‌ট্‌কে ঘোরায়।

ডুবোজাহাজকে জলের ওপর ভাসাবার জন্যে অথবা জলের তলায় ডোবাবার জন্যে অনেকগুলি ট্যাঙ্ক থাকে। এই ট্যাঙ্কগুলিকে বাতাস বা জল দিয়ে ভর্তি করা যায়।

এগুলি বাতাস দিয়ে ভর্তি করা হলে ডুবোজাহাজটি জলের ওপর ভেসে ওঠে এবং জল দিয়ে ভর্তি করা হলে সেটি জলের তলায় ডুবে যায়। ডুবোজাহাজটি যদি আবার জলের ওপর ভেসে উঠতে চায়, তবে উচ্চচাপবিশিষ্ট বায়ু বা বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে ট্যাঙ্ক থেকে জল বের করে দেওয়া হয় এবং সেই শূন্য ট্যাঙ্ক স্বভাবতঃই বাতাস দিয়ে ভর্তি হলে ডুবোজাহাজটি আবার ভেসে ওঠে।

ডুবোজাহাজ জলের তলায় যখন ডুব দেয় তখন তার সামনের দিকটি নীচের দিকে মুখ করে ডুব দেয়। সাবধানে হিসাব করে স্থাপিত জলভর্তি ট্যাঙ্কের সাহায্যে ডুবোজাহাজের অবস্থানকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এছাড়া ডুবোজাহাজের কয়েকটি ডানা থাকে, সেগুলি জলের তলায় তাকে সোজা রাখে।

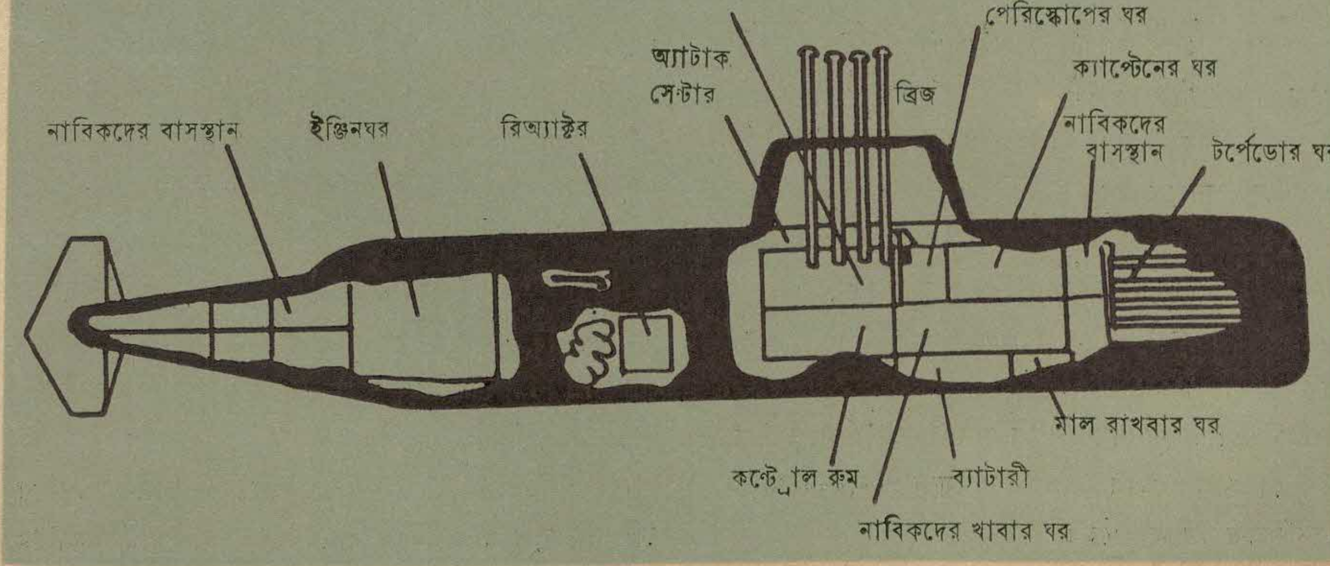
তুমি যদি কোন পদার্থকে ভারী করে ডুবিয়ে দাও, তবে সেটি ডুবতে ডুবতে একেবারে তলায় পৌঁছে তবে থামবে। যখন ডুবোজাহাজ এবং তার জলভর্তি ট্যাঙ্কের মিলিত ওজন ডুবোজাহাজ কর্তৃক স্থানচ্যুত জলের ওজনের সমান হয়, তখন ডুবোজাহাজটি আর ওপরেও ভেসে ওঠে না অথবা নীচেও ডুবে তলিয়ে যায় না।

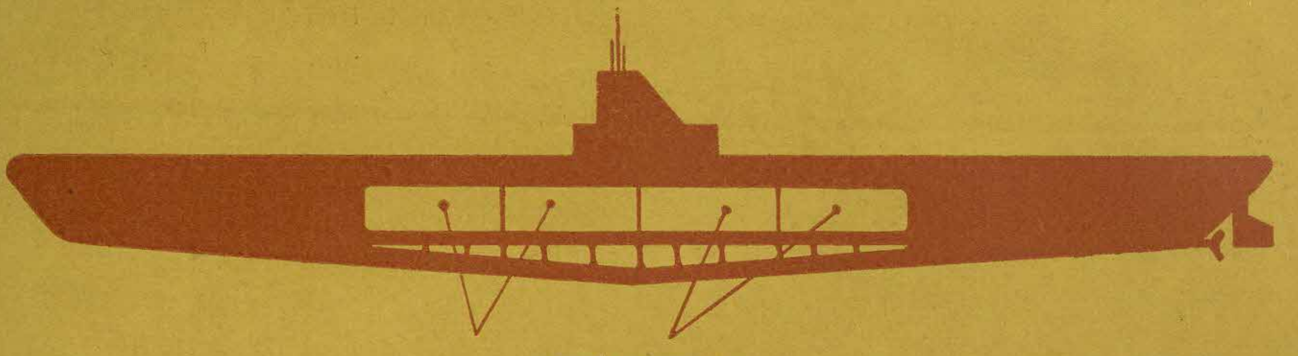
ডুবোজাহাজে দুটি পেরিস্কোপ থাকে, যার মধ্যে দিয়ে নাবিকরা ওপরের পৃথিবী দেখতে পান। পেরিস্কোপের ওপরের প্রান্তে থাকে একটি জানালা এবং একটি প্রিজ্‌ম্; নীচে ডুবোজাহাজের মধ্যে পেরিস্কোপের প্রান্তে থাকে আর একটি প্রিজ্‌ম্ এবং একটি আইপীস আর টিউবের মধ্যে থাকে অনেকগুলি লেন্স। পেরিস্কোপ হচ্ছে একটি লোহার টিউব; তার মাথার দিকটি জলের ওপরে একটু বেরিয়ে থাকে। এটি সাধারণতঃ পঁয়ত্রিশ ফুট দীর্ঘ হয়। একটি বিশেষ হাইড্রলিক ব্যবস্থার সাহায্যে গোটা যন্ত্রটিকেই ওঠানো বা নামানো যায়। দিগন্ত অবধি সব দিক দেখবার জন্যে টিউবটিকে চারিদিকে ঘোরানো যায়।

টর্পেডো

ডুবোজাহাজের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হচ্ছে টর্পেডো। এটি হচ্ছে লম্বা, চুরুটের মত আকৃতিবিশিষ্ট নলাকার বস্তু যা জলের মধ্যে দিয়ে নিজেকে সামনে চালিত করে। আধুনিকতম টর্পেডোগুলি বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে চালিত হয়। টর্পেডোর সামনের দিকে থাকে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক দ্রব্য এবং বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্যে দাহ্য পদার্থপূর্ণ একটি পলিতা বা নল আর পিছনের দিকে থাকে প্রপেলার। ডুবোজাহাজের সম্মুখভাগে এবং পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত টিউব থেকে উচ্চচাপবিশিষ্ট বায়ুর সাহায্যে টর্পেডোগুলি ছোঁড়া হয়।

আণবিক সাবমেরিন





সাবমেরিনের আভ্যন্তরীণ নক্সা

আণবিক শক্তিচালিত জাহাজ

সমুদ্রের ওপর আণবিক শক্তিচালিত প্রথম জাহাজ হচ্ছে ৪৪০ ফুট দীর্ঘ ১৬,০০০ টনের রাশিয়ান বরফ ভাঙ্গার জাহাজ 'লেনিন'। ১৯৫৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর সে তার প্রথম যাত্রা শুরু করে।

১৯৫৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও 'সাভানা' নামে একটি আণবিক জাহাজ নির্মাণ করেন। ৬০ জন যাত্রী, ২৫ জন অফিসার, ৮৪ জন নাবিক এবং ৯,২৫০ টন ওজনের মাল নিয়ে ঘণ্টায় ২১ নট যাবার সামর্থ্য 'সাভানা'র আছে। জাহাজটি ৫৯৫.৫ ফুট দীর্ঘ। 'সাভানা' এক নাগাড়ে তিন বছর ধরে নতুন কোন জ্বালানি না নিয়ে ৩০০,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে পারে।

আণবিক জাহাজ কিভাবে চলে

জাহাজে আণবিক শক্তি ব্যবহারের অনেক সুবিধা আছে। এতে ক্রমাগত জ্বালানি দেবার দরকার হয় না। রিঅ্যাক্টরের জন্যে প্রয়োজনীয় সামান্য পরিমাণ ইউরেনিয়াম মাল, নাবিক ও যাত্রীদের জন্যে বহুগুণ বেশী জায়গার সঙ্কুলান করতে পারে। তাছাড়া, এতে কোন ধোঁয়া হয় না।

আণবিক শক্তিচালিত জাহাজে নিউক্লিয়ার-রিঅ্যাক্টর পদ্ধতি (১) টারবাইন পরিচালন পদ্ধতি যা জাহাজের একক প্রপেলারটিকে ঘোরায় এবং (২) যে টারবাইনগুলি বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করে, তাদের বাষ্প সরবরাহ করে। রিঅ্যাক্টর পদ্ধতির যন্ত্রপাতিগুলি একটি ইস্পাতের আধারের মধ্যে রাখা থাকে এবং তাদের ভালোভাবে আচ্ছাদিত করা থাকে। জাহাজের পাশে অবস্থিত ভারী ইস্পাত এবং একটির পর একটি ইস্পাত ও কাঠের স্তর দিয়ে গঠিত একটি পুরু প্রতিবন্ধক দ্বারা সংঘর্ষের প্রভাব থেকে রিঅ্যাক্টর পদ্ধতিকে রক্ষা করা হয়।

রিঅ্যাক্টর পদ্ধতির কেন্দ্রস্থল হচ্ছে কোর। এতে থাকে ইউরেনিয়াম ডাইঅক্সাইড সমন্বিত জ্বালানি। পাম্প দ্বারা চালিত চাপবিশিষ্ট জলস্রোত রিঅ্যাক্টরের মধ্যে দিয়ে দুটি বদ্ধ লুপ বা সার্কিটে যায়। এটি প্রাইমারী ওয়াটার

লুপটি গঠন করেছে। প্রত্যেকটি লুপের মধ্যেকার জল একটি হিট এক্সচেঞ্জারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়; সেখানে ওই জল আরও কতকগুলি বদ্ধ পাইপের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত জলে নিজের তাপ ত্যাগ করে। এটি হচ্ছে সেকেণ্ডারী ওয়াটার সিস্টেম। প্রাইমারী সিস্টেমের জল আবার হিট এক্সচেঞ্জার থেকে রিঅ্যাক্টরে ফিরে যায় এবং সেখানে আবার উত্তপ্ত হয়। সেকেণ্ডারী সিস্টেমের জল উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পে পরিণত হয় এবং তাতে বেশ কিছু পরিমাণ আর্দ্রতা থাকে। যাইহোক, ওই বাষ্প তখন যায় হিট এক্সচেঞ্জারের ঠিক ওপরে অবস্থিত একটি ষ্টীম ড্রামে। ড্রামের মধ্যে বাষ্পের ঐ আর্দ্রতাকে নষ্ট করে ফেলা হয় এবং শুকনো, সংপৃক্ত বাষ্পকে প্রধান ষ্টীম সেপারেটরের মধ্যে পাঠানো হয়। সেখান থেকে অধিকাংশ বাষ্প উচ্চ এবং নিম্ন-চাপ টারবাইনগুলির দিকে প্রবাহিত হয়। রিডাক্সান গিয়ারের মাধ্যমে সেগুলি একক প্রপেলারটিকে ঘোরায়। অবশিষ্ট বাষ্পকে পাঠানো হয় যে টারবাইনগুলি বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করে সেগুলির দিকে। পরিচালন টারবাইনগুলি এবং টার্বো-জেনারেটর-গুলির দিকে প্রবাহিত বাষ্প যথাক্রমে প্রধান ও সহায়ক কনডেনসারে পাঠানো হয়। সেখানে তা ঠাণ্ডা হয়ে আবার জলে পরিণত হলে সেই জলকে পাম্পের সাহায্যে হিট এক্সচেঞ্জারে ফেরৎ পাঠানো হয়।

আণবিক সাবমেরিন

১৯৫৪ সালের ২১শে জানুয়ারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগ সর্বপ্রথম আণবিক শক্তিচালিত ডুবোজাহাজ 'নটিলাস' চালনা করেন। তারপর আরও কতকগুলি আণবিক শক্তিচালিত ডুবোজাহাজ নির্মিত হয়েছে।

একটি আণবিক ডুবোজাহাজ পুনর্বার জ্বালানী না নিয়ে ৬০,০০০ মাইল বা তারও বেশী ভ্রমণ করতে পারে এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্যে জলের তলায় ডুবে থাকতে পারে।

আণবিক সাবমেরিন কিভাবে চলে

একটি মামুলী ডুবোজাহাজ থেকে আণবিক ডুবো-জাহাজের পার্থক্য নির্ণয় করে শেষোক্তের পাওয়ার প্ল্যাট। একটি ডুবোজাহাজের টারবাইনগুলিতে এবং প্রপেলার শ্যাফ্‌টে আণবিক শক্তি সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া যায় না। শক্তি সরবরাহের জন্যে একটি পরোক্ষ উপায়

আণবিক শক্তিচালিত বরফ ভাঙ্গার জাহাজ 'লেনিন'



অবলম্বন করা হয়। একটি আণবিক ডুবোজাহাজে আণবিক রিঅ্যাক্টরের চারিদিকে প্রবহমান জল পরমাণুর বিভিন্ন অংশে ভেঙ্গে পড়ার ফলে যে প্রচণ্ড শক্তি নিঃসৃত হয় তার দ্বারা অতিমাত্রায় উত্তপ্ত হয়। এই উত্তপ্ত বাষ্প তখন পাইপের মধ্যে দিয়ে হিট এক্সচেঞ্জার নামে একটি যন্ত্রে যায়। এখানে উত্তপ্ত বাষ্পসমন্বিত পাইপগুলি আরেকটি বদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে প্রবাহিত জল দ্বারা বেষ্টিত। এই দ্বিতীয় ব্যবস্থার মধ্যেকার জল যখন উত্তপ্ত পাইপগুলির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন তাও উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পে পরিণত হয়। এই বাষ্প একপ্রস্থ টারবাইনের পাখায় গিয়ে আঘাত করে এবং সেগুলি তখন প্রপেলার শ্যাফ্‌টকে ঘোরায়।

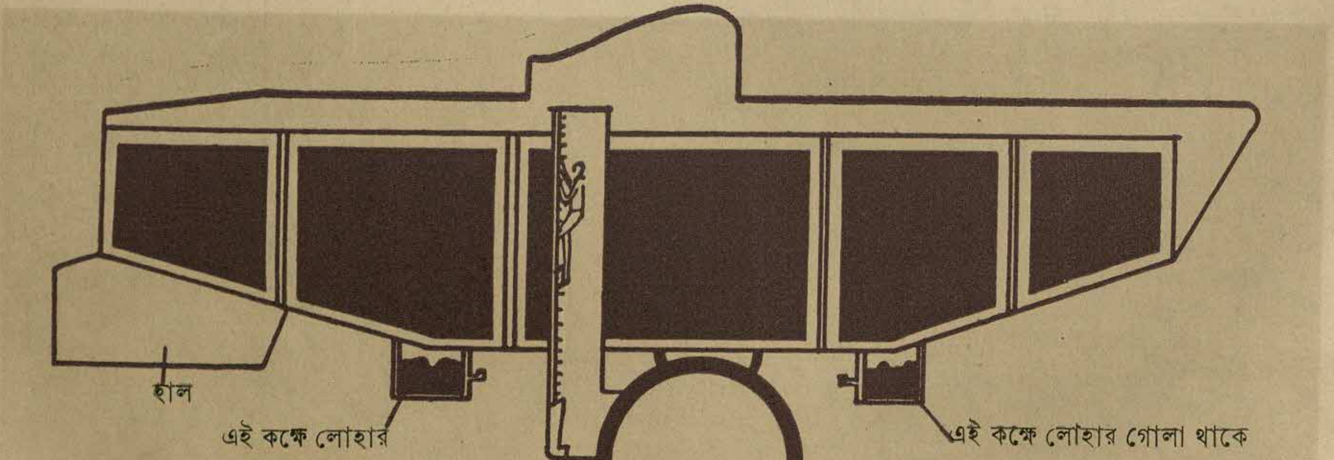
টারবাইনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হবার পর, বাষ্প ঠাণ্ডা হয় এবং আবার জলে পরিণত হয়। সেই জলকে আবার পাম্পের সাহায্যে হিট এক্সচেঞ্জারে পাঠানো হয়।

টারবাইন কতকগুলি বৈদ্যুতিক জেনারেটরকেও চালায়। এর ফলে যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়, তা দিয়ে ডুবোজাহাজের ভিতর আলোকিত করা, স্টোভ জ্বালানো ইত্যাদি নানা কাজ করা হয়।

ব্যাথিস্কেফ

সমুদ্রের গভীর তলদেশের বিচিত্র চমকপ্রদ জীবন এই শতাব্দীতে এক চিত্তাকর্ষক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে দেখা সম্ভব হয়েছে, তার নাম 'ব্যাথিস্ফিয়ার'। ১৯৩০ সালে চার্লস উইলিয়াম বীবি এটি নির্মাণ করেন। এটি ছিল একটি ভারী লৌহগোলক। তাতে লাগানো ছিল কোয়ার্টজ-এর জানালা। সমুদ্রের ওপর জাহাজ থেকে ক্রেনের সঙ্গে সংযুক্ত লোহার তৈরী মোটা দড়ি দিয়ে এটিকে সমুদ্রের গভীরে নামিয়ে দেওয়া হত। ব্যাথিস্ফিয়ার সমুদ্রের ৩,০০০ ফুট নীচে অবধি পৌঁছতে পেরেছিল। ১৯৪০-এর দশকে অগস্ত পিকার্ড নামে সুইজারল্যাণ্ডের এক পদার্থবিদ 'ব্যাথিস্কেফ' নামে আরও উন্নত ধরনের একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। সেটি নিজেই সমুদ্রের গভীরে যেতে পারত। ১৯৬০ সালে একটি উন্নত ধরনের ব্যাথিস্কেফ সমুদ্রের গভীরে প্রায় সাত মাইল নীচে নেমেছিল। ওই বছরের

ব্যাথিস্কেফের গঠন



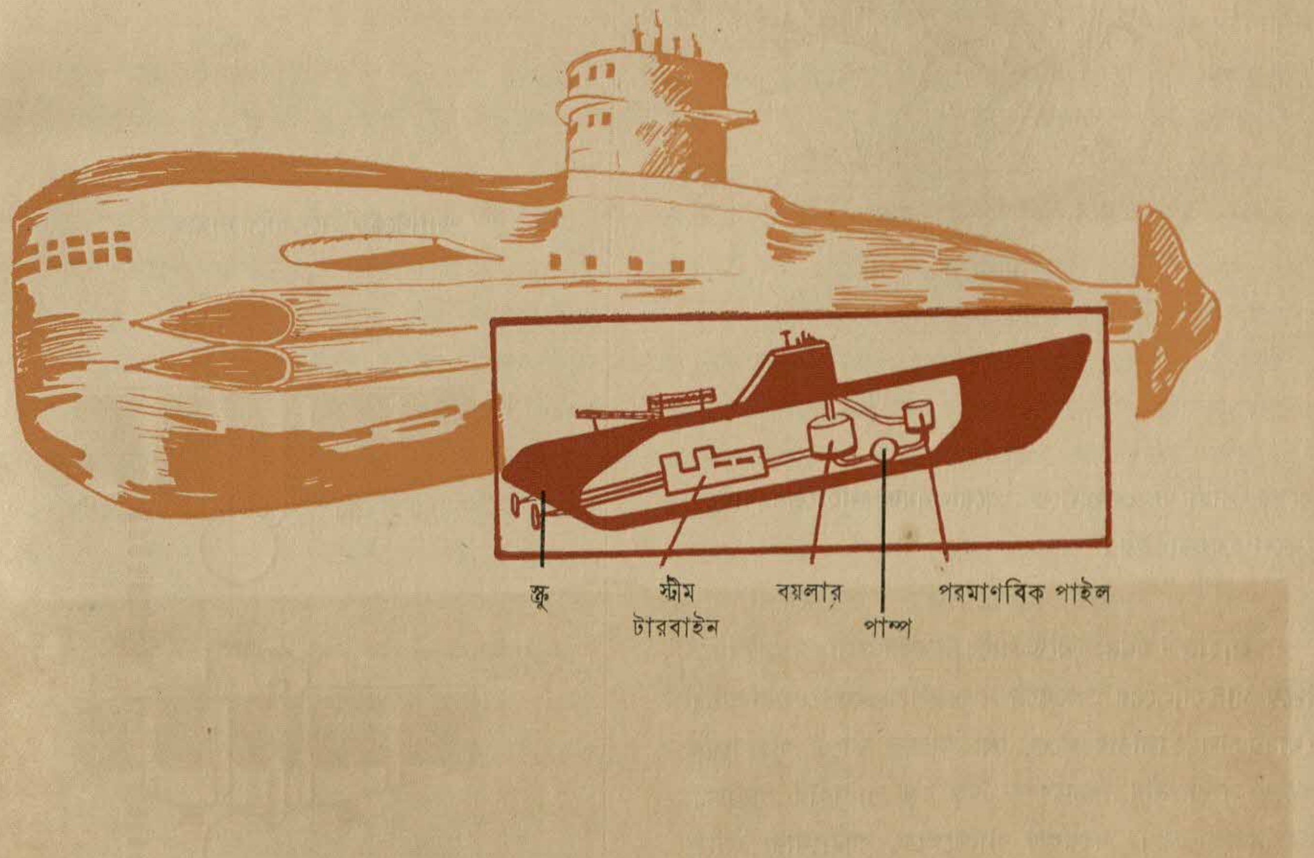
২২শে জানুয়ারী অগস্তের পুত্র জ্যাকুইস এবং ডন ওয়াল্‌শ নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর এক লেফটেন্যান্ট প্রশান্ত মহাসাগরে ৩৭,৮০০ ফুট নীচে নেমেছিলেন।

ব্যাথিস্কেফ কিভাবে চলে

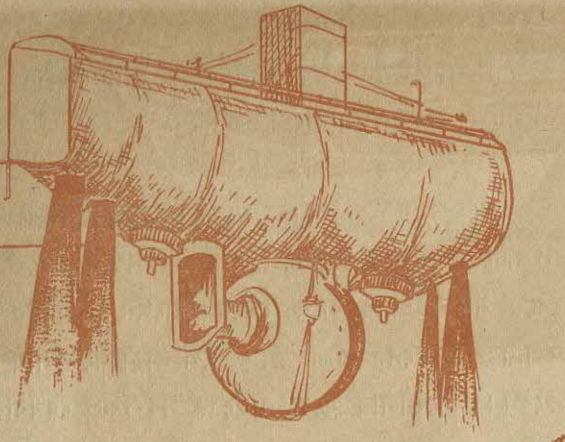
ব্যাথিস্কেফ হচ্ছে একটি পাতলা খোলের জাহাজ। এর ওপরে থাকে কনিং টাওয়ার বা যেখানে দাঁড়িয়ে ইত্যাদি ভারী জিনিসগুলিকে জাহাজ থেকে ফেলে দিয়ে অথবা গ্যাসোলিন বের করে দিয়ে ব্যাথিস্কেফকে ওপরে বা নীচে তোলা বা নামানো হয়।

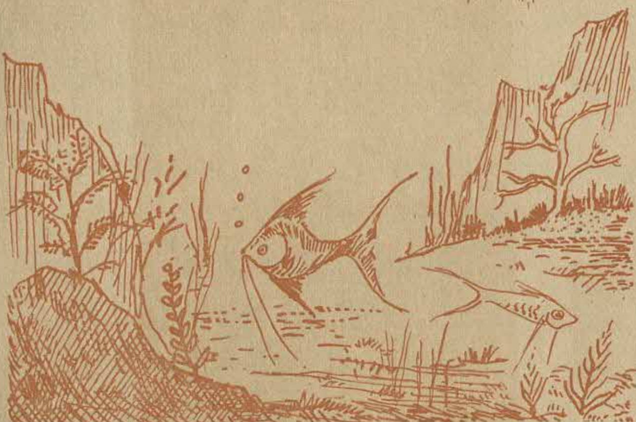
গণ্ডোলায় পৌঁছবার জন্যে নাবিকেরা প্রথমে কনিং টাওয়ারের ওপরে ওঠেন, তারপর সেখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে এয়ার লকে নেমে আসেন। এয়ার লকের তলায় পাটাতনের একটি ফাঁক খুলে তাঁরা গণ্ডোলায় প্রবেশ করেন। গণ্ডোলার মধ্যে বাইরের সব কিছু দেখবার জন্যে

নটিলাস



জাহাজ চালানো ও পর্যবেক্ষণের কাজ করা হয় এবং নীচে থাকে গণ্ডোলা নামে একটি লৌহ গোলক। জাহাজের খোল গ্যাসোলিন দিয়ে পূর্ণ থাকে। গ্যাসোলিন জল অপেক্ষা হাল্কা বলে এটি জাহাজকে ভাসিয়ে রাখতে পারে। সমুদ্রের জল ঢুকতে দিয়ে, ব্যালাস্ট বা লোহা, পাথর অনেকগুলি ছিদ্র থাকে। গণ্ডোলার মধ্যে থাকে কন্ট্রোল বোর্ড এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি। যে সব লোহার গোলা ব্যালাস্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ যেগুলি ফেলে দিলে জাহাজ আবার ওপরে উঠতে শুরু করে, সেগুলি সাইলো এবং খোলের তলায় বাক্সের মধ্যে থাকে। একটি চুম্বক



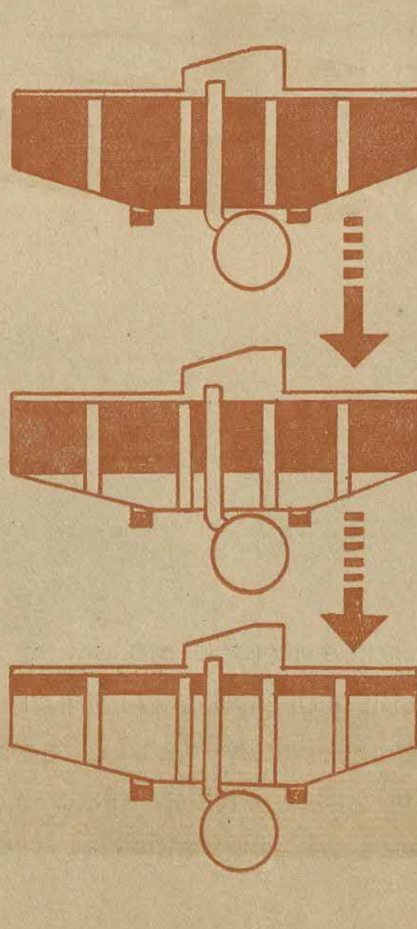


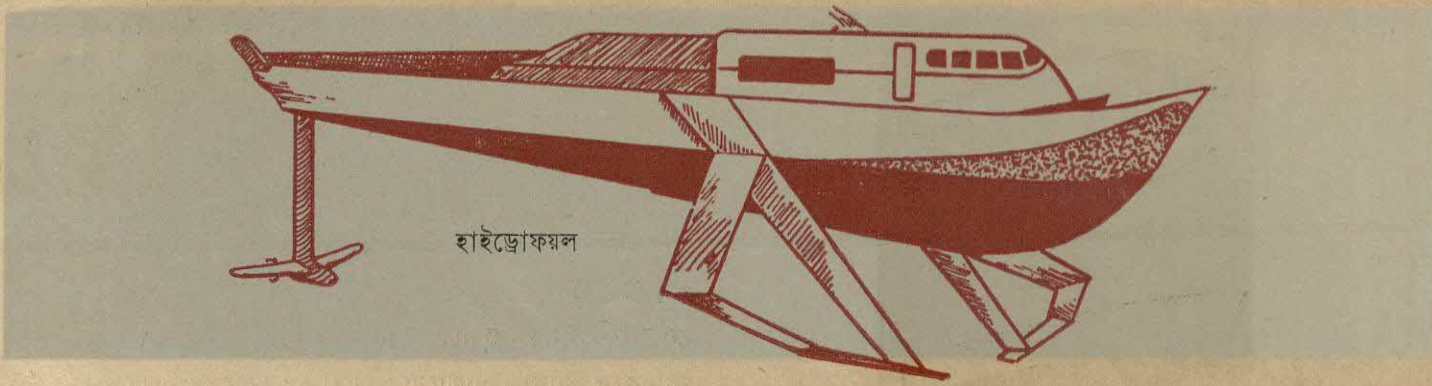
ব্যাথিস্কেফ

যন্ত্রের সাহায্যে সেগুলিকে প্রয়োজনমত জাহাজের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়।

জাহাজটি যখন ডুবতে থাকে, তখন তলার একটি ছিদ্র দিয়ে গ্যাসোলিনের প্রকোষ্ঠে সমুদ্রজল ঢুকতে দেওয়া হয়। মোটরগুলি চালাবার জন্যে এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্যে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি বড় বড় ব্যাটারীর সাহায্যে উৎপন্ন করা হয়। কয়েকটি ব্যাথিস্কেফে, কাঠামোর তলার দিকে যেখানে গণ্ডোলা লাগানো থাকে, সেখান থেকে একটি ভারী লোহার শিকল ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। জাহাজটি যখন ওপরে উঠতে চায়, তখন প্রথমে এই শিকলটি জাহাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। এই ভাবে হাল্কা হয়ে জাহাজটি ওপরে উঠতে শুরু করে এবং লোহার গোলাগুলি ক্রমে ক্রমে বাইরে ফেলে দিয়ে জাহাজটিকে ওপরে উঠতে সাহায্য করা হয়। যে জাহাজগুলিতে শিকল থাকে না, সে জাহাজগুলি লোহার গোলাগুলি ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ওপরে উঠতে থাকে।

ব্যাথিস্কেফ ধীরে ধীরে নামছে





হাইড্রোফয়ল

"পাখায় ভর দিয়ে যে নৌকা জলের মধ্যে দিয়ে ওড়ে"—হাইড্রোফয়ল নৌকার এই হচ্ছে সঠিক বর্ণনা। এর পাখা ফয়েল নামে পরিচিত।

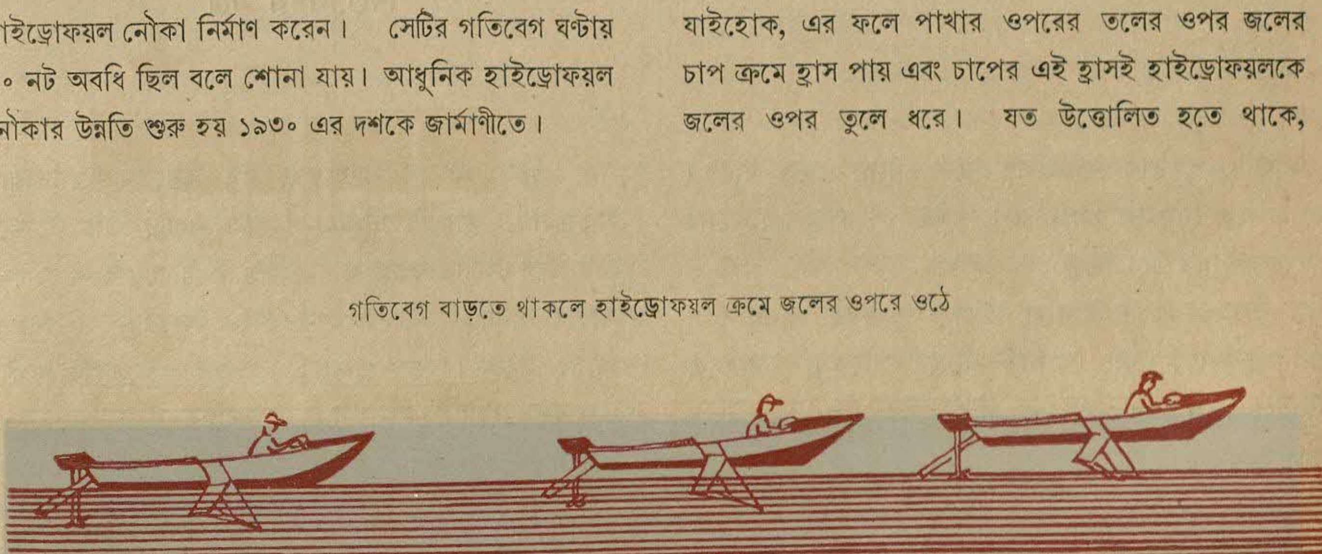
হাইড্রোফয়লের পরিকল্পনা বেশ কয়েক বছর আগেকার। ১৮৮৭ সালে কাউন্ট দ্য ল্যাম্বার্ট নামে একজন ফরাসী ভদ্রলোক সেন্ নদীর ওপর সর্বপ্রথম একটি পাখাওয়ালা নৌকা চালনা করেন। ১৯০৫ সালে ইউরিকো ফরলানিনি নামে একজন ইটালীয়ান ভদ্রলোক প্রথম একটি সফল হাইড্রোফয়ল নৌকা নির্মাণ করেন। সে নৌকাটির গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৪০ নট। ১৯১৯ সালে টেলিফোনের আবিষ্কর্তা আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল একটি ৫ টন ওজনের হাইড্রোফয়ল নৌকা নির্মাণ করেন। সেটির গতিবেগ ঘণ্টায় ৭০ নট অবধি ছিল বলে শোনা যায়। আধুনিক হাইড্রোফয়ল নৌকার উন্নতি শুরু হয় ১৯৩০ এর দশকে জার্মাণীতে।

হাইড্রোফয়ল নৌকা কিভাবে চলে

হাইড্রোফয়ল নৌকার পাখাগুলি নৌকার তলদেশ থেকে নীচের দিকে বিস্তৃত হয়ে একটি অবলম্বনের সঙ্গে সংযুক্ত। এতে দুজোড়া পাখা থাকে। একজোড়া স্থাপিত থাকে নৌকার ভারকেন্দ্রের সম্মুখে এবং অপর জোড়া থাকে নৌকার পশ্চাদ্ভাগের কাছে।

জলের মধ্যে দিয়ে হাইড্রোফয়ল নৌকা যখন অল্প বা সাধারণ গতিবেগে যায় তখন এমনি সাধারণ নৌকার মতই তার কাঠামোর কিছু অংশ জলের নীচে ডুবে থাকে। নৌকার গতিবেগ বাড়তে থাকলে পাখাগুলির ওপরের তল থেকে জল প্রতিসরিত হয়, ঠিক যেমন এরোপ্লেনের পাখার ওপরের তল থেকে বাতাস প্রতিসরিত হয়। যাইহোক, এর ফলে পাখার ওপরের তলের ওপর জলের চাপ ক্রমে হ্রাস পায় এবং চাপের এই হ্রাসই হাইড্রোফয়লকে জলের ওপর তুলে ধরে। যত উত্তোলিত হতে থাকে,

গতিবেগ বাড়তে থাকলে হাইড্রোফয়ল ক্রমে জলের ওপরে ওঠে





বিভিন্ন ধরনের হাইড্রোফয়ল

নৌচালনা

গভীর সমুদ্রে যেখানে দুধারের তীরভূমি চোখে পড়ে না, সেখানে জাহাজ চালানোকে বলে গভীর সমুদ্রে নৌবাহবিজ্ঞান। দুধারে তীরভূমির কোন চিহ্ন না থাকায় নাবিককে জাহাজ চালানোর জন্যে হয় নক্ষত্রের ওপর অথবা বেতার সঙ্কেতের ওপর নির্ভর করতে হয়।

নক্ষত্রের সাহায্যে নাবিক তাঁর জাহাজের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করতে পারেন। উত্তর মেরুতে যেমন মেরু নক্ষত্র ঠিক মাথার ওপরে থাকে, ঠিক তেমনই অন্যান্য নক্ষত্রগুলিও পৃথিবীর ওপরে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিরাজ করে। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রত্যেকটি নক্ষত্রের একটি অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমা থাকে যা ঠিক তার নীচের ভূপৃষ্ঠের অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমার অনুরূপ। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট নক্ষত্রকে ধরে নাবিক ঠিক তার নীচের ভূপৃষ্ঠের অবস্থানও সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেন। একমাত্র অসুবিধা হচ্ছে যে, পৃথিবী সর্বদাই তার অক্ষের ওপর ঘুরছে বলে নক্ষত্রগুলির অবস্থানও পাল্টে যাচ্ছে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট নক্ষত্রের অবস্থান এই বিষয়ে যে অভিধান আছে তা দেখে চট্ করে বের করা যায়।

দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র

নৌকার সম্মুখভাগ তত জলের থেকে ওপরে উঠতে থাকে। অবশেষে নৌকার সমস্ত তলদেশটিই পরিষ্কারভাবে জলের তলের ওপরে উঠে পড়ে।

গতি কমতে থাকলে, পাখার ওপরের তলের চাপ বাড়তে থাকে এবং নৌকাটি নামতে থাকে। অবশেষে, হাইড্রোফয়ল আবার সাধারণ নৌকার মত জলের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে।

প্রথম আমলে নাবিকেরা পথ চিনতেন ধ্রুবতারার সাহায্যে। তারপর চীনারা বিশাল সমুদ্রে জাহাজ নিয়ে ঠিক পথে চলবার জন্যে প্রথম দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র বা কম্পাসের সাহায্য নেন। তাঁদের কাছ থেকে আরবরা এই বিদ্যাটি আয়ত্ব করেন। সে প্রায় ৯০০ বছর আগেকার কথা। তারপর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরবদের কাছ থেকে এই বিদ্যাটি শিখে নেন ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারী ইউরোপীয়রা।

চীনাদের নির্মিত দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রটি ছিল এক বাটি জলের মধ্যে খড়ের গাদার ওপর স্থাপিত একটি চুম্বকধর্মী

সূঁচ। আজকাল চৌম্বক দিঙ্ নির্ণয় যন্ত্রে একটি চুম্বক এমন মুক্তভাবে ঝোলানো থাকে যে, তা উত্তর চৌম্বক মেরুর দিকে আকর্ষিত হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, যে কোন চুম্বক যদি মুক্তভাবে ঝোলানো থাকে তবে স্থির অবস্থায় তা উত্তর চৌম্বক মেরুর দিকে মুখ করে থাকবে। চুম্বকের প্রত্যেকটি প্রান্তকে বলে মেরু। তাদের একটির নাম উত্তর মেরু এবং অপরটির নাম দক্ষিণ মেরু। চুম্বকের বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। পৃথিবী নিজেই এক বিরাট শক্তিশালী চুম্বক, সেইজন্যেই চুম্বকের সাহায্যে দিঙ্ নির্ণয় করা সম্ভব।

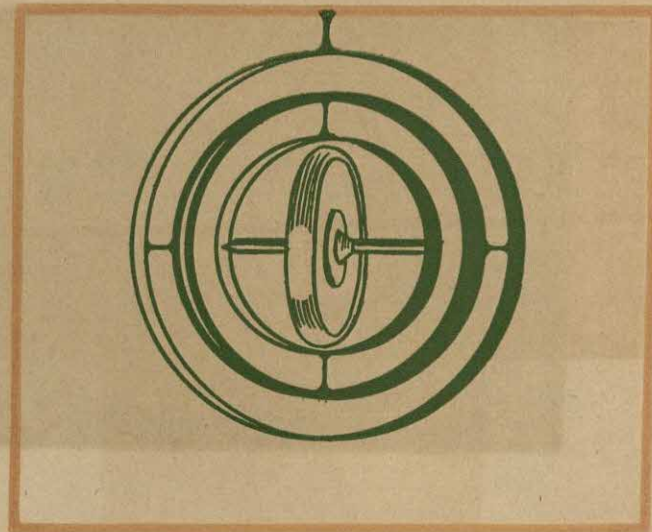
দিঙ্ নির্ণয় যন্ত্রের প্রধান চারিটি দিক হচ্ছে উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিম। এগুলিকে কার্ডিন্যাল পয়েন্ট বা প্রধান চারিটি দিক বলে। এই দিকগুলির মাঝামাঝি আরও চারিটি দিক আছে—উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম। এ ছাড়াও দিঙ্ নির্ণয় যন্ত্র আরও আটটি দিকে বিভক্ত—উত্তর-উত্তরপূর্ব, পশ্চিম-দক্ষিণপশ্চিম, ইত্যাদি। এগুলিও আবার বিভিন্ন দিকে বিভক্ত।

আজকাল দিঙ্ নির্ণয় যন্ত্রে এই সমস্ত দিকগুলি নির্দেশ করা থাকে না। তার পরিবর্তে দিঙ্ নির্ণয় যন্ত্রগুলিতে আটটি প্রধান দিক নির্দেশ করা থাকে এবং তারা আবার ৩৬০টি ডিগ্রিতে বিভক্ত করা থাকে। প্রত্যেকটি ডিগ্রি ৬০ মিনিটে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি মিনিট ৬০ সেকেণ্ডে বিভক্ত।

চৌম্বক দিঙ্ নির্ণয় যন্ত্রের কাছে কোন ধাতব পদার্থ থাকলে হিসাব গোলমাল হয়ে যেতে পারে—এর নাম বিচ্যুতি। দীর্ঘপথ ভ্রমণের সময় এই ধরনের সামান্য বিচ্যুতিই জাহাজের গতিমুখ অনেক বদলে দিতে পারে। সেইজন্যে বিশেষ গণনার সাহায্যে এই ধরনের ভুলকে সংশোধন করা হয়।

আজকাল বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে আরও নিখুঁত ধরনের চুম্বক ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কোন কারণে বিদ্যুৎশক্তির সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে এই ধরনের চুম্বক অকেজো হয়ে পড়ে। সেইজন্যে চৌম্বক দিঙ্ নির্ণয় যন্ত্রের ব্যবস্থা সব জাহাজেই থাকে।

আজকাল জাহাজে, উড়োজাহাজে ও জরিপের কাজে দিঙ্ নির্ণয় যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।



জাইরোকম্পাস

জাইরোকম্পাস

চৌম্বক দিঙ্ নির্ণয় যন্ত্রের বিচ্যুতির সমস্যার জন্যে আধুনিক জাহাজ, উড়োজাহাজ এবং ডুবোজাহাজগুলি (বিশেষতঃ আণবিক সাবমেরিনের পক্ষে এটি অপরিহার্য) জাইরোকম্পাস ব্যবহার করে।

জাইরোকম্পাসের কথা জানতে হলে প্রথমে জাইরো-স্কোপের কথা জানতে হবে। তোমাদের মধ্যে যারা সাইকেলে চড়তে জান তারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ যে, সাইকেল যখন বেশ দ্রুত চলে তখন তাকে আয়ত্বে রাখা বেশ সহজ; কিন্তু সাইকেলের গতিবেগ কম হলে তাকে ঠিকভাবে চালান কষ্টসাধ্য। ঘুরন্ত লাট্টু দেখেছ? সেটি যখন ঘোরে তখন সেটি আলের ওপর খাড়া হয়ে থাকে; কিন্তু গতি কমে গেলেই সেটি ঘুরপাক খেয়ে পড়ে যায়। এই দুটি উদাহরণ থেকে একথাই বোঝা যায় যে, যে সমস্ত জিনিস সহজেই পড়ে যায়, তাদের মধ্যে কোনক্রমে গতি সঞ্চারিত করে দিলে তারা খাড়া হয়ে থাকে। এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই জাইরোকম্পাসের সৃষ্টি।



জাইরোকম্পাসের অক্ষদণ্ডটি সর্বদাই ভৌগলিক উত্তর-দক্ষিণ দিক নির্দেশ করে

জাইরোস্কোপ যন্ত্র একটি অক্ষদণ্ডের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান একটি ভারী চক্র মাত্র। এই চাকাটি একই মুখে ঘুরতে থাকে যদি না জোর করে তার ঘোরার গতিমুখ বদলে দেওয়া হয়। জাইরোকম্পাসে চাকাটি এমনভাবে স্থাপিত থাকে যে, তার অবলম্বনগুলির অবস্থান পরিবর্তন হলেও তা চাকায় সঞ্চারিত হয় না। সাধারণতঃ বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে চক্রটি সমভাবে আবর্তিত হতে থাকে; আর ওই আবর্তিত চক্রসমেত অক্ষদণ্ডটি সেই নির্দিষ্টমুখী হয়েই স্থির থাকে।

জাইরোকম্পাসে জাইরোস্কোপের সাহায্যে ভৌগলিক দিক সহজেই নির্ণীত হয়। চুম্বকক্ষেত্র জাইরোকম্পাসের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এটিকে একবার স্থিরভাবে স্থাপন করলে, এর অক্ষ সর্বদাই ভৌগলিক উত্তর দিকে মুখ করে থাকে, চৌম্বক উত্তর দিকে নয়। চৌম্বক দিঙ্ নির্ণয় যন্ত্র অপেক্ষা জাইরোকম্পাস ব্যবহারের সুবিধা এই কারণেই বেশী।

জাইরোস্কোপের ভারী ঘূর্ণ্যমান চাকাটি গিমবল নামে একটি আংটির মত গোল জিনিসের মধ্যে কীলকের সাহায্যে মুক্ত ভাবে ঝোলানো থাকে। ওই প্রথম গিমবলটি আবার তার সমকোণে স্থাপিত আর একটি গিমবলের মধ্যে থাকে। এর ফলে জাইরোস্কোপটি উঁচু-নীচু যে কোন তলেই শূন্যে মুক্তভাবে ঝুলে থাকতে পারে। গিমবলগুলি এইভাবে স্থাপিত থাকার ফলে সেগুলি যেদিকেই ঘুরে যাক না কেন, চাকাটিকে যেদিকে মুখ করে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটি সেইদিকে মুখ করেই ঘুরতে থাকে।

জাইরোকম্পাসের সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে যে, তার চাকাটির অক্ষটিকে একটি নির্দিষ্ট দিকে মুখ করে চাকাটিকে ঘুরিয়ে দিলে, গিমবলগুলির অবস্থান পরিবর্তন সত্ত্বেও সেটি সেইদিকে মুখ করেই থাকে। সুতরাং জাইরো-কম্পাসের কাঁটাটিকে একবার ভৌগলিক উত্তর দিকে মুখ করে স্থাপন করলে, সেটি যতক্ষণ ঘুরবে ততক্ষণ সেইদিকে মুখ করেই থাকবে। ফলে সহজেই দিঙ্ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা অসীম। এর সাহায্যে চালকহীন বিমান, রকেট, টর্পেডো প্রভৃতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অভীষ্ট লক্ষ্যবস্তুর দিকে চালিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

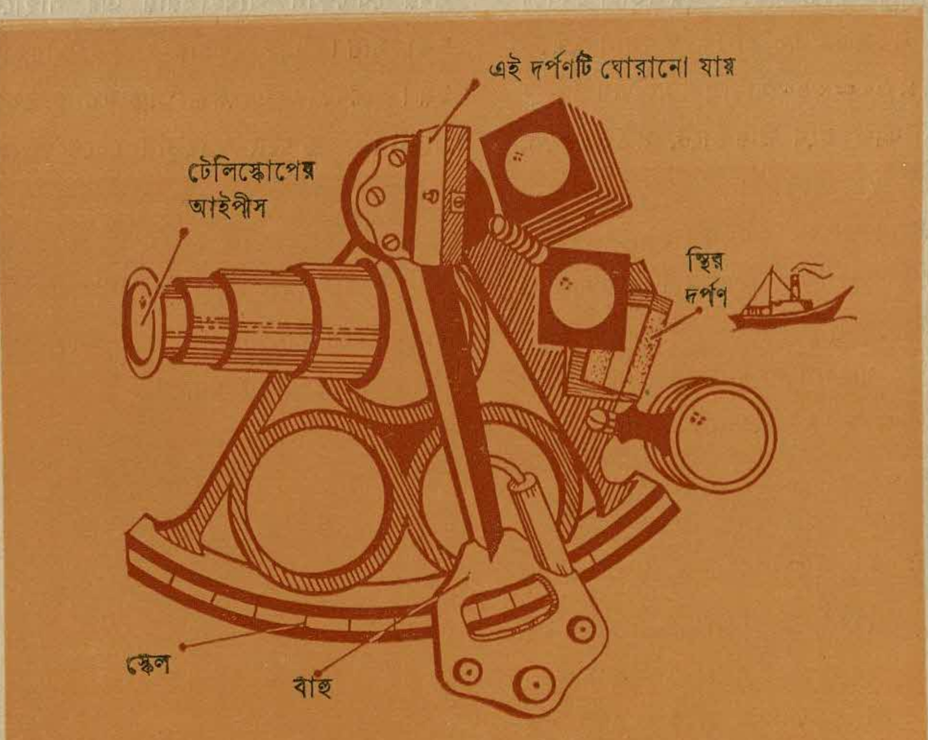
সেক্সট্যাণ্ট

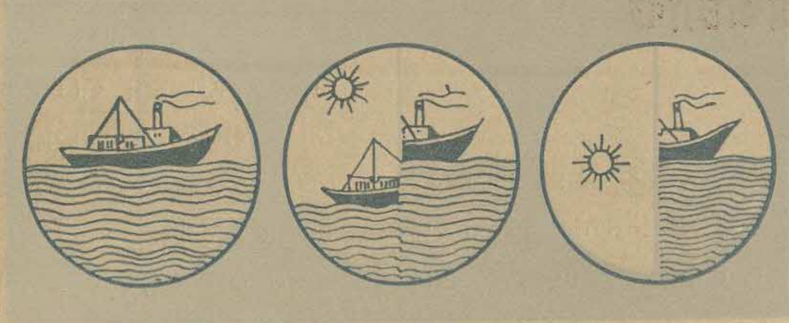
সাধারণতঃ ভূপৃষ্ঠ থেকে সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের কৌণিক উচ্চতা পরিমাপের জন্যে সেক্সট্যাণ্ট যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এর সাহায্যে কোন জ্যোতিষ্ক পৃথিবীর দিঙ্‌মণ্ডলের কত ডিগ্রি উঁচুতে রয়েছে তার পরিমাণ যে কোন সময়ে সহজেই মাপা যায়। সেক্সট্যাণ্টের সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট নক্ষত্রের কৌণিক উচ্চতা পরিমাপ করে নাবিক নক্ষত্রটির ভৌগলিক অবস্থান থেকে তাঁর দূরত্ব সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন।

সেক্সট্যাণ্ট যন্ত্রের সংলগ্ন একখানি দর্পণ ঘুরিয়ে কোন নক্ষত্রের আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করা হয়। ওই প্রতিফলিত আলোকরশ্মিকে আবার অপর একখানি স্থির-সংবদ্ধ দর্পণে প্রতিফলিত করা হয়। এই প্রতিফলনের ফলে প্রতিবিম্বিত নক্ষত্রটি যন্ত্রের মধ্যে পৃথিবীর দিঙ্‌মণ্ডলে অবস্থিত বলে মনে হয়। ওই প্রথম দর্পণখানিকে যত ডিগ্রি ঘুরিয়ে স্থির দর্পণে নক্ষত্রটির প্রতিফলিত রশ্মি দেখা যাবে, দিঙ্‌মণ্ডল থেকে নক্ষত্রটি তত ডিগ্রি কৌণিক উচ্চতায় অবস্থিত হবে। যন্ত্রের সঙ্গে সংলগ্ন বৃত্তাংশে চিহ্নিত স্কেল থেকে ওই সব ডিগ্রির পরিমাণ সঙ্গে সঙ্গে স্থির করা সম্ভব।

ধর, একটি নক্ষত্র জেনিথ বা খমধ্য থেকে দশ ডিগ্রি কোণে অবস্থিত। এখন প্রত্যেক ডিগ্রি মানে ৬০ সামুদ্রিক মাইল; সুতরাং নক্ষত্রটির ভৌগলিক অবস্থান থেকে নাবিকের দূরত্ব ১০ × ৬০ = ৬০০ সামুদ্রিক মাইল।

সেক্সট্যাণ্ট





সেক্সট্যান্টের ব্যবহার। সূর্যের প্রতিবিম্ব দুটি দর্পণ থেকে প্রতিফলিত হয়। আইপীসের মধ্যে দিয়ে সোজাসুজি দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দিগন্তের সমান্তরাল অংশটিকে বের করা হয়। সূর্যকে যতক্ষণ না দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ওপরের আয়নাটিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সূর্যের উত্তোলন কোণটিকে বের করা হয়। আয়নাটি ঘোরাতে থাকলে স্কেলের গায়ে লিভারটিও ঘুরতে থাকে এবং সূর্যের অবস্থান জানা হলে স্কেলের গায়ে অঙ্কিত চিহ্ন দেখে জাহাজের সঠিক অবস্থান বের করা হয়।

এর পরবর্তী ধাপ হচ্ছে অন্য দ্বিতীয় একটি নক্ষত্রের ভৌগলিক অবস্থান থেকে জাহাজের দূরত্ব নিরূপণ করা। এই দ্বিতীয় নক্ষত্রটি যদি খমধ্য থেকে ছয় ডিগ্রি কোণে অবস্থিত হয় তাহলে নক্ষত্রটির ভৌগলিক অবস্থান থেকে জাহাজের দূরত্ব হবে ৬×৬০=৩৬০ সামুদ্রিক মাইল।

এখন নাবিকের কাজ হবে তাঁর চার্টে, সঠিক স্কেলে, দুটি বৃত্ত আঁকা। এই দুটি বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ হবে যথাক্রমে ৬০০ এবং ৩৬০ মাইল। তখন ওই বৃত্ত দুটি যে বিন্দুতে ছেদ করেছে তা থেকে জাহাজের অবস্থান নিরূপিত হয়। বস্তুতঃ বৃত্ত দুটি পরস্পরকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে, কিন্তু সম্ভাব্য অবস্থান দুটির ব্যবধান বেশ কয়েক শ' মাইল হয় বলে নাবিকের পক্ষে সঠিক অবস্থানটি নিরূপণ করতে কোন কষ্টই হয় না।

নৌবাহবিজ্ঞানে আর একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্রের নাম ক্রোনোমিটার। এটি সময়-নিরূপক এক রকম ঘড়ি। ক্রোনোমিটারের সময় গ্রীনউইচের সময়ের সঙ্গে মেলানো থাকে।

গ্রহ-নক্ষত্রাদি যতক্ষণ দৃষ্টিগোচর থাকে ততক্ষণ এই সব যন্ত্র কাজে দেয়। কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে সূর্য ইত্যাদি জ্যোতিষ্ক দেখা যায় না এবং এই সমস্ত যন্ত্রও তখন অকেজো হয়ে পড়ে। এখন বেতারের সাহায্যে এই অসুবিধা দূর করা সম্ভব হয়েছে। দিন-রাত্রি সব সময় যে কোন আবহাওয়ায় এর সাহায্যে সঙ্কেত প্রেরণ করা যায়। এই বেতার সঙ্কেত তীরভূমি থেকে পাঠানো হয়। বেতার তরঙ্গের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। সুতরাং তীরভূমি থেকে জাহাজে সে সঙ্কেত পৌঁছতে যে সময় নেয় তা নগণ্য। কিন্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে দুটি বেতার তরঙ্গ পৌঁছবার মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধানও লক্ষ্য করা সম্ভব এবং সময়ের ওই মধ্যবর্তী ব্যবধান হিসাব করে জাহাজের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করাও সম্ভব হয়েছে।

ভারতীয় জলপথ

সুদূর অতীতে ভারতীয় জাহাজ পণ্য নিয়ে বিদেশের বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়াত। পোত নির্মাণের গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী ছিল ভারতবর্ষ। ব্রিটিশ পদদলিত হওয়ার পরেও ভারতে তৈরী জাহাজ ট্রাফালগারের বিখ্যাত নৌযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। নাভারিণোতে স্যার এডওয়ার্ড কর্ডিংটনের ফ্ল্যাগ শিপ নিরানব্বই কামানওয়ালা এইচ. এম. এস. 'গ্যান্‌জেস' বোম্বাই-র ডক ইয়ার্ডে তৈরী হয়েছিল।

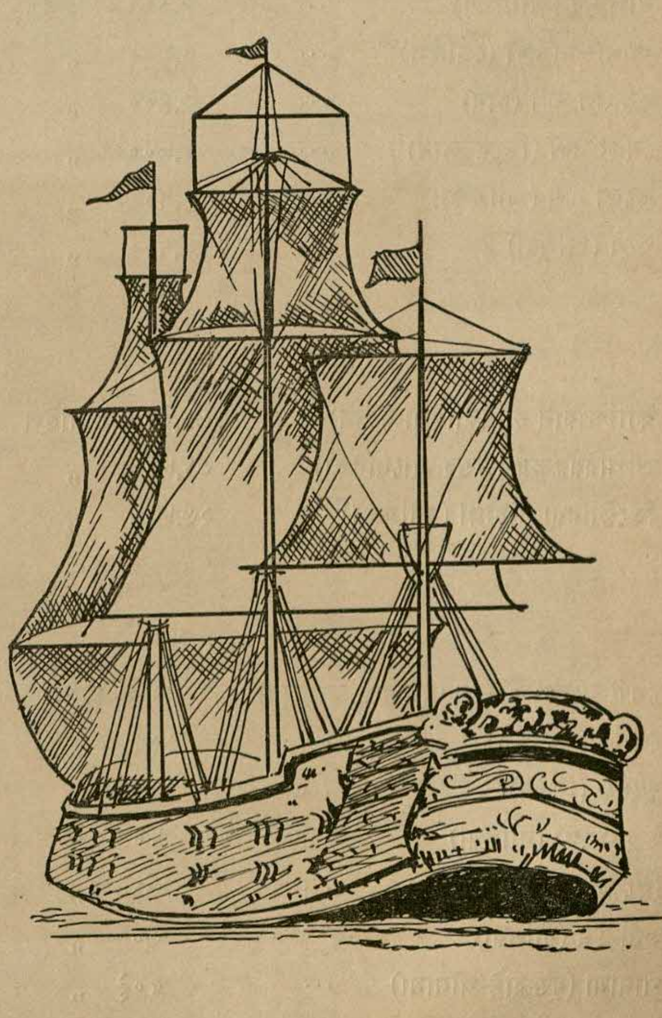
ইংরেজ জাহাজ নির্মাতাদের স্বার্থের খাতিরে ভারতবর্ষে পোত নির্মাণ ১৮৩১ সালে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮৬০ সাল থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে ১০২টি কোম্পানী ভারতবর্ষে জাহাজী ব্যবসায় নিযুক্ত ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় শিল্পপতিরা উদ্যোগী হলেন ভারতবর্ষের পাঁচ হাজার বছরের পুরনো ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করবার জন্যে। ১৯১৯ সালের ৫ই এপ্রিল প্রথম ভারতীয় যাত্রীবাহী জাহাজ এস. এস. 'লিবার্টি' বোম্বাই থেকে রওনা হয় ইংল্যাণ্ড অভিমুখে।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে ১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী ১১টি ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর মালিকানায় মাত্র ৪২টি স্টীমার ছিল। এগুলি সমস্তই উপকূল বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল। তারপর একুশ বছরের মধ্যে ১৯৬৭ সালের ৩১শে জানুয়ারী ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর মালিকানায় জাহাজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৩২টি।

আধুনিককালে ১৯১৯ সালে সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী ভারতবর্ষে প্রথম জাহাজ নির্মাণ শুরু করেন।

১৯৪১ সালের ২১শে জুন বিশাখাপত্তনমে প্রথম ভারতীয় জাহাজ নির্মাণের কারখানাটি স্থাপিত হয়। ১৯৪৬ সালে কাজ শুরু করে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে এই কোম্পানী তাঁদের নির্মিত প্রথম জাহাজ 'জল-উষা' জলে ভাসান। ১৯৫২ সালে ভারত সরকার এই কারখানাটি ক্রয় করে তার পরিচালনভার গ্রহণ করেন। জাপানের একটি কোম্পানীর সহযোগিতায় ভারত সরকার কোচিনে আর একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপন করেছেন।

ভারতবর্ষের উপকূলরেখা হচ্ছে ৫,৬৯০ কিলোমিটার। এই সমগ্র উপকূলে বড় বন্দর আছে আটটি—কলিকাতা, পারাদীপ, বিশাখাপত্তনম, মাদ্রাজ, কোচিন, বোম্বাই, মোরমুগাঁও এবং কাণ্ডলা। মাঝারি ও ছোট বন্দরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে টিউটিকোরিন, পোরবন্দর, ভবনগর, বেদি, ভারভাল, ওখা, মাণ্ডভী, সুরাট, দ্বারকা, ম্যাঙ্গালোর, কোজিকোড, কারওয়ার, কালিকট, আলেপ্পি, চন্দাবলী, কুইলন, নাগাপাত্তিনাম, কাঁকিনাড়া, কারিকল, পণ্ডিচেরী এবং ভাটকাল।



মহাসাগর

প্রশান্ত মহাসাগর	...	৬৩,৮০১,৬৬৮ বর্গমাইল
আটল্যান্টিক মহাসাগর	...	৩১,৮৩৯,৩০৬ "
ভারত মহাসাগর	...	২৮,৩৫৬,২৭৬ "
সুমেরু মহাসাগর	...	৫,৪৪০,১৯৭ "

সাগর

মালয় সাগর	...	৩,১৪৪,০৫৩ বর্গমাইল
ক্যারিবিয়ান সাগর	...	১,০৬৩,৩৪০ "
ভূমধ্য সাগর	...	৯৬৬,৭৫৭ "
দক্ষিণ চীন সাগর	...	৮৯৫,৪০০ "
বেরিং সাগর	...	৮৭৫,৭৫৩ "

নদী

নীল নদ (আফ্রিকা)	...	৪,১৬০ মাইল
আমাজান নদী (ব্রেজিল)	...	৩,৯০০ "
ইয়াংসি নদী (চীন)	...	৩,৪০০ "
মেকং নদী (ভিয়েতনাম)	...	২,৮০০ "
কঙ্গো নদী (আফ্রিকা)	...	২,৭১৮ "
ওবে (রাশিয়া)	...	২,৭০০ "

হ্রদ

ক্যাস্পিয়ান হ্রদ (রাশিয়া-ইরান)	...	১৬৯,৩০০ বর্গমাইল
সুপিরিয়র হ্রদ (উত্তর আমেরিকা)		৩১,৮২০ "
ভিক্টোরিয়া নায়াঞ্জা (আফ্রিকা)	...	২৬,৮২৮ "

খাল

সেন্ট লরেন্স সীওয়ে (যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা)		১৮৯ মাইল
গোটা (সুইডেন)	...	১১৫ "
সুয়েজ (মিশর)	...	১০০.৬ "
ভল্গা-মস্কো (রাশিয়া)	...	৮০ "
কিয়েল (জার্মানী)	...	৬১ "
ভল্গা-ডন (রাশিয়া)	...	৬০ "
পানামা (যুক্তরাষ্ট্র-পানামা)	...	৫০½ "

যাত্রীবাহী জাহাজ

কুইন এলিজাবেথ (ইংল্যাণ্ড)	...	৮৩,৬৭৩ টন
কুইন মেরী (ইংল্যাণ্ড)	...	৮১,২৩৭ "
ফ্রান্স (ফ্রান্স)	...	৬৬,৩৪৮ "
ইউনাইটেড স্টেটস (যুক্তরাষ্ট্র)	...	৫২,০৭২ "
লিবার্টি (ফ্রান্স)	...	৫১,৮৩৯ "
ক্যানবেরা (ইংল্যাণ্ড)	...	৪৫,৭৭৩ "
মাইকেলএঞ্জেলো (ইটালী)	...	৪৩,০০০ "
রফেলো (ইটালী)	...	৪৩,০০০ "
ওরিয়ানা (ইংল্যাণ্ড)	...	৪১,৯১৫ "
রটারড্যাম (নেদারল্যাণ্ডস)	...	৩৮,৬৪৫ "

তৈলবাহী জাহাজ

টোকিও মারু (জাপান)	...	১,৫০,০০০ টন
নিশো মারু (জাপান)	...	৭৪,৮৬৮ "
ইউনিভার্স ডাফেন (লাইবেরিয়া)		৭২,২৬৬ "
ইউনিভার্স এপোলো (লাইবেরিয়া)		৭২,১৩২ "
ম্যানহাটান (যুক্তরাষ্ট্র)	...	৬৫,৭৪০ "
মোবিল ব্রিলিয়াণ্ট (ইংল্যাণ্ড)	...	৫৮,২১১ "
মোবিল ডেলাইট (ইংল্যাণ্ড)	...	৫৮,১৫৩ "
মোবিল কমেট (ইংল্যাণ্ড)	...	৫৮,০৫৭ "
মোবিল অ্যাস্ট্রাল (ইংল্যাণ্ড)	...	৫৮,০০০ "
নেস চ্যাম্পিয়ান (ইংল্যাণ্ড)	...	৫৪,৭৪৯ "

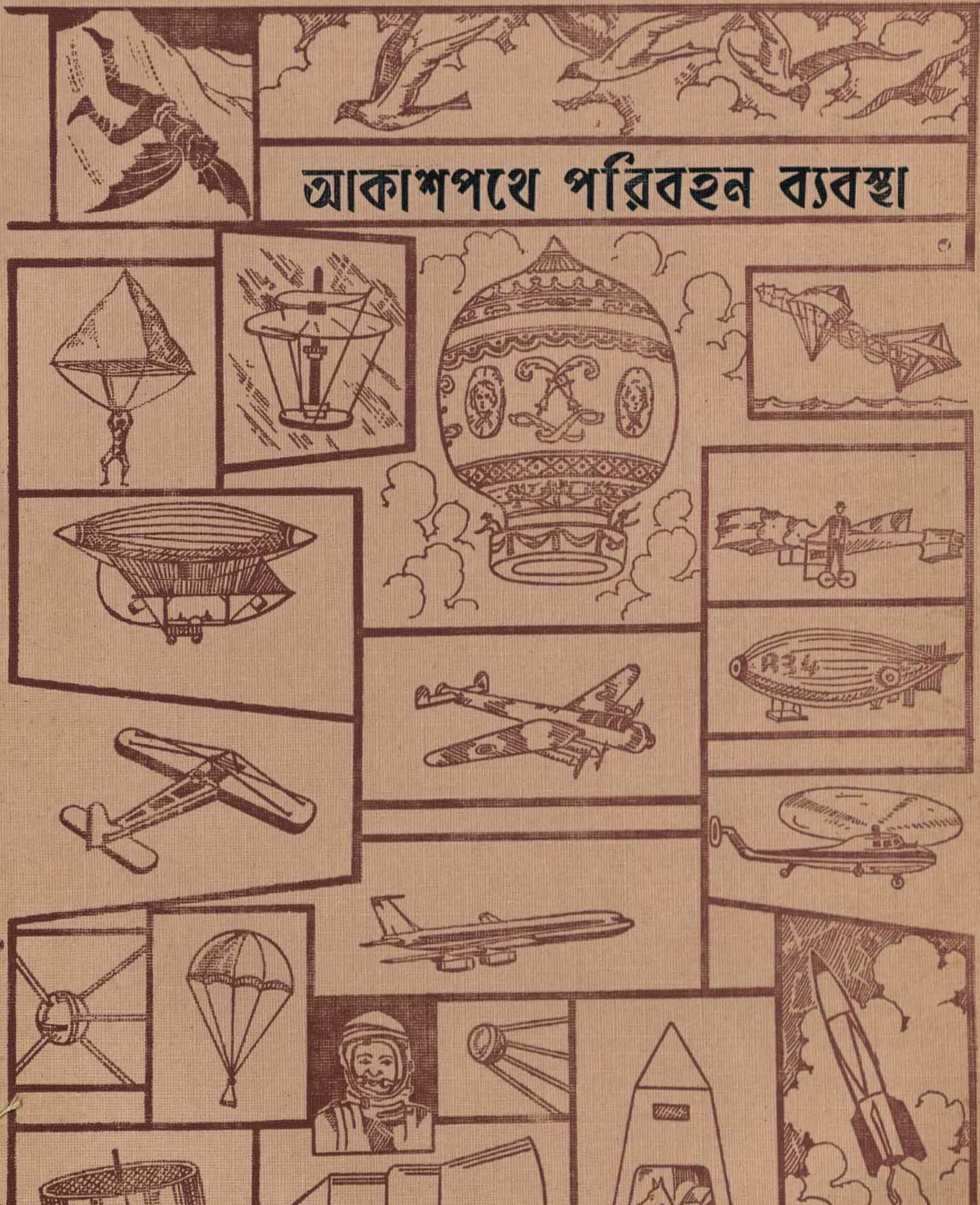
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বন্দর

নিউইয়র্ক বন্দর (যুক্তরাষ্ট্র)

সর্বাপেক্ষা উচ্চ লাইটহাউস

বিশপ রক (ইংল্যাণ্ড)	...	১৪৬ ফুট উঁচু

আকাশপথে পরিবহন ব্যবস্থা



আকাশপথে পরিবহন ব্যবস্থা

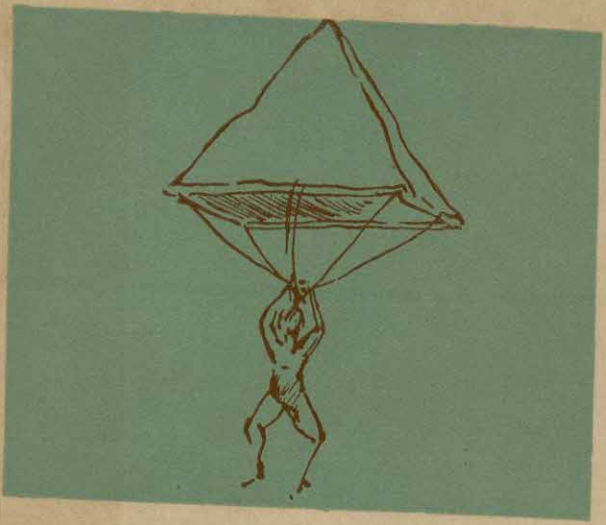
এরোপ্লেন

চিরকাল কৌতূহলই মানুষের মনে জাগিয়েছে আবিষ্কারের প্রেরণা। গুহা আবিষ্কার করার পর থেকে মানুষের সন্ধানী মনে কৌতূহল জেগেছে গুহার চারিদিকের পরিবেশ সম্পর্কে। এই নতুন-কিছু-জানার নেশায় সে অতিক্রম করেছে পাহাড়-পর্বত, আবিষ্কার করেছে নতুন দেশ, পাড়ি দিয়েছে মহাসাগর। কিন্তু জানার কোন শেষ হয় নি।

হাজার হাজার বছর আগে, পাখীদের আকাশে উড়ে বেড়ানো দেখে মানুষের মনে জাগে আকাশ-জয়ের কল্পনা। ভেবেছে নকল ডানা লাগিয়ে তারাও আকাশে পাখীদের মতই ভেসে বেড়াতে পারবে। কিন্তু পৃথিবীর মানুষের পক্ষে তা শুধু কল্পনাই রয়ে যায়। তার এই কল্পনা প্রকাশ পায় রূপকথায় ও পৌরাণিক কাহিনীতে। তবু মানুষ নকল ডানা লাগিয়ে আকাশে ওড়ার বাসনাকে ত্যাগ করতে পারে না। পরীক্ষা চালাতে গিয়ে আসে শুধুই ব্যর্থতা। কিন্তু তবু মানুষের সেই চিরন্তন কৌতূহল জাগিয়ে রাখে তার আকাশ-জয়ের কল্পনাকে।

পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত বিমান





লিওনার্ডোর প্যারাসুটের কল্পনা

আকাশ-জয়ের প্রচেষ্টার পথপ্রদর্শক

প্রথম বিজ্ঞানী যিনি আকাশে ওড়ার কল্পনাকে সার্থক রূপ দিতে এগিয়ে আসেন, তিনি হলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইতালীয় মনীষী লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি। লিওনার্ডো ছিলেন চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, ইঞ্জিনীয়ার, আবিষ্কর্তা ও বিজ্ঞানী। পাখীদের আকাশপথে গতিবিধি তিনি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। বাতাস সম্পর্কেও তিনি গবেষণা করেন। অনেক পরীক্ষার পর তিনি একটি ডানা-ঝাপটানো যন্ত্র তৈরী করেন। লিওনার্ডো মনে করতেন হাত আর পায়ের সাহায্যে এ ধরনের যন্ত্র চালিয়ে মানুষ উড়তে পারবে। কিন্তু তাঁর তৈরী ডানা-ঝাপটানো যন্ত্র কোনদিনই আকাশপথে পাড়ি দিতে পারেনি। নকল ডানা লাগিয়ে



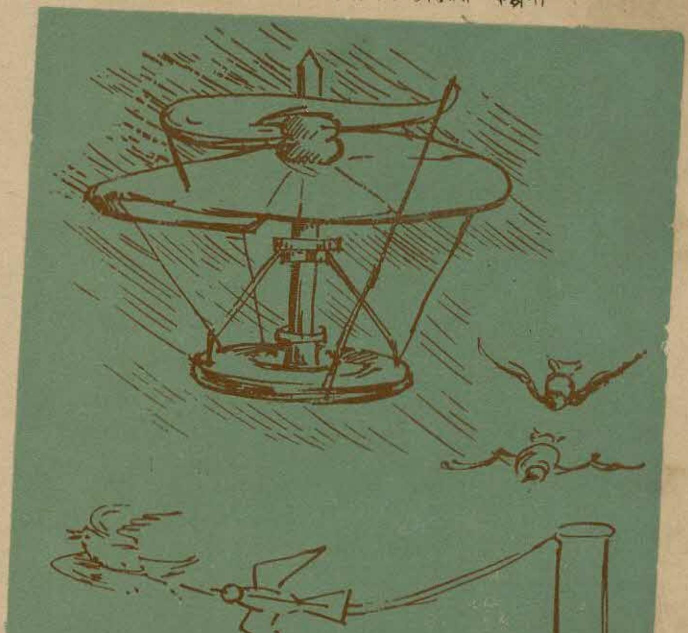
আকাশজয়ী গ্রীক দেবতা মার্কারি

ওড়ার প্রচেষ্টায় আগেও মানুষ বিফল হয়েছে যে কারণে লিওনার্ডের যন্ত্রও কার্যকর হল না সেই একই কারণে। আসলে নকল ডানা লাগিয়ে ওড়বার মত শক্তি মানুষের মাংসপেশীতে নেই। তাছাড়া মানুষ পরীক্ষা চালিয়ে এসেছে ডানা চালিয়ে বাতাসকে পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে। এটা তাঁদের জানা ছিল না যে, পাখী ওড়বার সময় বাতাসে সামনের দিকে চাপ দেয়।

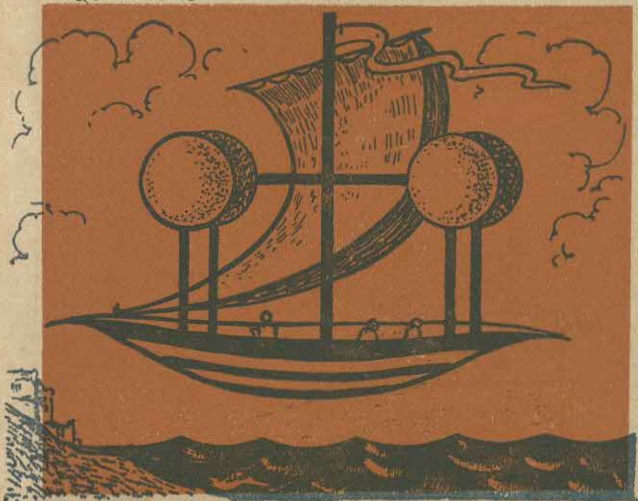
বিফলতা সত্তেও লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি ছিলেন আকাশ-জয়ের ইতিহাসে প্রথম বিজ্ঞানী। আধুনিককালের হেলিকপ্টার ও প্যারাসুটের কল্পনা সর্বপ্রথম তিনিই করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে আরেকজন ইতালীয় ফ্রানসিস্কো ডি লানা পাখীর চেয়ে বাতাস সম্পর্কেই বেশী কৌতূহলী ছিলেন। তিনি জানতেন বাতাসের ওজন আছে। সুতরাং ছিপি যেমন জলে ভাসতে পারে বাতাসের চেয়ে

লিওনার্ডোর হেলিকপ্টারের কল্পনা



হাল্কা কোন জিনিস নিশ্চয়ই হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে পারবে। তাঁর পরিকল্পিত উড়োজাহাজ দেখতে ছিল পাল-তোলা নৌকার মত। পাতলা তামার তৈরী চারটি বায়ুশূন্য গোলকের সাহায্যে তিনি এটিকে ভাসিয়ে রাখার পরিকল্পনা করেন। তাঁর এই কল্পনার উড়োজাহাজ কোনদিনই তৈরী হয় নি আর হলেও আকাশে ওড়ানো সম্ভব ছিল না। তবুও লিওনার্ডের মত লানাও ছিলেন মানুষের ভবিষ্যৎ আকাশ-জয়ের প্রচেষ্টায় পথপ্রদর্শক।



ডি লানার কাল্পনিক উড়োজাহাজ

প্রথম আকাশ-যাত্রা

প্রায় একশ বছর পর ফ্রান্সের অ্যান্নোনে নামে এক শহরে মন্টগলফার নামে দুই ভাই আকাশ-জয়ের পরিকল্পনায় মনোযোগ দিলেন। কিভাবে আকাশে মেঘের মত ভেসে বেড়ানো যায়, এ নিয়ে তাঁদের জল্পনাকল্পনার অন্ত ছিল না।

শোনা যায় এক শীতের রাত্রে আগুনের ওপর ধোঁয়া লক্ষ্য করতে করতে তাঁরা ভাবলেন, একটি ব্যাগে যদি ধোঁয়া ভর্তি করা হয় তাহলে ব্যাগটি হয়ত ওপর দিকে উঠে যাবে। তাঁরা একটি ছোট সিল্কের ব্যাগ দিয়ে পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষা সফল হল। এরপর দুই ভাই বড় বড় ব্যাগের সাহায্যে অনেক পরীক্ষা চালালেন। অবশেষে ১৭৮৩ সালের ৫ই জুন তাঁদের নির্মিত ৩৮ ফুট ব্যাসের একটি বেলুন ৬,০০০ ফুট ওপরে উঠে ১০ মিনিটে দেড় মাইল দূরে গিয়ে আবার ভূমি স্পর্শ করে। এইভাবে মন্টগলফার ভাইদের প্রচেষ্টায় প্রথম বেলুন আবিষ্কৃত হল। তাঁরা জানলেন, গরম বাতাস ঠাণ্ডা বাতাসের চেয়ে হাল্কা। তাই যতক্ষণ বাতাস গরম থাকে ততক্ষণই বেলুন আকাশে ভেসে থাকতে পারে। আরও পরীক্ষা চলতে লাগল।

অবশেষে মানুষ খুঁজে পেল আকাশের ঠিকানা। ১৭৮৩ সালের ২১শে নভেম্বর পিলত্রে দ্য রেজিয়ার ও মারকুইস দ্য আরলানদিস মন্টগলফার ভাইদের নির্মিত গ্যাস বেলুনে চড়ে পৃথিবীর প্রথম মানুষ হিসাবে আকাশ পাড়ি দিলেন। এই প্রথম বেলুন পঁচিশ মিনিটে সাড়ে পাঁচ মাইল আকাশপথ ভ্রমণের পর মাটিতে নেমে এলো।

এর দশদিন পর ফরাসী পদার্থবিদ অধ্যাপক জে. এ. সি. চার্লসের পরিকল্পনানুযায়ী রবার্ট নামে দুই ভাই সিল্কের পরিবর্তে রবারের নির্মিত বেলুনে গরম বাতাসের পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ভর্তি করে সেই বেলুন আকাশে ওড়ান। এই ধরনের একটি বেলুনে চার্লস ও রবার্টদের বড় ভাই প্যারিস থেকে যাত্রা করে সাতাশ মাইল পথ দু ঘণ্টায় অতিক্রম করেন। মানুষ বেলুনে চড়ে মেঘের মত বাতাসে ভেসে চলল।

জঁা-পিয়ারে ব্ল্যানচার্ড নামে একজন ফরাসী ভদ্রলোক প্রথম পেশাদার বেলুনচালক হন। ১৭৮৫ সালে ডাঃ জন জেফ্রিস নামে একজন আমেরিকান ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনি সর্বপ্রথম ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন। কিন্তু বেলুনের গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করার কোন কৌশল তখনও মানুষ জানত না।

নিয়ন্ত্রণশীল বেলুন

১৮৫২ সালে হেনরী গিফার্ড নামে একজন ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার প্রথম নিয়ন্ত্রণশীল বেলুন তৈরী করেন। এই বেলুন লম্বায় ছিল ১৪৩ ফুট এবং দেখতে চুরুটের মত। এই বেলুনে তিনি বাষ্পীয় ইঞ্জিনচালিত পাখা ব্যবহার করেন। এর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় পাঁচ মাইল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আরও দুজন উন্নত ধরনের নিয়ন্ত্রণশীল বেলুন তৈরী করে খুবই কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ব্রেজিলের অ্যালবার্টো স্যান্টোস ডুমোঁ। তিনিই প্রথম (১৮৯৮) উন্নত ধরনের নিয়ন্ত্রণশীল বেলুন তৈরী করেন ও ১৯০১ সালে প্যারিসের এফিল টাওয়ারের চারিদিকে পাক দিয়ে সকলকে বিস্মিত করেন।

অপর জন হলেন জার্মানীর একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার কাউন্ট ভন জেপেলিন। তাঁর নামানুযায়ী তৈরী বিরাটকায় বেলুন ছিল একটি কৃতিত্বপূর্ণ অবদান। কঠিন কাঠামোয় তৈরী বেলুনের প্রচলন তিনিই প্রথম করেন। তাঁর নির্মিত বেলুনগুলির তলায় যাত্রীদের বহন করবার জন্যে একটি কামরা ঝোলানো থাকত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এ ধরনের জেপেলিনের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। যুদ্ধের পর যাত্রীবাহী জেপেলিন ইওরোপ ও আমেরিকায় প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে উন্নত ধরনের এরোপ্লেন আবিষ্কৃত হয়ে গেছে।

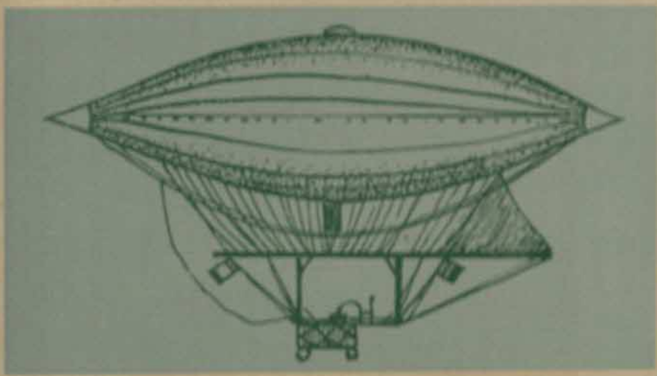
এরোপ্লেনের কর্ম্মদক্ষতা জেপেলিনের চেয়ে অনেক বেশী। ফলে এই বিরাটকায় বেলুন ক্রমে আকাশ থেকে বিদায় নিল। ১৯৩৭ সালের ৬ই মে 'হিণ্ডেনবুর্গ' নামে অতিকায় একটি জেপেলিন অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৩৬ জন যাত্রীসমেত ধ্বংস হয়। তারপর আর কখনও এই ধরনের যাত্রীবাহী বেলুন নির্মিত হয় নি। তবে বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরের পরীক্ষা চালানোর কাজে ছোট হাইড্রোজেন বেলুনের ব্যবহার আজও প্রচলিত আছে।



১৭৮৩ সালের ২১শে নভেম্বর বেলুনে চড়ে মানুষের প্রথম আকাশপাড়ি

এরোপ্লেন তৈরীর সূচনা

মানুষের আকাশ-জয়ের স্বপ্নকে সার্থক করার জন্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যিনি প্রথম গবেষণা ও পরীক্ষা চালান তিনি হলেন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক স্যার জর্জ কেলী।



হেনরী গিফার্ডের নিয়ন্ত্রণশীল বেলুন

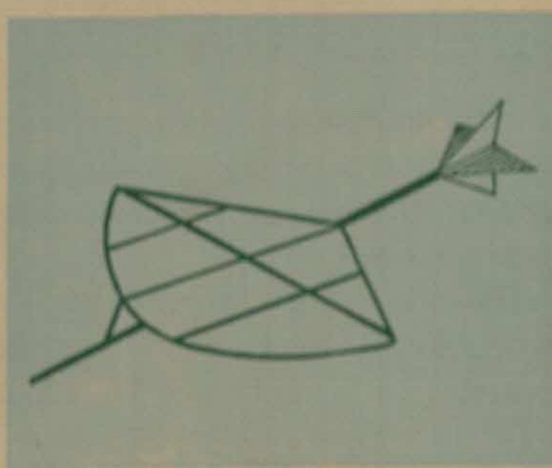
বাতাসের চেয়ে হাল্কা বেলুনে চড়ে মানুষ আকাশে পাড়ি দিলেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাখীদের ডানা চালিয়ে ওড়ার রহস্য ভেদ না করা পর্যন্ত মানুষের পক্ষে বাতাসের-চেয়ে-ভারী কোন বিমান তৈরী করা সম্ভব হবে না। স্যার কেলী তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্যে গবেষণা ও পরীক্ষা শুরু করলেন। ১৮০৪ সালে তিনি সাধারণ ঘুড়ি দিয়ে ছোট একটি মডেল গ্লাইডার তৈরী করেন। এই গ্লাইডারের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেন যে, ডানা না চালিয়েও বাতাসে ভেসে থাকা সম্ভব। স্যার কেলী এই অচল ডানার নীতিটি সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে অনেকগুলি গ্লাইডার তৈরী করেন। যন্ত্রবিহীন এই গ্লাইডারই হল এরোপ্লেনের অগ্রদূত। যন্ত্রচালিত এরোপ্লেনের পরিকল্পনাও তিনি করেন। এ ছাড়া আকাশ-পথে বিমান-চালনা সম্পর্কে অনেক তথ্য তিনি আবিষ্কার করেন। এইজন্যেই কেলীকে আধুনিক বিমানচালনা বিদ্যার জনক বলা হয়।

প্রকৃত যন্ত্রচালিত এরোপ্লেন তৈরীর কাজ শুরু হয় ইংল্যাণ্ডের উইলিয়াম হেনসন ও জন স্ট্রিংফেলোর প্রচেষ্টায়। কেলীর আবিষ্কৃত তথ্যকে কাজে লাগাতে এঁরাই প্রথম এগিয়ে এলেন।

প্রথম যন্ত্রচালিত মডেল এরোপ্লেন

হেনসন্, স্ট্রিংফেলোকে নিয়ে বাষ্পীয় ইঞ্জিনচালিত একটি এরোপ্লেনের পরিকল্পনা করলেন। হেনসনের চিন্তাধারা সেদিনকার বিচারের মাপকাঠিতে অনেকখানি অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও আকাশে ওড়ার মত একখানি প্লেনও তিনি তৈরী করতে পারেন নি। সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি শেষে আকাশ-জয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করলেন। কিন্তু তাঁর সহকর্মী জন স্ট্রিংফেলো যন্ত্রচালিত মডেল এরোপ্লেন নিয়ে একাই পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। ১৮৪৮ সালে তাঁর প্রচেষ্টা সফল হল। দশ ফুট লম্বা ডানা লাগিয়ে বাষ্পীয় ইঞ্জিনচালিত একটি মডেল এরোপ্লেন তিনি তৈরী করলেন। এই প্লেনটি প্রায় ২২ গজ উড়তে সক্ষম হয়। এই প্লেনটিই ইতিহাসের সর্বপ্রথম যন্ত্রচালিত মডেল এরোপ্লেন।

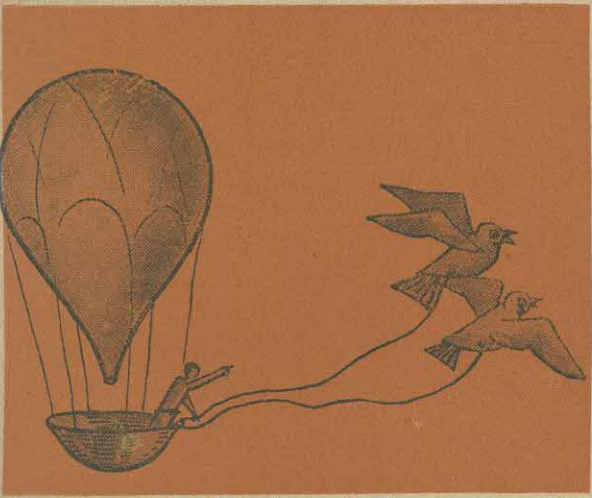
স্ট্রিংফেলো তাঁর এই মডেল এরোপ্লেনটি লণ্ডনে নিয়ে আসেন। সেখানে সেটি ১২০ ফুট ওড়ে।



কেলীর মডেল গ্লাইডার

১৮৬০-এর দশকে ফ্রান্সিস ওয়েনহ্যাম অনেকগুলি ডানা-সম্বলিত বেশ কয়েকটি মডেল গ্লাইডার নির্মাণ করেন। কিন্তু তাঁর নির্মিত গ্লাইডারগুলি আকাশে বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি।

১৮৭১ সালে ফ্রান্সের অ্যালফন্সো পিনাউড একটি মডেল এরোপ্লেন তৈরী করেন। সেটি ১১ সেকেণ্ডে ১৩১ ফুট উড়তে সক্ষম হয়। এর চার বছর পরে ইংল্যাণ্ডের টমাস ময় 'এরিয়েল ষ্টীমার' নামে বিরাটকায় একটি মডেল এরোপ্লেন তৈরী করেন। তার বিশাল



শক্তিচালিত উড়োজাহাজের কল্পনা

পাখা দুটি বাষ্পীয় ইঞ্জিন দ্বারা চালাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এটি উড়তে সক্ষম হয় নি ; কিন্তু এটি দেখে মানুষের মনে বিশ্বাস হলো যে, বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাহায্যে এরোপ্লেন চালানো সম্ভব।

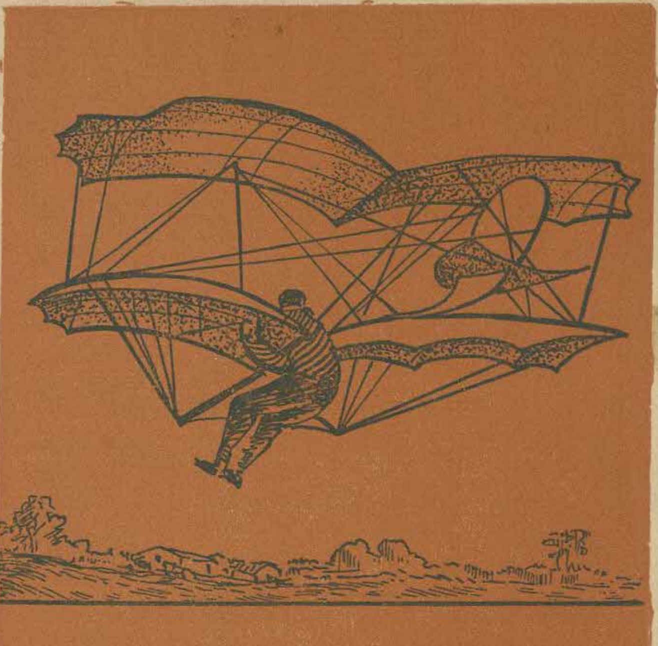
১৮৯৩ সালে অষ্ট্রেলিয়ার লরেন্স হারগ্রেভ এবং ইংল্যাণ্ডের হোরাসিও ফিলিপস এরোপ্লেনের ডানা নিয়ে গবেষণা করে এ বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেন।

স্যার হিরাম ম্যাক্সিম নামে একজন ইংল্যাণ্ডে বসবাসকারী আমেরিকান ভদ্রলোক এবং ক্লেমেণ্ট অ্যাডার নামে একজন ফরাসী ভদ্রলোক ১৮৯৭ সালে যথাক্রমে ইংল্যাণ্ডে এবং ফ্রান্সে দুটি মডেল এরোপ্লেন তৈরী করেন। ম্যাক্সিমের তৈরী চার টন ওজনের অতিকায় যানটি রেলের ওপর দিয়ে যেতে গিয়ে লাইনচ্যুত হয়ে ধ্বংস হয়। অ্যাডারের নির্মিত 'এভিয়ন ৩' নামে এরোপ্লেনটি ঠিক ওড়ে নি, বরং লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছিল বলা যায়।

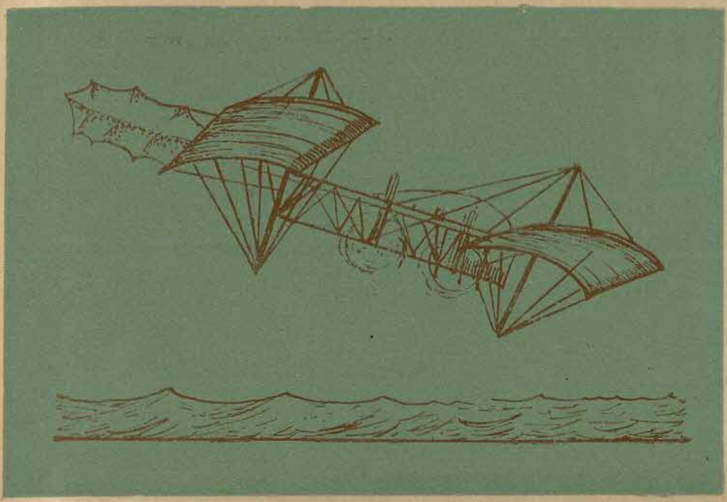
গ্লাইডার এরোপ্লেনের অগ্রদূত

গ্লাইডিং বা অচল ডানার সাহায্যে শূন্যে ভেসে থাকা নিয়ে যাঁরা কৃতিত্বপূর্ণ পরীক্ষা চালিয়ে যান তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন ফ্রান্সের ক্যাপ্টেন জঁা-মেরী লে ব্রি। কিন্তু এ বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান জার্মানীর লিলিয়েন্থাল ভাইদের। পাখীদের ডানা মেলে ভেসে বেড়ানো লক্ষ্য করেই তাঁরা গ্লাইডার তৈরী করে পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। ১৮৯১ সালে অটো লিলিয়েন্থাল প্রথম গ্লাইডার তৈরী করেন ও একটি কৃত্রিম পাহাড়ের ওপর থেকে গ্লাইডারের সাহায্যে প্রায় একশ গজেরও বেশী উড়তে সক্ষম হন। লিলিয়েন্থাল অনেকগুলি গ্লাইডার তৈরী করে দু হাজারেরও বেশীবার

গ্লাইডার নির্মাণ ও চালনায় লিলিয়েন্থাল অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন



সফলভাবে পরীক্ষা চালিয়ে যান। ১৮৯৬ সালের ৯ই অগাস্ট যন্ত্রচালিত গ্লাইডারে ওড়ার প্রচেষ্টায় তিনি ব্যর্থ হন ও সেই দুর্ঘটনায় মারা যান। কিন্তু তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও গবেষণা মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।



উন্নত ধরনের ইঞ্জিন থাকা সত্ত্বেও ল্যাংলের এরোপ্লেন সেটকে শূন্যে পাঠাবার বিশেষ উৎক্ষেপণ যন্ত্রটি কার্যকর না হওয়ায় আকাশে উড়তে সক্ষম হল না

গ্লাইডিং নিয়ে সফল পরীক্ষা চালানোর ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের পার্সি পিলচার এবং আমেরিকার অক্টেভ সান্নুটের নামও উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৯ সালে নিজের পরিকল্পনানুযায়ী নির্মিত একটি ইঞ্জিনের দ্বারা চালিত গ্লাইডারে উড়তে গিয়ে পিলচার দুর্ঘটনায় মারা যান। সান্নুট অনেকগুলি গ্লাইডার নির্মাণ করেন। তাদের মধ্যে প্রথমটি নির্মিত হয়েছিল ১৮৯৬ সালে। বার্দ্ধক্যের জন্যে তিনি নিজে বেশীবার ওড়েন নি। লিলিয়েন্থালের শিষ্য এ. এম. হেরিং সান্নুটের নির্মিত গ্লাইডারগুলিতে চড়ে আকাশে উঠতেন। তাঁর নির্মিত একটি প্লেন ৭০০ বার আকাশে ওড়ে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে গ্লাইডারচালনা বিদ্যাটি বেশ আয়ত্তে এসে গেল। বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, যদি কোন উপায়ে গ্লাইডারের সঙ্গে একটি ইঞ্জিন লাগানো যায় তাহলে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে সেটি ওপরে উঠে যেতে সক্ষম হবে। তাঁদের চিন্তাধারা যে কতখানি সঠিক ছিল তা আজ আমরা বুঝতে পারি।

যন্ত্রচালিত এরোপ্লেনের সূচনা

এ ব্যাপারে অগ্রণীদের মধ্যে আমেরিকার স্যামুয়েল পি. ল্যাংলের নাম উল্লেখযোগ্য। সফল বিজ্ঞানী হিসাবে গৌরবময় জীবন কাটিয়ে বৃদ্ধ বয়সে তিনি যন্ত্রচালিত এরোপ্লেন তৈরীর কাজে ব্রতী হন। মডেল প্লেন তৈরী করে তিনি তাঁর পরিকল্পনাকে ক্রমে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। ১৮৯৬ সালে তাঁর তৈরী বাষ্পীয় ইঞ্জিনচালিত মডেল প্লেন ঘণ্টায় প্রায় ত্রিশ মাইল বেগে এক মাইলের কিছু কম পথ উড়তে সক্ষম হয়। এর আগে আর কোন যন্ত্রচালিত প্লেন এতখানি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। বছর দুই পরে আমেরিকা ও স্পেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ল্যাংলেকে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী একটি প্লেন তৈরী করার জন্য অর্থ মঞ্জুর করলেন।

নতুন উদ্যমে শুরু হল উন্নত ধরনের ইঞ্জিন তৈরীর কাজ। তিন বছর পরিশ্রমের পর ল্যাংলে ও তাঁর সহকারী চার্লস ম্যানলি একটি নতুন ধরনের পেট্রল ইঞ্জিন তৈরী করলেন।

এই ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারগুলি ছিল বৃত্তাকারে সাজানো। এই ধরনের ইঞ্জিনকে বলা হয় 'রেডিয়াল' ইঞ্জিন। ল্যাংলের এই নতুন ইঞ্জিনই হল প্লেনের জন্যে তৈরী প্রথম রেডিয়াল ইঞ্জিন। এই কৃতিত্বপূর্ণ আবিষ্কার সত্ত্বেও তাঁর তৈরী ইঞ্জিনচালিত এরোপ্লেন (তিনি যার নাম দিয়েছিলেন এরোড্রাম) আকাশে উড়তে সক্ষম হল না। ১৯০৩ সালের ৮ই অক্টোবর ও ৮ই ডিসেম্বর তাঁর দুটি প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

ল্যাংলে বিফল হবার কিছুদিন পরেই আসে প্রকৃত জয়ের সূচনা। মানুষের বহু আকাঙ্খিত স্বপ্ন সফল হল।

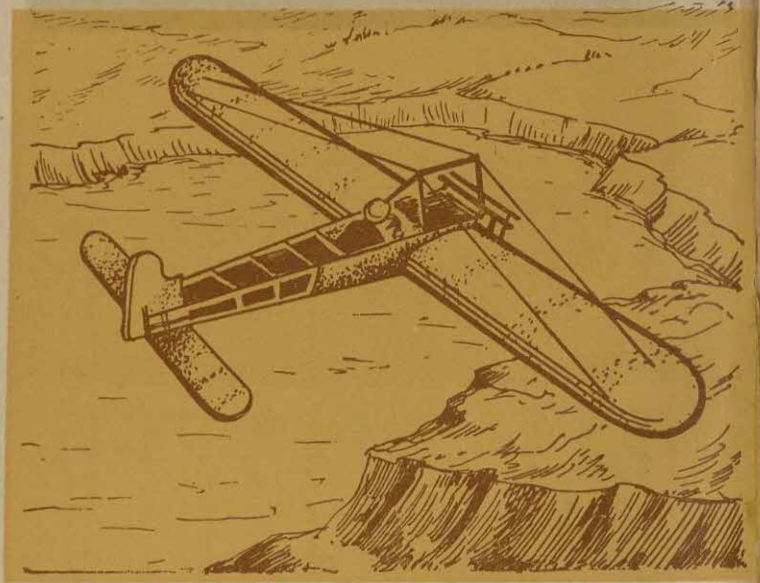
স্যান্টোস ডুঁমোর এরোপ্লেন



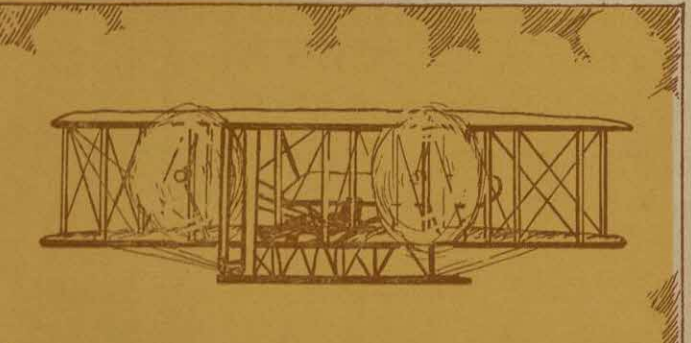
রাইট ভাইদের প্রথম এরোপ্লেন

বহু যুগের স্বপ্নকে সফল করার জন্যে উইলবার ও অরভিল রাইট ১৯০০ সাল থেকে যন্ত্রচালিত এরোপ্লেন সম্পর্কে গবেষণা ও পরীক্ষা শুরু করেন। ওহিও-র ডেটনে রাইট ভাইরা সাইকেল মেরামতের কাজে সুদক্ষ কারিগর ছিলেন। এরোপ্লেন তৈরীর চিন্তা মাথায় আসার পর তাঁরা লিলিয়েন্থাল, ল্যাংলে, সান্টুট প্রমুখ ব্যক্তিদের গবেষণা ও পরীক্ষার বিষয় ও ফলাফল সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন। তাঁরা পাখীদের ডানা চালিয়ে আকাশে ওড়া ও ডানা মেলে ভেসে থাকার পদ্ধতিটিও খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করেন।

১৯০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁরা নিজেদের নির্মিত প্রথম গ্লাইডারটি নর্থ ক্যারোলিনার উপকূলে কিটি হকের সমুদ্রবেলায় ওড়ান। এরপর গ্লাইডার তৈরী করে কিছুদিনের মধ্যেই গ্লাইডারচালনায় তাঁরা সুদক্ষ হয়ে উঠলেন। অনেক পরীক্ষার পর ১৯০২ সালে তাঁরা আর একটি উন্নত ধরনের গ্লাইডার তৈরী করেন যার সাহায্যে তাঁরা প্রায় এক হাজারেরও বেশি বার উড়তে সক্ষম হন। উড়ন্ত অবস্থায় গ্লাইডারকে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলটিও তাঁরা আয়ত্ত করেন। এরপর তাঁরা ইঞ্জিনচালিত এরোপ্লেন তৈরীর পরিকল্পনায় মনোযোগ দেন। অনেক পরিশ্রম ও পরীক্ষার পর তাঁদের প্রথম যন্ত্রচালিত এরোপ্লেন তৈরীর কাজ শেষ হল। দুই-ডানার এই প্লেনের জন্যে চার সিলিণ্ডারের গ্যাসলিন ইঞ্জিনটিও তাঁরা নিজেরাই তৈরী করেছিলেন। প্লেনটির নাম দিয়েছিলেন তাঁরা 'ফ্লায়ার'।

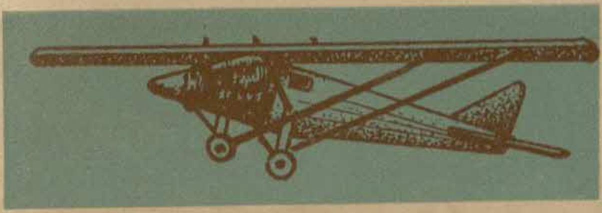


১৯০৯ সালের ২৫শে জুলাই লুই ব্লেরিও এরোপ্লেনে সর্বপ্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার হন



১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর রাইট ভাইদের পরিচালনায় প্রথম যন্ত্রচালিত প্লেন আকাশে ওড়ে

এলো আসল পরীক্ষার দিন। ১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর। অরভিল রাইটের পরিচালনায় ইতিহাসের প্রথম যন্ত্রচালিত প্লেন আকাশে উড়ল। তাঁদের বহু বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে সাফল্যমণ্ডিত হল মানুষের আকাশ-জয়ের স্বপ্ন। শুরু হল মানুষের আকাশ পাড়ি দেওয়ার নতুন যুগ।



চার্লস লিণ্ডবার্গের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্লেন
"স্পিরিট অব সেণ্ট লুই"

ফ্রান্সের গ্যাব্রিয়েল এবং চার্লস ভয়সিন ভ্রাতৃদ্বয় অনেকগুলি এরোপ্লেন তৈরী করেন।

ইওরোপে শক্তিচালিত প্লেন আকাশে ওড়াবার প্রথম কৃতিত্ব স্যাণ্টোস ডু মোর। তিনি অনেকবার আকাশে ওড়েন এবং ১৯০৬ সালে উল্লসিত জনতার সমক্ষে ২১.২ সেকেণ্ডে ৬৯০ ফুট দূরত্ব অতিক্রম করেন। ভয়সিন ভ্রাতৃদ্বয় এই এরোপ্লেনটি তৈরী করেছিলেন।

পরের বছর ১৯০৭ সালে ভয়সিন ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্মিত আর একটি এরোপ্লেনে ফ্রান্সের লিয়োঁ ডেলাগ্র্যাঞ্জ আকাশে ওড়েন। ভয়সিন ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্মিত আর একটি এরোপ্লেনে ফ্রান্সে বসবাসকারী হেনরী ফারমান নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোকও আকাশে ওড়েন।

১৯০৮ সালের ১৩ই জানুয়ারী ফারমান এক মাইল পথ উড়ে ৫০,০০০ ফ্রাঙ্ক পুরস্কার লাভ করেন। তিনিই প্রথম এক শহর থেকে আর এক শহরে (১৬ মাইল) উড়ে যান।

১৯০৮ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর অরভিল রাইট লেফটেন্যাণ্ট টমাস সেলফ্রিজকে যাত্রী হিসাবে নিয়ে আকাশে ওঠেন। কিন্তু ২৫ ফুট ওপরে উঠেই প্লেনের একটি প্রপেলার খুলে যায় এবং প্লেনটি মাটিতে আছড়ে পড়ে। সেলফ্রিজ নিহত হন। তিনিই প্রথম বিমানযাত্রী যিনি প্লেন দুর্ঘটনায় নিহত হন।

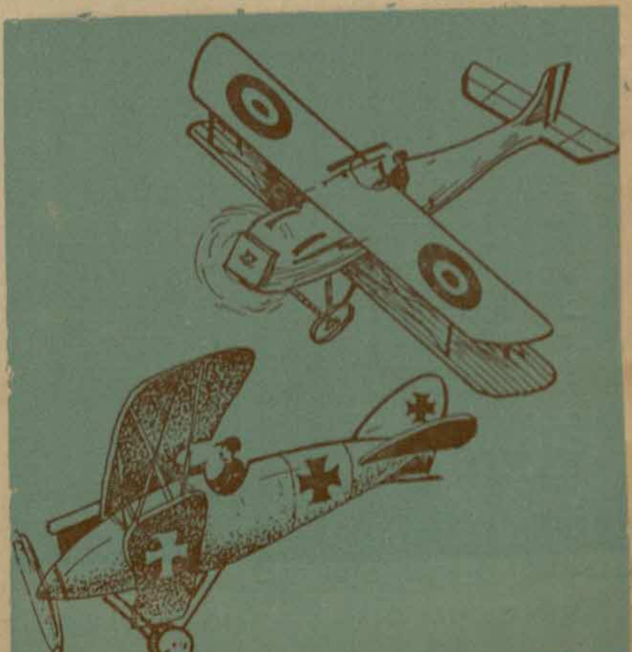
১৯০৯ সালের ২৫শে জুলাই লুই ব্লেরিও প্রথম এরোপ্লেনে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন।

১৯০৯ সালেই ফ্রান্সের ব্যারনেস রেমণ্ড দ্য লা রচি প্রথম মহিলা বিমানচালিকা হন।

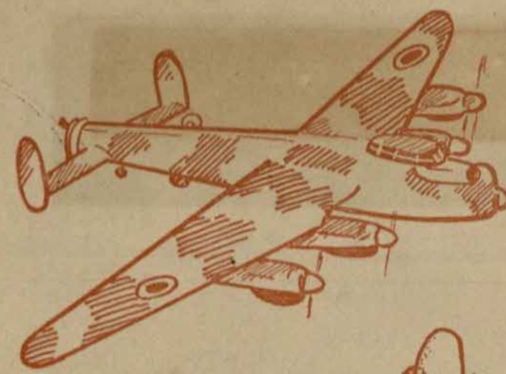
ক্রমে ক্রমে উন্নত ধরনের এরোপ্লেন তৈরী হতে লাগল। এরই মধ্যে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পদধ্বনি শোনা গেল।

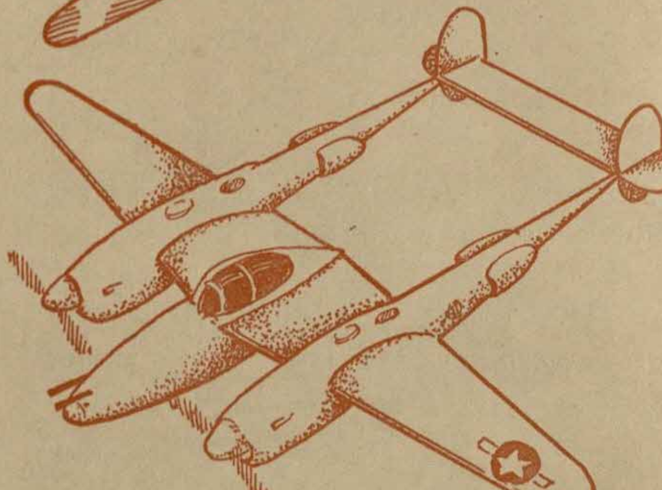
সামরিক উদ্দেশ্যে এরোপ্লেন ব্যবহার করলে শত্রুকে ঘায়েল করা যে অনেক সহজ, এটা সবাই জানতেন; কিন্তু তবুও যুদ্ধের প্রথম দিকে এরোপ্লেনচালকদের যুদ্ধ করতে দেওয়া হত না। তাঁরা শুধু পর্যবেক্ষণ করতেন। দুটি শত্রুপক্ষীয় বিমানের চালকদ্বয় আকাশপথে পরস্পরের দেখা পেলে হাত নেড়ে পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে যে যার পথে চলে যেতেন। কিন্তু একদিন এক ইংরেজ বৈমানিক হঠাৎ একটি জার্মাণ প্লেনের বৈমানিককে আকাশপথে গুলি চালিয়ে হত্যা করলেন। এর পরই শুরু হল আকাশপথে যুদ্ধ।

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের প্লেন



আকাশ জয়ের ইতিহাসের কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা



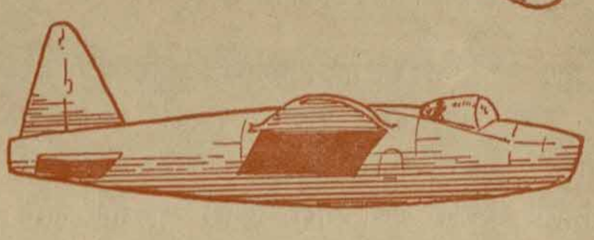


১৯০৯ সালে ফ্রান্সের লুই ব্লেরিও প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার হলেন।

১৯১৩ সালে রাশিয়ার সিকরস্কির তৈরী প্লেনটি ছিল সেযুগের বৃহত্তম ও প্রথম যাত্রীবাহী প্লেন।

১৯১৯ সালের ১৪ই জুন ইংল্যাণ্ডের ক্যাপ্টেন জন এলকক্ ও লেঃ আর্থার হুইটেন-ব্রাউন প্রথম সরাসরি আটলান্টিক মহাসাগর পার হন। তাঁদের সময় লেগেছিল ১৫ ঘন্টা ৫৭ মিনিট।

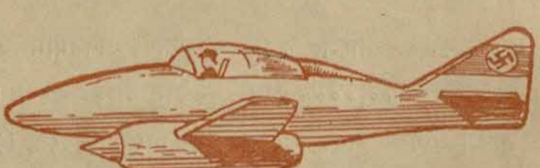
১৯১৯ সালের ১২ই নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ার রস এবং কিথ স্মিথ নামে দুই ভাই ইংল্যাণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়া আকাশপথে পাড়ি দেবার জন্যে যাত্রা শুরু করেন। ১১,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে তাঁরা অস্ট্রেসিয়া পৌঁছেছিলেন ১০ই ডিসেম্বর।



১৯২৪ সালে আমেরিকার কয়েকজন সামরিক অফিসার আকাশ-পথে প্রথম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

১৯২৬ সালের ৯ই মে রিচার্ড বার্ড ও ফ্লয়েড বেনেট প্রথম উত্তর মেরু পার হন। এই যাত্রায় ১,৬০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে তাঁদের সময় লেগেছিল প্রায় ১৬ ঘন্টা।

১৯২৭ সালের ২১শে মে চার্লস লিণ্ডবার্গ 'স্পিরিট অব্ সেন্ট লুই' প্লেনটি চালিয়ে নিউইয়র্ক থেকে প্যারিসে এসে পৌঁছান। আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে ৩,৬০০ মাইলের আকাশপথ তিনি ৩৩ ঘন্টা ৩১ মিনিটে অতিক্রম করেন।



১৯২৭ সালের ২৮শে জুন লেঃ লেস্টার জে. মেটল্যাণ্ড এবং অ্যালবার্ট এফ হেগেনবার্জার আকাশপথে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করবার জন্যে যাত্রা শুরু করেন। ২,৪০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে তাঁদের সময় লেগেছিল ২৫ ঘন্টা ৫০ মিনিট।

১৯২৮ সালে এমেলিয়া ইয়ারহার্ট প্রথম নারীযাত্রী হিসাবে আটল্যান্টিক পার হন। ১৯৩২ সালে লিণ্ডবার্গের মত তিনি একাই আটল্যান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৯৩৭ সালে পৃথিবী পরিভ্রমণের দুঃসাহসিক যাত্রায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।



প্লেন তৈরীর ইতিহাসে যুগান্তর আনে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ

১৯২৯ সালের ২৮শে নভেম্বর রিচার্ড বার্ড দক্ষিণ মেরু পার হন।

১৯৩০ সালে প্রফেসার পিকার্ড ও তাঁর সহকারী বেলুনে দশ মাইল উঁচুতে উঠে সকলকে বিস্মিত করেন।

প্লেন কিভাবে আকাশে ওড়ে



আকাশ-পথে এরোপ্লেন কিভাবে উড়ে যায় তা জানতে গেলে প্রথমেই জানা দরকার প্লেন শূন্যে ভেসে থাকে কি করে? প্লেন বাতাসের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় তার ডানায় ভার তোলবার একটি বিশেষ শক্তি জন্মায়। এই শক্তির জোরেই প্লেনটি বাতাসে ভেসে থাকে।

কিন্তু ডানায় এই শক্তি কিভাবে জন্মায়? এই ব্যাপারটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন ডেনিয়েল বারনৌলি ১৭৩৮ সালে। বিজ্ঞানীরা জানতেন বায়ুর ওজন আছে ও তার সংস্পর্শে এলে সব বস্তুরই ওপর বায়ুর একটি চাপ পড়ে। বারনৌলি আবিষ্কার করলেন, বায়ু যখন কোন বস্তুর গা ঘেঁসে বইতে থাকে তখন সেই বস্তুর ওপর বায়ুর চাপ কমে যায়; এবং বায়ুর গতিবেগ যত বাড়ে চাপ তত কমে। এটি বোঝার জন্যে একটি সহজ পরীক্ষা করা যায়। এক টুকরো পাতলা কাগজকে যদি মুখের সামনে ধরে জোরে ফুঁ দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে, কাগজটি ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। এর থেকে বারনৌলির তত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। বায়ুর গতিবেগ বেশী হওয়ার জন্যে

বারনৌলির তত্ত্বের পরীক্ষা

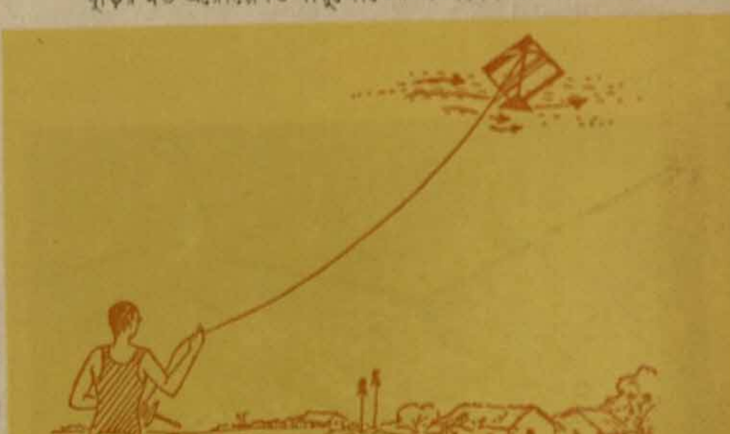


কাগজের ওপর দিকে বায়ুর চাপ কমে যায়। কিন্তু নীচের দিকে আগের মতই বায়ুর চাপ রয়ে যায় অর্থাৎ ওপরের থেকে কাগজের নীচের দিকেই এইসময় চাপ বেশী থাকে। ফলে কাগজটি ওপর দিকে ওঠে। এই ঊর্ধ্বমুখী বায়ুর চাপই প্লেনকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখে। প্লেনের বেলায় এ ধরনের চাপ কিভাবে সৃষ্টি হয় তা জানতে হলে এর ডানার গড়নের দিকে লক্ষ্য করতে হবে।

প্লেন কিভাবে শূন্যে ভেসে থাকে

প্লেনের ডানার গড়ন অনেকটা ধনুকের মত। ওপর দিকটি বাঁকা আর তলার দিকটি সোজা। ডানার সামনের দিকটি মোটা আর পিছনের দিকটি ক্রমে পাতলা হয়ে এসেছে। প্লেন এগোবার সময় ডানার ওপরে ও নীচে বায়ু-স্রোতের সৃষ্টি হয়। ডানার ওপর দিকের গড়নের জন্যে বায়ুর গতিপথ হয় বাঁকা। এখন বাঁকা রাস্তার দূরত্ব বেশী, ফলে বায়ুকে ডানার ওপর দিয়ে দ্রুত চলতে হয়। সুতরাং বারনৌলির তত্ত্ব অনুসারে বায়ুর চাপ ডানার ওপরের দিকে কম। কিন্তু ডানার নীচের দিকে বায়ুর চাপ আগের মতই রয়ে গেছে অর্থাৎ ডানার তলায় বায়ুর চাপ ওপর দিকের চাইতেও বেশী। সুতরাং বোঝা গেল বায়ুর মধ্যে দিয়ে প্লেন যখন এগিয়ে যায় তখন ডানার তলার দিকে একটি ঊর্ধ্বমুখী চাপ পড়ে শক্তির সৃষ্টি হয়। এরই ফলে প্লেন শূন্যে ভেসে থাকে।

ঘুড়ির মত এরোপ্লেনও বায়ুস্রোতের প্রভাবেই আকাশে ওড়ে



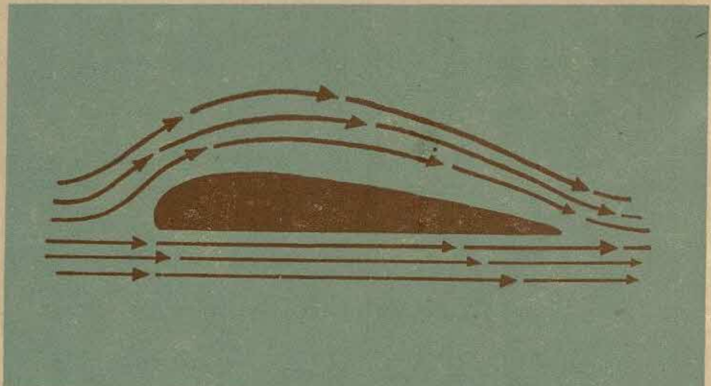
এরোপ্লেনকে ভেসে থাকতে হলে তাকে বায়ুর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। এই জন্যেই গ্লাইডার নিয়ে পরীক্ষা চালাবার সময় লিলিয়েন্থাল, রাইটপ্রমুখ অগ্রণীদের পাহাড়ের ওপর থেকে দ্রুতগতিতে নেমে গতিবেগ সৃষ্টি করতে হয়েছিল।

এরোপ্লেনের বেলায় এই কাজটি সম্ভব হয় প্রপেলারের সাহায্যে। প্রপেলারটি লাগানো থাকে ইঞ্জিনের সাথে। ইঞ্জিন চললেই প্রপেলার ঘুরতে থাকে। ঘোরা শুরু হলেই প্রপেলারটি বায়ুর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায় অর্থাৎ প্রপেলার সমেত প্লেনটি বায়ুর মধ্যে দিয়ে এগোতে থাকে। কিন্তু কিভাবে প্রপেলার কাজ করে সেটি জানা প্রয়োজন।

প্রপেলারের ব্লেডের গড়ন অনেকটা প্লেনের ডানার মতন। ব্লেডের সামনের দিকটি বাঁকানো। ফলে বায়ু দ্রুতগতিতে চলে ব্লেডের সামনে নিম্নচাপের সৃষ্টি করে। কিন্তু ব্লেডের ঠিক পিছনে থাকে উচ্চচাপ। সুতরাং পিছন দিক থেকে বায়ু চাপ দেওয়ার জন্যেই প্রপেলার সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সাধারণ কাঠের স্ক্রু যেভাবে কাঠের মধ্যে প্রবেশ করে ঠিক সেইভাবেই এরোপ্লেনের প্রপেলারও ঘুরতে ঘুরতে বায়ুর মধ্যে দিয়ে প্লেনটিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

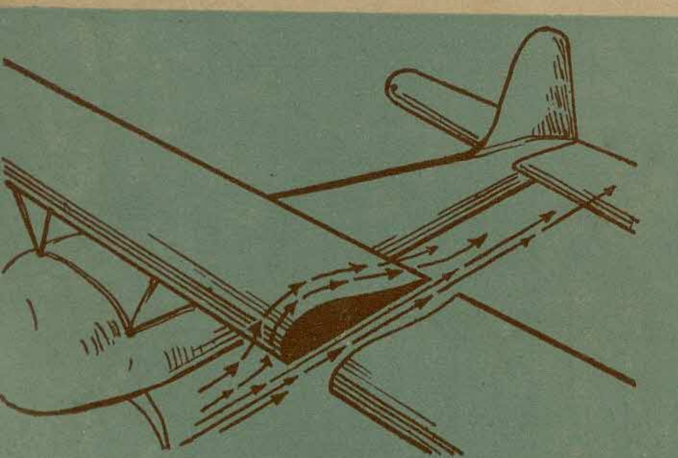
আবার প্রপেলারটি ঘোরার ফলে ডানার ওপর দিয়ে বায়ুর গতিবেগ দ্রুত হয় ফলে ডানার ভার তোলার ক্ষমতা জন্মায়। তাহলে এক কথায় প্লেনকে বায়ুর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব প্রপেলারের আর শূন্যে ভাসিয়ে রাখার দায়িত্ব এরোপ্লেনের ডানার।

এবার দেখা যাক প্লেন যখন আকাশে উড়তে থাকে তখন কি কি শক্তির প্রভাব প্লেনের ওপর পড়ে। উড়ন্ত অবস্থায় মোট চারটি শক্তি কাজ করে। ছবিতে এই শক্তিগুলির প্রভাব দেখানো হয়েছে। একটি হল উর্ধ্বমুখী শক্তি বা 'লিফ্‌ট্', যার ফলে প্লেন ভেসে থাকতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়টি মাধ্যাকর্ষণের টান, যা প্লেনটিকে মাটির দিকে টানে। তৃতীয়টি হল ঘাত অর্থাৎ যে শক্তির টানে প্লেন সামনের দিকে এগিয়ে যায়। আর বায়ুর ঘর্ষণের ফলে জন্মায় চতুর্থ শক্তিটি যা প্লেনের সম্মুখগতিকে বাধা দেয়। এই ঘর্ষণজনিত শক্তিটিকে বলে—'ড্র্যাগ'।



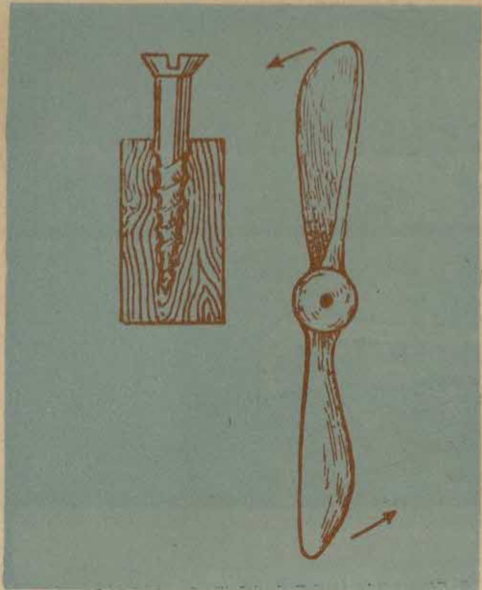
এরোপ্লেনের ডানার ওপরের তলে বায়ুর হ্রাসপ্রাপ্ত চাপ এরোপ্লেনটিকে মাটির ওপরে উঠে ভেসে থাকতে অনেক পরিমাণে সাহায্য করে।

এরোপ্লেনের ডানা দুটিকে এমনভাবে তৈরী করা হয় যে, ডানার নীচের দিক অপেক্ষা ওপরের দিক দিয়ে বায়ু দ্রুততর বেগে ছোটে। এর ফলে ডানার ওপরে বায়ুর চাপ হ্রাস পায় এবং বায়ুর স্বাভাবিক চাপ সেটিকে ওপরে ঠেলে তোলে। তীরের সাহায্যে বায়ুচাপের এই তারতম্য দেখানো হয়েছে।



তাহলে দেখা যাচ্ছে প্লেনকে আকাশে উড়তে হলে লিফ্‌ট্-এর মাপ এমন হওয়া প্রয়োজন যা মাধ্যাকর্ষণের টান অর্থাৎ প্লেনের ওজনের চেয়েও বেশী। আবার প্লেনের সম্মুখগতি সব সময় বায়ুর ঘর্ষণজনিত শক্তির জন্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই বিপরীতমুখী শক্তির প্রভাব কমাবার জন্যে প্লেনের বহিরাবরণ যতদূর সম্ভব মসৃণ রাখা হয়।

আকাশ-পথে প্লেনের গতিবিধিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় তা জানার আগে এর বিভিন্ন সচল অংশগুলি সম্পর্কে পরিচিত হওয়া দরকার। অতি প্রয়োজনীয় পরিচালক অংশগুলি ছবিতে দেখানো হয়েছে। প্লেনের চালক এইসব সচল অংশগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেই প্লেনকে আকাশ-পথে উড়িয়ে নিয়ে যায়।



কাঠের স্ক্রুর মত প্রপেলারটি বাতাস
কেটে প্লেনকে এগিয়ে নিয়ে যায়

প্লেনের ডানার পিছন দিকের সচল অংশগুলিকে বলে 'এলিরণ'। প্রতিটি ডানায় একটি করে এলিরণ আছে। এই দুটি এলিরণ এমনভাবে যুক্ত থাকে যে, একটিকে নীচের দিকে নামালে অপরটি ওপরের দিকে উঠে যায়। এই এলিরণের সাহায্যেই প্লেনটিকে পাশের দিকে কাত করা সম্ভব হয়।

এবার প্লেনের লেজের দিকে লক্ষ্য করা যাক। লেজের দিকে রয়েছে দুটি ছোট ডানার মত অংশ ও আর একটি উর্ধ্বমুখী পাখ্‌না। এই দুটি ডানাকে বলে 'স্টেবিলাইজার'। এদের কাজ হল আকাশে প্লেনের ভারসাম্য রক্ষা করা। স্টেবিলাইজার দুটির পিছন দিকে রয়েছে আরো দুটি সচল অংশ। এদের বলে 'এলিভেটর'। এই এলিভেটর দুটিকে উঠিয়ে বা নামিয়ে প্লেনের মুখটি ওপর নীচ করা সম্ভব হয়।

প্লেনের লেজের দিকে যে উর্ধ্বমুখী পাখ্‌না আছে তার পিছনের দিকে একটি সচল অংশ আছে। এটিকে বলে 'রাডার'। এই রাডারের কাজ হল নৌকার হালের মত অর্থাৎ নির্দিষ্ট গতিপথে প্লেনকে চালনা করা। রাডারকে ডাইনে বা বাঁয়ে সরিয়ে প্লেনকে ঘোরানো সম্ভব হয়।

এই সব সচল অংশগুলির মধ্যে এলিরণ ও এলিভেটর-গুলি যুক্ত থাকে একটি পরিচালক দণ্ডের সাথে যা হাত দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আর রাডার নিয়ন্ত্রণ করা হয় পায়ের সাহায্যে।

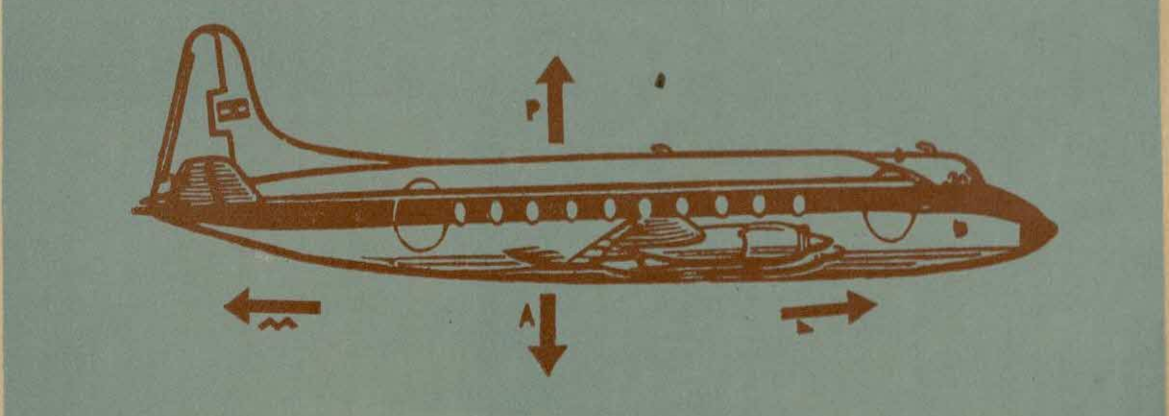
P উর্দ্ধমুখীশক্তি বা লিফ্‌ট্‌

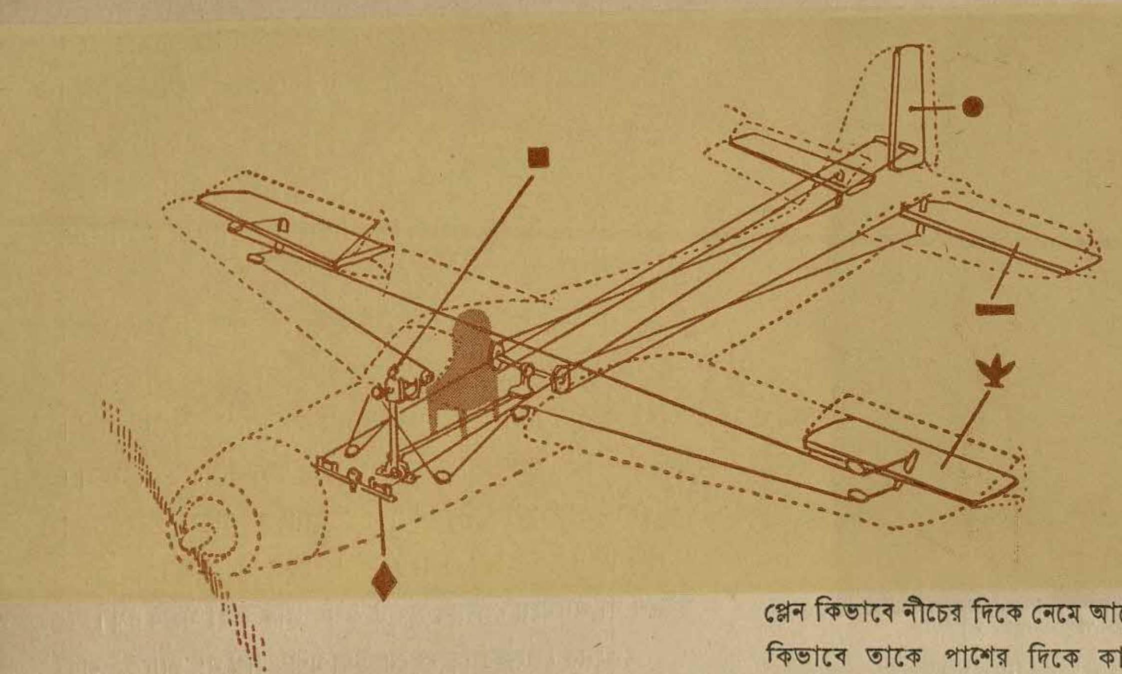
বায়ুর ঘর্ষণজনিত শক্তি

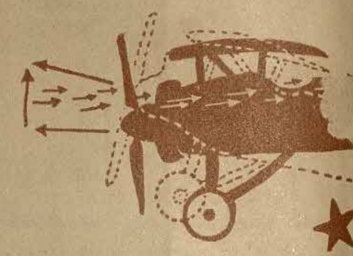
A মাধ্যাকর্ষণের টান

ঘাত

প্লেন যখন আকাশে উড়তে থাকে তখন চারটি শক্তির প্রভাব প্লেনের ওপর পড়ে।
ছবিতে এই শক্তিগুলির প্রভাব দেখানো হয়েছে।







■ পরিচালকদণ্ড

◆ রাডারচালক

● রাডার

▬ এলিভেটর

এলিরণ

প্লেন কিভাবে নীচের দিকে নেমে আসে, কিভাবে ওপর দিকে ওঠে, কিভাবে তাকে পাশের দিকে কাত করিয়ে ঘোরানো হয়, কিভাবেই বা তাকে নির্দিষ্ট পথে চালানো হয় সেসব এই ছবিগুলিতে দেখানো হয়েছে।

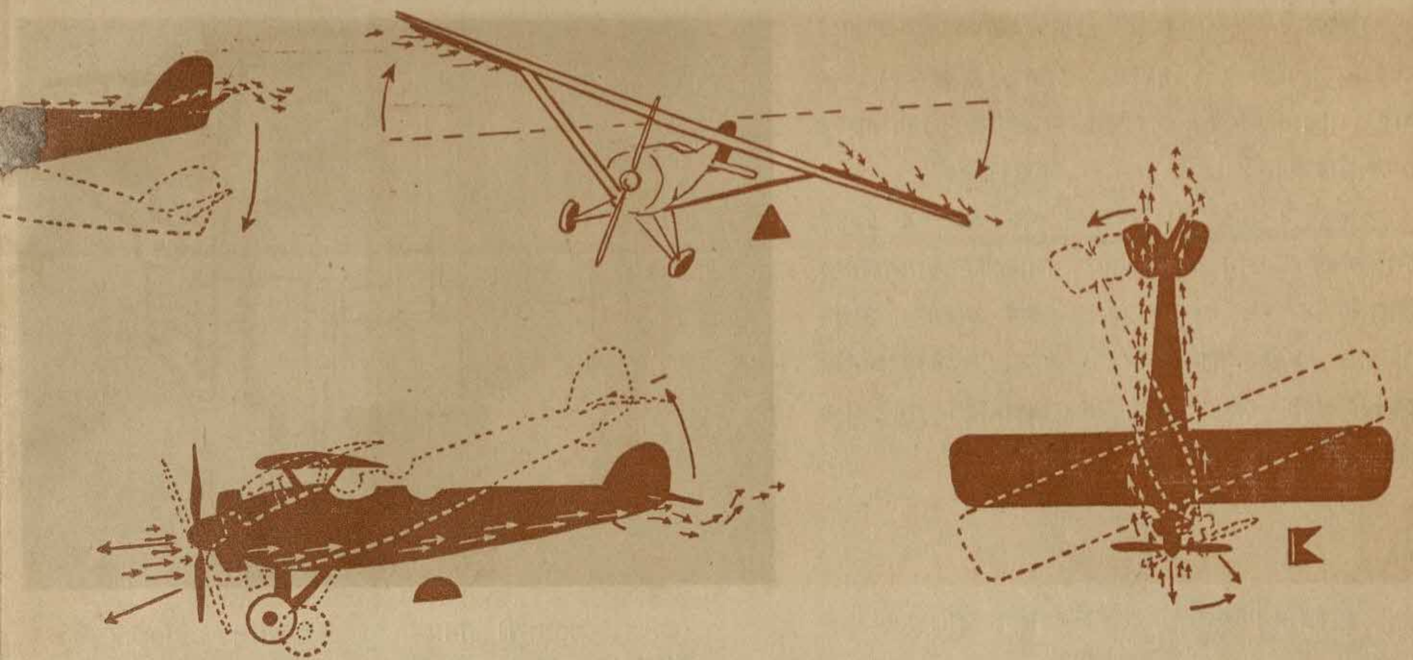
প্লেন পরিচালনা

এবার ছবিতে দেখা যাক আকাশে প্লেন পরিচালনার বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি কিভাবে সম্ভব হচ্ছে।

প্লেন কিভাবে নীচের দিকে নেমে আসে? নামার সময় প্লেনের চালক এলিভেটর দুটিকে নীচের দিকে নামিয়ে দেয়। ফলে বায়ুস্রোত (তীরের সাহায্যে দেখানো হয়েছে) এলিভেটর দুটিকে নীচের দিক থেকে ধাক্কা মারে। বায়ুর উর্ধ্বমুখী চাপে লেজটি ওপর দিকে উঠে যায়। এর ফলে প্লেনের মুখটি নীচের দিকে নেমে আসে ও প্লেনটি মাটির দিকে নামতে থাকে।

প্লেন কিভাবে ওপর দিকে ওঠে? এটিও সম্ভব হয় এলিভেটরের সাহায্যে। এবার এলিভেটর ওপরের দিকে ওঠানো হয়। ফলে বায়ুস্রোত ওপর দিক থেকে চাপ দেয়। এতে লেজটি নীচের দিকে নেমে আসে। আর লেজটি নেমে এলেই প্লেনের মুখটি ওপর দিকে উঠে যায় অর্থাৎ প্লেনটি ওপরের দিকে উঠতে আরম্ভ করে।

প্লেনকে পাশের দিকে কাত করার ব্যাপারটি সম্ভব হয় এলিরণ দুটির সাহায্যে। এটি প্লেন চালনার পক্ষে খুবই জরুরী। কারণ প্লেনকে ঘোরাতে গেলেই একদিকে কাত করা প্রয়োজন। এলিরণ দুটি এমনভাবে যুক্ত থাকে যে, একটিকে ওপর দিকে ওঠালে অপরটি নীচের দিকে নেমে আসে। যে এলিরণটি ওপরের দিকে ওঠে তার ওপর বায়ুর নিম্নমুখী চাপ পড়ে ফলে সেদিকের ডানাটি নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর অপর দিকের এলিরণটি নীচের দিকে নামার ফলে বায়ুর চাপ এমনভাবে পড়ে



★ প্লেনটি ওপর দিকে উঠছে

▲ প্লেনটিকে একপাশে কাত করা হচ্ছে

নীচের দিকে প্লেনটি নেমে আসছে

প্লেনটিকে ঘোরানো হচ্ছে

যাতে ডানাটি ওপর দিকে উঠে যায়। এইভাবে এলিরণগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে নির্দিষ্ট দিকে কাত করে ঘোরানো সম্ভব হয়।

প্লেনকে নির্দিষ্ট গতিপথে চালনার কাজটি করা হয় রাডারের সাহায্যে। রাডারের কাজ হল আসলে নৌকার হালের মত। হালের সাহায্যে যেমন নৌকার গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করা হয় তেমনি রাডার-এর সাহায্যে এরোপ্লেনকে আকাশে নির্দিষ্ট পথে চালনা করা সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে রাডার ও এলিরণের যুক্ত পরিচালনার দ্বারাই প্লেনকে নির্দিষ্ট দিকে ঘোরানো হয়।

এছাড়া চালককে আরও অনেকগুলি নির্দেশক যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। উন্নত ধরনের প্লেন সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে পরিচালক যন্ত্রগুলির সংখ্যা ও জটিলতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

ভারতীয় বিমান

১৮৭৭ সালে জোসেফ লীন নামে এক ভদ্রলোক বোম্বাই-র লালবাগ উদ্যান থেকে বেলুনে করে ৭,৫০০ ফুট ওপরে উঠে ভারতবর্ষে প্রথম বিমান চালনার সূচনা করেন।

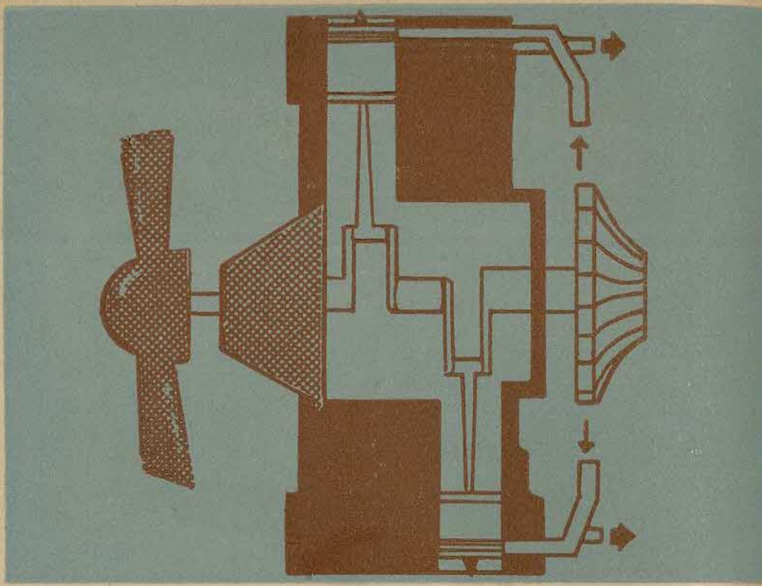
১৯১১ সালে সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ভারতবর্ষের আকাশে প্রথম এরোপ্লেন চালনা করেন। ওই বছরেই এলাহাবাদ থেকে নৈনীতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম এরোপ্লেনের সাহায্যে ডাক নিয়ে যাওয়া হয়। উপরিউক্ত দুটি শহরের দূরত্ব হচ্ছে ছ মাইল। এরোপ্লেনটি চালনা করেন ফরাসী বৈমানিক পিকেট।

তারপর ১৯২০ সালে বোম্বাই-র তৎকালীন গভর্ণর লর্ড লয়েড এরোপ্লেনের সাহায্যে ডাক নিয়ে যাওয়ার নিয়মিত ব্যবস্থাটির উদ্বোধন করেন। ওই বছরেই ইংল্যাণ্ড এবং ভারতবর্ষের মধ্যে বিমান চলাচলের পরিকল্পনা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে বিমানবন্দর নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়।

১৯২৯ সালে লণ্ডন থেকে করাচী অবধি নিয়মিত বিমান চলাচল শুরু হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের আবির্ভাব হয়।

ভারতবর্ষে এখন মোট ৮২টি বিমানবন্দর আছে। তাদের মধ্যে কলিকাতা (দমদম), বোম্বাই (সান্তাক্রুজ), এবং দিল্লীর (পালাম) বিমানবন্দরগুলি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসাবে স্বীকৃত।

ভারতবর্ষে এরোপ্লেন নির্মাণের কাজ শুরু হয় ১৯৪০ সালে যখন হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফট লিমিটেড ব্যাঙ্গালোরে এরোপ্লেন মেরামত করবার জন্যে একটি কারখানা স্থাপন করেন। ১৯৪৫ সালে ভারত সরকার কোম্পানীটির কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। এখন ওই কারখানায় নিয়মিতভাবে এরোপ্লেন তৈরী করা হয়।



প্লেনের প্রপেলারটি চালানো হয় পিস্টনচালিত ইঞ্জিনের সাহায্যে। ছবিতে ইঞ্জিনের আভ্যন্তরীণ ভাগ দেখানো হয়েছে। এটি মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনের মতই। তবে এতে সিলিণ্ডারগুলি বৃত্তাকারে সাজানো থাকে। ফলে অনেকগুলি পিস্টনের সাহায্যে প্রপেলারটিকে ঘোরানো সম্ভব হয়। এই ধরনের ইঞ্জিনকে বলে 'রেডিয়াল ইঞ্জিন'।

ভারতীয় বিমানের কয়েকটি স্মরণীয় তারিখ

১৯১১—এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত একটি প্রদর্শনীর মাঠ থেকে ফরাসী বৈমানিক পিকেট ছ মাইল দূরে নৈনীতে প্রথম সরকারী ডাক নিয়ে যান ওই বছরের ১৮ই ফেব্রুয়ারী।

১৯১২—বড়দিন উপলক্ষ্যে কলিকাতায় জুলে টাইক এবং ব্যারণ দ্য কার্টার্স ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম জনসাধারণের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে যাত্রী হিসাবে নিয়ে এরোপ্লেন চালনা করেন।

১৯১৮—ক্যাপ্টেন রস স্মিথ কর্তৃক মিশর থেকে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম এরোপ্লেন চালনা।

১৯১৯—ম্যাকলারেন এবং হেলী কর্তৃক ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম এরোপ্লেন চালনা।

১৯২৭—ভারতবর্ষে আন্তর্জাতিক বিমান দপ্তর স্থাপন।

১৯২৮—ভারতবর্ষে প্রথম ফ্লাইং ক্লাব স্থাপন।

১৯২৯—ইংল্যাণ্ড এবং ভারতবর্ষের মধ্যে বিমানযোগে নিয়মিত ডাক পাঠাবার ব্যবস্থা শুরু হয় ওই বছরের ৩০শে মার্চ।

১৯৩০—প্রথম ভারতীয় বৈমানিক ভগৎলাল বিমান চালনার লাইসেন্স পান।

১৯৫৩—ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্‌স্ কর্পোরেশন গঠন করে ভারতীয় বিমানপথ জাতীয়করণ করা হয় ওই বছরের ১লা অগাস্ট।

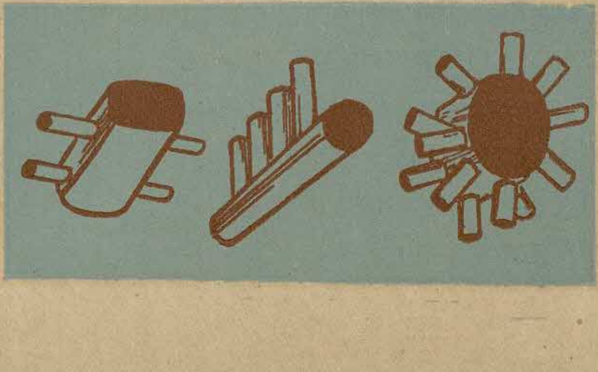
১৯৫৭—ভারতে প্রথম ভাইকাউন্ট বিমান চলাচলের সূচনা করেন ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্‌স্ কর্পোরেশন।

১৯৫৮—ভারতবর্ষ এবং রাশিয়ার মধ্যে নিয়মিত বিমান চলাচল শুরু হয়।

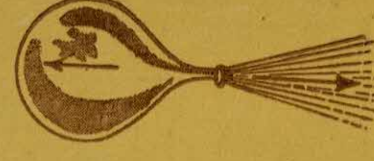
১৯৬০—একখানি বোয়িং-৭০৭ এরোপ্লেন লণ্ডনে যাত্রা করে ভারতবর্ষে প্রথম জেট এরোপ্লেন চালনার সূচনা করে ওই বছরের ১৯শে এপ্রিল।

১৯৬১—ভারতবর্ষে নির্মিত শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমান প্রথম আকাশে ওড়ে ওই বছরের ২৪শে জুন।

বিভিন্ন ধরনের পিস্টনচালিত ইঞ্জিন



জেট প্লেন



নিউটনের গতিসূত্রের দৃষ্টান্ত



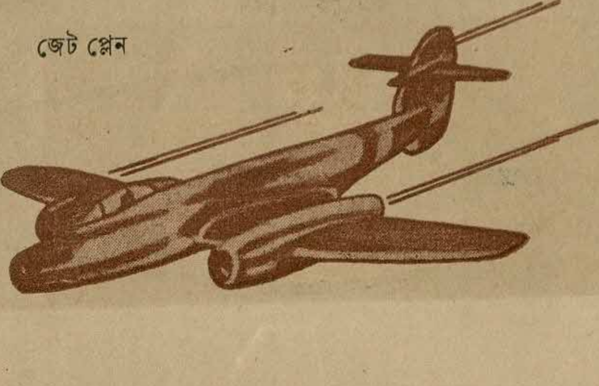
হিরোর জেট ইঞ্জিন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে এক নতুন ধরনের প্লেন সৃষ্টি হল যা মানুষের আকাশে ওড়ার ইতিহাসে আনল এক নতুন যুগ। এই প্লেনকে বলা হয় জেট প্লেন। এদের বিশেষত্ব হল—প্রপেলারবিহীন এই প্লেনগুলি এক উন্নত ধরনের ইঞ্জিনের সাহায্যে খুবই দ্রুতগতিতে আকাশ-পথে উড়ে যায়। এই বিশেষ যান্ত্রিক কৌশলের ব্যবহার প্লেনের ক্ষেত্রে নতুন হলেও এ ধরনের যন্ত্র বহু শতক আগে উদ্ভাবিত হয়।

শোনা যায় যে, প্রায় দু হাজার বছরেরও আগে আলেকজান্দ্রিয়ায় হিরো নামে এক গ্রীক গণিতবিদ্ প্রথম জেটচালিত ইঞ্জিন তৈরী করেন। তাঁর এই ইঞ্জিনে ছিল একটি ধাতুর তৈরী বল যার মধ্যে নলের সাহায্যে বাষ্প ভর্তি হত। বলের সঙ্গে লাগানো ছিল দুটি বাঁকানো নল। এই নল দুটির মধ্যে দিয়ে বাষ্প সবেগে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলটি বাষ্পের গতিপথের বিপরীত দিকে (তীরের সাহায্যে ছবিতে দেখানো হয়েছে) ঘুরতে থাকত। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি যে কোন কাজে লাগানো যেতে পারে তা মানুষের কল্পনায়ও আসেনি।

এই ব্যাপারটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন প্রায় তিনশ বছর আগে। গতি-সম্পর্কিত তাঁর এই সূত্রটি হচ্ছে, ক্রিয়া থাকলেই প্রতিক্রিয়া থাকবে এবং ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হবে সমান ও বিপরীত। হিরোর ইঞ্জিনও এই সূত্র অনুসারে চলে। বাঁকানো নলের মধ্যে দিয়ে বাষ্প সবেগে বেরিয়ে আসার ফলে যে ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়ার ফলে ইঞ্জিনটি ঘুরতে থাকে।

জেট প্লেন



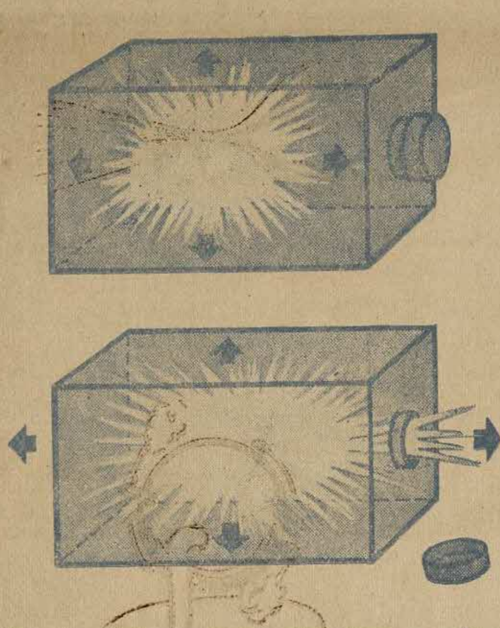
কয়েকটি সহজ দৃষ্টান্তের সাহায্যে নিউটনের গতিসূত্রটি বোঝা যাবে। বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়া হলে বন্দুকের বাঁট কাঁধে ধাক্কা মারে। বন্দুকের গুলি সবেগে সামনে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তারই প্রতিক্রিয়ার ফলে চালকের কাঁধে বন্দুকের বাঁটের ধাক্কা লাগে। এবার আর একটি পরীক্ষা করা যাক। একটি বেলুনকে যদি ফুলিয়ে হাত থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে, বেলুনটি বেশ জোরে লাফিয়ে উঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার বেলুনের ভিতর থেকে সব হাওয়া বেরিয়ে গেলেই সেটি মাটিতে পড়ে যাবে। আসলে কি হচ্ছে? বেলুনের মুখ দিয়ে দ্রুত হাওয়া বেরিয়ে আসার ফলে যে ক্রিয়া হয় তারই সমান ও বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়ার ফলেই বেলুনটি ছুটে যায়। এই

জেট ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে

জেট ইঞ্জিন বিভিন্ন প্রকারের হলেও তাদের কর্মপদ্ধতি একই থাকে। এ ধরনের ইঞ্জিন একটি লম্বা নলের মত। এতে থাকে তিনটি প্রধান অংশ। সেগুলি হল ঃ

কম্প্রেসার

ইঞ্জিনের সামনের দিকে লাগানো এই ঘূর্ণ্যমান যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুকে দহন-প্রকোষ্ঠের মধ্যে টেনে নেওয়া হয়। তাছাড়া কম্প্রেসার বায়ুর চাপ অনেকগুণ বাড়িয়েও দেয়।

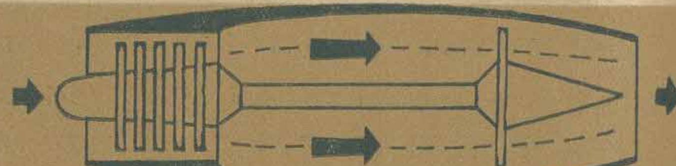


টিনের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটানো হলে তার ফলে উৎপন্ন গ্যাস টিনের চারিদিকেই সমান শক্তিতে চাপ দেবে। টিনের খোলা মুখটি ঢাকনার সাহায্যে শক্ত ভাবে বন্ধ রাখলে টিনটি প্রায় একই জায়গায় স্থির হয়ে থাকবে। কিন্তু ঢাকনাটি খোলা রাখলে টিনটি গ্যাসের নির্গমণ পথের বিপরীত দিকে দ্রুত ছুটে যাবে।

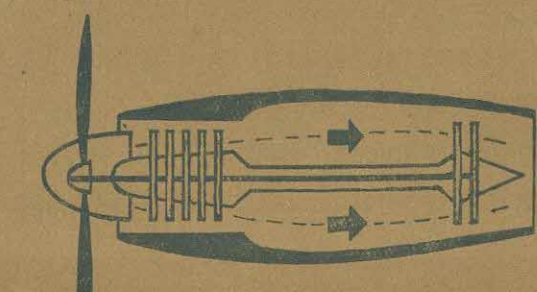
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্র অনুসারেই জেট প্লেন আকাশ-পথে উড়ে যায়। যে বিশেষ কৌশলে প্লেনের ইঞ্জিনে গতি সঞ্চারিত হয়, তাকে বলে 'জেট-প্রোপালসন'। এই কৌশলটি সহজভাবে বোঝার জন্যে আরেকটি পরীক্ষা চালানো যায়। মনে করা যাক একদিক খোলা একটি টিনে (ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে) কোন উপায়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হল। এর ফলে উৎপন্ন তপ্ত গ্যাস টিনের চারিদিকেই সমান শক্তিতে চাপ দেবে।

ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে টিনের খোলা মুখটি যদি ঢাকনার সাহায্যে শক্ত ভাবে বন্ধ রাখা হয়, তবে টিনটি একই জায়গায় স্থির থাকবে কারণ টিনের চারিদিকেই চাপ সমান রয়েছে।

কিন্তু ঢাকনাটি খুলে দিলে কি হবে? টিনটি গ্যাসের নির্গমন পথের বিপরীত দিকে দ্রুত ছুট দেবে। এর প্রকৃত কারণ হল খোলা মুখ দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে গেলেও তার ঠিক বিপরীত দিকে গ্যাস আগের মতই চাপ দিচ্ছে। এই চাপের জোরেই টিনটি বিপরীত দিকে ছুট দেয়। জেট ইঞ্জিনে ঠিক একই কৌশলে গতি সঞ্চারিত হয়।

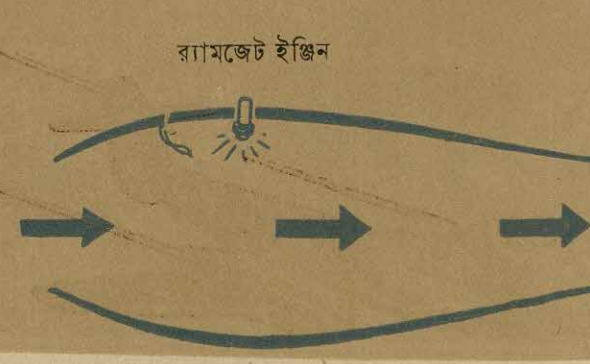


টার্বোজেট ইঞ্জিন



টার্বোপ্রপ্ জেট ইঞ্জিন

র‍্যামজেট ইঞ্জিন

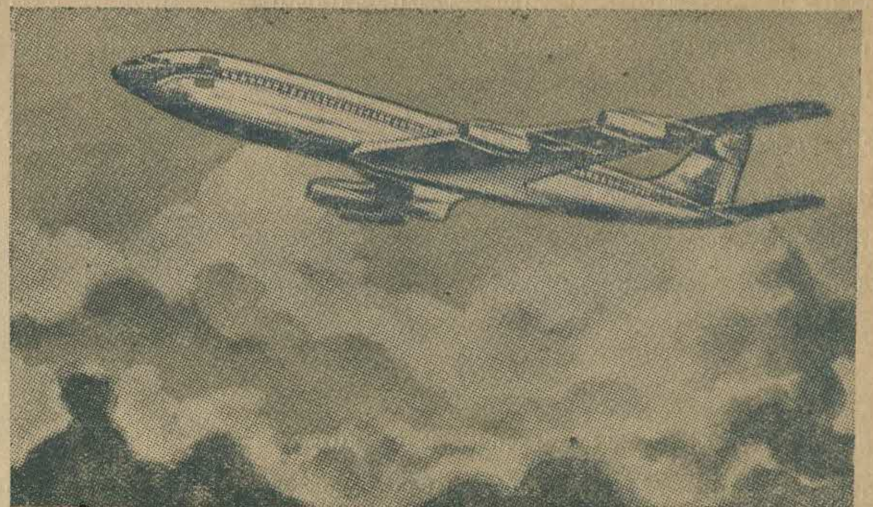


দহন-প্রকোষ্ঠ বা 'কম্বাস্‌চন্‌' চেম্বার

এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে উচ্চচাপবিশিষ্ট বায়ু ও জ্বালানির দহন প্রক্রিয়ার ফলে উত্তপ্ত গ্যাসের সৃষ্টি হয়।

টারবাইন

ইঞ্জিনের পিছন দিকে অবস্থিত এই ঘূর্ণ্যমান যন্ত্রটি ও কম্প্রেসার একই দণ্ডের সাহায্যে যুক্ত থাকে। দহন-প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসা উচ্চচাপের গ্যাসের সাহায্যে এটিকে চালানো হয়।



বর্তমান যুগের দূর পাল্লার যাত্রীবাহী জেট বিমান

জেট প্লেনের ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে সেটি এবার সহজেই বোঝা যাবে।

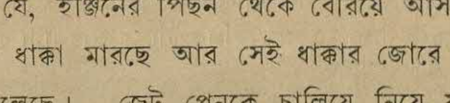
কম্প্রেসারের টানে বায়ু সবেগে ইঞ্জিনে প্রবেশ করে। কম্প্রেসার থেকে বেরিয়ে আসার পর বায়ুর চাপ আগের চেয়ে প্রায় নয় গুণ বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় বায়ু দহন-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে জ্বালানির তেলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। আবদ্ধ প্রকোষ্ঠে উচ্চচাপের বায়ুর মধ্যে ঐ তেল প্রজ্বলিত হলে প্রচণ্ড চাপবিশিষ্ট গ্যাস টারবাইনের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যায়।

এর ফলে টারবাইনটি দ্রুত গতিতে ঘুরতে শুরু করে ও কম্প্রেসারটিকেও ঘোরাতে থাকে। টারবাইন অতিক্রম করে এই গ্যাস ভীষণ বেগে সরু নলপথে বেরোতে থাকে। গ্যাসের এই পশ্চাদ্‌গতির ফলেই জেট প্লেন সম্মুখগতি লাভ করে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখা প্রয়োজন। জেট প্লেন ছুটে চলার কারণ এই নয় যে, ইঞ্জিনের পিছন থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাস বাতাসকে ধাক্কা মারছে আর সেই ধাক্কার জোরে প্লেনটি এগিয়ে চলেছে। জেট প্লেনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে শক্তি তৈরী হচ্ছে ইঞ্জিনের ভিতরেই।

বিভিন্ন প্রকার ইঞ্জিনের কর্ম্মক্ষমতা

ইঞ্জিন	সবচেয়ে বেশী গতিবেগ (মাইল ঘণ্টায়)
প্রপেলার-চালিত	৩৭৫
টার্বোপ্রপ	৫০০
টার্বোপ্রপ্‌ জেট	১৩০০
র‍্যামজেট	৪০০০



বিভিন্ন প্রকারের জেট ইঞ্জিন

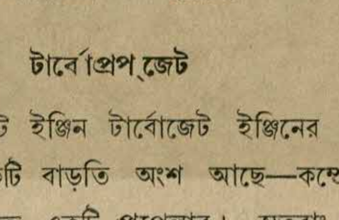
জেট ইঞ্জিন মুখ্যতঃ তিন রকমের : টার্বোজেট, টার্বোপ্রপ্‌ জেট ও র‍্যামজেট।

টার্বোজেট

টার্বোজেট ইঞ্জিনই সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের ইঞ্জিনের কর্মপদ্ধতি সাধারণ জেট ইঞ্জিনের মত। এ সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

টার্বোপ্রপ্‌ জেট

টার্বোপ্রপ্‌ জেট ইঞ্জিন টার্বোজেট ইঞ্জিনের মতই। তবে এতে আরেকটি বাড়তি অংশ আছে—কম্প্রেসারের সাথে একই দণ্ডে যুক্ত একটি প্রপেলার। সুতরাং এক্ষেত্রে টারবাইনের সাহায্যে কম্প্রেসার ও প্রপেলার উভয়কেই



ঘোরানো হয়। বহির্গামী উচ্চচাপের গ্যাস ও প্রপেলার এই দুয়ের সাহায্যেই প্লেনটি এগিয়ে চলে; সুতরাং বোঝা যাচ্ছে পিস্টনচালিত ইঞ্জিন ও টার্বোজেটের মাঝামাঝি

অবস্থা হল—টার্বোপ্রপজেট ইঞ্জিনের। প্রপেলার ঘোরানোর বাড়তি কাজের জন্যে এর টারবাইনটি আরো বড়ো এবং ভারী হয়। টার্বোপ্রপজেট ইঞ্জিনের গতিবেগ অপেক্ষাকৃত কম হলেও এর কর্মক্ষমতা টার্বোজেটের চেয়ে বেশী। প্রপেলারের সাহায্যে অনেক কম গতিবেগ উৎপন্ন করেই প্লেনটি মাটি থেকে আকাশে উড়তে পারে। সুতরাং ছোট বিমানবন্দরেও এই ধরনের প্লেন সহজেই ওঠানামা করতে সক্ষম হয়।

র্যামজেট

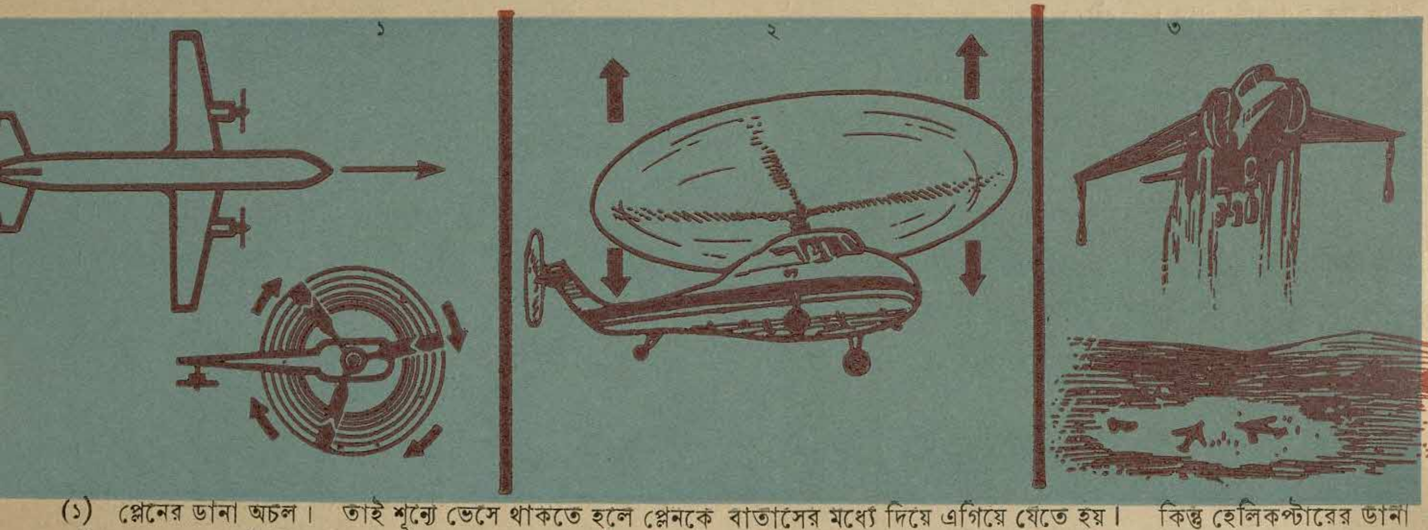
তিন রকমের জেট ইঞ্জিনের মধ্যে র্যামজেটই সর্বাপেক্ষা সরল। এটি হল ছদিক খোলা একটি লম্বা নল বিশেষ। এর মধ্যে ঘূর্ণ্যমান কোন অংশ নেই। প্লেনটি বায়ুর মধ্যে দিয়ে যখন খুব জোরে ছুটতে থাকে তখন ইঞ্জিনের মুখ দিয়ে সবেগে বায়ু ঢুকতে শুরু হয়।

ইঞ্জিনের সাহায্যেই প্রয়োজনীয় গতিবেগ দিতে হয়। র্যামজেট অন্যান্য সব ধরনের জেট ইঞ্জিন অপেক্ষা দ্রুতগামী।

জেট ইঞ্জিন ও পিস্টন ইঞ্জিন

জেট প্লেন পিস্টনচালিত প্লেনের চেয়ে অনেক বেশী কর্মক্ষম। জেট প্লেন অনেক বেশী দ্রুতগামী ও শক্তিশালী। এর গঠনও অপেক্ষাকৃত সরল। অধিক উচ্চতায় জেট প্লেনের কর্মক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। জ্বালানি হিসাবে পেট্রল ছাড়া কেরোসিন বা ডিজেল তেলও এতে ব্যবহার করা যায়। তবে অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে কম দূরত্ব অতিক্রম করার জন্যে পিস্টনচালিত প্লেন অপরিহার্য।

জেট প্লেনের একটি অসুবিধা হল—ওঠা-নামার জন্যে এর অনেক লম্বা 'রান্‌ওয়ে' প্রয়োজন হয়। 'রান্‌ওয়ে' হল যে বিশেষ পথ দিয়ে চ'লে প্লেন ওঠে বা নামে। বর্তমান



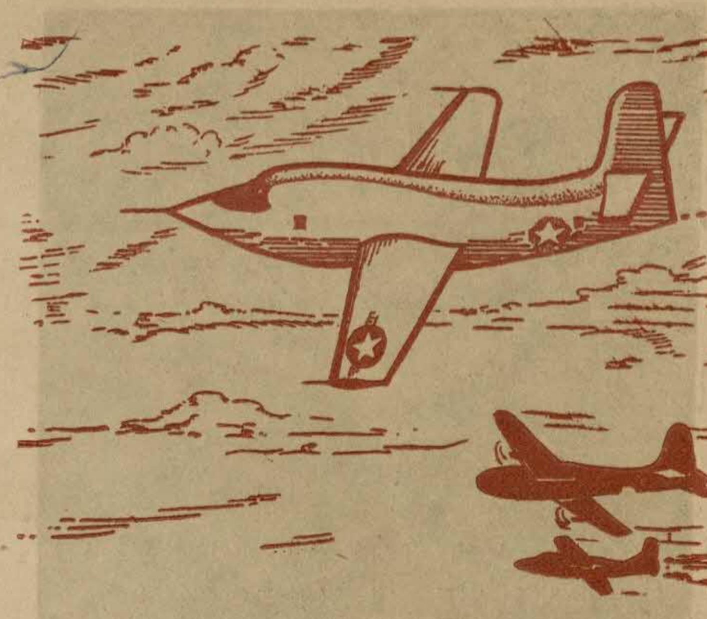
(১) প্লেনের ডানা অচল। তাই শূন্যে ভেসে থাকতে হলে প্লেনকে বাতাসের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু হেলিকপ্টারের ডানা ঘূর্ণ্যমান। ফলে এটি স্থির অবস্থা থেকে খাড়া শূন্যে ভেসে উঠতে সক্ষম। (২) ঘূর্ণ্যমান ডানার দ্বারা বাতাসকে নীচের দিকে চাপ দেওয়ার ফলেই হেলিকপ্টার সোজাসুজি শূন্যে ভেসে ওঠে। লেজের এক পাশে লাগানো ছোট পাখাটি ঘুরিয়ে হেলিকপ্টারের ভারসাম্য বজায় রাখা হয়। (৩) পরীক্ষামূলক এই জেট প্লেন হেলিকপ্টারের মত খাড়াভাবে শূন্যে ভেসে উঠতে সক্ষম।

এবার বায়ুর সাথে জ্বালানি মিশ্রিত করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। উত্তপ্ত গ্যাস-মিশ্রিত বায়ু সরু নলপথে প্রচণ্ড বেগে পিছন দিক দিয়েই বেরোতে থাকে কেননা ইঞ্জিনের সামনের দিক দিয়ে ক্রমাগত বায়ু সবেগে ঢুকে আসে। সুতরাং উত্তপ্ত গ্যাস পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ফলেই র্যামজেট সম্মুখগতি লাভ করে।

কিন্তু র্যামজেট ইঞ্জিনকে চালু করার আগে প্লেনটির গতি খুব দ্রুত হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং অন্য কোন ধরনের

যুগের বড় বড় জেট প্লেনের জন্যে 'রান্‌ওয়ে'র দৈর্ঘ্য প্রায় ছ মাইল হয়। জেট প্লেনের ইঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্দও খুব বিরক্তিকর। তবে আন্তঃ-মহাদেশীয় দূরত্ব অতিক্রম করা বা মহাসাগরের ওপর দিয়ে লম্বা পাড়ি দেওয়ার জন্যে জেট প্লেনই ভাল। যাত্রীবাহী প্লেন হিসাবে জেট প্লেন আজ সব দেশেই ব্যাপক-ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই দ্রুতগতি-সম্পন্ন প্লেনের সাহায্যে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যাওয়া সম্ভব হয়।

সুপারসনিক প্লেন



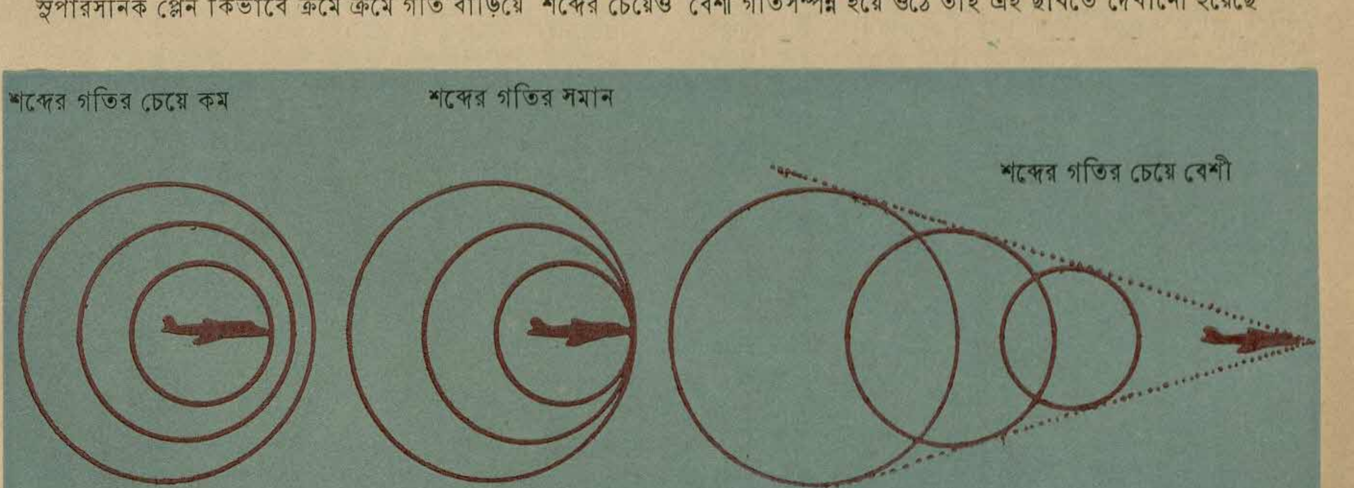
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রকেটইঞ্জিনচালিত 'বেল এক্স-১' প্লেনটিই প্রথম শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতে উড়তে সক্ষম হয়। অন্য একটি বড় প্লেনের সাহায্যে ৩০,০০০ ফুট উঁচুতে নিয়ে এর ইঞ্জিন চালু করা হয়।

উন্নত ধরনের ইঞ্জিন সৃষ্টি হবার সাথে সাথে প্লেনের গতিবেগও বেড়ে চলল। তবু বিজ্ঞানীদের মনের আশা মিটল না। তাঁরা চাইলেন আরও দ্রুতগতিসম্পন্ন প্লেন সৃষ্টি করতে। ফলে সৃষ্টি হল এক নতুন ধরনের প্লেন। একে বলা হয় 'সুপারসনিক' প্লেন অর্থাৎ যে প্লেনের গতিবেগ শব্দ-তরঙ্গের চেয়েও বেশী। 'সুপারসনিক' কথাটির অর্থ হল, শব্দের চেয়েও অধিক গতিসম্পন্ন। সাধারণ অর্থে বাতাসে শব্দ-তরঙ্গের গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১১২০ ফুট বা ঘণ্টায় প্রায় ৭৬০ মাইল। তবে এই মাপ পরিবর্তনশীল। শব্দের গতি বাতাসের প্রকৃতি ও তাপমাত্রার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

কিন্তু প্লেনকে এই প্রচণ্ড গতিবেগে চালনা করার পথে এক নতুন বাধা উপস্থিত হল। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন, প্লেনের গতি যখন শব্দ-তরঙ্গের গতির কাছাকাছি পৌঁছয় তখন এই নতুন বাধা উপস্থিত হয়। প্লেনের গতি শব্দের গতির সমান হলেই দেখা যায় প্লেনটি ভীষণভাবে কাঁপতে শুরু করেছে। এই কাঁপুনির মাত্রা মাঝে মাঝে এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে, প্লেনের ডানা ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়।

এই ব্যাপারটির বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এর কারণ জানতে পেরেছেন। শব্দের গতির সমান হলেই প্লেন যে-বাধার সম্মুখীন হয়, তাকে বলে 'সাউণ্ড বেরিয়ার' অর্থাৎ 'শব্দ-প্রাচীর'। শব্দের গতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেই এর এই নাম।

সুপারসনিক প্লেন কিভাবে ক্রমে ক্রমে গতি বাড়িয়ে শব্দের চেয়েও বেশী গতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে তাই এই ছবিতে দেখানো হয়েছে





আমেরিকার পরীক্ষামূলক রকেট প্লেনগুলির মধ্যে এক্স-১৫ অন্যতম। এই প্লেনটি ৪,৫০০ মাইল বেগে উড়তে ও ১০০ থেকে ১৫০ মাইল উর্ধ্বে আরোহণ করতে সক্ষম। একটি বিরাট প্লেনের সাহায্যে এক্স-১৫ প্লেনকে প্রায় ৪০,০০০ ফুট উঁচুতে নিয়ে এর রকেট ইঞ্জিন চালু করা হয়।

কোন বস্তুর দ্রুত কম্পনের ফলে বায়ুর মধ্যে চাপের বৈষম্য ঘটে ফলে বায়ুতে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, যেমন জলে ঢিল ফেললে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। শব্দের উৎপত্তিস্থল থেকে তরঙ্গের স্তর ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে।

প্লেন যখন শব্দের চেয়ে ধীর গতিতে চলে, তখন প্লেন যে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করে সেগুলি প্লেনের আগেই ছুটে চলে। ছবিতে বৃত্তরেখার সাহায্যে শব্দ-তরঙ্গগুলি দেখানো হয়েছে। কিন্তু প্লেনের গতি ক্রমে যখন শব্দের গতির সমান হয়ে যায় তখন প্লেনটি শব্দ-তরঙ্গের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে। এই অবস্থায় পৌঁছলে শব্দের উচ্চচাপবিশিষ্ট তরঙ্গগুলি প্লেনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। ফলে এগুলি প্লেনটিকে ঘিরে থাকে ও প্লেনের সামনের দিকে উচ্চচাপ বায়ুর একটি প্রাচীর সৃষ্টি করে। এই অবস্থাতেই প্লেনটি উচ্চচাপ তরঙ্গের ধাক্কায় ভীষণভাবে কাঁপতে থাকে। এখন প্লেনটিকে শব্দের চেয়েও দ্রুতগতিতে ছুটতে হলে প্লেনটিকে উচ্চচাপের এই প্রাচীরকে ভেদ করে যেতে হয় যাকে বলে 'সাউণ্ড বেরিয়ার'।

কিন্তু প্লেন এই বাধা ভেঙ্গে বেরোতে পারলে অর্থাৎ গতি শব্দের চেয়েও দ্রুত হলে শব্দ-তরঙ্গগুলি প্লেনের পিছনেই পড়ে থাকে ও প্লেনটি সুপারসনিক গতিতে এগিয়ে যায়। আবার গতি কমবার সময়ও প্লেনকে 'সাউণ্ড বেরিয়ার' অতিক্রম করতে হয়।

সুপারসনিক প্লেনের গড়নও বিশেষ ধরনের হয়। প্লেনের মুখটি থাকে সূঁচের মত সরু ও ডানা দুটি থাকে পিছন দিকে বাঁকানো। এই বিশেষ গড়নই প্লেনটিকে সহজে 'সাউণ্ড বেরিয়ার' অতিক্রম করে যেতে সাহায্য করে।

সুপারসনিক প্লেনগুলির গতি নির্দিষ্ট করা হয় একটি বিশেষ এককের সাহায্যে। এই এককটি হল 'ম্যাক সংখ্যা'। এই 'ম্যাক সংখ্যা' থেকে বোঝা যায় প্লেনের গতি শব্দের গতির তুলনায় কতখানি বেশী বা কম। শব্দের চেয়ে দ্বিগুণ গতিসম্পন্ন প্লেনের গতিকে বলা হয় ম্যাক-২, তিনগুণ হলে ম্যাক-৩ ইত্যাদি।

এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার। শব্দের গতিবেগ বায়ুর তাপ ও ঘনত্বের ওপর নির্ভরশীল। সমুদ্রের কাছে শব্দের গতি ঘণ্টায় প্রায় ৭৬০ মাইল (তাপমাত্রা ৬০ ডিগ্রি ফারেনহিট)। কিন্তু ৩৫,০০০ ফুট উচ্চতায় বায়ুর ঘনত্ব কম এবং তাপমাত্রাও অনেক কম (-৬৫ ডিগ্রি ফারেনহিট), ফলে শব্দের গতি ঘণ্টায় প্রায় ৬৬০ মাইল। এই বিশেষ গতিকেই 'ম্যাক—১' চিহ্নিত করা হয়।

বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে বসেই শব্দের চেয়ে দ্রুতগতি-সম্পন্ন প্লেনের ওপর বায়ুর প্রভাব সম্পর্কে জানার জন্যে এক বিশেষ পন্থা আবিষ্কার করছেন। একে বলে 'উইণ্ড টানেল'। প্লেনের মডেলটিকে 'উইণ্ড টানেলের' মধ্যে রেখে খুব দ্রুত বায়ুস্রোত সৃষ্টি করা হয়। এই পরীক্ষা থেকেই প্লেনের প্রকৃত গড়ন ও সংশ্লিষ্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন।

সুপারসনিক প্লেন নির্মাণে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। রকেট ইঞ্জিনচালিত, তাঁদের 'বেল এক্স—১' প্লেনটি ১৯৪৭ সালে শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতে ছুটতে সক্ষম হয়। এরপর উন্নত থেকে উন্নততর ধরনের সুপারসনিক প্লেন তৈরী হতে থাকে। এ ধরনের প্লেনের সামরিক ব্যবহারই বেশী। পরীক্ষামূলক ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার ব্যাপক। বর্তমান যুগে উন্নত ধরনের জেট ও রকেট ইঞ্জিনচালিত দ্রুতগামী প্লেন সৃষ্টি হওয়ায় মানুষের আকাশ-পাড়ির ইতিহাসে দেখা দিয়েছে আর একটি নতুন যুগের সম্ভাবনা।

হেলিকপ্টার

হেলিকপ্টার বলতে বোঝায় বিশেষ এক শ্রেণীর উড়োজাহাজ, যা সোজাসুজি ওপরে উঠতে বা নীচে নামতে পারে। প্রকৃতপক্ষে হেলিকপ্টারকে খুব সহজে যে কোন দিকে চালনা করা যায় এবং এমন কি শূন্যে স্থির অবস্থায়ও রাখা যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বিজ্ঞানী লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি হেলিকপ্টারের প্রথম পরিকল্পনা করেন।

তবে হেলিকপ্টার নির্মাণের ইতিহাসে অগ্রণী হলেন রাশিয়ার সিকোরস্কি। ১৯১০ সালে তিনি প্রথম হেলিকপ্টারের একটি মডেল তৈরী করেন। তবে প্রকৃত সাফল্য আসে প্রায় তিরিশ বছর পর—তাঁর আমেরিকায় বসবাসকালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় খুব দ্রুত হেলিকপ্টারের উন্নতি হতে থাকে।

খুব কম জায়গার মধ্যে হেলিকপ্টার স্বচ্ছন্দে অবতরণ করতে পারে বলে পার্বত্য এলাকায় ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এরূপ উড়োজাহাজ খুবই সুবিধাজনক।

হেলিকপ্টার অল্প পরিসর জায়গা থেকে স্বচ্ছন্দে খাড়াভাবে উড়ে যেতে ও নেমে আসতে পারে। এটি সম্ভব হয় হেলিকপ্টারের ওপর দিকে লাগানো পাখার সাহায্যে। পাখার ব্লেডগুলি প্রকতপক্ষে এরোপ্লেনের ডানার অনুরূপ।

আমরা জেনেছি, ডানাই এরোপ্লেনকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখে। এরোপ্লেনের খোলের সাথে লাগানো ডানা যখন বাতাসের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায় তখনই ডানায় ভার তোলার ক্ষমতা জন্মায় অর্থাৎ শূন্যে ভেসে ওঠার আগে প্লেনকে বাতাসের মধ্যে দিয়ে ছুটে যেতে হয়। হেলিকপ্টারের ডানাই (পাখার ব্লেড) সচল। যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ব্লেডগুলিকে ঘোরানো হয়। ব্লেডগুলি বাতাস কাটতে থাকে, ফলে শূন্যে ভেসে ওঠার মত শক্তি জন্মায়। এর ব্লেডগুলি নিয়ন্ত্রণশীল। এগুলিকে প্রয়োজনমত কাত করেই হেলিকপ্টারকে সামনে, পিছনে বা পাশের দিকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় (১৪৮ পাতার ছবি দ্রষ্টব্য)।

বিমানবন্দর

প্রায় সব বিমানযাত্রাই কোন বিমানবন্দরে শুরু হয় এবং অপর বিমানবন্দরে গিয়ে তা শেষ হয়। বিমানবন্দরে বিস্তীর্ণ মাঠের ওপরে নির্মাণ করা হয় কন্‌ক্রীটের 'রাণওয়ে'। এই রাণওয়ের ওপর দিয়ে ছুটেই এরোপ্লেন অবশেষে আকাশে ওঠে বা মাটিতে নেমে আসে।

এরোপ্লেনের 'গ্যারেজ'কে বলে হ্যাঙ্গার। যেসব এরোপ্লেন মেরামত করতে হবে, তাদের এই হ্যাঙ্গারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যেসব এরোপ্লেনের ওড়বার দেরী আছে, তাদেরও এইসব হ্যাঙ্গারে রাখা হয়।

বিমানবন্দরে নানা কাজ করার জন্যে বহু কর্মচারী নিযুক্ত থাকেন। বিমানবন্দর থেকে বেতারের সাহায্যে এরোপ্লেনগুলির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়, আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয় এবং অন্যান্য নানা প্রয়োজনীয় কাজ করা হয়।

বিমানবন্দর থেকে কোন এরোপ্লেন যাত্রা শুরু করার আগে তার কলকব্জাগুলিকে ইঞ্জিনীয়াররা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেন, প্রয়োজনমত মেরামত করে দেন। তারপর তাতে প্রয়োজনীয় গ্যাস এবং তেল ভর্তি করা হয়। বিমানবন্দরের আবহাওয়া অফিস বৈমানিককে আবহাওয়ার অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে দেন। বৈমানিক তাঁর যাত্রার পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে পেশ করেন; এই পরিকল্পনার মধ্যে থাকে যাত্রার দিক এবং উড্ডয়নের উচ্চতা।

তারপর বৈমানিক বেতারের সাহায্যে বিমানবন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। সেখান থেকে তাঁকে তাঁর যাত্রার সঠিক সময়, গতিবেগ, বায়ু কোনদিকে বইছে এবং রাস্তা সম্বন্ধে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়। আকাশে ওঠবার আগে রাণওয়ের কোন্ অংশ দিয়ে তিনি তাঁর এরোপ্লেন নিয়ে ছুটবেন, সেকথাও তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ইঙ্গিত পাবার সঙ্গে সঙ্গেই এরোপ্লেন তার যাত্রা শুরু করে। বৈমানিক ম্যাপ এবং চার্টের সাহায্যে তাঁর এরোপ্লেনকে চালনা করতে থাকেন।

গন্তব্যস্থলে যাবার সময় প্রত্যেক এরোপ্লেনই আকাশে একটি নির্দিষ্ট পথ দিয়ে চলে। রাস্তায় মোটরগাড়ী চলাচল করবার জন্যে যেমন নিয়মকানুন

আছে, বিভিন্ন এরোপ্লেনের জন্যেও তেমনি নিয়মকানুন আছে। বিভিন্ন এরোপ্লেনের জন্যে এইসমস্ত রাস্তার নির্দিষ্ট উচ্চতা ও বিস্তৃতি আছে। এবং বৈমানিককে সেই রাস্তা ধরেই চলতে হয়। অবশ্য বিপদে পড়লে এই রাস্তা ধরে চলবার কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না।

তারপর যে বিমানবন্দরে তাঁকে নামতে হবে, বৈমানিক তাঁর এরোপ্লেনখানি নিয়ে সেদিকে এগিয়ে আসেন। রাত্রিবেলায় আলোকসংকেত দেখে তিনি বিমানবন্দরটিকে চিনতে পারেন। তখন তিনি বেতারের সাহায্যে বিমানবন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তিনি তাঁর এরোপ্লেনের নম্বর, মডেল, সেই এরোপ্লেনটি কোন কোম্পানীর, তার অবস্থিতি, উচ্চতা, গতি ইত্যাদি সম্বন্ধে কন্ট্রোল টাওয়ারকে জানিয়ে অবতরণের জন্যে তাঁদের কাছ থেকে নির্দেশ চেয়ে পাঠান।

বিমানবন্দরে তখন যদি আরও কয়েকটি এরোপ্লেনের অবতরণের কথা থাকে, তবে কন্ট্রোল টাওয়ার একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা জানিয়ে তাঁকে সেই উচ্চতায় বিমানবন্দরের ওপরে ঘুরপাক খেতে বলেন। এইভাবে বিভিন্ন উচ্চতায় অনেকগুলি এরোপ্লেন বিমানবন্দরে নামবার জন্যে বিমান বন্দরের ওপর চক্কর দিতে থাকে। সবচেয়ে নীচের এরোপ্লেনটি থাকে এক হাজার ফুট ওপরে। তার ওপরেরটি থাকে আরও এক হাজার ফুট ওপরে। এইভাবে পর পর যেসব এরোপ্লেন বিমানবন্দরে আসে সেগুলি নামবার সুযোগের অপেক্ষায় একের এক হাজার ফুট ওপরে আরেকজন উড়তে থাকে। তারপর কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে সঙ্কেত গেলে সবচেয়ে নীচের এরোপ্লেনটি বিমানবন্দরে নেমে আসে। সঙ্গে সঙ্গে ওপরের অপেক্ষমান প্রত্যেকটি এরোপ্লেন এক হাজার ফুট করে নীচে নেমে আসে।

দিনের বেলায় বিমানবন্দরে অবতরণ করাটা তুলনা-মূলকভাবে সহজ। কিন্তু রাত্রির ঘন অন্ধকার দূরে থাক দিনের বেলাতেও, বিশেষতঃ পশ্চিমী দেশের বিমান-বন্দরগুলিতে, অনেকসময় এত ঘন কুয়াশা থাকে যে, এক হাত দূরের মানুষ চোখে দেখা যায় না। এইরকম প্রাকৃতিক অবস্থায় বিমানবন্দরে সাধারণতঃ দুটি পদ্ধতির যেকোন একটির সাহায্যে এরোপ্লেনকে অবতরণে সাহায্য করা হয়। এই দুটি পদ্ধতির নাম ইনস্ট্রুমেন্ট ল্যাণ্ডিং সিস্টেম (ILS) এবং গ্রাউণ্ড কন্ট্রোল অ্যাপ্রোচ (GCA)।

ইনস্ট্রুমেন্ট ল্যাণ্ডিং সিস্টেম

যে সমস্ত বিমানবন্দরে ইনস্ট্রুমেন্ট ল্যাণ্ডিং পদ্ধতির ব্যবস্থা আছে, সেখানে বৈমানিক ককপিটের বাইরে না তাকিয়েও তাঁর এরোপ্লেনকে নীচে নামিয়ে আনতে পারেন।

এই ব্যবস্থায় রাণওয়ের একেবারে শেষ প্রান্তে অবস্থিত প্রেরক কেন্দ্র থেকে একজোড়া সমান্তরাল রশ্মি পাঠানো হয়; এই দুটি রশ্মিই একই বেতার কম্পাঙ্কের। এরোপ্লেনের মধ্যে একটি বেতার গ্রাহকযন্ত্র দিয়েই এদের ধরা যায়। বৈমানিক তাঁর এরোপ্লেনটিকে এই দুটি রশ্মির মাঝখানে রাখেন। দ্বিতীয় একটি প্রেরকযন্ত্র থেকে আরেক জোড়া রশ্মি পাঠানো হয়; এ দুটি রশ্মি থাকে একটির ওপরে আরেকটি। যতক্ষণ বৈমানিক তাঁর এরোপ্লেনটিকে এই দ্বিতীয় রশ্মি জোড়ার মাঝখানে রাখতে পারেন, ততক্ষণ তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, তিনি সঠিকভাবেই নামছেন। রাণওয়ের প্রান্ত থেকে কত দূরে তিনি আছেন, বৈমানিক তা জানতে পারেন কতকগুলি 'ফ্যানমার্কার' প্রেরকযন্ত্রের সাহায্যে। এগুলিকে ফ্যানমার্কার বলা হয় কারণ এদের প্রত্যেকটি পাখার আকারের একটি রশ্মি সোজা আকাশের ওপর পাঠায়।

এইভাবে পুরোপুরি যন্ত্রের সাহায্যে বিমানবন্দরে অবতরণ করাটা খুব কঠিন। সৌভাগ্যক্রমে কদাচিৎ এর প্রয়োজন হয়।

গ্রাউণ্ড কন্ট্রোল অ্যাপ্রোচ

এই ব্যবস্থায় বিমানবন্দরে দু প্রস্থ র‍্যাডার যন্ত্র কাজ করে। অপারেটর যদি রাণওয়ের অনেক ওপর থেকে নীচে তাকাতেন, তাহলে তিনি যে দৃশ্য দেখতে পেতেন, প্রথম প্রস্থ র‍্যাডার যন্ত্রের পর্দায় অবিকল সেই ছবিটিই ফুটে ওঠে। দ্বিতীয় প্রস্থ র‍্যাডার যন্ত্রের পর্দায় ফুটে ওঠে সেই দৃশ্যের ছবি যা অপারেটর মাটিতে রাণওয়ের এক পাশ থেকে বহুদূরে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকালে যে দৃশ্য দেখতে পেতেন। এই দুটি র‍্যাডার যন্ত্রের পর্দাতেই আগত এরোপ্লেনের ছবিটি ফুটে ওঠে। বেতারের সাহায্যে অপারেটর তার বৈমানিকের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

এখন স্বভাবতঃই র‍্যাডারের পর্দায় যেসব ছবি ফুটে উঠেছে, তাদের দিকে তাকিয়ে অপারেটরের পক্ষে বৈমানিককে সঠিক পরামর্শ দিয়ে এরোপ্লেনটিকে নিরাপদে অবতরণ করতে সাহায্য করায় বিশেষ কষ্ট হয় না।

র‍্যাডার

র‍্যাডার শব্দটি এসেছে RAdio Detection And Ranging শব্দগুলির মধ্যে বড় হাতের অক্ষরগুলি থেকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই বিশেষ করে র‍্যাডারকে কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। ঠিকভাবে বলতে গেলে, র‍্যাডারের আবিষ্কার ওই সময়েই হয়েছে। নাৎসী জার্মানী চেয়েছিল প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করে ইংল্যাণ্ডকে ধ্বংস করবে; কিন্তু র‍্যাডারের সাহায্যে ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর পাইলটরা জার্মান প্লেনের আগমনের কথা আগে থেকেই জানতে পারতেন এবং সময় থাকতে প্রয়োজনমত ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন।

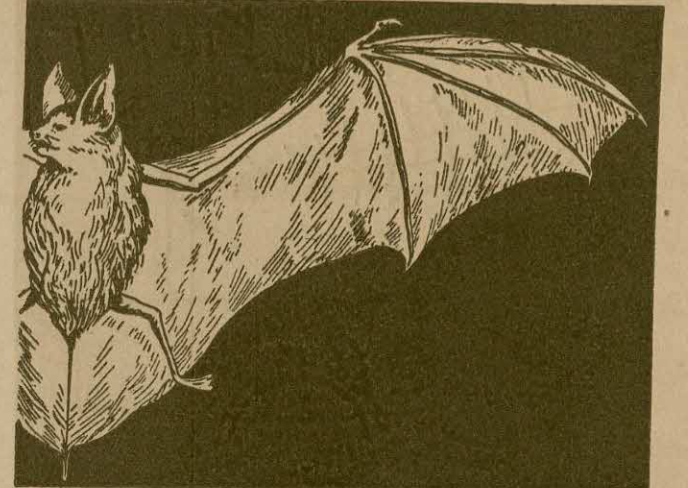
১৯২০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ গবেষণাকেন্দ্রে এ. এইচ. টেলর এবং এল. সি. ইয়ং র‍্যাডার নিয়ে প্রাথমিক গবেষণা করেন। এঁরা দুজন হাই-ফ্রিকোয়েন্সির বেতার তরঙ্গ ছেড়ে এবং তার প্রতিধ্বনি বিশ্লেষণ করে পোটোম্যাক নদীর ওপর জাহাজের উপস্থিতি টের পেয়েছিলেন। তাঁদের সেই প্রাথমিক গবেষণার সূত্র ধরেই মূলতঃ পরবর্তীকালে উন্নত ধরনের র‍্যাডার নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে।

উন্নত ধরনের র‍্যাডার নির্মাণের জন্যে আরও যাঁদের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজ পদার্থবিদ এম. এল. ই. ওলিফ্যাণ্ট এবং ম্যাসাচুসেট্স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির মার্কিন পদার্থবিদ ডাঃ লী এ. দ্যু ব্রিজ।

বাদুড় ও র‍্যাডার

বাদুড় অন্ধ, তারা রাত্রে ওড়ে, তবু কোন কিছুর সঙ্গে তাদের ধাক্কা লাগে না—এর ওপর ভিত্তি করেই র‍্যাডারের কার্যপ্রণালী। দৃষ্টিশক্তির পরিবর্তে বাদুড়ের রয়েছে এক চমকপ্রদ শ্রবণশক্তি।

র‍্যাডারে ট্রান্সমিটার থেকে বেতার তরঙ্গ চারিদিকে পাঠানো হয়। সেই তরঙ্গ যখন কোন বস্তুকে আঘাত করে,

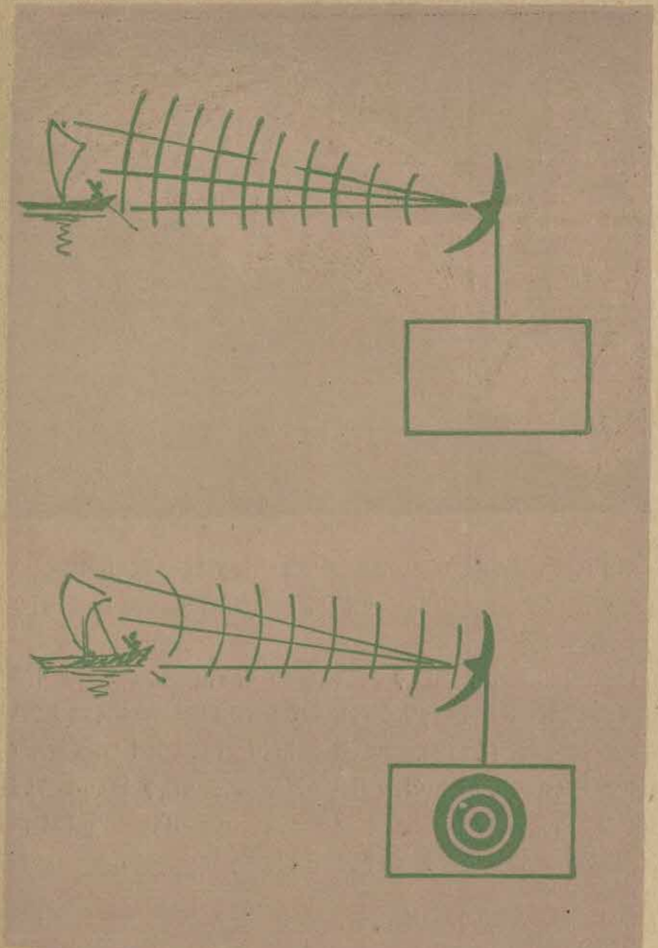


বাদুড়কে অন্ধ বললেই চলে। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে বাদুড়ের উড়তে কোন অসুবিধা হয় না। কোথাও কোন ধাক্কাও ওরা খায় না।

বিজ্ঞানীরা বলেন, বাদুড় সেকেণ্ডে ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ বার কম্পন-বিশিষ্ট শব্দ-তরঙ্গ তৈরী করতে সক্ষম। অন্ধকারের মধ্যে এই ধরনের শব্দ কোন দেওয়ালে বা গাছে বাধা পেলে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। প্রতিফলিত শব্দ শুনে বাদুড় হিসেব করে নেয় যে, দেওয়াল বা গাছ কত দূরে আছে এবং সেই হিসেব অনুযায়ী সরে গিয়ে তা এড়িয়ে যায়।

র‍্যাডার যন্ত্রে প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রের জন্যে একটিই অ্যাণ্টেনা থাকে। এই অ্যাণ্টেনা থেকে প্রেরক যন্ত্রের মাধ্যমে প্রেরিত বেতার তরঙ্গ কোন কিছুতে বাধা পেলে ধাক্কা খেয়ে আবার এই অ্যাণ্টেনায় ফিরে আসে এবং তার মাধ্যমে যায় গ্রাহক যন্ত্রে। সেখানে অসিলস্কোপ বেতার তরঙ্গের সেই প্রতিধ্বনিকে দৃশ্যমান একটি নক্সায় রূপান্তরিত করে।





জাহাজে বা সাবমেরিনে স্থাপিত র‍্যাডার যন্ত্রের সাহায্যে স্থলভূমি, অন্য জাহাজ, হিমশৈল প্রভৃতি দেখা যায়। র‍্যাডারের অ্যান্টেনার সাহায্যে প্রেরিত বেতার তরঙ্গ দূরে অবস্থিত কোন বস্তুতে আঘাত লেগে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলে, প্রেরক যন্ত্রে অসিলস্কোপে তার যে দৃশ্যমান নক্‌সা ধরা পড়ে, তা দেখে একজন বিশেষজ্ঞ বলে দিতে পারেন, বস্তুটি কি।

তখন তা আবার ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে এবং তাদের কিছু অংশ আবার ট্রান্সমিটারে চলে আসে। এই যে বেতার তরঙ্গ ট্রান্সমিটারে ফিরে আসে তা দিয়ে একটি বস্তুর উপস্থিতি, তার দিক এবং তার দূরত্ব নির্ণয় করা হয়।

সোনার বেতার তরঙ্গের পরিবর্তে শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে, কিন্তু তার কাজ একই ধরনের। বাদুড় সোনার ব্যবহার করে। একটি সাবমেরিনের মত, তা শব্দ তরঙ্গ পাঠায় এবং কোন কঠিন বস্তুতে আঘাত লাগলে তা ফিরে আসে।

বাদুড় যখন রাত্রে ওড়ে তখন সে প্রতি সেকেণ্ডে ৫০,০০০ থেকে ১০০,০০০ সাইক্‌ল্‌-এর হাই-ফ্রিকোয়েন্সি শব্দ খানিকক্ষণ পরপর ছাড়ে। মানুষের কান প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ২০,০০০ সাইক্‌ল্‌-এর বেশী ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ শুনতে পায় না। সুতরাং বাদুড়ের এই শব্দ মানুষ শুনতে পায় না। কিন্তু বাদুড় সে যে শব্দ করছে, তা শুনতে পায়।

মানুষ যে সব সোনার যন্ত্র তৈরী করেছে, তাদের চেয়ে বাদুড়ের সোনার বহুগুণ বেশী নিখুঁত। অথচ মানুষের তৈরী সর্বাপেক্ষা ছোট সোনারের চেয়ে বাদুড়ের সোনার বহুগুণে ছোট।

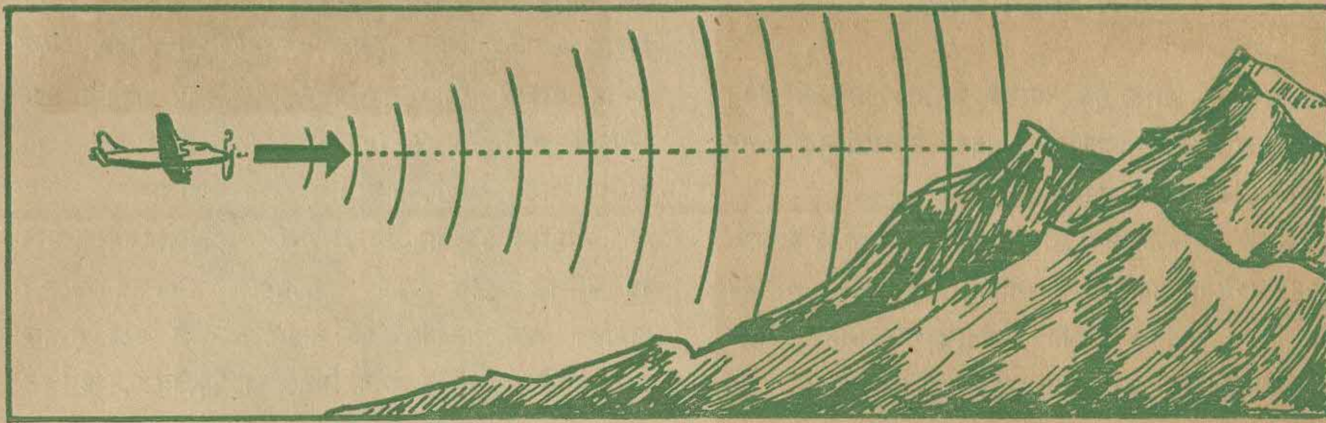
র‍্যাডার কিভাবে কাজ করে

র‍্যাডার সেটে প্রেরক আর গ্রাহক যন্ত্র দুই-ই আছে। ট্রান্সমিটার কতকটা বেতার প্রচারকেন্দ্রের মতই চলে। কিন্তু রিসিভার চলে অনেকটা টেলিভিসন গ্রাহক যন্ত্রের মত। এতে বেতার তরঙ্গের প্রতিধ্বনি ছবির মত ধরা হয়।

ট্রান্সমিটারটি একটি বিশেষ ধরনের প্রচারকেন্দ্র। ঠিক নিয়মিত সময় অন্তর এটি দিয়ে থেকে থেকে ছোট ছোট হাই-ফ্রিকোয়েন্সির বেতার তরঙ্গ ছাড়া হয়। এই বেতার তরঙ্গ ছাড়ার জন্যে একটি অ্যান্টেনার সাহায্য নেওয়া হয়।

র‍্যাডার যন্ত্রের সাহায্যে আগত ঝড়-জলের সঙ্কেত পাওয়া যায়। র‍্যাডারের পর্দায় তার ছবি ফুটে উঠলে বিমানচালক তার অবস্থিতি বুঝে তাকে এড়িয়ে নিজের প্লেন নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যান।





এরোপ্লেনে স্থাপিত র‍্যাডার যন্ত্র থেকে বেতার তরঙ্গ ছাড়া হচ্ছে

সেটি যতক্ষণ র‍্যাডার সেট চালানো হয় ততক্ষণ প্রতি মিনিটে এক থেকে ত্রিশবার ঘোরে। তার ফলে এটি চারিদিকের সমস্ত জায়গাটুকু বারবার খুঁটিয়ে দেখতে পারে। কয়েক ধরনের র‍্যাডারে বিরামহীন বেতার তরঙ্গ ছাড়া হয়।

যাইহোক, এই তরঙ্গগুলি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল গতিতে সরলরেখায় চলে। সামনে যাবার পথে তারা যদি কোন বস্তুতে আঘাত করে তবে তার থেকে প্রতিফলিত হয়। সেই প্রতিফলিত তরঙ্গের কিছুটা যেখান থেকে তারা যাত্রা শুরু করেছিল সেই ঘূর্ণমান অ্যাণ্টেনায় আবার ফিরে আসে।

এই যে বেতার তরঙ্গ কোন বস্তুতে আঘাত লেগে অ্যাণ্টেনায় ফিরে এল, এখন তা অ্যাণ্টেনার মাধ্যমে যায় র‍্যাডারের গ্রাহক যন্ত্রে। সেই গ্রাহক যন্ত্রে থাকে অসিলস্কোপ নামে একটি ক্যাথোড-রে টিউব। অসিলস্কোপ বেতার তরঙ্গের সেই প্রতিধ্বনিকে দৃশ্যমান একটি নক্সায় পরিবর্তিত করে। টিউবের চওড়া দিকটি এক ধরনের ফ্লুরেসেণ্ট পদার্থ দিয়ে আবৃত থাকে। এইটিই হচ্ছে র‍্যাডারের পর্দা। প্রতিফলিত স্পন্দনে টিউবে এসে পৌঁছলে, একটি ইলেকট্রনের স্রোত পর্দায় গিয়ে আঘাত করে এবং ফ্লুরেসেণ্টের আবরণ একটি আলোর ফুট্‌কি জ্বালে, তাকে বলে পিপ।

সাধারণতঃ র‍্যাডারের পর্দার মাঝখানে একটি বিন্দু দিয়ে যেখানে র‍্যাডারটি রয়েছে, সেখানটা দেখানো হয়। সেই বিন্দু থেকে পিপ যত দূরে থাকবে, যে বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে বেতার তরঙ্গ ফিরে এসেছে সেই বস্তুটিও র‍্যাডার থেকে তত দূরে রয়েছে বুঝতে হবে।

অ্যাণ্টেনা ঘুরতে থাকলে, বেতার তরঙ্গ আরেকটি বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে এবং র‍্যাডারের পর্দায় আরেকটি বিন্দু দেখা যায়। অ্যাণ্টেনা ঘুরছে বলে প্রত্যেকটি বিন্দুই ক্রমে মিলিয়ে যায় এবং অ্যাণ্টেনা ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই বস্তুর ওপর এসে পড়লে আবার পর্দায় সেই বিন্দুটি ফুটে ওঠে। এর ফলে র‍্যাডারের পর্দায় একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানচিত্র ফুটে ওঠে। একটি বস্তু ট্রান্সমিটারের যত কাছে চলে আসে, সেই বিন্দুটিও পর্দার তত মাঝখানে চলে আসে।

এরোপ্লেনে স্থাপিত র‍্যাডার যন্ত্র থেকে প্রেরিত বেতার তরঙ্গ সামনের পাহাড়ে ধাক্কা লেগে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসছে



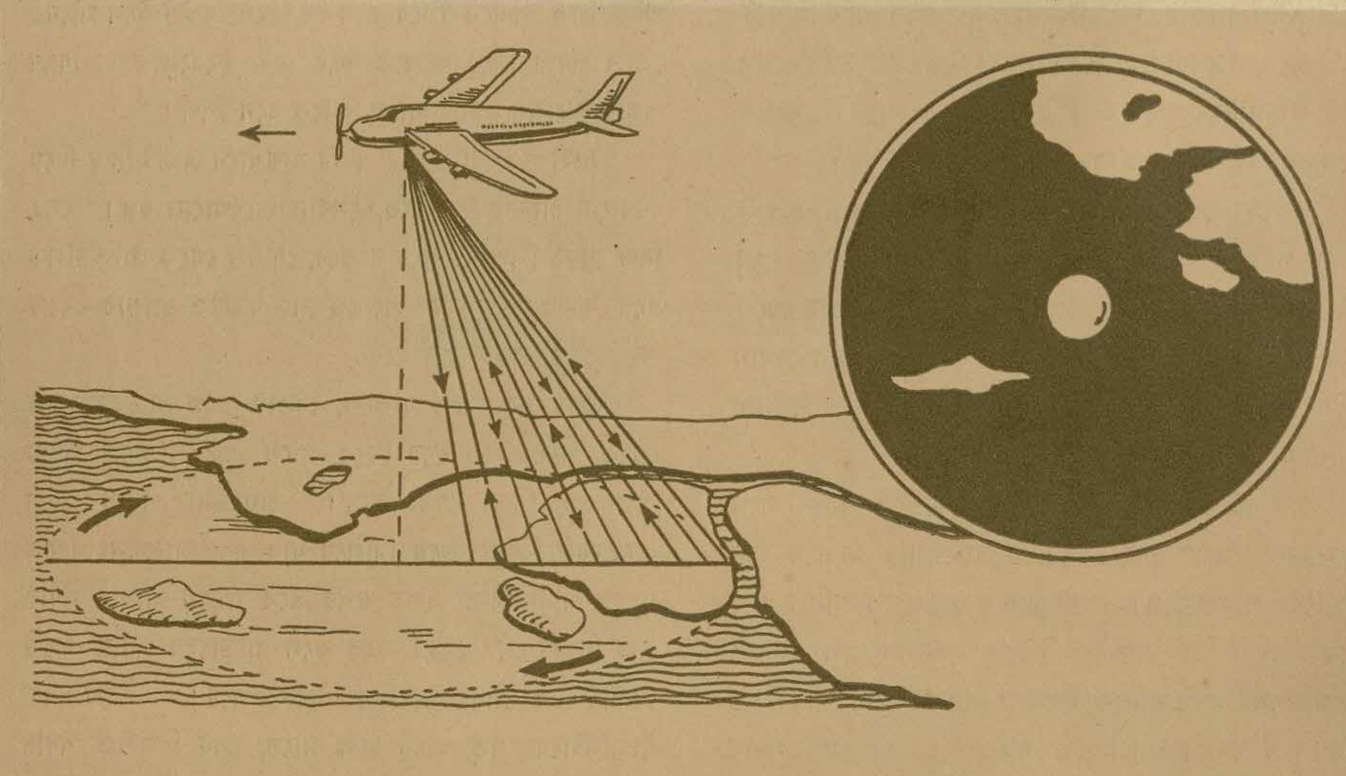
র‍্যাডারের ব্যবহার

যুদ্ধ এবং শান্তি দুই সময়েই র‍্যাডার ব্যবহৃত হয়। মাটিতে, জাহাজে, সাবমেরিনে অথবা এরোপ্লেনের ওপর র‍্যাডার যন্ত্র স্থাপন করা যায়।

মাটির ওপর যেসব র‍্যাডার যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে, তাদের সাহায্যে প্রধানতঃ শত্রুপক্ষীয় এরোপ্লেনের আগমন জানা যায়। বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র পরিচালনা করবার জন্যেও সামরিক কাজে র‍্যাডার ব্যবহৃত হয়।

অন্য জাহাজ, হিম শৈল, প্রভৃতি দেখা যায়। নৌবাহিনীর জাহাজগুলিতে স্থাপিত র‍্যাডার কেবলমাত্র সাবমেরিন, শত্রু-পক্ষীয় জাহাজ এবং এরোপ্লেনই দেখে না, কামান এবং বন্দুকের গুলি ছোঁড়াও নিয়ন্ত্রণ করে। জাহাজের ওপর স্থাপিত র‍্যাডার জাহাজের যাত্রাপথের হদিশও দেয়।

সামরিক ও অসামরিক দুই ধরনের এরোপ্লেনেই র‍্যাডার যন্ত্র স্থাপিত থাকে অন্য এরোপ্লেনকে দেখবার জন্যে। সামরিক এরোপ্লেনগুলি এর সাহায্যে লক্ষ্য করে আগত এরোপ্লেনটি শত্রুপক্ষীয় অথবা মিত্রদের। এরোপ্লেনে স্থাপিত



এরোপ্লেনে স্থাপিত র‍্যাডার যন্ত্র থেকে প্রেরিত র‍্যাডার বীম নীচে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে সেখানকার দৃশ্য ওপরে র‍্যাডারের পর্দায় প্রতিফলিত করছে

বিমানবন্দরে স্থাপিত র‍্যাডারগুলি খারাপ আবহাওয়ার সময়ে এরোপ্লেনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বিমানবন্দরে অবতরণ করতে সাহায্য করে।

জাহাজের ওপর র‍্যাডার যন্ত্র স্থাপন বর্তমানে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমুদ্র ভ্রমণে এ অনেক নিরাপত্তা বাড়িয়ে দিয়েছে। জাহাজের ওপর স্থাপিত র‍্যাডার যন্ত্রে স্থলভূমি,

র‍্যাডার আরও অনেক কাজে লাগে। এর সাহায্যে ঝড় বা সাইক্লোন উঠলে বোঝা যায়; পাইলট তখন সেই অনুযায়ী নিরাপদে তাঁর এরোপ্লেনকে চালনা করেন। এর সাহায্যে বোমারু এরোপ্লেনগুলি রাত্রে তাদের লক্ষ্য স্থির করে। ভূপৃষ্ঠের ঠিক কতটা ওপরে এরোপ্লেনটি রয়েছে, র‍্যাডারের সাহায্যে তা জানা যায়।



পাখীরা সহজেই উড়ে যায়

রকেট



কিন্তু ডানা চালিয়ে মানুষের পক্ষে
আকাশে ওড়া অসম্ভব।

ভাবলে অবাক হতে হয় যে, এমন এক সময় ছিল যখন মানুষ আকাশে উড়তে পারত না। আর কল্পনাও করা যায় না, পাখীর ওড়া দেখে মানুষের মনে জাগত ঈর্ষা। পাখীদের ডানা নেড়ে সহজে উড়ে বেড়ানো দেখে তারা ভেবেছে, যদি কোন উপায়ে ওই রকম ডানা লাগাতে পারা যায় তাহলে তাদের পক্ষেও হয়ত ওড়া সম্ভব হবে। কিন্তু তা কোনদিনই সম্ভব হয় না। তাই মানুষের এই অদম্য বাসনা রূপ নেয় কল্পনায়—ছবিতে, দেবতার মূর্তিতে আর রূপকথায়।

সময় বয়ে চলে। কিন্তু মানুষ আকাশে ওড়ার বাসনাকে ত্যাগ করতে পারে না।

প্রথম বিজ্ঞানী যিনি আকাশে ওড়ার কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেন, তিনি হলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর বিখ্যাত মনীষী লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি। তিনি ছিলেন একাধারে চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, ইঞ্জিনীয়ার ও আবিষ্কর্তা। তাঁর তৈরী ডানা ঝাপটানো যন্ত্র যদিও কোনদিনই আকাশ পাড়ি দিতে পারে নি, তবু আধুনিক কালের হেলিকপ্টার ও প্যারাসুটের কল্পনা তিনিই সর্বপ্রথম করেন। বহু বাধা ও হতাশা সত্ত্বেও চলতে থাকে আকাশ জয়ের গবেষণা।

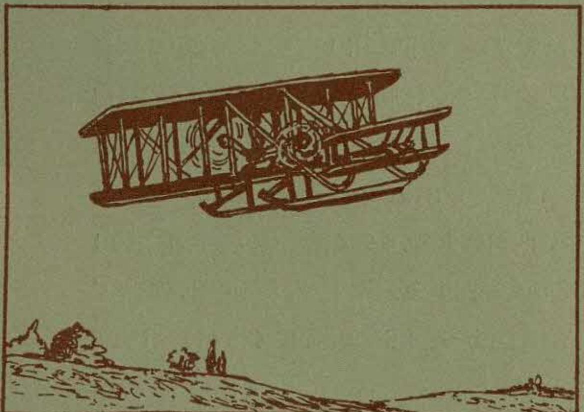
কেন? এ প্রশ্নের উত্তর বহুদিন মানুষের জানা ছিল না। মানুষের চেষ্টা বিফল হল কেননা নকল ডানা লাগিয়ে ওড়বার মতো শক্তি মানুষের মাংসপেশীতে নেই। তাছাড়া পাখীদের ডানা ঝাপটানোর প্রকৃত ভঙ্গীটিও মানুষের জানা ছিল না। ওড়বার সময় পাখী ডানা দিয়ে বাতাসে সামনের দিকে চাপ দেয়। কিন্তু মানুষ পরীক্ষা চালিয়ে এসেছে জলে সাঁতার কাটার ভঙ্গীতে অর্থাৎ ডানা চালিয়ে বাতাসকে পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে।

অবশেষে মানুষ খুঁজে পেল আকাশের ঠিকানা—১৭৮৩ সালে যেদিন গ্যাস বেলুনে চড়ে মানুষ প্রথম আকাশে পাড়ি দিল। কিন্তু প্রকৃত জয়যাত্রার সূচনা হল তারও অনেক পরে—১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর যেদিন উইল্‌বার ও অরভিল নামে রাইট ভাইদের যন্ত্রচালিত এরোপ্লেন প্রথম আকাশে উড়ল। তার পর থেকে ষাট বছরের মধ্যেই মানুষ হয়ে উঠল বায়ুমণ্ডলের একচ্ছত্র অধিপতি। সৃষ্টি হল উন্নত থেকে উন্নততর এরোপ্লেন। কিন্তু তবু মানুষের মনের আশা মিটল না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে মহাকাশের অসীম শূন্যে পাড়ি দিতে চাইল মানুষ। চাঁদ, গ্রহ ও তারার দিকে তাকিয়ে ভাবল, আকাশে উড়ে বেড়ানোর মত মহাকাশে বিচরণ করা কি সম্ভব নয়? বিজ্ঞানের কাছে সবই সম্ভব। বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় দেখা দিল এক নতুন যুগ।

তারপর এল আর একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল রাশিয়ার মেজর য়ুরি গ্যাগারিন মহাশূন্যের নিঃসীম বিস্তারে পৃথিবীর মানুষকে প্রথম পথ দেখালেন। মানুষের মহাকাশ বিজয়ের স্বপ্ন সত্যিই সফল হল।

মহাকাশের যুগ বিংশ শতাব্দীতে শুরু হলেও কল্পনায় মহাকাশ পাড়ি চলে আসছিল বহু যুগ ধরে। চাঁদের দেশে অভিযান সম্পর্কে অনেক রূপকথাই যুগে যুগে রচিত হয়েছে। ১৮৬৫ সালে জুল ভার্ণে তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা "পৃথিবী থেকে চন্দ্রে" (ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন) এক বিরাট বন্দুকের সাহায্যে কোন বস্তুকে চাঁদে পাঠাবার এক কাল্পনিক চিত্র আঁকলেন। এই পরিকল্পনা বাস্তব ক্ষেত্রে অসম্ভব হলেও তাঁর রচনা আজও জনপ্রিয়।

আগেকার যুগে রচিত এই সব কাহিনীতে ধরেই নেওয়া হত যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল চাঁদ পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু



১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর রাইট ভাইদের আবিষ্কৃত প্রথম যন্ত্রচালিত এরোপ্লেন আকাশে উড়ল



ষাট বছরের মধ্যেই মানুষ হয়ে উঠল বায়ুমণ্ডলের একচ্ছত্র অধিপতি



১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল মানুষের মহাকাশ বিজয়ের স্বপ্ন সফল হল

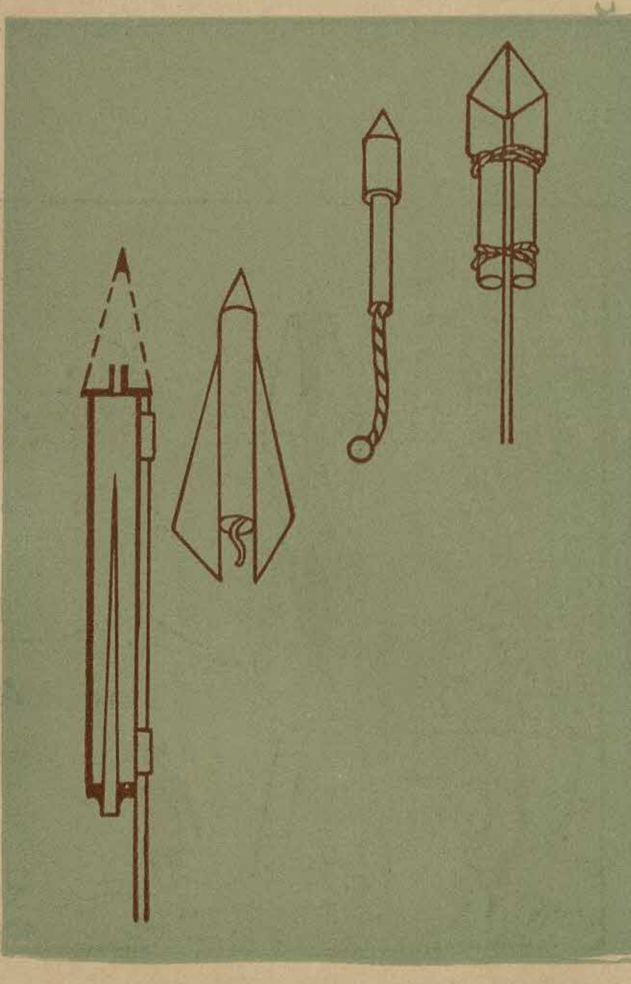
১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় মানুষের তৈরী প্রথম উপগ্রহ এক নম্বর স্পুটনিক সুদূর আকাশে উঠল। সেইদিন থেকে সৌরজগতের কোটি কোটি বছরের ইতিহাসে শুরু হল সেই নতুন যুগের। এই নতুন যুগকে বলা যায় মহাকাশের যুগ।

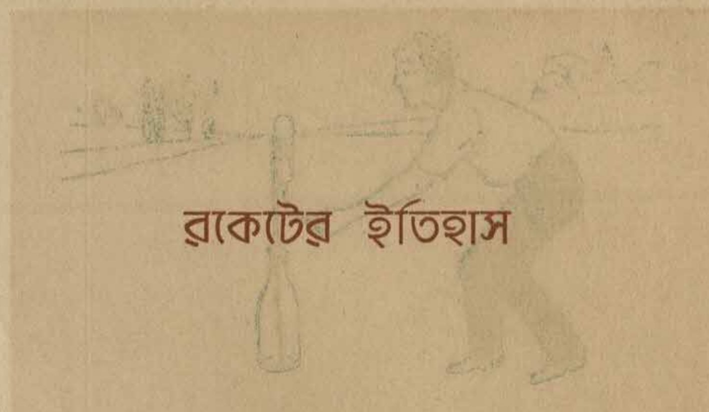
আজ আমরা জানি যে, বায়ুমণ্ডলের শতকরা নব্বই ভাগ জড়ো হয়ে আছে মাটির কাছাকাছি দশ মাইলের মধ্যে। কুড়ি মাইলের মধ্যে আছে শতকরা নিরানব্বই ভাগ। যত ওপরের দিকে ওঠা যাবে ততই বায়ুর চাপ কমবে। এইভাবে উঠতে উঠতে একশ মাইল ছাড়িয়ে

যাবার পর বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রায় থাকে না বললেই চলে। তারপর বিরাজ করছে অনন্ত মহাশূন্য। এরোপ্লেন, বেলুন বা জেট প্লেন মহাশূন্যে অচল, কারণ প্রথমত বায়ু ছাড়া ভাসমান অবস্থায় থাকা সম্ভব নয়। আর এরোপ্লেন বা জেট প্লেনের ইঞ্জিন চালু রাখার জন্যে চাই অক্সিজেন। তার যোগান বায়ু-ই দেয়। সুতরাং মহাশূন্যে বিচরণের জন্যে প্রয়োজন এক বিশেষ ধরনের ব্যোমযান—যাকে বলা হয় রকেট। এই রকেটই সফল করেছে মানুষের মহাকাশ জয়ের যুগ-যুগান্তরের স্বপ্ন।

আর প্রথম এরোপ্লেন সৃষ্টি হবার যাট বছরের মধ্যেই মানুষ পা দিল আকাশ থেকে মহাকাশে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত বারুদ দিয়ে চালিত রকেট





রকেটের ইতিহাস

মহাকাশজয়ী রকেট এ যুগের সৃষ্টি। কিন্তু রকেট বিজ্ঞানের প্রয়োগ চলে আসছে বহু বছর ধরে। শোনা যায় যে, প্রায় সাতশ বছর আগে চীনদেশে রকেটের সূত্রপাত। চীনারাই প্রথম আতসবাজী হিসাবে ও যুদ্ধের সময় অস্ত্র হিসবে রকেটের ব্যবহার জানত। বারুদ হিসাবে ব্যবহার করত পটাসিয়াম নাইট্রেট, কাঠকয়লা ও গন্ধকের মিশ্রণ। এই বারুদ একটি নলে ভর্তি করে আগুন ধরিয়ে দিলে নলটি ভীষণ বেগে আকাশে ছুটে যেত। এ ধরনের রকেট বা হাউই আমাদের খুবই পরিচিত। কিন্তু যুদ্ধের সময় এই রকেটই ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করেছে।

ইতিহাসে রকেটের প্রথম উল্লেখ ১২৩২ সালে। কাই-ফুং-ফু আক্রমণের সময় চীনারা মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে তথাকথিত অগ্নিবাণ ব্যবহার করেছিল।

ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইউরোপ রকেটকে সামরিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার তথ্যটি ভারতের কাছ থেকেই আয়ত্ব করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীরঙ্গপত্তনের যুদ্ধে মহীশূরের টিপু সুলতান ইংরেজ সেনাদের বিরুদ্ধে রকেট ব্যবহার করেন। ইংরেজরা সেদিন জয়ী হলেও রকেট নির্মাণ ও ব্যবহারের বিদ্যাটি তারা ভোলে নি। এর কয়েক বছর পরেই ইংল্যাণ্ডের স্যার উইলিয়াম কংগ্রীভ কঠিন জ্বালানি ব্যবহার করে উন্নত ধরনের রকেট তৈরী করেন। এ ধরনের রকেট ইংরেজ নৌ-বাহিনীর খুব নির্ভরযোগ্য অস্ত্র ছিল। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।

এইসব রকেটে কোন বিস্ফোরক থাকত না। কিন্তু তবুও যুদ্ধের সময় এই অস্ত্র খুব কার্যকরী ছিল কারণ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করে রকেট শত্রুপক্ষের মনে ভীতির সঞ্চার করত।



আগেকার দিনে যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত রকেট ছিল হাউই বাজীর মত

কিন্তু কিছুদিন পর থেকে রকেটের ব্যবহার ক্রমেই কমে আসতে লাগল। উন্নত ধরনের কামান আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে অস্ত্র হিসাবে রকেটের কোন স্থানই রইল না। কেননা রকেটের চেয়ে কামানের লক্ষ্যভেদ করবার নিপুণতা ছিল অনেক বেশি।

এরপর বহু বছর ধরে রকেট দিয়ে আতসবাজী তৈরী ও জাহাজডুবি হলে তীর থেকে ছুঁড়ে দিয়ে জলমগ্ন লোকদের বিপদ থেকে উদ্ধার করার কাজ ছাড়া আর বিশেষ কোন কাজ হত না।

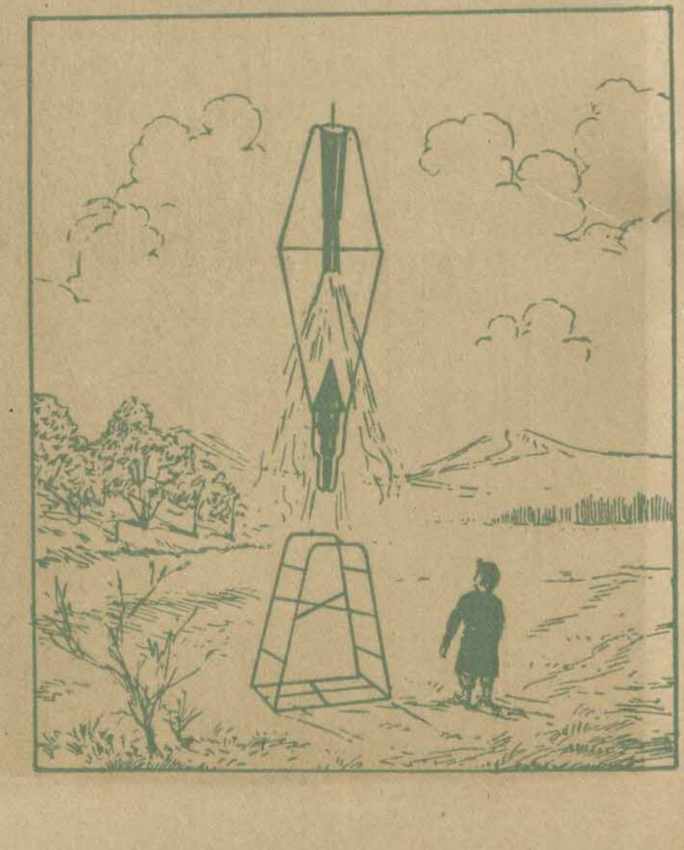
আধুনিক রকেট বিজ্ঞানের সূচনা

রকেট-বিজ্ঞান আবার জন্ম নিল বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। কনস্টানটিন জিয়লকোভাস্কি নামে একজন রুশ গণিতবিদ রকেট পরিচালনা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল রকেটের সাহায্যে মহাকাশে পাড়ি দেওয়া সম্ভব। রকেট-বিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি কয়েকটি গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রকেট পরিচালিত মহাকাশ-যানের একটি মডেলও তিনি তৈরী করেন। এই মডেল থেকেই বোঝা যায় তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাশক্তি সেই যুগের বিচারের মাপকাঠিতে কতখানি অগ্রসর ছিল। তিনিই প্রথম রকেটে তরল জ্বালানি ব্যবহারের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। সেই যুগে ছোট ছোট রকেটে বারুদ হিসাবে কঠিন জ্বালানিই ব্যবহৃত হত। তিনি এই মতবাদ প্রকাশ করেন যে, তরল জ্বালানি ব্যবহার করে রকেটের বেগ আরও অনেক বেশি বাড়ানো সম্ভব। কিন্তু জিয়লকোভাস্কি নিজে কোন রকেট নির্মাণ করে পরীক্ষা চালাতে সফল হন নি। তাই তাঁর প্রকাশিত মতবাদ কোন সাড়া জাগাতে পারে নি।

প্রায় একই সময়ে আমেরিকার রবার্ট এইচ. গডার্ডও একই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চিন্তা শুরু করেন। মহাকাশ অভিযানের আধুনিক ধারণার জনক হিসাবে আমেরিকার গডার্ড ও রাশিয়ার জিয়লকোভাস্কির কথা মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রবার্ট হাচিন্স গডার্ডকেই আধুনিক রকেটের জনক বলা হয়। তিনি ছিলেন পদার্থবিদ্যার একজন সাধারণ অধ্যাপক। তিনি মনে মনে বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র রকেটের সাহায্যেই সুদূর আকাশে ওঠা সম্ভব। ছাত্র অবস্থা থেকেই রকেট সম্পর্কে তিনি চিন্তা শুরু

১৯২৬ সালে গডার্ডের তৈরী প্রথম তরল জ্বালানি দিয়ে চালিত রকেট আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়

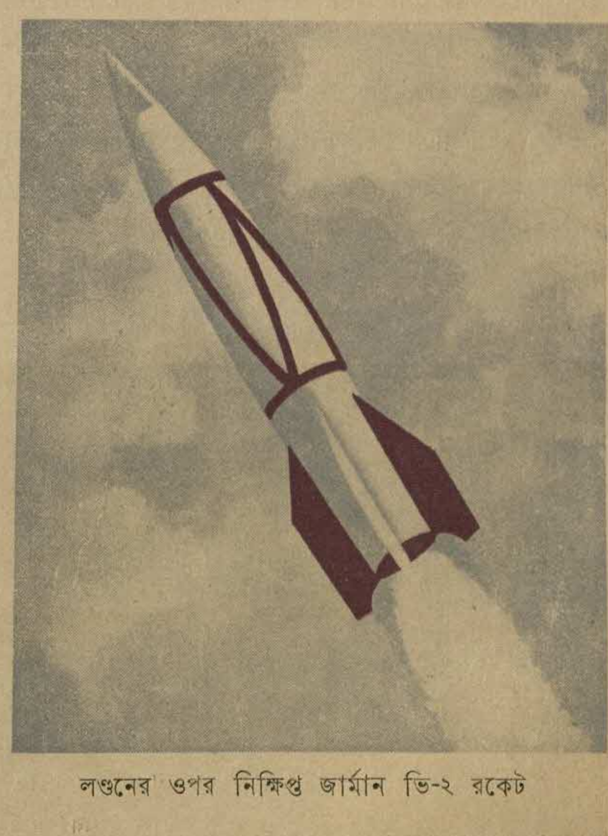


করেন। কিন্তু এই তরুণ বিজ্ঞানী তাঁর মতবাদ প্রকাশ করার চেষ্টা করেন নি। সেই সময়ে রকেটের তত্ত্বকে লোকে পাগলের প্রলাপ বলে মনে করত। ১৯১৯ সালে তিনি রকেট সম্পর্কে প্রথম বিবরণী প্রকাশ করেন। এই বিবরণীর তিনি নাম দিয়েছিলেন—"এ মেথড ফর রিচিং এক্সট্রিম অল্‌টিচুড্‌স" বা "অতি উচ্চে আরোহণের উপায়"। তিনি বলেন যে, একসাথে পর পর কয়েকটি রকেট সংযুক্ত করে মানুষ মহাকাশে পৌঁছতে পারবে। তাঁর যুক্তি যে কতখানি সঠিক ছিল তা আজ আমরা বুঝতে পারি। কয়েক পর্যায়ের রকেটের সাহায্যেই মানুষ অসীম মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাকাশযান পাঠাতে সক্ষম হয়েছে।

তরল জ্বালানিপূর্ণ রকেট

তাঁর তত্ত্বকে প্রমাণ করার জন্যে গডার্ড প্রকৃত রকেট নির্মাণের কাজ শুরু করলেন। অনেক গবেষণা ও পরীক্ষা চালাবার পর ১৯২৬ সালে তাঁর প্রচেষ্টায় পৃথিবীর সর্বপ্রথম তরল জ্বালানিপূর্ণ রকেট আকাশে উঠতে সক্ষম হয়। যদিও তাঁর তৈরী রকেট দেখতে খুবই অদ্ভুত ছিল তবু সেটিই ছিল আধুনিক রকেটের পথপ্রদর্শক। এই প্রথম রকেটের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৬৪ মাইল এবং আড়াই সেকেণ্ডে রকেটটি প্রায় ১৮৪ ফুট উঁচুতে উঠেছিল।

তিনি শুধু যে রকেট তৈরী করেছিলেন তা নয়, রকেটের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সম্পর্কেও তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর নির্মিত রকেট প্রমাণ করে যে, এ ধরনের যন্ত্রই মহাশূন্যে কার্যকরী হবে আর মানুষকে একদিন চাঁদে ও সুদূর মহাকাশে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। তিনি যে রকেট তৈরী করেছিলেন তার প্রধান অংশগুলি ছিল—রকেটের কাঠামোর ওপর দিকে জ্বালানির ট্যাঙ্ক; এই ট্যাঙ্ক থেকে পাইপ দিয়ে তরল অক্সিজেন ও পেট্রলকে পাম্পের সাহায্যে পাঠানো হল রকেট-মোটরের মধ্যে। মোটরের ভিতর বিস্ফোরণ ঘটানোর ফলে রকেটের নীচের দিকের খোলা অংশ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে গ্যাস বেরোতে থাকে আর রকেটটি উড়ে যায় আকাশের দিকে। এরপরও গডার্ড রকেট সম্পর্কে অনেক গবেষণা চালিয়ে যান। তাঁর রকেট নির্মাণের কলাকৌশল পরে জার্মানরা ভি-২ অস্ত্রে ব্যবহার করেছিল। তিনি যে শুধু রাসায়নিক রকেট নিয়ে গবেষণা করেছিলেন তা নয়, পরমাণবিক রকেটের পরিকল্পনাও তিনি করেন। এমন কি মহাকাশ ভ্রমণে সৌরশক্তির ব্যবহার সম্পর্কেও তিনি মন্তব্য করেন। তাই গডার্ডকেই বলা হয় আধুনিক রকেট-বিজ্ঞানের জনক। রকেট ইতিহাসের গোড়ার দিকে আর যাঁদের নাম লেখা আছে তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন জার্মানীর হারমান ওবারথ। ১৯২৩ সালে মহাকাশ-ভ্রমণ সম্বন্ধে তাঁর বই ইউরোপে সর্বপ্রথম কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল। রকেট বিজ্ঞানের গোড়ার দিকে আরও অনেকের অবদান আছে কিন্তু ওবারথের বইখানি সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত। তাঁর লেখায় অনুপ্রাণিত হয়ে কয়েকজন জার্মান যুবক ১৯২৮ সালে মহাকাশ-ভ্রমণ সংস্থা নামে এক সমিতি গঠন করেন। সমিতির সভাপতি ওবারথ ছাড়া আর একজন উল্লেখযোগ্য সদস্য সমিতিতে ছিলেন। তাঁর নাম ওয়ার্ণার ফন ব্রন। পরবর্তীকালে ইনিই হলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রকেট ইঞ্জিনীয়ার।



লণ্ডনের ওপর নিক্ষিপ্ত জার্মান ভি-২ রকেট

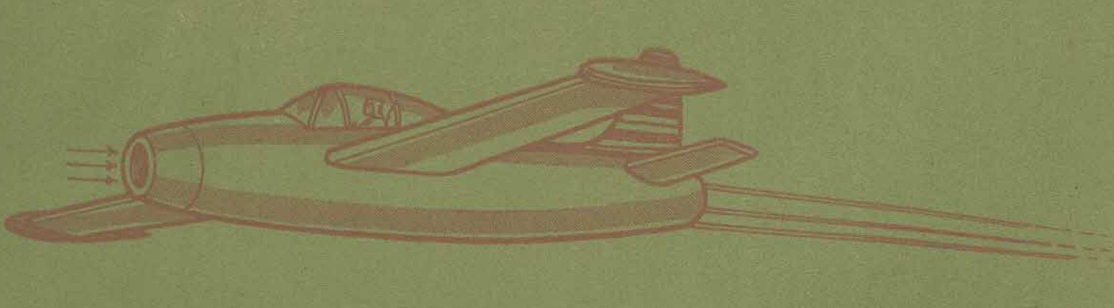
শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মহাশূন্যে ওড়ার স্বপ্ন হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। বহুদূরে বিস্ফোরক নিয়ে যাবার কাজে রকেটকে লাগানো হল। শুরু হল ভি-১, ভি-২ নামে কুখ্যাত অস্ত্র তৈরীর কাজ। জার্মানীর পিনিমিউড রকেট শিবিরে চলল রকেট সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা। প্রথম দিকে রকেট কুশলীদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। কিন্তু ক্রমাগত পরীক্ষা চালিয়ে প্রথম সফল রকেট তৈরী হল ১৯৪২ সালে। যিনি রকেটের বহুমুখী সমস্যার সমাধান করে ভি-২ রকেট সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিই ওয়ার্ণার ফন ব্রন। সেদিনকার বিচারের মাপকাঠিতে ভি-২ ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এই রকেট লম্বায় ছিল ৪৬ ফুট, ওজন ১৪ টনেরও বেশি আর এর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় ৩,০০০ মাইলেরও বেশি। অনুমান করা হয় এক হাজারের বেশি এ ধরনের রকেট ইংল্যাণ্ডের ওপর এসে পড়ার ফলে হাজার হাজার লোক মারা যায়। ভাগ্যের কথা এই যে, তখনও পর্যন্ত রকেটের পরিচালন যন্ত্র নিখুঁত না হওয়ায় এই রকেটগুলি সব সময় লক্ষ্য স্থানে এসে পৌঁছত না।

যুদ্ধ শেষ হল। কিন্তু সমরশাস্ত্রে ও মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে রকেট স্থায়ী আসন লাভ করল। জার্মানীর রকেট বিজ্ঞানের সব তথ্য চলে এল আমেরিকা ও রাশিয়ার হাতে। শুরু হল নতুন করে রকেট উন্নয়নের কাজ। খুব দ্রুত গতিতে উন্নতি হতে লাগল। ফলে মানুষ ১৯৫৭ সালে মহাকাশজয়ী রকেটের সাহায্যে পাঠাল প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ এক নম্বর স্পুটনিক আর ১৯৬১ সালে মানুষ নিজেই মহাকাশে পাড়ি জমাল।

রকেটের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

রকেট আসলে হাউই বাজীর মত। নীচের দিকে আগুন লাগালেই হাউই ওপর দিকে ছুটে যায়। কিন্তু এর ছুট কিভাবে তৈরী হল সেটি এবার বোঝা দরকার। এই ব্যাপারটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্যার আইজাক নিউটন প্রায় তিনশ বছর আগে। একটি ছোট সূত্রের সাহায্যে তিনি এই ব্যাপারটিকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সূত্রটি হচ্ছে ঃ ক্রিয়া থাকলেই প্রতিক্রিয়া থাকবে—ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হবে সমান ও বিপরীত। এই সূত্রটি বোঝার জন্যে কয়েকটি সহজ দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। বন্দুক থেকে যখন গুলি ছোঁড়া হয় তখন বন্দুকের বাঁট কাঁধে ধাক্কা মারে। এখানে গুলি ছোঁড়া হল ক্রিয়া আর কাঁধে বন্দুকের বাঁটের ধাক্কা হল প্রতিক্রিয়া।

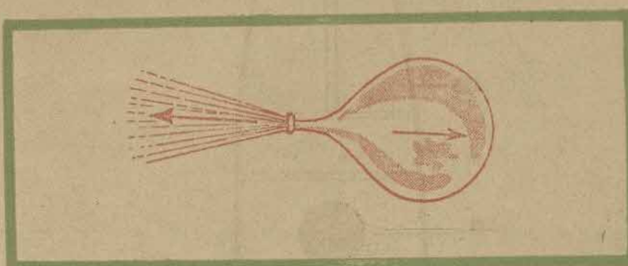
আবার বেলুনকে ফুলিয়ে হাত থেকে ছেড়ে দিলে বেলুনটি বেশ জোরে ছুটতে থাকে। এখানেও সেই ব্যাখ্যা ঃ বেলুনের মুখ দিয়ে হাওয়া বেরনোর ফলে যে ক্রিয়া হয় তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে বেলুন ছুটে যায়। এ ধরনের অনেক উদাহরণই দেওয়া যায়। রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময় আসলে আমরা পিছনের দিকে মাটির ওপরে চাপ দিই। আর এই পিছনের দিকে চাপ দেবার জন্যেই আমাদের শরীর সামনের দিকে এগিয়ে যায়।



জেট প্লেন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্র অনুসারেই আকাশে ওড়ে। কিন্তু মহাশূন্যে জেট প্লেন অচল কারণ ইঞ্জিন চালু রাখার জন্যে অক্সিজেন মহাশূন্যে নেই ; আর বায়ু ছাড়া প্লেন শূন্যে ভেসেও থাকতে পারে না।



রকেটের গতিবেগ কিভাবে তৈরী হয়



গতিসূত্রের দুটি দৃষ্টান্ত। প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে; নিউটনের এই সূত্র অনুসারেই রকেট আকাশে ওঠে।

রকেট কিভাবে কাজ করে সেটির ব্যাখ্যা মূলতঃ খুব সোজা। সেটি জানার আগে আর একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে জেনে নেওয়া দরকার। রকেট ইঞ্জিন আর অন্য ধরনের ইঞ্জিন যেমন, জেট ইঞ্জিন, এরোপ্লেন ইঞ্জিন, ইত্যাদির মধ্যে একটি মৌল পার্থক্য আছে। আমরা জানি যে, কোন ইঞ্জিন চালানোর জন্যে অক্সিজেনের প্রয়োজন।

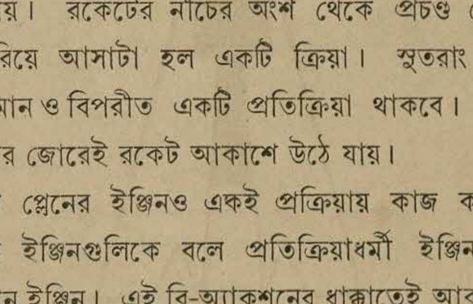
রকেট ইঞ্জিনে বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্যে যে অক্সিজেন প্রয়োজন তা রকেটের ভিতরেই থাকে কিন্তু জেট প্লেন বা এরোপ্লেনের বেলায় বাইরের বাতাস সেই অক্সিজেনের জোগান দেয়। রকেটের সাথে জেট প্লেন বা অন্যান্য ধরনের ইঞ্জিনের তফাৎ এইখানে। হাউই বা উড়ন-তুবড়ি যা প্রায় রকেটেরই মত, তাদেরও অক্সিজেনের জন্যে নির্ভর করতে হয় বাতাসের ওপর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মহাকাশে পাড়ি দিতে হলে রকেটই হল একমাত্র বাহন কেননা অন্যান্য ধরনের ইঞ্জিনের জন্যে চাই অক্সিজেন, যার লেশমাত্র মহাকাশে নেই।

হাউই বা রকেটের ব্যাখ্যাও নিউটনের এই সূত্র থেকেই পাওয়া যায়। রকেটের নীচের অংশ থেকে প্রচণ্ড বেগে গ্যাস বেরিয়ে আসাটা হল একটি ক্রিয়া। সুতরাং এই ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত একটি প্রতিক্রিয়া থাকবে। এই প্রতিক্রিয়ার জোরেই রকেট আকাশে উঠে যায়।

জেট প্লেনের ইঞ্জিনও একই প্রক্রিয়ায় কাজ করে। এ ধরনের ইঞ্জিনগুলিকে বলে প্রতিক্রিয়াধর্মী ইঞ্জিন বা রি-অ্যাকশন ইঞ্জিন। এই রি-অ্যাকশনের ধাক্কাতেই আকাশে জেট প্লেন ছোটে ও রকেট মহাকাশে উড়ে যায়।

এবার জেনে নেওয়া যাক রকেটের ছুট কিভাবে তৈরী হয়? এটি বোঝার জন্যে খুব সহজ একটি পরীক্ষা করা যেতে পারে। মনে করা যাক, একটি টিন আছে যার একদিক খোলা। এখন বড় রকমের একটি পটকাকে টিনের ভিতরে ঢুকিয়ে ফাটালে দেখা যাবে যে, টিনটি সামনের দিকে অর্থাৎ টিনের যে দিকটি বন্ধ সেই দিকে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে।

কিন্তু টিনের খোলা দিকটি যদি বন্ধ থাকে তাহলে দেখা যাবে টিনটি একই জায়গায় রয়ে গেছে। পরীক্ষাটি খুব সহজ (১৪৫-১৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু আসলে কি হয়? সেটি বোঝার জন্যে রকেট-মোটরের ছবির দিকে তাকানো যাক। রকেট মোটরটি একদিক খোলা টিন বলেই ধরা যেতে পারে। কোন উপায়ে এই রকেট মোটরের মধ্যে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ ঘটানো হল। ফলে ভিতরের পুঞ্জীভূত গ্যাস মোটরের চারিদিকে ভীষণ এক চাপ সৃষ্টি করবে।

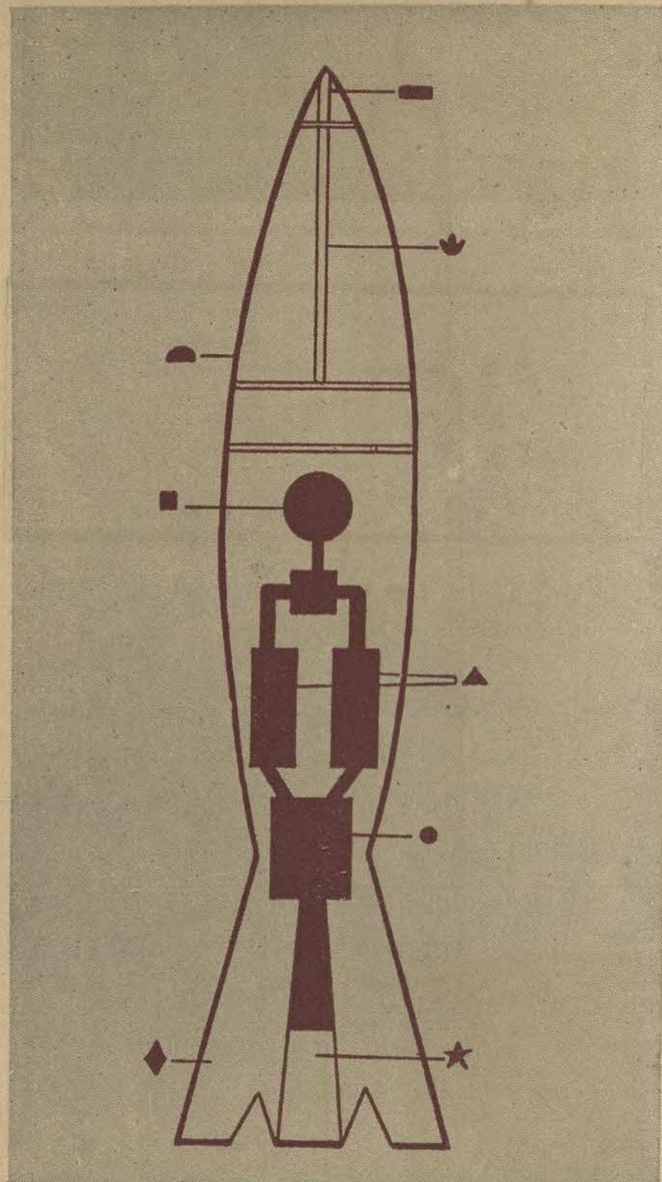


রকেট মোটরে বিস্ফোরণ

এখন মোটরের এই খোলা দিকটি যদি বন্ধ থাকে, তাহলে চারিদিকের চাপ সমান হবে ফলে মোটরটি নিশ্চল হয়ে থাকবে যেমন টিনের মুখ বন্ধ থাকলে টিনটি স্থির থাকে। কিন্তু মোটরের মুখ যদি খোলা থাকে তাহলে সেই দিক দিয়ে ভিতরের গ্যাস প্রচণ্ড বেগে ছুটে বেরিয়ে যাবে। ফলে সেদিকে কোন চাপ থাকবে না। কিন্তু তার ঠিক বিপরীত দিকে আগের মতই চাপ রয়ে যাবে। এই চাপই রকেট মোটরকে ধাক্কা দেবে আর সেই ধাক্কার জোরে রকেট ছুটে চলবে। মুখ-খোলা টিনের বেলায়ও একই ব্যাপার ঘটে। সুতরাং বোঝা গেল রকেটের ছুট তৈরী করার জন্যে যে শক্তির বা ধাক্কার প্রয়োজন তা তৈরী হচ্ছে রকেট-মোটরের ভিতরেই। এখানে আর একটি বিষয়ে খুব পরিষ্কার ধারণা করে নেওয়া দরকার।

রকেট ছুটে চলার কারণ এই নয় যে, রকেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাস কোন কিছুকে ধাক্কা মারছে আর সেই ধাক্কার জোরে রকেট এগিয়ে চলছে। আগেই বলা হয়েছে রকেটের বেগের জন্যে জোর তৈরী হচ্ছে রকেটের ভিতরেই। সুতরাং রকেট-মোটর থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাস মাটিতে বা হাওয়ায় ধাক্কা দিক বা না দিক তাতে কিছুই যায় আসে না।

রকেটের ভিতরের জরুরী অংশগুলি ছবিতে দেখানো হয়েছে। রকেটের জ্বালানি ও অক্সিজেনের জন্যে রয়েছে দুটি পৃথক আধার। পাম্প বা চাপবিশিষ্ট গ্যাসের সাহায্যে জ্বালানি আর অক্সিজেনকে আনা হয় রকেট-মোটরে। এই মোটরের ভিতরেই বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে মোটরের নীচের নালীমুখ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে গ্যাস বেরিয়ে আসতে থাকে। রকেটও সঙ্গে সঙ্গে উপর দিকে উঠতে আরম্ভ করে। নালীমুখের আকার খুব গুরুত্বপূর্ণ। নালীমুখের কাজ হচ্ছে রকেট-মোটরে উৎপন্ন গ্যাসকে বাইরের দিকে যত বেশি সম্ভব গতিবেগ দেওয়া। রকেট থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাসের গতিবেগ (যাকে বলা হয় নিঃসরণ বেগ) যত বেশি হবে রকেটের বেগও তত বেশি হবে। রকেটের নীচের অংশে লাগানো পাখনা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় রকেটের গতিপথ।



রকেটের বিভিন্ন অংশ

- ▬ সাজ সরঞ্জাম
- ❦ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ
- ◓ ধাতু নির্মিত আবরণ
- ■ পাম্প
- ▲ জ্বালানি ও অক্সিজেন
- ● রকেট মোটর
- ★ নালীমুখ
- ◆ রকেটের পাখনা

রকেটের জ্বালানি

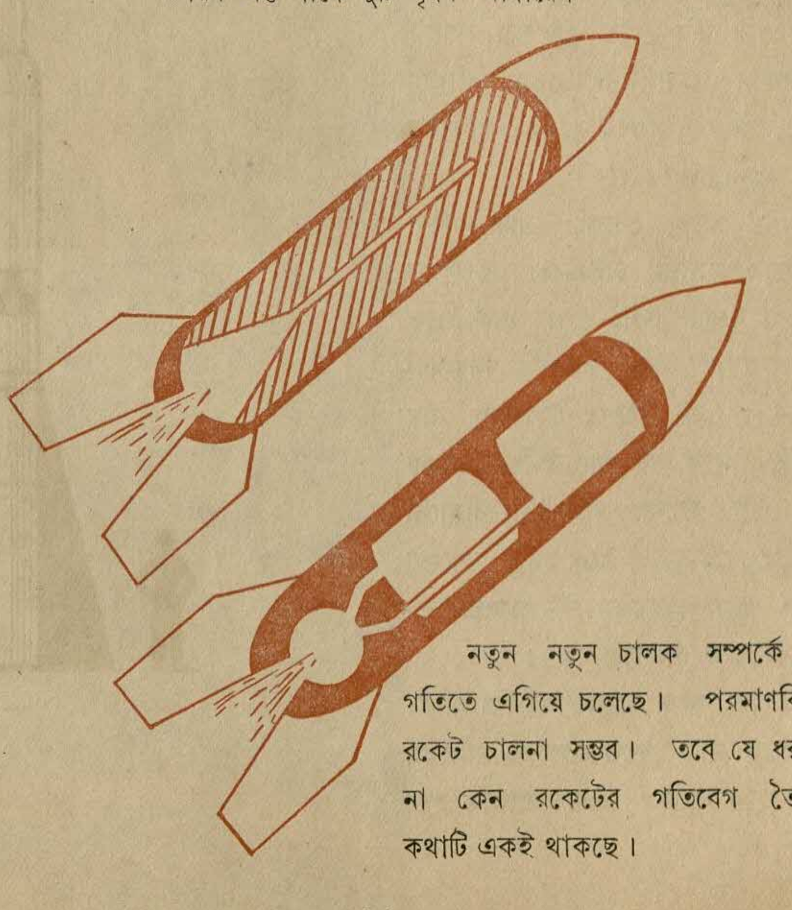
রকেটের জ্বালানি দুরকমের—কঠিন জ্বালানি ও তরল জ্বালানি। জ্বালানি হচ্ছে এমন এক জিনিস যা জ্বললে প্রচুর পরিমাণে তাপ পাওয়া যায়। কিন্তু জ্বলবার জন্যে চাই অক্সিজেন। এই অক্সিজেন যে বস্তু যোগান দেয় তাকে বলে জারক বস্তু বা অক্সিডাইজার। জ্বালানি ও জারক বস্তু, এ দুইয়ের সমন্বয়কে বলা যায় রকেটের চালক।

তরল চালকের বেলায় জ্বালানি ও জারক বস্তু দুটি পৃথক আধারে থাকে। কিন্তু কঠিন চালকের বেলায় জ্বালানি ও জারক বস্তু এক সাথে মিশ্রিত থাকে। এই দুই ধরনের চালকের দোষগুণ সম্পর্কে কিছু জানা প্রয়োজন।

কঠিন-চালক পরিচালিত রকেটের গঠন খুব সরল। এই ধরনের রকেটের মোটরে তরল-চালক পরিচালিত রকেটের মত পাম্প, ভাল্‌ভ্‌ বা অন্য কোন সঞ্চরণশীল অংশ নেই। কঠিন-চালক ও তরল-চালক রকেটের অভ্যন্তরভাগ ছবিতে দেখানো হয়েছে। আগেই জেনেছি যে, কঠিন-চালকে জ্বালানি ও জারক বস্তু একসাথেই মিশ্রিত থাকে। সুতরাং এতে একবার অগ্নিসংযোগ করলে আর নেবানো যায় না। কিন্তু তরল জ্বালানির চলাচলকে খুব সহজেই কম-বেশি করা যেতে পারে।

তরল জ্বালানি ব্যবহার করার আর একটি সুবিধা এই যে, তরল জ্বালানির নিঃসরণের বেগ সব চেয়ে বেশি। কর্ম্মদক্ষতা হিসাবে কঠিন জ্বালানির সুনাম আছে। সাধারণ অবস্থায় কঠিন জ্বালানি নিষ্ক্রিয় থাকে ও যে কোন মুহূর্তে ব্যবহারের জন্যে নিরাপদে বহু বছর ধরে সঞ্চয় করে রাখা যায়। এই কারণে কঠিন জ্বালানি রকেটের সামরিক উপযোগিতা অনেক বেশি।

কঠিন-চালক রকেটে জ্বালানি ও জারক বস্তু একসাথে মিশ্রিত থাকে ; কিন্তু তরল-চালক রকেটে জ্বালানি ও জারক বস্তু থাকে দুটি পৃথক আধারে।



নতুন নতুন চালক সম্পর্কে গবেষণার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। পরমাণবিক শক্তির সাহায্যেও রকেট চালনা সম্ভব। তবে যে ধরনের জ্বালানিই হোক না কেন রকেটের গতিবেগ তৈরী করার গোড়ার কথাটি একই থাকছে।

মাধ্যাকর্ষণজয়ী রকেট

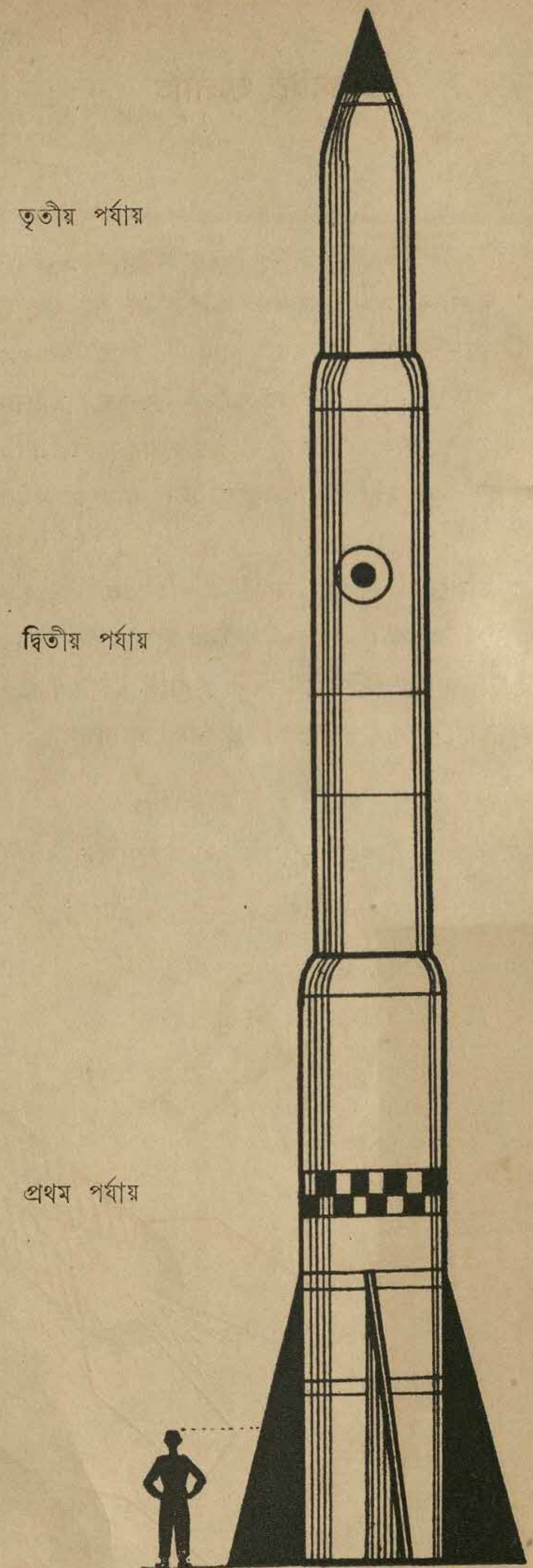
মহাশূন্যে পাড়ি দিতে হলে পৃথিবীর আকর্ষণটাই মস্ত এক বাধা। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ প্রত্যেকটি জিনিসকেই পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টানছে। সুতরাং মহাকাশে পৌঁছতে হলে প্রথমেই চাই এমন একটি প্রচণ্ড গতিবেগ বা ছুট যা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানীদের গণনায় কোন বস্তু যদি সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগে ছুট দিতে পারে তাহলে সেই বস্তুটি পৃথিবীর আকর্ষণকে ছিঁড়ে মহাশূন্যে চলে যেতে পারবে। এই বিশেষ গতিবেগের মাপ, যেখানে পৌঁছতে পারলে মাধ্যাকর্ষণকে ছিঁড়ে মহাশূন্যে উধাও হওয়া যায়, তাকে বলে নিষ্ক্রমণ বেগ। আবার এই নিষ্ক্রমণ বেগে পৌঁছবার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডলের ঘষায় গতিবেগ যায় কমে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কোন রকেটকে মহাশূন্যে যেতে হলে রকেটের গতিবেগের জোর এত বেশি হওয়া উচিত যা পৃথিবীর টানের জোরের চেয়েও বেশি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে রকেটে কিভাবে এত বেশি ছুট করা যায়?

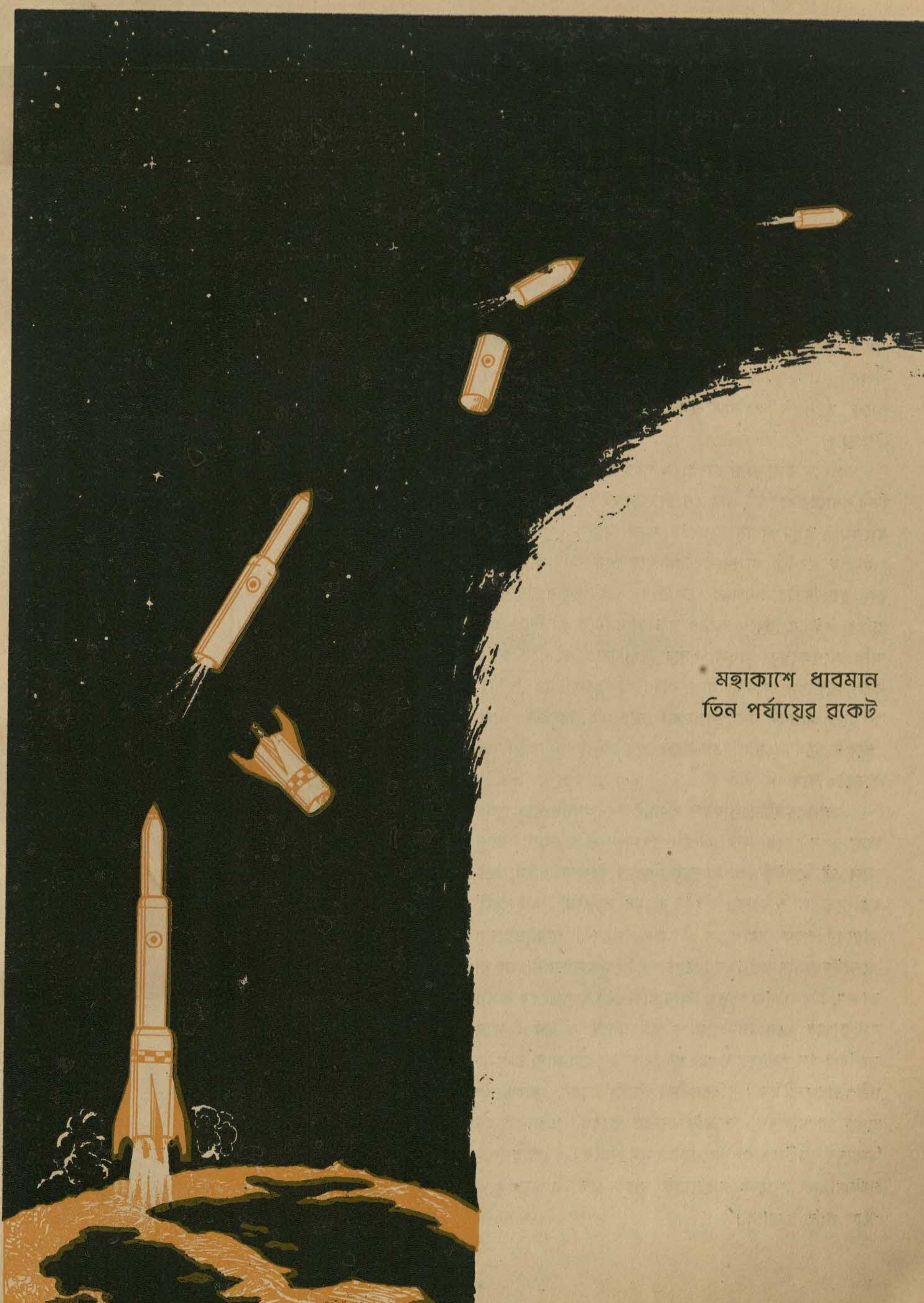
এ পর্যন্ত যত রকমের জ্বালানির সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে এটি একেবারেই সম্ভব নয়। গতিবেগ বাড়াতে হলে জ্বালানির ওজন বাড়াতে হবে।

হিসাব করে দেখা গেছে, সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগ আনতে যে পরিমাণ জ্বালানি চাই—তা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং এমন একটি উপায় চাই যাতে অনেক কম পরিমাণ জ্বালানি নিয়ে রকেটটি নিষ্ক্রমণ-বেগে পৌঁছতে পারে। এই বিশেষ উপায়টির নাম হল—মাল্টিস্টেজ রকেট, যাকে বহু-পর্যায়-বিশিষ্ট রকেট বলা যেতে পারে। এই ধরনের রকেটের সাহায্যে কয়েক পর্যায়ে নিষ্ক্রমণ বেগে পৌঁছানো সম্ভব হয়। কাজেই মূল রকেটটিকে অনেক সহজে ও অনেক কম জ্বালানিতেই পৃথিবীর টান ছিঁড়ে মহাশূন্যে পাঠানো যায়।

এতে সুবিধা এই যে, কোন রকেটকেই জ্বালানির বাড়তি বোঝা টানতে হচ্ছে না; ফলে রকেটের গতিবেগ ও পাল্লা বাড়ানো সহজ হয়ে যাচ্ছে। এবার জানতে হবে ব্যাপারটি কিভাবে ঘটছে?



তিন পর্যায়ের রকেট



মহাকাশে ধাবমান
তিন পর্যায়ের রকেট

তিন পর্যায়ের রকেট কিভাবে কাজ করে

এখানে তিন পর্যায়ের রকেটের কথা ধরা যাক। একটির ওপর আরেকটি এইভাবে তিনটি রকেটকে পর পর সাজিয়ে রাখা হয়। সবচেয়ে তলার রকেটটি হল প্রথম পর্যায় তারপর দ্বিতীয় আর তার ওপরে থাকে তৃতীয় পর্যায়। এই তৃতীয় পর্যায়ই হল মূল রকেট। এর মধ্যে থাকে যন্ত্রপাতি ও যাত্রীসমেত মহাকাশযান বা কৃত্রিম উপগ্রহ।

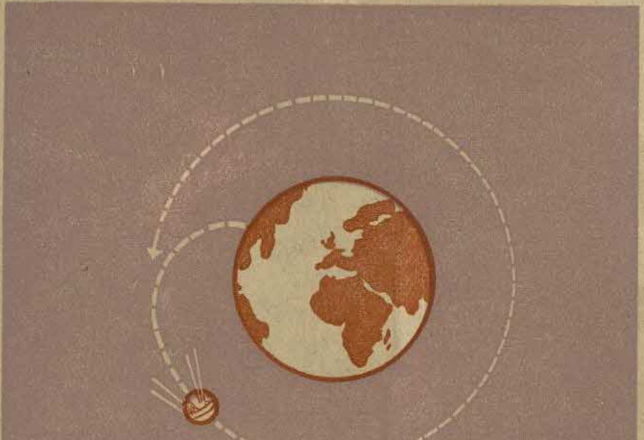
প্রথমে চালু করা হয় প্রথম পর্যায়ের রকেটটি। ফলে তিন পর্যায়ের রকেটটি আকাশে উঠে ক্রমেই বেগ সঞ্চয় করতে থাকে। প্রথম পর্যায় রকেটের সমস্ত জ্বালানি পুড়ে গেলে পর সেই রকেটটি আপনা থেকেই খসে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে চালু হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের রকেটটি। এই দ্বিতীয় পর্যায়টির সুবিধা এই যে, তাকে অনেক কম ওজন নিয়ে ছুট দিতে হয় আর অপেক্ষাকৃত পাতলা বায়ুর মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়। ফলে গতিবেগ অনেক বেড়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে দ্বিতীয় পর্যায়ের জ্বালানি নিঃশেষ হবার পরে এই রকেটটি নিজে থেকেই খসে পড়ে। তখন শুরু হয় তৃতীয় পর্যায় বা মূল রকেটের কাজ।

মূল রকেটটি চালু হবার সময়েই অনেকখানি বেগ তার মধ্যে এসে গেছে আর এদিকে কোন বাড়তি বোঝা নেই। ফলে এই রকেটটি বেশ সহজেই নিষ্ক্রমণ বেগ অতিক্রম করে মহাশূন্যে পাড়ি দেয়। এই ধরনের রকেটের সাহায্যেই মানুষের পক্ষে মহাকাশে উপগ্রহ পাঠানো সম্ভব হয়েছে। রকেটের পর্যায় সংখ্যা যে তিনের চেয়ে বেশি বাড়ানো যায় না তা নয়, চার বা পাঁচ হতেও কোন বাধা নেই। পর্যায়ের সংখ্যা যত বাড়বে রকেটের পাল্লা ও বেগ ততই বাড়বে। তবে অসুবিধা হল পর্যায়ের সংখ্যা খুব বেশি বাড়ালে নানা রকমের জটিলতার সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীরা আশা করেন, ভবিষ্যতের রকেট পরমাণবিক তেজেই চালিত হবে। তখন রকেট নির্মাণের জটিলতাও অনেক কমে যাবে। আর এই পরমাণবিক রকেটের সাহায্যেই মানুষ একদিন গ্রহ থেকে গ্রহে পাড়ি জমাবে।

মহাকাশে মানুষের দূত

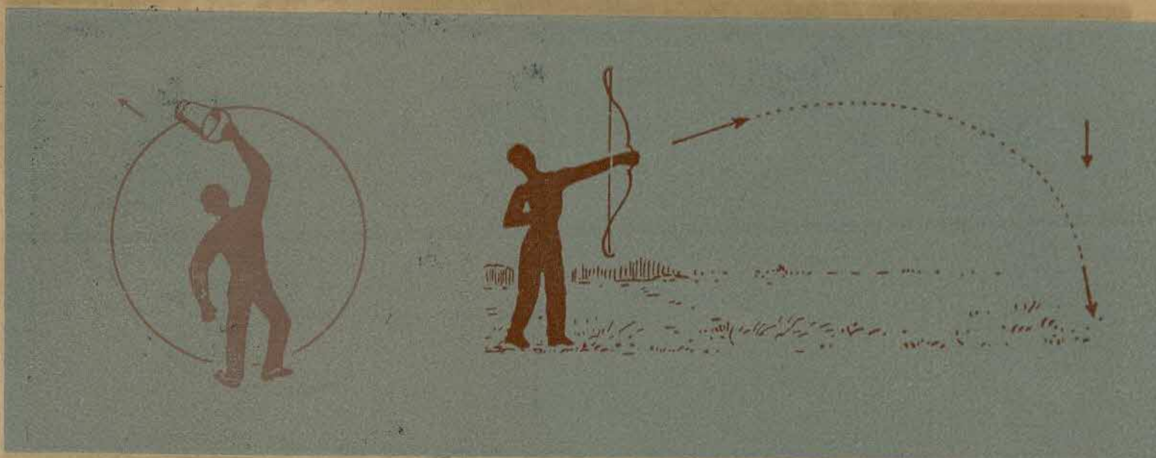
মহাকাশজয়ী রকেট সৃষ্টি হবার পর বিজ্ঞানীরা চিন্তা শুরু করলেন কিভাবে মহাশূন্যে ভ্রমণের প্রচেষ্টাকে সফল করা যায়। সশরীরে মহাশূন্যে যাত্রা শুরু করার আগে প্রথম কাজটি হচ্ছে, মহাশূন্য সম্পর্কে সমস্ত সঠিকভাবে জানা। এ কাজটি সমাধা করার জন্যে বিজ্ঞানীরা সৃষ্টি করলেন কৃত্রিম উপগ্রহ। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর মানুষের তৈরী প্রথম উপগ্রহ আকাশে পাঠান হল। সেদিন থেকে শুরু হল এক নতুন যুগ। পৃথিবীর মানুষের কাছে মহাকাশ ভ্রমণ আর কল্পনা রইল না। এই নতুন যুগটি সফল রূপ নিয়েছে সোভিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায়।

কৃত্রিম উপগ্রহ হচ্ছে মানুষের তৈরী ব্যোমযান যা কোন বিশেষ কক্ষপথে থেকে পৃথিবীর চারিদিকে পাক খেতে থাকে



প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপরিক্রমা

যেমন চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে পাক খেয়ে চলেছে। আবার সূর্যের চারিদিকে পাক খেলে সেটা হবে সৌরমণ্ডলের কৃত্রিম গ্রহ।



চক্রাকারে আবর্তনের ফলেই বহিঃকেন্দ্রিক শক্তির সৃষ্টি হয় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানেই তীরটি মাটিতে এসে পড়ে

কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ

হিসাব করে দেখা গেছে যে, কোন কৃত্রিম উপগ্রহকে প্রায় দুশ মাইল উঁচুতে পৃথিবীর চারিদিকে পাক খাওয়াতে হলে সেই কৃত্রিম উপগ্রহের গতিবেগ হওয়া দরকার ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল। সুতরাং রকেটের সাহায্যে উপগ্রহটিকে কোন নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছিয়ে দিয়ে প্রয়োজনীয় গতিবেগ দেওয়াতে পারলে উপগ্রহটি সেই কক্ষপথে পাক খেয়ে চলবে। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার। সেটি হল কক্ষপথে উপগ্রহের পাক খাওয়া শুরু হলে আর কোন রকেটের প্রয়োজন হয় না। নিজস্ব বেগেই উপগ্রহটি পাক খেতে থাকে যেমন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘণ্টায় ৬৬,৬০০ মাইল বেগে পাক খেয়ে চলেছে।

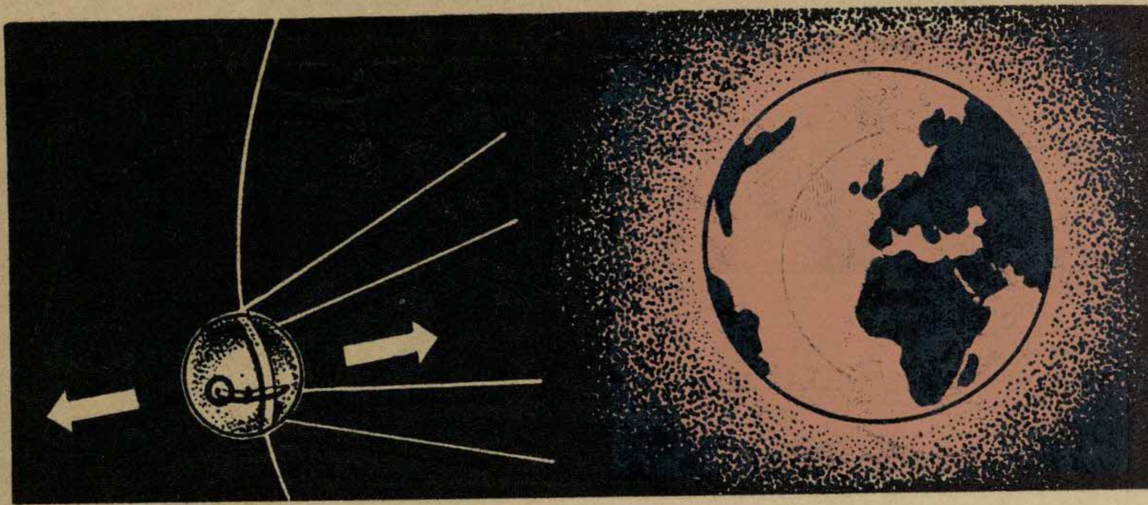
কক্ষপথে পাক খেতে হলে দুটি বিপরীতমুখী শক্তির মাপ সমান হওয়া প্রয়োজন



উপগ্রহের কক্ষ আবর্তন কিভাবে সম্ভব হয় ?

যখন একটি উপগ্রহ কোন এক বিশেষ কক্ষপথে পৃথিবীর চারিদিকে পাক খায় তখন উপগ্রহটির ওপর দুটি প্রধান শক্তির প্রভাব থাকে। একটি হল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অপরটি বহিঃকেন্দ্রিক শক্তি। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কি ? সব বস্তুকেই পৃথিবী অবিরত তার কেন্দ্রের দিকে টানছে। পৃথিবীর টান আছে বলেই কোন বস্তুকে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলে মাটিতে এসে পড়ে। পৃথিবীর এই টানকেই বলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি।

বহিঃকেন্দ্রিক শক্তি কি ? এটি বোঝার জন্যে একটি সহজ পরীক্ষা করা যাক। ওপরের ছবিতে যেমন দেখান হয়েছে, জল সমেত একটি বালতিকে যদি সেইভাবে ঘোরানো যায় তাহলে দেখা যাবে যে, জল বালতি থেকে পড়ে যাচ্ছে না। এর কারণ হল চক্রাকারে ঘোরার ফলে জল সমেত বালতির ঠিক উল্টোদিকে আর একটি শক্তি কাজ করছে। এরই নাম বহিঃকেন্দ্রিক শক্তি। এই বহিঃকেন্দ্রিক শক্তি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীত দিকে কাজ করে বলেই বালতি থেকে জল পড়ে যায় না।



দুই বিপরীতমুখী টান সমান হওয়ার ফলেই উপগ্রহ নিজ কক্ষপথে পাক খায়

এবার উপগ্রহের পাক খাওয়ার ব্যাপারটি ভালভাবে বোঝার জন্যে আর একটি সহজ পরীক্ষা চালান যেতে পারে। এক টুকরো সুতোর একদিকে একটি বল বেঁধে, অপর দিকটি হাতে ধরে ঘোরালে দেখা যাবে বলটি চক্রাকারে পাক খেয়ে চলেছে কিন্তু গায়ে এসে পড়ছে না। এর কারণ বলটির একদিকে রয়েছে চক্রাকারে ঘোরার ফলে উৎপন্ন বহিঃকেন্দ্রিক টান অপর দিকে সুতোর মধ্যে দিয়ে হাতের টান। দুই বিপরীতমুখী টান সমান হয়ে যায় বলেই বলটি মাটিতে পড়তে পারে না। এই একই কারণে কৃত্রিম উপগ্রহ বা চাঁদ মহাশূন্যে পাক খেতে থাকে।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আছে বলেই সুতো-বাঁধা-বলের মত কৃত্রিম উপগ্রহ বা চাঁদ ঘুরতে থাকে পৃথিবীর চারিদিকে। বহিঃকেন্দ্রিক শক্তি নির্ভর করে গতিবেগের ওপর। গতিবেগ বাড়লে বহিঃকেন্দ্রিক শক্তি বেড়ে যায়। আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নির্ভর করে দূরত্বের ওপর। দূরত্ব বাড়লে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কমে।

কোন বিশেষ উচ্চতায় কৃত্রিম উপগ্রহকে পাক খাওয়াতে হলে উপগ্রহটির গতিবেগ এমন হওয়া দরকার যাতে বহিঃকেন্দ্রিক শক্তির মাপ মাধ্যাকর্ষণের সমান হয়। এই বিশেষ গতিবেগকেই বলা হয় চক্রবেগ। পৃথিবী থেকে উপগ্রহের কক্ষপথ যত দূরে হবে চক্রবেগ হবে তত কম। এই কক্ষপথ উপবৃত্তাকার হওয়ার ফলে পৃথিবী থেকে উপগ্রহের দূরত্ব সমান থাকে না।

কৃত্রিম উপগ্রহ কতদিন আকাশে থাকে ?

একটি প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক—কৃত্রিম উপগ্রহ চিরকাল কি আকাশে থাকে ? না, তা সম্ভব নয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। মহাশূন্যে বাতাসের পরিমাণ খুব কম হলেও কিছুটা আছে। বাতাসের সঙ্গে অনবরত ঘর্ষণের ফলে উপগ্রহের গতিবেগ ক্রমশঃ কমতে থাকে। বেগ কমার সাথে সাথে উপগ্রহটি নেমে আসে পৃথিবীর দিকে। ফলে বেগ আরও কমে যায়, শেষকালে বাতাসের ঘন স্তরের সংস্পর্শে এসে উপগ্রহটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

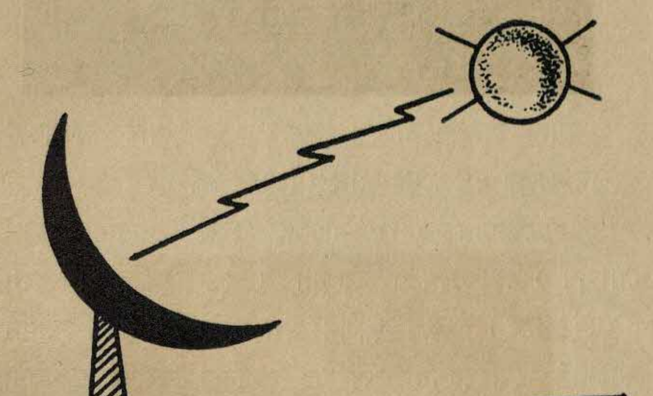
কোন উপগ্রহের কক্ষপথ যদি সম্পূর্ণভাবে বায়ুমণ্ডলের বাইরে থাকে তাহলে বহুযুগ ধরে উপগ্রহটি আকাশে থাকবে। কিন্তু উপগ্রহটি অনুভূ অবস্থায় (পৃথিবী থেকে দূরত্ব যখন সর্বাপেক্ষা কম) যদি বায়ুমণ্ডলের মধ্যে এসে পড়ে তাহলে খুব তাড়াতাড়িই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। প্রকৃত-পক্ষে বিজ্ঞানীরা স্বল্পায়ু উপগ্রহই বেশি পছন্দ করেন কেননা কৃত্রিম উপগ্রহের কাজ করার ক্ষমতা শেষ হয়ে গেলে তার অস্তিত্ব অর্থহীন হয়ে পড়ে।

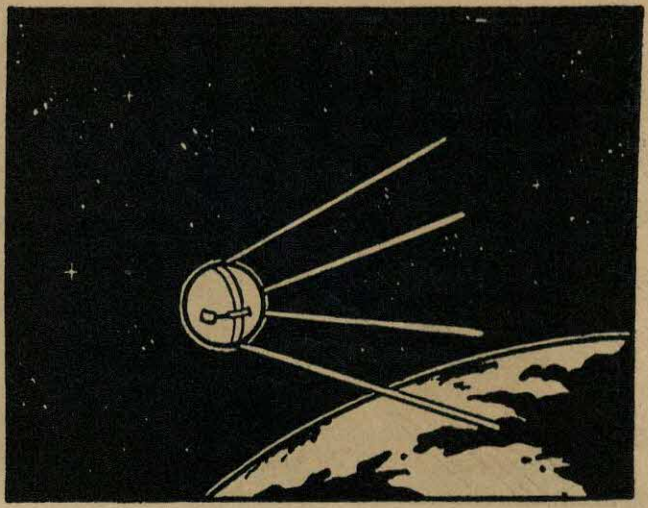
কৃত্রিম উপগ্রহ ও পৃথিবীর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা

কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে মানুষের দূত। এরাই মহাকাশের অবস্থা সম্পর্কে অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীতে পাঠায়। আর বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে বসেই সেই সব পাঠানো তথ্য থেকে ধারণা করে নেন—মহাশূন্যের আসল চেহারাটা। কিন্তু খবরগুলি উপগ্রহ থেকে কিভাবে পৃথিবীতে পৌঁছায়?

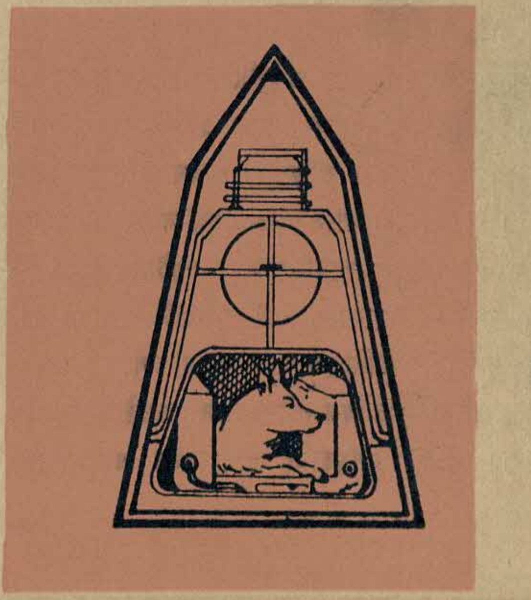
উপগ্রহের মধ্যে থাকে নানান ধরনের জটিল যন্ত্রপাতি। তাদের কাজ হল মহাশূন্য সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা। কিন্তু সংগৃহীত তথ্যগুলিকে পৃথিবীতে পাঠানো চাই। এটি সম্ভব হয় বেতার যন্ত্রের সাহায্যে। উপগ্রহের যেসব যন্ত্রগুলি মহাশূন্যে পরীক্ষার কাজ চালায় সেগুলি যুক্ত থাকে একটি বিশেষ বেতার যন্ত্রের সাথে যার কাজ হল পৃথিবীতে খবরগুলি পাঠানো। এই বেতার যন্ত্রকে বলে রেডিও ট্রান্সমিটার বা বেতার-প্রেরক যন্ত্র। আর পৃথিবীতে থাকে আর একটি যন্ত্র যাকে বলে বেতার-গ্রাহক যন্ত্র বা রেডিও রিসিভার। এই রিসিভারে উপগ্রহ থেকে আসা বেতার তরঙ্গ ধরা পড়ে। বিজ্ঞানীরা এই সব বেতার তরঙ্গের বিশ্লেষণ করে মহাশূন্যের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন।

বেতার তরঙ্গের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীতে মহাকাশ সম্পর্কে খবর পাঠায়





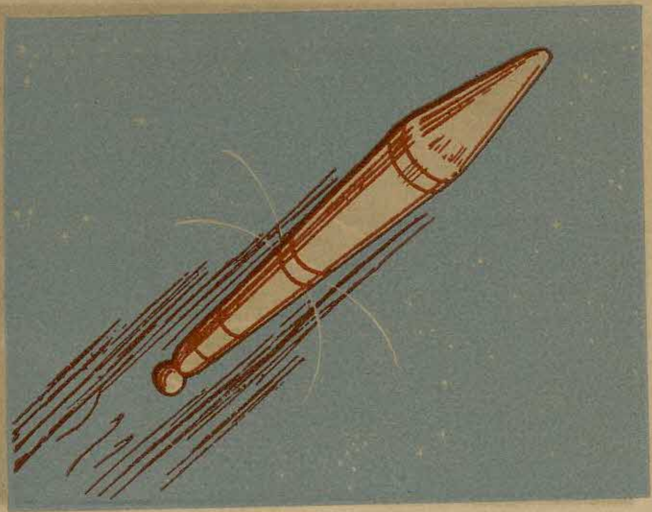
প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ রাশিয়ার এক নম্বর স্পুটনিক



দু নম্বর স্পুটনিকের কক্ষে প্রথম মহাকাশচারী কুকুর লাইকা

মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ

মহাকাশ অভিযান আরম্ভ মানুষের তৈরি প্রথম উপগ্রহ এক নম্বর স্পুটনিক দিয়ে। রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় এক নম্বর স্পুটনিক ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর আকাশে উঠে সমস্ত পৃথিবীকে বিস্ময়াবিষ্ট করেছিল। ১৮৪ পাউণ্ড ওজনের এই উপগ্রহ ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে পৃথিবীকে প্রতি ৯৬.২ মিনিটে একবার করে পাক দিয়েছিল

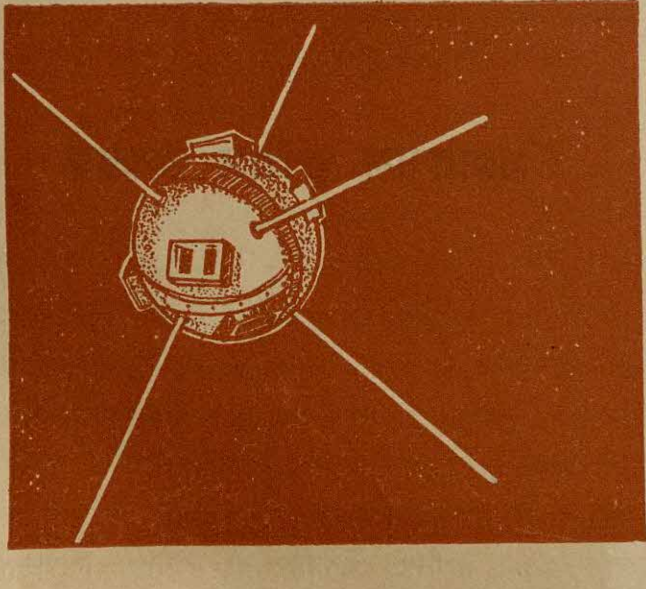


আমেরিকার প্রথম সফল প্রচেষ্টা এক নম্বর এক্সপ্লোরার

উপবৃত্তাকার কক্ষপথে। ফলে এর দূরত্ব পৃথিবী থেকে কখনো ছিল খুব কাছে কখনো খুব দূরে। সর্বাপেক্ষা কাছের দূরত্বকে বলা হয় অনুভূ ও সর্বাপেক্ষা দূরের দূরত্বকে অপভূ। তিন মাসে পৃথিবীকে প্রায় ১৪০০ বার পাক দিয়ে ১৯৫৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী প্রথম উপগ্রহটির ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটে। ইতোমধ্যে আসে আর একটি সফল প্রচেষ্টা। লাইকা নামে একটি কুকুর সমেত দু নম্বর স্পুটনিক কক্ষ পরিক্রমা শুরু করে। মহাকাশে এই কুকুরটি সাতদিন বেঁচেছিল। কিন্তু দু নম্বর স্পুটনিকের পাক খাওয়া চলতে থাকে।

আমেরিকার বিজ্ঞানীদের সফল প্রচেষ্টার সূত্রপাত ১৯৫৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী এক নম্বর এক্সপ্লোরার দিয়ে।

ক্ষুদ্রতম কৃত্রিম উপগ্রহ আমেরিকার ভ্যানগার্ড



তারপর আকাশে ওঠে ক্ষুদ্রতম উপগ্রহ ভ্যানগার্ড। পৃথিবী থেকে এর সর্বাপেক্ষা বেশি দূরত্ব ২,৪৫৩ মাইল। বিজ্ঞানীদের মতে ভ্যানগার্ডের আয়ু প্রায় ২০০ বছর। আমেরিকার তিন নম্বর এক্সপ্লোরারের পর উৎক্ষিপ্ত হয় রাশিয়ার তিন নম্বর স্পুটনিক।

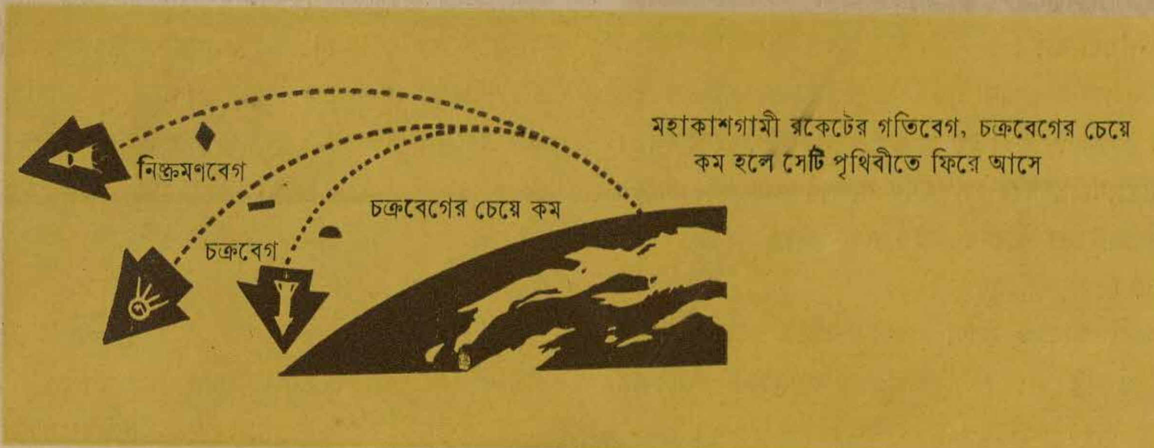
দুই দেশের বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় খুব দ্রুতগতিতে চলতে থাকে মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাবার জয়যাত্রা। মহাকাশ অভিযান শুরু হওয়ার দুবছরের মধ্যেই পনেরটি উপগ্রহ কক্ষ পরিক্রমা করে।



তিন নম্বর স্পুটনিক

নীচে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত কয়েকটি প্রধান কৃত্রিম উপগ্রহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

এক্সপ্লোরার—১৯৫৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী এক্সপ্লোরার ১ মহাকাশে পাঠিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশ যুগে প্রবেশ করে। এই কৃত্রিম উপগ্রহটির সাহায্যে ভ্যান অ্যালেন রেডিয়েশন অঞ্চলের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। এর পর আরও কয়েকটি এক্সপ্লোরার পাঠিয়ে মহাকাশের তাপমাত্রা, বিকিরণ এবং চৌম্বক ঝড় আয়নোস্ফীয়ারের গঠন, তেজস্ক্রিয় পদার্থের আচরণ, গামা রশ্মি এবং অন্যান্য মহাজাগতিক রশ্মি প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা গেছে।



ভ্যানগার্ড—১৯৫৮ সালের ১৭ই মার্চ প্রথম ভ্যানগার্ড কৃত্রিম উপগ্রহটি মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়। পৃথিবী থেকে এর সর্বাপেক্ষা বেশী দূরত্ব ছিল ২,৪৫৩ মাইল এবং সর্বাপেক্ষা কম দূরত্ব ছিল ৪০৯ মাইল। এই পর্যায়ের ভ্যানগার্ড ১ উপগ্রহটির সাহায্যেই বৈজ্ঞানিকেরা প্রথম জানতে পারেন যে, পৃথিবীর আকার নাসপাতির মত। এই কৃত্রিম উপগ্রহটি এখনও তার কক্ষপথে ঘুরছে এবং আশা করা হচ্ছে যে, আরও কয়েকশ' বছর ঘুরবে।

দ্বিতীয় ভ্যানগার্ডটি ছাড়া হয় ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। এর কাজ আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা।

তৃতীয় ভ্যানগার্ডটি ছাড়া হয় ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই কৃত্রিম উপগ্রহটিকে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র, এবং ভ্যান অ্যালেন রেডিয়েশন অঞ্চল সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কাজে লাগানো হয়।

আন্তর্জাতিক কৃত্রিম উপগ্রহ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে একসাথে কাজ করে কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছে। এদের কয়েকটির বিবরণ নীচে দেওয়া হল ঃ

এরিয়েল ঃ ইংল্যাণ্ডের সহযোগিতায় এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলি পাঠানো হয়। প্রথম এরিয়েলটি উৎক্ষেপণ করা হয় ১৯৬২ সালের ২৬শে এপ্রিল। মহাজাগতিক

প্রথম আটটি কৃত্রিম উপগ্রহ

উপগ্রহের নাম	দেশ	উৎক্ষেপণের তারিখ	ওজন (পাউণ্ড)	অপভূ (মাইল)	অনুভূ (মাইল)	কক্ষ আবর্তনের সমাপ্তি
এক নম্বর স্পুটনিক	রাশিয়া	৪. ১০. ১৯৫৭	১৮৪.০০	৫৮৮	১৪২	৪. ১. ১৯৫৮
দু নম্বর স্পুটনিক	,,	৩. ১১. ১৯৫৭	১১২০.০০	১০৩৮	১৪০	১৪. ৪. ১৯৫৮
এক নম্বর এক্সপ্লোরার	আমেরিকা	৩১. ১. ১৯৫৮	৩০.৮০	১৫৭৩	২২৪	আয়ু ৫ বছর
ভ্যানগার্ড	,,	১৭. ৩. ১৯৫৮	৩.২৫	২৪৬৬	৪০৯	আয়ু ২০০ বছর
তিন নম্বর এক্সপ্লোরার	,,	২৬. ৩. ১৯৫৮	১৮.৫৬	১৭৪৬	১২১	২৭. ৬. ১৯৫৮
তিন নম্বর স্পুটনিক	রাশিয়া	১৫. ৫. ১৯৫৮	২৯২৫.০০	১১৬৮	১২৩	৬. ৪. ১৯৬০
চার নম্বর এক্সপ্লোরার	আমেরিকা	২৬. ৭. ১৯৫৮	৩৮.৪৩	১৩৮৬	১৫৭	২২. ১০. ১৯৫৯
স্কোর এটলাস	,,	১৮. ১২. ১৯৫৮	৮৬৬১.০০	৯২৮	১১৫	২১. ১. ১৯৫৯

রশ্মি সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই উপগ্রহটির সাহায্যে পাওয়া যায়।

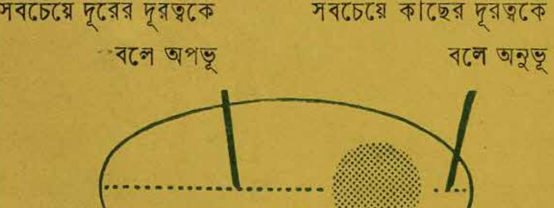
অ্যাল্যুয়েৎ : কানাডার সহযোগিতায় এই কৃত্রিম উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ করা হয় ১৯৬২ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর। এটির সাহায্যে বেতার প্রতিধ্বনি পাঠিয়ে আয়নোস্ফীয়ারের মধ্যে ইলেক্ট্রনের ঘনত্ব ইত্যাদি আরও বহু তথ্য জানা যায়।

এগুলি ছাড়াও ফ্রান্স এবং ইটালির সহযোগিতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কয়েকটি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

আন্তর্গ্রহ এক্সপ্লোরার—চাঁদে অভিযান করার আগে পৃথিবী থেকে চাঁদে যাবার কল্পিত পথের বিশদ বিবরণ (যথা বিকিরণ, চৌম্বক ক্ষেত্র ইত্যাদি) জানার জন্যে এই পর্যায়ের কৃত্রিম উপগ্রহগুলি পাঠানো হচ্ছে। এক্সপ্লোরার ১৮ উপগ্রহটিকে এই উদ্দেশ্যে প্রথম উৎক্ষেপণ করা হয় (১৯৬৩ সালের ২৭শে নভেম্বর)। পৃথিবী থেকে এর সর্বাপেক্ষা বেশী দূরত্ব ছিল ২৩,০০০ মাইল এবং সর্বাপেক্ষা কম দূরত্ব ছিল প্রায় ১২০ মাইল।

এই উপগ্রহগুলি সৌরশক্তি দ্বারা চালিত। এই ব্যবস্থায় সূর্যরশ্মিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

ডিস্‌কভারার—১৯৫৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রথম ডিস্‌কভারার কৃত্রিম উপগ্রহটিকে উৎক্ষেপণ করা হয়।



উপগ্রহের কক্ষপথ

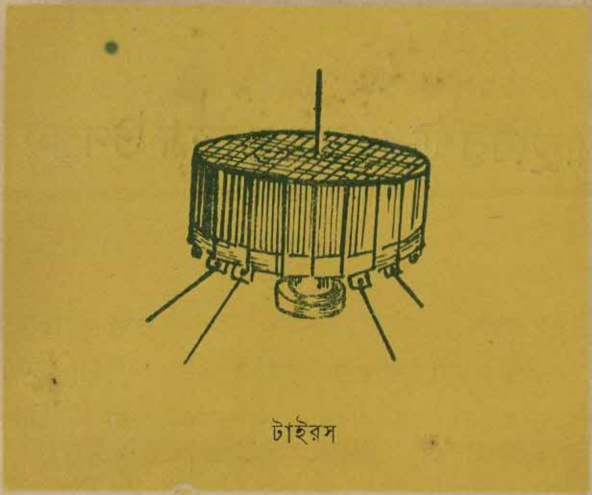
এর পরের ছয়টি ডিস্‌কভারার পাঠানো হয় সমুদ্র অথবা আকাশে মহাকাশযান থেকে তার আরোহীকে কিভাবে উদ্ধার করা যায় সে বিষয়ে পরীক্ষা চালাবার জন্যে। এই ধরনের উদ্ধারকার্য প্রথম সফল হয় ডিস্‌কভারার ১২ থেকে ১৯৬০ সালের ১১ই অগাস্ট তারিখে। এই উদ্ধারকার্য চালায় জাহাজ-হেলিকপ্টারের একটি দল। ১৯৬০ সালের ১৮ই অগাস্ট একটি সি-১১৯ এরোপ্লেন মাটি থেকে ৮,০০০ ফুট ওপরে ডিস্‌কভারার ১৪ থেকে প্রথম আকাশে উদ্ধারকার্য চালায়।

একো—১৯৬০ সালের ১২ই অগাস্ট উৎক্ষিপ্ত একো ১ প্রমাণ করে যে, মানুষের নির্মিত উপগ্রহ থেকে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত করে বহু দূরের অঞ্চলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব। এটির ব্যাস ১০০ ফুট এবং ওজন ১৩২ পাউণ্ড। পৃথিবীর এক কেন্দ্র থেকে প্রেরিত বেতার সঙ্কেত একো-র গায়ে প্রতিফলিত হয়ে অন্য কেন্দ্রে যায়।

১৯৬৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী একো ২ উৎক্ষেপণ করা হয়। এর ব্যাস ১৩৫ ফুট, উচ্চতা প্রায় ১৪ তলা বাড়ীর সমান এবং ওজন ৬০০ পাউণ্ড। এই কৃত্রিম উপগ্রহটি সোভিয়েত রাশিয়ার সহযোগিতায় ব্যবহার করা হয়।

রিলে—এই ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে টেলিফোন, টেলিভিসন, টেলিপ্রিণ্টার এবং অনুরূপ বেতার সঙ্কেতের মাধ্যমে আন্তর্মহাদেশীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। এই পর্যায়ের উপগ্রহগুলি একো-র মত নিষ্ক্রিয় নয়। এগুলির মধ্যে স্থাপিত থাকে এমন সব যন্ত্রপাতি যেগুলি সঙ্কেত গ্রহণ করে তার শক্তি বাড়িয়ে দিয়ে আবার তা পুনর্সম্প্রচারিত করে। এই সব যন্ত্রপাতি ঠিকমত কাজ করছে কিনা এবং মহাকাশের বিকিরণ সম্বন্ধেও রিলে সংবাদ পাঠায়। প্রথম রিলে উৎক্ষেপণ করা হয় ১৯৬২ সালের ১৩ই ডিসেম্বর। এটির ওজন ১৭২ পাউণ্ড। ১৮ ইঞ্চি দীর্ঘ অ্যাণ্টেনা সমেত এর দৈর্ঘ্য ৩৩ ইঞ্চি। কক্ষপথে পরিক্রমাকালে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে এর সর্বাপেক্ষা বেশী দূরত্ব ছিল ৪,৬১২ মাইল এবং সর্বাপেক্ষা কম দূরত্ব ছিল ৮২০ মাইল।

১৯৬৪ সালের ২১শে জানুয়ারী উৎক্ষিপ্ত রিলে ২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে।



টাইরস

সিনকম—এগুলিও সক্রিয় কৃত্রিম উপগ্রহ। এই পর্যায়ের পরীক্ষামূলক উপগ্রহগুলির ব্যাস হয় ২৮ ইঞ্চি, দৈর্ঘ্য ২৫ ইঞ্চি এবং ওজন ১৫০ পাউণ্ড। পৃথিবী তার অক্ষের ওপর একবার ঘুরতে যে সময় নেয় এই উপগ্রহগুলিও নিরক্ষবৃত্তের ২২,৩০০ মাইল ওপরে সেই একই সময়ে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এই ধরনের গতিবেগসম্পন্ন কৃত্রিম উপগ্রহগুলির সর্বাপেক্ষা বড় সুবিধা এই যে, সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখতে এই ধরনের মাত্র তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহই যথেষ্ট।

এই পর্যায়ের প্রথম সিনকম কৃত্রিম উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ করা হয় ১৯৬৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী।

টেলস্টার—রিলে পর্যায়ের কৃত্রিম উপগ্রহগুলির মত টেলস্টার নামীয় উপগ্রহগুলিও সক্রিয়। এগুলির ব্যাস ৩৪½ ইঞ্চি। টেলস্টার ১ এবং ২-এর ওজন যথাক্রমে ১৭০ এবং ১৭৫ পাউণ্ড।

টেলস্টার ১ ১৯৬২ সালের ১০ই জুলাই উৎক্ষেপণ করা হয়। ওই দিনই এর সাহায্যে ইউরোপ এবং আমেরিকার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়। পৃথিবী থেকে এর কক্ষপথের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দূরত্ব ছিল যথাক্রমে ৫৯৩ এবং ৩,৫০৩ মাইল।

টেলস্টার ২ পাঠানো হয় ১৯৬৩ সালের ৭ই মে। পৃথিবী থেকে এর সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দূরত্ব যথাক্রমে ৬,৭১৩.৩ এবং ৬০৪ মাইল।

কুরিয়ার—এটিও সক্রিয় কৃত্রিম উগ্রপহ। এর মোট ওজন ছিল ৫০০ পাউণ্ড। তার মধ্যে ৩০০ পাউণ্ড ওজন ছিল এর মধ্যে স্থাপিত ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতিগুলির। এইসব যন্ত্রপাতির মধ্যে ট্রান্সমিটার ছিল ১,৩০০টি। ১৯,২০০টি সৌর ব্যাটারী এর শক্তি সরবরাহ করত। কক্ষপথে এর সর্বোচ্চ উচ্চতা ছিল ৬৫৮ মাইল এবং সর্বনিম্ন উচ্চতা ছিল ৫০১ মাইল। ১৯৬০ সালের ৪ঠা অক্টোবর এটি উৎক্ষেপণ করা হয়। কয়েকদিন পর ২৩শে অক্টোবর এটি অকেজো হয়ে যায়।

স্কোর—১৯৫৮ সালের ১৮ই ডিসেম্বর উৎক্ষিপ্ত এই কৃত্রিম উপগ্রহটি সর্বপ্রথম মহাকাশ থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর সম্প্রচার করে। ত্রিশদিন পর এর রাসায়নিক ব্যাটারীগুলির আয়ু শেষ হয়ে গেলে এটি অকেজো হয়ে পড়ে।

ট্রানসিট—এই পর্যায়ের কৃত্রিম উপগ্রহগুলি পৃথিবী-ব্যাপী জাহাজ ও এরোপ্লেনের উদ্দেশ্যে আবহাওয়া সংক্রান্ত বার্তা প্রেরণ করে। এই ব্যবস্থায় উপযুক্ত কক্ষপথে অবস্থিত চারটি উপগ্রহের সাহায্যে জাহাজ ও এরোপ্লেনগুলি প্রতি ১½ ঘণ্টা অন্তর আবহাওয়ার সংবাদ পাবে।

ট্রানসিট ১-বি ১৯৬০ সালের ১৩ই এপ্রিল উৎক্ষিপ্ত হয়।

টাইরস—১৯৬০ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে টাইরস ১ উৎক্ষেপণ করার পর এই পর্যায়ের কৃত্রিম উপগ্রহগুলি ৩,৫০,০০০ হাজারেরও বেশী ব্যবহারোপযোগী

টেলস্টার

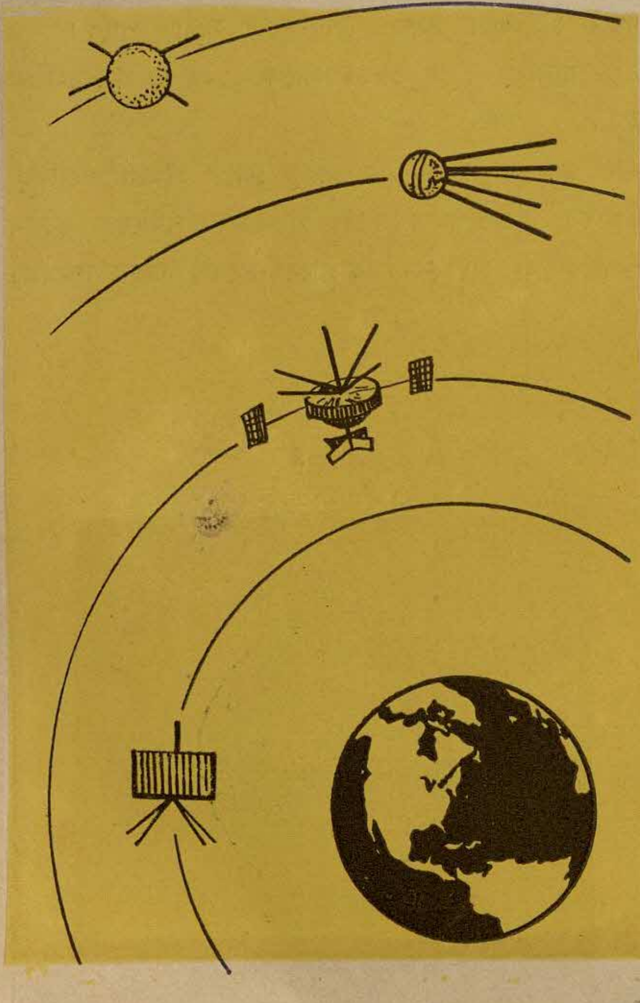


মেঘের ছবি পাঠিয়েছে। এই পর্যায়ের উপগ্রহগুলির সাহায্যে পৃথিবীর আবহমণ্ডলকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ হয়েছে ফলে আবহাওয়ার আরও সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

ড্রামের মত দেখতে টাইরস উপগ্রহগুলি ১৯ ইঞ্চি দীর্ঘ হয়। এগুলির ব্যাস ৪২ ইঞ্চি। এগুলির ওজন ২৬৩ থেকে ২৮৭ পাউণ্ডের মধ্যে এবং কক্ষপথ পৃথিবী-পৃষ্ঠের ওপরে ৩৬৭ থেকে ৬০৪ মাইলের মধ্যে।

নিমবাস—টাইরস পর্যায়ের কৃত্রিম উপগ্রহগুলি বৈজ্ঞানিকদের যে অভিজ্ঞতা দিয়েছে তা কাজে লাগিয়ে তাঁরা নিমবাস পর্যায়ের কৃত্রিম উপগ্রহগুলি পাঠাচ্ছেন। এগুলিতে যেসব ক্যামেরা আছে সেগুলি সর্বদাই পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকে। ৮৩০ পাউণ্ড ওজনের প্রথম নিমবাস উপগ্রহটি ১৯৬৪ সালের ২৮শে অগাস্ট উৎক্ষেপণ করা হয়।

কৃত্রিম উপগ্রহের যুগ



মানুষের উপকারে কৃত্রিম উপগ্রহ

মহাকাশে প্রেরিত কৃত্রিম উপগ্রহগুলি মানুষের জ্ঞানের পরিসীমা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং নৌবাহবিজ্ঞান, যোগাযোগব্যবস্থা, জোতির্বিদ্যা, আবহাওয়া-তথ্য ইত্যাদি বিষয়ে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে।

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীকে ঘিরে মহাকাশে অবস্থিত ঘন ভ্যান অ্যালেন রেডিয়েশন অঞ্চল আবিষ্কৃত হয়েছে। পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে পুরানো তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিয়ে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে এই তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, পৃথিবীর আকার নাসপাতির মত এবং উত্তর মেরুর দিকটি বোঁটার মত উঁচু। কৃত্রিম উপগ্রহ এও প্রমাণ করেছে যে, সূর্যরশ্মি চাপ দেয়। পৃথিবীকে বেষ্টন করে যে চৌম্বকক্ষেত্র রয়েছে তার একটি নক্সা প্রণয়ন করাও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে সম্ভব হয়েছে। উচ্চ বায়ুমণ্ডলে এবং চৌম্বকক্ষেত্রের ওপর সৌরমণ্ডলের পরিবর্তনের প্রভাবও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে।

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে নৌচালনা

শুধুমাত্র আটল্যান্টিক মহাসাগরেই সর্বক্ষণের জন্যে ২০,০০০ জাহাজ চলাচল করছে। পৃথিবীর আকাশে সব সময় হাজার হাজার এরোপ্লেন উড়ছে। সাগরে ও আকাশে নাবিক ও বৈমানিক তাঁর সঠিক অবস্থান জানার জন্যে সব সময়েই উদগ্রীব। সময় সঙ্কেত এবং র‍্যাডারের সাহায্যে জাহাজ এবং এরোপ্লেনগুলি যে-কোন আবহাওয়ায় দিন-রাত্রির যে-কোন সময়ে এই বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রেরিত উপগ্রহগুলির সাহায্যে তাদের অবস্থান বুঝতে পারে।

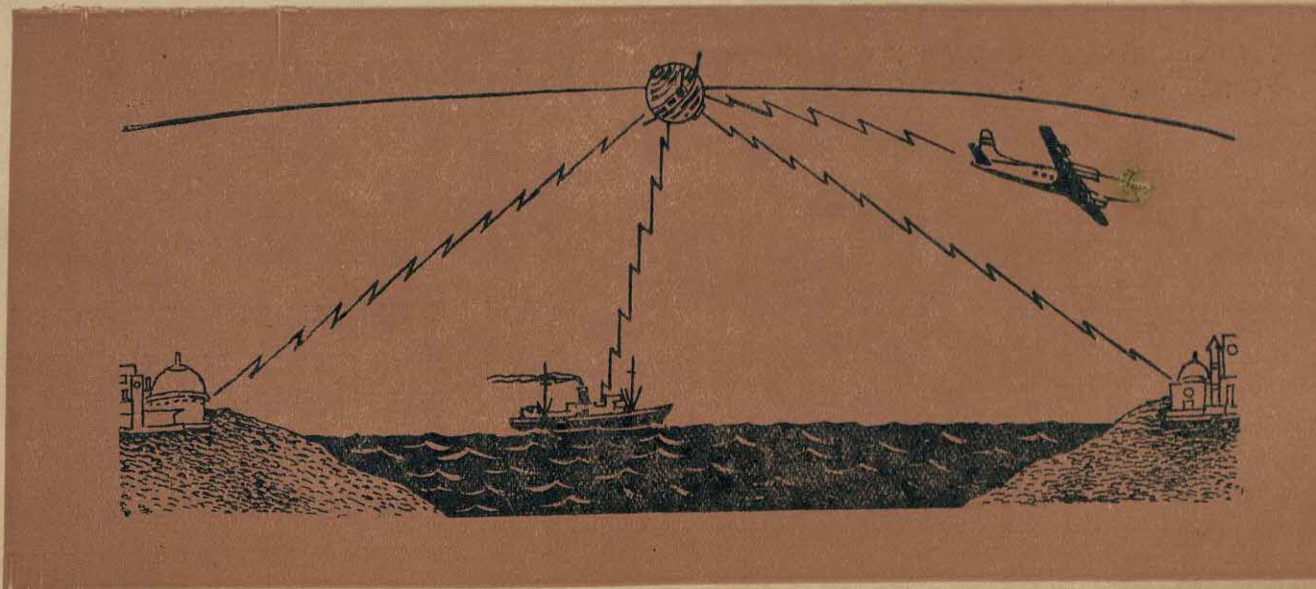
কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা

বিশ্বব্যাপী যোগাযোগরক্ষার ব্যবস্থায় কৃত্রিম উপগ্রহগুলি এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে উন্নত ধরনের টেলিফোন ও টেলিভিসন যোগাযোগ স্থাপন মার্কিন বিজ্ঞানীদের আরেকটি সাফল্য। যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনকারী উপগ্রহ দু ধরনের। নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়। নিষ্ক্রিয় উপগ্রহে, মাটি থেকে প্রেরিত বেতার তরঙ্গ উপগ্রহের মসৃণ গায়ে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। সক্রিয় উপগ্রহ মাটি থেকে প্রেরিত বেতার তরঙ্গ গ্রহণ করে ও এই তরঙ্গের শক্তি বাড়িয়ে নির্দিষ্ট দিকে পাঠাতে পারে। একো-১ ও একো-২ নিষ্ক্রিয় উপগ্রহ। স্কোর, কুরিয়ার, টেলস্টার-১, টেলস্টার-২ ও রিলে সক্রিয় উপগ্রহ।

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আবহাওয়াসংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ

কৃত্রিম উপহে টেলিভিসনক ক্যামেরা এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থাপন করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এইসব কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর যেসব অঞ্চলের আবহাওয়ার সংবাদ দিচ্ছে, সেসব অঞ্চলের ওই সব সংবাদ এর আগে মানুষের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আবহাওয়াসংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করে এবং সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস বহু পূর্বেই দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। বৃষ্টিপাত অথবা খরা সম্বন্ধে পূর্বেই অবহিত হয়ে মানুষ তার জলসম্পদকে সেই অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে। কৃত্রিম উপগ্রহ টর্নেডো,

কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে আন্তর্মহাদেশীয় টেলিফোন ও টেলিভিসন যোগাযোগ ব্যবস্থায় ও আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশনে একটি নতুন যুগের সূত্রপাত চলছে



বন্যা, তুষারঝড়, হারিকেন এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্বন্ধে বহু পূর্বেই আভাস দিচ্ছে, ফলে মানুষ তার আগেই নিরাপদ আশ্রয়ে আশ্রয় নিচ্ছে এবং ক্ষতির পরিমাণ যাতে কম হয় সেজন্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করছে। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস পেয়ে জাহাজ, এরোপ্লেন, কৃষি এবং অন্যান্য শিল্প যেগুলি ভালোমন্দ আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল তারা আগেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা আশা করেন যে, কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আবহাওয়া সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের পরিসীমা যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে নিজের সুবিধার জন্যে আবহাওয়া পরিবর্তন করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হবে না।

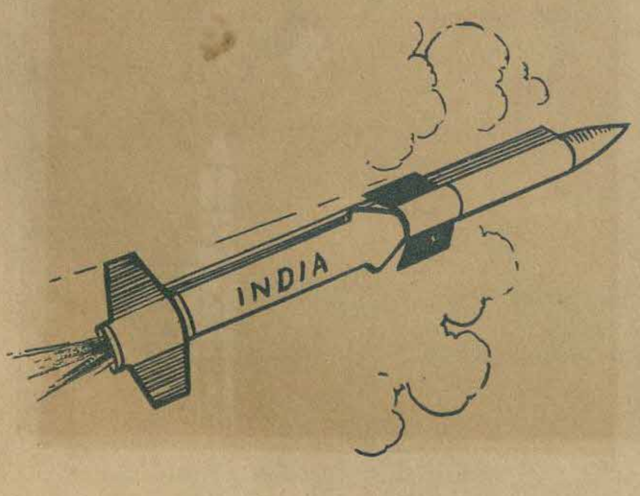
বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধতর স্তর সম্পর্কেও কৃত্রিম উপগ্রহ অনেক তথ্য প্রকাশ করেছে। জানা গিয়েছে, পৃথিবীর উর্দ্ধে ৬০০ থেকে ১৫০০ মাইল পর্যন্ত হিলিয়ম গ্যাসের একটি স্তর আছে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরের মধ্যে মহাকাশে চৌম্বকক্ষেত্র সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা গিয়েছে। পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫৬,০০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। আরও জানা যায় যে, মহাশূন্য থেকে আসা বিদ্যুৎকণিকা পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রে বন্দী হয়ে একটি বিকিরণ বলয়ের সৃষ্টি করেছে যার নাম ভ্যান অ্যালেন বলয়।

ভারতবর্ষে কেরালা রাজ্যের ত্রিবান্দাম শহরের অদূরে থুম্বায় আবহাওয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য জানবার জন্যে একটি রকেট-উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৬৩ সালের ২১শে নভেম্বর এখান থেকে প্রথম রকেটটি উৎক্ষিপ্ত হয়।

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ

গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে জ্যোতির্বিদরা প্রথমেই যে অসুবিধার সম্মুখীন হন তা হচ্ছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। এই বায়ুমণ্ডল একটি পর্দার মত তাঁদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রাখে। এই বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশই ভূপৃষ্ঠ থেকে কুড়ি মাইল ওপর অবধি বিস্তৃত। এই উচ্চতার ওপরে টেলিস্কোপ এবং অন্যান্য যন্ত্র স্থাপন করে যদি জ্যোতির্বিদরা পর্যবেক্ষণ করেন, তবে তাঁরা আরও বেশী তথ্য জানতে পারবেন। ভবিষ্যতে কৃত্রিম উপগ্রহে টেলিস্কোপ এবং ওই ধরনের অন্যান্য যন্ত্র স্থাপন করে প্রকৃতি এবং সৌরমণ্ডল সম্বন্ধে আরও সুনির্দিষ্ট তথ্য আহরণ করা সম্ভব হবে।

ভারতের প্রথম রকেট। ১৯৬৩ সালের ২১শে নভেম্বর কেরলের থুম্বা থেকে 'নাইক কাজন' নামক রকেটটি উৎক্ষিপ্ত হয়।



কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে ভৌগলিক তথ্য সংগ্রহ

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর উপরিস্থিত ভূমি এবং সাগরের সুনির্দিষ্ট দূরত্ব এবং অবস্থান ও আকার জানা সম্ভব হয়েছে। যেমন এখন কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে জানা গেছে যে, পৃথিবীর আকার নাসপাতির মত। এই সমস্ত তথ্যের সাহায্যে পৃথিবীর নিখুঁত মানচিত্র আঁকা আরও সহজ হবে এবং আমাদের এই গ্রহ সম্বন্ধে আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও আরও বাড়বে।

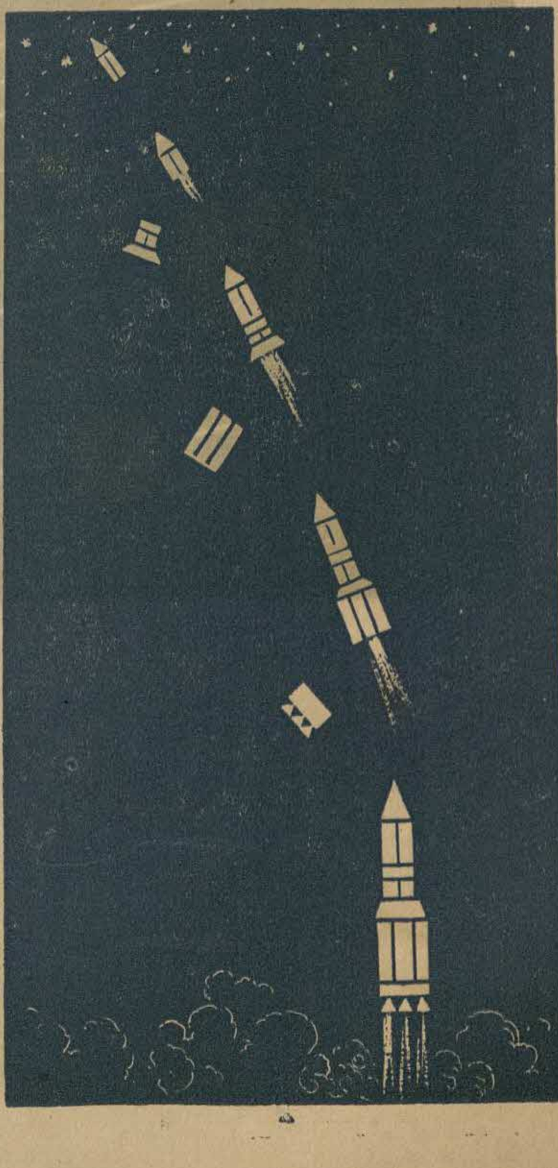
কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে চিকিৎশাসাস্ত্রের উন্নতি

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে চিকিৎসাশাস্ত্রের সবিশেষ উন্নতি করা সম্ভব হবে বলে বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন। হৃদপিণ্ড এবং রক্তের অসুস্থতার চিকিৎসায় কৃত্রিম উপগ্রহের ভূমিকা ভবিষ্যতে অপরিহার্য হবে বলে মনে হয়। তার স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে কোন মানুষ তা কতটা সহ্য করতে পারবে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে।

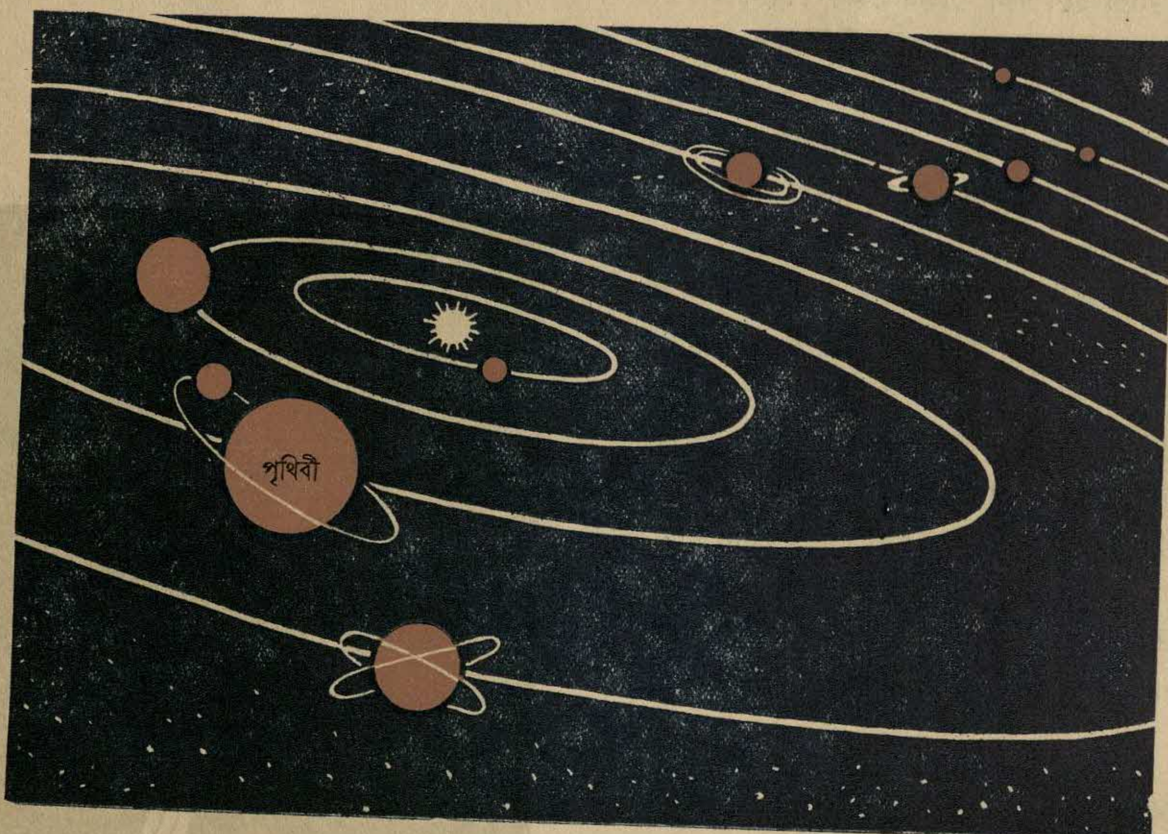
কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে যেসব তথ্য জানা যাচ্ছে তার সাহায্যে ভবিষ্যতে মানুষের খাদ্য ও কৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে বলে মনে হয়।

এমনি এক কৃত্রিম উপগ্রহই হবে মহাশূন্যে মানুষের বিরাম স্থান (স্পেস স্টেসন), যেখান থেকে মানুষ একদিন পাড়ি জমাবে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে বা সুদূর নক্ষত্রলোকে।

বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা এক আশ্চর্য যুগে বাস করছি সন্দেহ নেই, তবে এটি ভুললে চলবে না যে, বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর পুরোপুরি কৃতিত্ব পৃথিবীর মানুষেরই।



বহু-পর্যায় বিশিষ্ট রকেটের উৎক্ষেপণ



সৌরজগৎ

মহাকাশ অভিযান

মহাকাশের অঙ্গনে

মহাকাশ! সাধারণ অর্থে মহাকাশ বা মহাশূন্য বলতে বোঝায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরের অঞ্চলটিকে। মহাকাশ বলতে বুঝি এমন এক জায়গা, যেখানে কিছুই নেই; এমন কি বাতাস পর্যন্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে মহাকাশের শুরু কোনখান থেকে তার কোন নির্দিষ্ট সূচক-চিহ্ন নেই। কোন উড়োজাহাজ পৃথিবীর মাটি ছেড়ে ওপরে উঠলেই আমরা বলি—সেটি শূন্যে রয়েছে।

কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে মহাকাশের শুরু পৃথিবী ছাড়িয়ে প্রায় ১২০ মাইল উঁচু থেকে কেননা এটিই আমাদের বায়ুমণ্ডলের সীমারেখা। এই অঞ্চলে বাতাসের ঘনত্ব এত কম যে, কোন উড়োজাহাজের পক্ষে ভাসমান থাকা সম্ভব নয়।

আবার শরীরতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে মহাকাশের শুরু মাটি থেকে মাত্র দশ মাইল উঁচুতে। কারণ এরপর মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকার মত প্রয়োজনীয় অক্সিজেন বাতাসে নেই।

এ প্রসঙ্গে অন্য আরেকটি মত হল মহাকাশের শুরু মাটি থেকে ৬০০ মাইল ওপরে। কিন্তু শুরু যেখানেই হোক না কেন, এর শেষ কোথায়? আসলে মহাশূন্য অনন্ত, এর কোন শেষ নেই। পৃথিবী ছাড়িয়ে যত দূরেই যাওয়া যাক না কেন আমরা এই বিপুল মহাবিশ্বের মধ্যেই থাকব।

সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সবই এই মহাবিশ্বের অন্তর্গত। আমাদের এই পৃথিবী হচ্ছে একটি গ্রহ। আর সূর্য তো মাত্র মাঝারি আকারের তারা। এ ধরনের হাজার হাজার কোটি তারা নিয়ে রচিত একটি ছায়াপথ। এমনি দশ কোটি ছায়াপথ নিয়ে আমাদের এই মহাবিশ্ব। আর এই বিপুল মহাবিশ্বের মাঝে বিরাজ করছে অনন্ত মহাশূন্য।

কয়েক হাজার কোটি তারা নিয়ে গঠিত এই ছায়াপথে সূর্য একটি মাঝারি আকারের তারা



সৌরমণ্ডল

বিপুল এই মহাবিশ্বের তুলনায় এ সৌরমণ্ডল অতি ক্ষুদ্র। এর কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য আর তার চারিপাশে প্রায়-বৃত্তাকারে নিজেদের কক্ষপথে ঘুরে চলেছে নয়টি বিভিন্ন আকারের গ্রহ। এই সব গ্রহের রয়েছে আবার উপগ্রহ। যেমন পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র। বৃহস্পতির রয়েছে এমনি বারটি উপগ্রহ। এছাড়াও রয়েছে হাজার হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ ও গ্রহাণু, নক্ষত্ররাজি, ছায়াপথ, উল্কা, ধূমকেতু ইত্যাদি। এই সব নিয়েই এই সৌরমণ্ডল।

এই গ্রহগুলিকে তাদের নিজেদের কক্ষপথে রেখেছে—তা থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে না—সূর্যের অভিকর্ষ। তারা একই দিকে সূর্যকে পাক দিয়ে ঘুরে চলেছে। সূর্যের কাছাকাছি তাদের গতিবেগ কিছু বেশী। নীচে এই গ্রহগুলির ব্যাস, সূর্য থেকে তাদের দূরত্ব এবং সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে তাদের কত সময় লাগে, তা দেখানো হয়েছে।

গ্রহ	সূর্য থেকে দূরত্ব (মাইল)
বুধ	৩৬,০০০,০০০
শুক্র	৬৭,২০০,০০০
পৃথিবী	৯২,৯০০,০০০
মঙ্গল	১৪১,৫০০,০০০
বৃহস্পতি	৪৮৩,৩০০,০০০
শনি	৮৮৬,১০০,০০০
ইউরেনাস	১,৭৮২,৮০০,০০০
নেপচুন	২,৭৯৩,৫০০,০০০
প্লুটো	৩,৬৬৬,০০০,০০০

সূর্য

আগেই বলেছি সূর্যকে কেন্দ্র করেই গ্রহগুলি নিজেদের কক্ষপথে ঘুরপাক খাচ্ছে। সূর্যের উপরিভাগের তাপমাত্রা প্রায় ১০,৩০০° ডিগ্রি ফারেনহিট এবং অভ্যন্তর-ভাগের তাপমাত্রা প্রায় ৫ কোটি ডিগ্রি ফারেনহিট। এই তাপমাত্রায় কোন জিনিস কঠিন থাকতে পারে না। সেইজন্যে সূর্যও কোন কঠিন পদার্থ নয়। আবার এই অত্যধিক তাপমাত্রার ফলে যে আলো উদ্ভূত হয়, তা-ই সূর্যকে উজ্জ্বল দেখায়। সূর্যের ব্যাস প্রায় ৮৬৪,০০০ মাইল। তার নিজের অক্ষের ওপর সূর্য প্রতি ২৫ দিন ৯ ঘণ্টায় একবার ঘোরে।

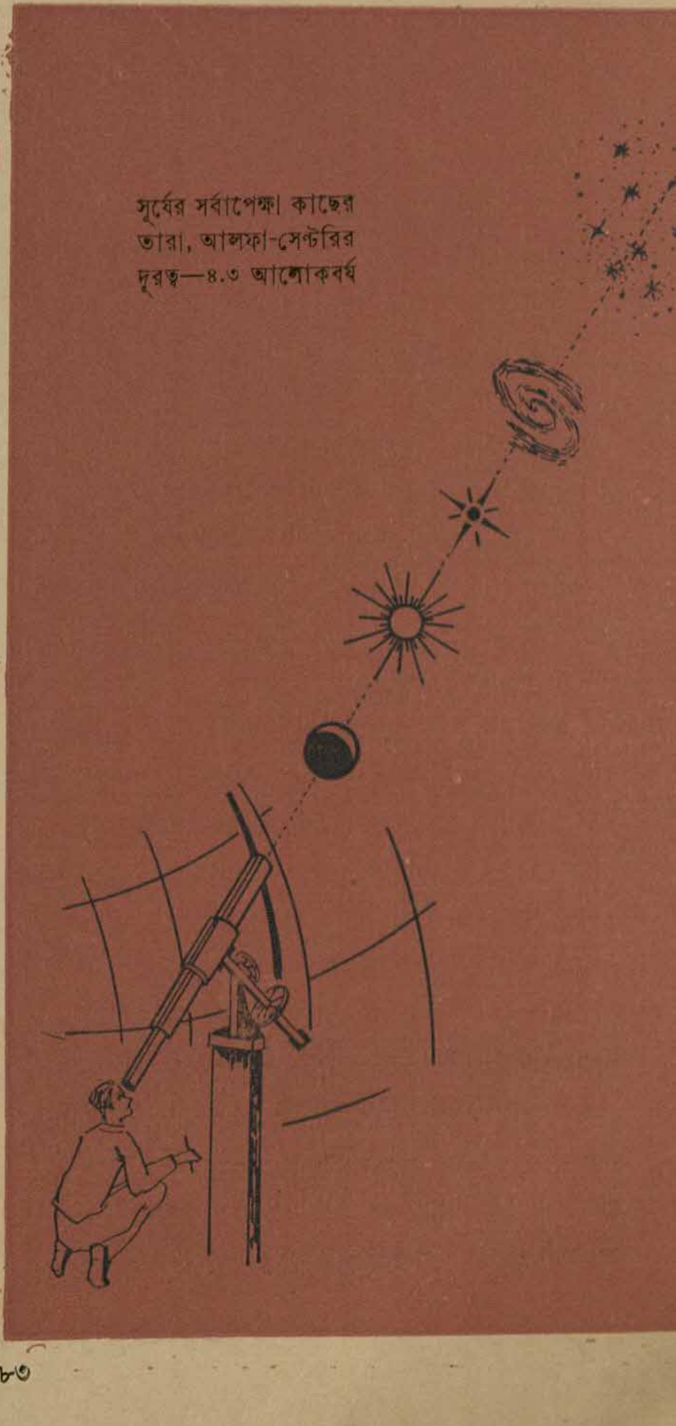
পৃথিবী

নয়টি গ্রহের মধ্যে আকারের দিক দিয়ে পৃথিবীর স্থান পঞ্চম। নিরক্ষরেখার কাছে এর ব্যাস হচ্ছে ৭,৯২৭ মাইল এবং মেরুর কাছে ৭,৯০০ মাইল। এর পরিধি হচ্ছে প্রায় ২৫,০০০ মাইল এবং এর আয়তন প্রায় ১৯৬,৯৫০,০০০ বর্গমাইল। গড়ে প্রতি সেকেণ্ডে ১৮.৫২ মাইল গতিতে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে।

এই বিপুল মহাবিশ্বে দূরত্বের মাপকাঠিকে বলা হয়—আলোকবর্ষ। অর্থাৎ আলো যতটা পথ এক বছরে অতিক্রম করে। আলোর বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। এ পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা দূরের যেসব ছায়াপথের সন্ধান পাওয়া গেছে তাদের দূরত্ব ৫০ কোটি আলোকবর্ষ।

সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করবার সময়	ব্যাস (মাইল)
৮৮ দিন	৩,০০০
২২৪$\frac{৩}{৪}$ দিন	৭,৬৫০
৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিন	৭,৯২৭
৬৮৭ দিন	৪,২০০
৪,৩৩২ দিন	৮৮,৭০০
১০,৭৫৯ দিন	৭৫,০০০
৩০,৬৮৭ দিন	৩০,৯০০
৬০,১২৭ দিন	৩৩,০০০
৯০,৪০০ দিন	৩,৬০০

অন্যান্য গ্রহগুলির মধ্যে শুক্র এবং মঙ্গল সম্বন্ধেই বিজ্ঞানীরা বেশী কৌতূহলী কারণ সেগুলিই পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত কাছের গ্রহ। শুক্র এবং মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে এবং সেখানে মানুষের অভিযান চালাবার প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আমরা পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।



পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল

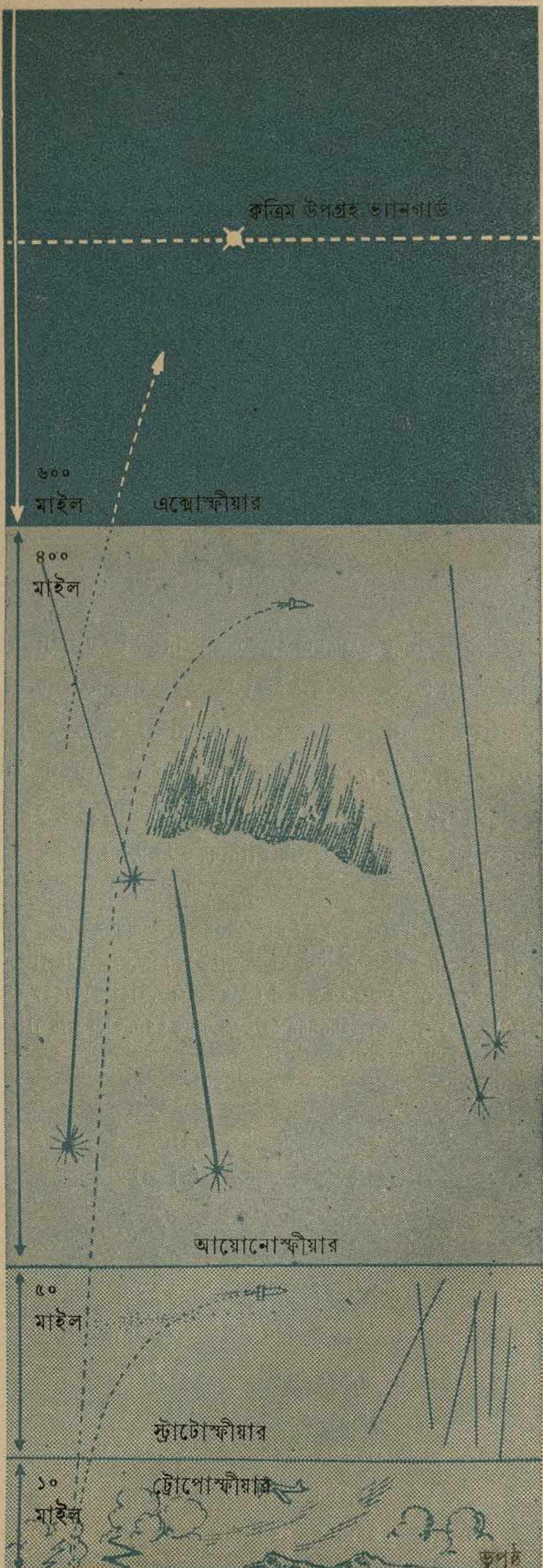
মহাকাশে পাড়ি দিতে হলে প্রথমে জানতে হবে আমাদের এই বায়ুমণ্ডলের খবর।

পৃথিবীর এই বায়ুমণ্ডলকে চারিটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। মাটির ওপরেই যে স্তরটি রয়েছে তাকে বলে ট্রোপোস্ফীয়ার। মাটি থেকে প্রায় দশ মাইল উঁচু পর্যন্ত এই স্তরটি বিস্তৃত। বায়ুমণ্ডলের শতকরা প্রায় নব্বই-ভাগ এরই মধ্যে জড়ো হয়ে আছে। বায়ুমণ্ডলের চাপও এই অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী। যত ওপরের দিকে ওঠা যাবে চাপ ততই কমবে। মেঘ ও ঝড়বৃষ্টি এই এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এর ওপরের স্তরটির নাম স্ট্র্যাটোস্ফীয়ার। মাটি থেকে দশ মাইল উঁচুতে শুরু হয়ে প্রায় পঞ্চাশ মাইল উঁচু পর্যন্ত এই স্তরটির বিস্তার। এই এলাকায় মানুষের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এখানে বায়ুর চাপ খুবই কম।

স্ট্র্যাটোস্ফীয়ারের ওপরের স্তরের নাম আয়োনোস্ফীয়ার। এই স্তরটি মাটি থেকে পঞ্চাশ মাইল উঁচুতে শুরু হয়ে ছ'শো মাইল পর্যন্ত ছড়ানো। এ অঞ্চলে বায়ু নেই বললেই চলে। এই এলাকাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এখানে সূর্যের তীব্র আলোর প্রভাবে গ্যাসীয় পদার্থের পরমাণু বিদ্যুৎধর্মবিশিষ্ট হয়ে ওঠে। এই বিশেষ অবস্থায় পরমাণুকে বলা হয় 'আয়োন'। বায়ুমণ্ডলের এই এলাকায় রয়েছে অসংখ্য আয়োন। এই আয়োনোস্ফীয়ারের স্তর থেকেই পৃথিবী থেকে পাঠানো সর্ট-ওয়েভ বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে। এই স্তরের শুরুতে তাপমাত্রা হল ৭৫° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (৫০ মাইল উঁচুতে) আর প্রায় তিন'শ মাইল উঁচুতে তাপমাত্রা পৌঁছয় ২০০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। মেরুজ্যোতি এই অঞ্চলেই দেখা যায়।

বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে ওপরের স্তরটি হল এক্সোস্ফীয়ার। মাটি থেকে ৬০০ মাইল উর্ধ্বে এর শুরু আর শেষ কোথায় তার কোন সীমারেখা টানা হয়ত সম্ভব নয়। এই এলাকার বেরশীভাগই হাইড্রোজেন গ্যাসে পূর্ণ।



বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর

মহাকাশ অভিযানে রকেটের ভূমিকা

আগেকার যুগে রচিত মহাকাশ-অভিযানের কাল্পনিক কাহিনীগুলিতে ধরেই নেওয়া হত যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল চাঁদ পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু এখন আমরা জানি যে, বায়ুমণ্ডলের বেশীরভাগই মাটির কাছাকাছি এলাকাতেই জড়ো হয়ে আছে। মাটি থেকে একশ মাইল উঁচুতে উঠলেই বায়ুর চাপ প্রায় থাকে না বললেই চলে। সুতরাং সে অঞ্চলে সব রকমের উড়োজাহাজই অচল; কারণ বায়ুর অভাবে সেখানে তা আর ভেসে থাকতে পারে না। তাছাড়া উড়োজাহাজের ইঞ্জিন চালু রাখার জন্যে চাই অক্সিজেন। কারণ তোমরা জান যে, যে-কোন ইঞ্জিন চালাতে হলেই দহন-প্রকোষ্ঠে জ্বালানির সঙ্গে বায়ুর (অর্থাৎ



তার মধ্যেকার অক্সিজেন) সংমিশ্রণ হওয়া দরকার। ওই উচ্চতায় বায়ু প্রায় না থাকায় উড়োজাহাজের ইঞ্জিনও কাজ করতে পারে না। সুতরাং প্রয়োজন এক বিশেষ ধরনের ব্যোমযান যার ইঞ্জিন চালু রাখার জন্যে বায়ুমণ্ডলের প্রয়োজন হয় না।

উন্নততর রকেট আবিষ্কারের মূল তাগিদটা এই সমস্যাগুলির সমাধান করবার প্রচেষ্টা থেকেই এসেছে। আর উন্নততর রকেট তৈরীর সঙ্গে মহাকাশ অভিযানের সম্পর্কটা তাই এত নিবিড়। অর্থাৎ রকেটের সাহায্য ছাড়া মহাকাশ অভিযান সম্ভব নয়। রকেটের আবিষ্কার ও তার কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমরা এর আগেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

মহাকাশে যাত্রার আয়োজন

মহাশূন্যে অভিযানের প্রচেষ্টাকে সফল করার পথে রয়েছে অনেক বাধা। কেবলমাত্র মহাকাশজয়ী রকেট তৈরী করলেই চলবে না। সশরীরে মহাশূন্যে যাত্রা শুরু করার আগে এই অজানা এলাকার সম্পর্কে সবরকম তথ্য জোগাড় করতে হবে। তাছাড়াও রয়েছে একাধিক সমস্যা। এসব সমাধান করতে হলে প্রথমে জানতে হবে সেখানকার প্রকৃত অবস্থা। এই কাজটি সমাধা করার জন্যে বিজ্ঞানীরা সৃষ্টি করলেন কৃত্রিম উপগ্রহ। এগুলিই হল মহাকাশে মানুষের দূত। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় পাঠানো হলো প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ এক নম্বর স্পুটনিক। এরপর থেকে অনেকগুলি কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হয়েছে—সোভিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায়। এ বিষয়ে আমরা আগেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

মহাশূন্যে পাড়ির সমস্যা

মহাশূন্যে পাড়ি দিতে হলে মানুষকে অনেকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। মানুষ মহাশূন্যে নিঃসঙ্গ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে কি না এ নিয়ে অনেক গবেষণা ও পরীক্ষার কাজ চালু আছে। কিছু কিছু সমস্যার সমাধান বিজ্ঞানীরা খুঁজে বের করেছেন। তাছাড়া সোভিয়েত ও আমেরিকার মহাকাশ-যাত্রীদের অভিজ্ঞতা থেকেও অনেক তথ্য জানা গেছে।

পৃথিবী থেকে যাত্রা করার মুহূর্তেই আসে একটি প্রধান সমস্যা। সুদূর মহাকাশে পাড়ি জমাতে হলে রওনা হবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ব্যোমযানটির বেগ হওয়া প্রয়োজন ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল (নিষ্ক্রমণ-বেগ)। এই প্রচণ্ড গতিবেগে পৌঁছতে হলে ব্যোমযানের যে ত্বরণযুক্ত বেগ হওয়া দরকার, তার প্রতিক্রিয়া সহ্য করা কি

মানুষের পক্ষে সম্ভব হবে? ব্যোমযানের বেগ প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলবে (ত্বরণযুক্ত বেগ) ও যাত্রীর মনে হবে যেন শরীরের ভার অসম্ভব বেড়ে গেছে। ফলে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া সম্ভব হবে না।

ভার বা ওজন বলতে কি বুঝি

লিফটে চড়ে ওপরে ওঠার সময় লিফট যেই অচল অবস্থা থেকে সচল হয়, সেই মুহূর্তে মনে হবে, শরীরের ভার বেড়ে গেছে। কেন এ ধরনের অনুভূতি আসে? প্রথমে জানতে হবে 'ভার' বলতে কি বুঝি? আমরা জানি পৃথিবী প্রত্যেকটি জিনিসকে অনবরত কেন্দ্রের দিকে টানছে। কোন রকম বাধা না থাকলে প্রতিটি জিনিস মাধ্যাকর্ষণের টান গিয়ে হাজির হত পৃথিবীর কেন্দ্রে। কিন্তু পৃথিবীর মাটি থাকার জন্যে তা হওয়া সম্ভব নয়। মাধ্যাকর্ষণের টান বাধা পাওয়ার ফলেই তৈরী হয় ওজন বা ভার। পায়ের তলায় মাটি থাকার জন্যেই আমাদের শরীরে ভার আসে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর এই টান হল নির্দিষ্ট মাপের এক ত্বরণযুক্ত বেগ। এই নির্দিষ্ট মাপের ত্বরণযুক্ত বেগ বাধা পাওয়াতে তৈরী হয় এক নির্দিষ্ট ওজন। কোন কারণে এই ত্বরণযুক্ত বেগের মাপ বৃদ্ধি পেলে ওজনও বৃদ্ধি পাবে। মাধ্যাকর্ষণের ত্বরণযুক্ত বেগকে বলা হয় এক-'জি'। 'জি' অক্ষরটি সাধারণত ত্বরণের (অথবা মন্দনের, একক বোঝায়। যদি ব্যোমযানের ত্বরণ হয় দুই-'জি' তাহলে ওজনও দ্বিগুণ হয়ে যাবে। অর্থাৎ যাত্রীর ওজন যদি ১৫০ পাউণ্ড হয়, দুই-'জি' ত্বরণের প্রভাবে ওজন হবে ৩০০ পাউণ্ড। মহাকাশ-যাত্রাকালে রকেটের ত্বরণযুক্ত বেগ হয় প্রায় আট-'জি'র বেশী। অর্থাৎ যাত্রীর ওজন বৃদ্ধি পেয়ে ১২০০ পাউণ্ড হয়! এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার বেগ ত্বরণযুক্ত না হলে কোন অস্বস্তিকর অনুভূতি আসে না। পৃথিবীর সাথে আমরা সূর্যের চারিদিকে ঘণ্টায় ৬৬,৬০০ মাইল বেগে ছুটে চলেছি অথচ এই প্রচণ্ড ছুটকে আমরা টের পাই না পর্যন্ত।

বিজ্ঞানীরা নানাভাবে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ওজন তিন-চার গুণ বৃদ্ধি পেলে তা মানুষ বসা



দ্রুতগামী জেট বিমানে ভাবী মহাকাশচারীর ভারশূন্যতার তালিম

অবস্থাতেই সহ্য করতে পারে। তবে শোয়া অবস্থায় এই সহ্যশক্তি আরও অনেক বেড়ে যায়।

তবে মহাকাশ-ভ্রমণের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের যান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ওজন বৃদ্ধির অস্বস্তিকর অবস্থা সহ্য করার ট্রেনিং দেওয়া হয়। যদিও রকেটযোগে ভূমি ত্যাগ করার সময় প্রকৃত ত্বরণের সীমারেখা '১০-জি'র মত হয় তবুও অনুশীলনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করা হয়। এই যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বলে 'সেন্ট্রিফিউজ'।

ভারশূন্যতা

শরীরের ওজন বৃদ্ধি পাওয়াটাই একমাত্র অস্বস্তি নয়। ওজন একেবারে না থাকা বা ভারশূন্যতার অস্বস্তিও ভোগ করতে হয়। বাধাপ্রাপ্ত মাধ্যাকর্ষণের টানকেই আমরা ওজন বলি। কিন্তু যদি বাধা না থাকে অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণের টানে অবাধে যদি কোন বস্তু অবতরণ করতে থাকে তাহলে ভারশূন্য অবস্থা তৈরী হয়। লিফটে চেপে নীচে নামার সময় শরীরের ওজন অনেকটা কমে গেছে বলে

মনে হয়। অন্য একভাবেও ভারশূন্য অবস্থা তৈরী হয়। যেমন কৃত্রিম উপগ্রহের পাক খাওয়া। এ অবস্থায় মাধ্যাকর্ষণের টানের সমান ও বিপরীত দিকে কাজ করে বহিঃকেন্দ্রিক শক্তি। অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণের টানের কোন প্রভাব থাকে না ফলে তৈরী হয় ভারশূন্য অবস্থা। এই অবস্থায় ব্যোমযানের অভ্যন্তরে সব কিছুই হয় ভারশূন্য। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, ভারশূন্যতার জন্যে শারীরিক প্রতিক্রিয়ার চেয়ে মানসিক প্রতিক্রিয়াই বেশী হবে। ব্যোমযানের কোনটা ওপর দিক ও কোনটা নীচের দিক সেটা বোঝা যাবে না। শোয়া বা দাঁড়ানোর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। স্বাভাবিক ভাবে খাওয়া দাওয়া সম্ভব হবে না। তবে এই অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে, যাত্রীদের বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না বলেই বিজ্ঞানীরা মনে করেন। এ ব্যাপারেও শিক্ষার্থীদের অনুশীলন দেওয়া হয়। মাটি থেকে অনেক উঁচুতে দ্রুতগামী জেটপ্লেনকে বক্র গতিপথে চালনা করে কিছুক্ষণের জন্যে ভারশূন্যতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। তবে এ পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে মহাশূন্যের যাত্রীদের পক্ষে ভারশূন্য অবস্থাটা খুব বড় সমস্যা নয়। তবে বহুদিন এভাবে কাটালে তার প্রতিক্রিয়া কি দাঁড়াবে, তা এখনও জানা সম্ভব হয়নি।

এছাড়া ব্যোমযানের মধ্যে এমন একটি অবস্থা থাকা দরকার যাতে মানুষ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে। যেমন নিঃশ্বাস নেবার জন্যে চাই বায়ু, সঠিক চাপ ও উত্তাপ। তাছাড়া চাই জল ও খাবার। এ সবের জন্যে সঠিক ব্যবস্থা রাখাও কম সমস্যা নয়।

মহাকাশের অজানা সীমান্তে

মহাকাশে এমন অনেক বিপদের সম্ভাবনা আছে যেগুলি পৃথিবী থেকে সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। বায়ুমণ্ডলের বাইরে রয়েছে বহু ধরনের বিকিরণ, যেমন বেগুনী পারের আলো (আলট্রা ভায়োলেট রে), মহাজাগতিক রশ্মি (কসমিক রে) ও উল্কাপিণ্ড। বেগুনী পারের আলো এক বিশেষ ধরনের কাচ দিয়ে ঠেকানো যায়। তবে মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে আমাদের বিশেষ কিছু এখনও জানা নেই। যতদূর জানা গেছে মহাজাগতিক রশ্মি হচ্ছে এক ধরনের কণিকাস্রোত, যা প্রচণ্ড বেগে মহাশূন্য থেকে বর্ষিত হচ্ছে। তবে বায়ুমণ্ডলের আড়াল থাকার জন্যে এই রশ্মি মাটিতে এসে পৌঁছতে পারে না। সুতরাং এর প্রকৃত চেহারা জানতে হলে যেতে হবে বায়ুমণ্ডলের বাইরে। এছাড়াও রয়েছে এক্স-রে ও গামা-রে।

কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ জানা গেছে পৃথিবীর ওপর ১,৫০০ মাইল থেকে ২০,০০০ মাইল পর্যন্ত একটি বিকিরণ বলয় পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে। একে বলে ভ্যান-এ্যালেন বলয়। এই বলয় বিদ্যুতাবিষ্ট কণিকায় পূর্ণ। ভবিষ্যতের মহাকাশ-যাত্রীকে এই ভয়ংকর এলাকাটি পার হয়ে তবে চাঁদে বা অন্য কোন গ্রহে পৌঁছতে হবে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন এই বলয়টিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব। কারণ মেরু-অঞ্চলের ওপর এই বলয়টির উপস্থিতি নেই।



পৃথিবী

- ◆ ভ্যান এ্যালেন বেল্ট (অর্দ্ধেক দেখা যাচ্ছে)
- ▬ বেগুনী পারের আলো
- ◓ মহাজাগতিক রশ্মি
- ✦ বিদ্যুতাবিষ্ট কণিকাস্রোত
- ◣ উল্কাপাত

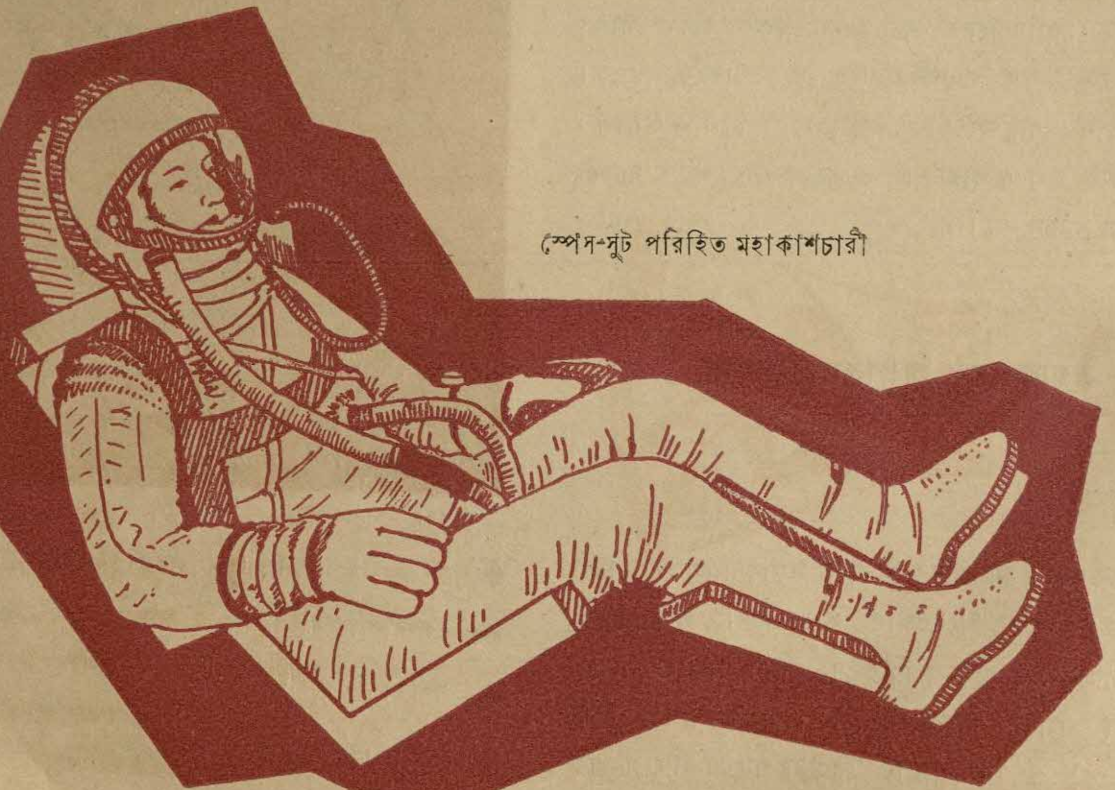
এছাড়া রয়েছে উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে ধাক্কা লাগার ভয়। মহাশূন্যে অসংখ্য ছোট ছোট উল্কাপিণ্ড প্রচণ্ডবেগে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের সাথে সংঘর্ষের ফলে ব্যোমযানের দেওয়াল ফুটো হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। তবে যতদূর জানা গেছে এ সম্ভাবনা খুবই কম।

স্পেস স্যুট

স্পেস স্যুট হচ্ছে মহাশূন্য-যাত্রীদের এক বিশেষ ধরনের পোষাক। হাল্কা জিনিসে তৈরী এই পোষাকে মহাকাশযাত্রীর সর্বাঙ্গ মোড়া থাকে।

আমরা জানি মাটির ওপর বায়ুর চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় পনেরো পাউণ্ড। কিন্তু মাটি থেকে দশ মাইল উঁচুতে উঠলেই বায়ুর চাপ এত কমে যায় যে, স্বাভাবিক শ্বাস-প্রক্রিয়া অচল হয়ে পড়ে। তাছাড়া চাপ খুব কমে গেলে শরীরের রক্ত অত্যধিক গরম হয়ে ফুটতে আরম্ভ করবে। এই অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে একান্ত প্রয়োজন স্পেস-স্যুটের। এই পোশাকের মধ্যে এমন ব্যবস্থা থাকে যার ফলে নিঃশ্বাস নেবার জন্যে স্বাভাবিক মাত্রায় অক্সিজেন, শরীরের বাইরে প্রয়োজনীয় চাপ ও উত্তাপ বজায় রাখা সম্ভব হয়। তাছাড়া কথা বলবার ও শোনবার জন্যে বেতার যন্ত্রও স্পেস-স্যুটের ভিতরেই থাকে।

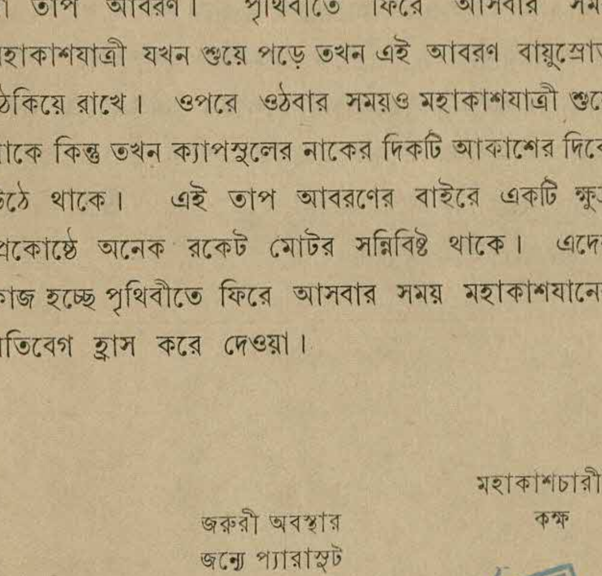
এত সব ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মহাশূন্যে মানুষের অবস্থা আরামপ্রদ হবে না এটা সুনিশ্চিত। সুদূর মহাকাশে ভারশূন্য অবস্থায় নিজেকে মনে হবে অসহায় শিশুর মত। বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে ভারের অনুভূতি সৃষ্টি করার জন্যে চুম্বকযুক্ত জুতো ব্যবহারের কথাও ভেবে দেখছেন। এর ফলে ব্যোমযানের ভিতরে চলাফেরা করতে গিয়ে আচমকা দেওয়ালে ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। তবে অনেকেই মনে করেন মহাশূন্যের যাত্রী ভারশূন্য অবস্থাতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে। মহাকাশের নিঃসীম শূন্যতায় যাত্রীর মনে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে এ নিয়ে অনেক গবেষণা চলেছে। মহাশূন্যের যাত্রায় মানুষকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় বাস করতে হবে। ব্যোমযানের সংকীর্ণ ঘরের মধ্যেই সব সময়ের জন্যে বদ্ধ থাকতে হবে।



স্পেস-সুট পরিহিত মহাকাশচারী

মহাকাশযান

মহাকাশযান বা ক্যাপসুলটি দেখতে অনেকটা ঘণ্টাকৃতি ট্যাঙ্কের মত। তার সামনের দিকটি প্রসারিত ভোঁতামুখ। ওই ভোঁতা প্রান্তের দিকে কৌচে মহাকাশযাত্রী শুয়ে থাকে। তার পিছনের দিকের প্রশস্ত গোলাকার দেওয়ালটি কাচতন্তু ও রজনের অনেকগুলি স্তর দিয়ে বেশ পুরু করে তৈরী করা হয়। এই ব্যবস্থাকে বলে হিট শীল্ড বা তাপ আবরণ। পৃথিবীতে ফিরে আসবার সময় মহাকাশযাত্রী যখন শুয়ে পড়ে তখন এই আবরণ বায়ুস্রোত ঠেকিয়ে রাখে। ওপরে ওঠবার সময়ও মহাকাশযাত্রী শুয়ে থাকে কিন্তু তখন ক্যাপসুলের নাকের দিকটি আকাশের দিকে উঠে থাকে। এই তাপ আবরণের বাইরে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অনেক রকেট মোটর সন্নিবিষ্ট থাকে। এদের কাজ হচ্ছে পৃথিবীতে ফিরে আসবার সময় মহাকাশযানের গতিবেগ হ্রাস করে দেওয়া।



মহাকাশযানের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য

ক্যাপসুলের ছোট মুখটি উপরের দিকে করে প্রেষবর্ধক রকেটের মাথায় এঁটে দেওয়ার ফলে রকেটের অন্যান্য অংশসহ ক্যাপসুল বায়ুপ্রবাহের ঝাপটা সহজেই কাটিয়ে চলতে পারে।

বলাবাহুল্য, কেবিনটি যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত থাকে এবং যন্ত্রগুলির বিন্যাস এমন যে, মহাকাশযাত্রী মাথা না ঘুরিয়েই সব যন্ত্রপাতি দেখতে পায়। এটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণ গতিবৃদ্ধি এবং হ্রাসের সময় মাথা নাড়াবার শক্তি তার থাকে না। মহাকাশযানের জানালা দিয়ে এবং মহাকাশযাত্রীর চোখের ঠিক নীচে রাখা একটি পেরিস্কোপ দিয়ে দেখার কাজ চলে।

যখন প্রেষবর্ধক-রকেট ভূমিত্যাগ করে তখন ক্যাপসুলকে খাড়া খানিকটা তুলে দেয় এবং যখন কক্ষপথের কাছাকাছি আসে তখন ক্যাপসুল একপাশে কাত হয়ে পড়ে। জ্বালানি নিঃশেষ হবার পর একটি ধারক রকেট দেয়-ভারকে কক্ষপথ পর্যন্ত বহন করে নেয় এবং ঘন্টায় ১৮,০০০ মাইল গতিবেগ দিয়ে কক্ষপথে স্থাপন করে।

কক্ষপথে আবর্তনের সময় ক্যাপসুলটি তার দীর্ঘ অক্ষ ভূপৃষ্ঠের সমান্তরাল করে চলে কিন্তু পৃথিবীতে ফিরে আসবার সময় হলে ডগাটি সামনের দিকে রেখে আস্তে আস্তে নীচের দিকে কাত হতে শুরু করে। এইজন্যে গতিমন্দনকারী রকেটের সাহায্য নেওয়া হয়। ক্যাপসুলটি যাতে সোজা নীচের দিকে নামতে না পারে সেজন্যে রকেটগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করে। গতিমন্দন ঠিক নির্দিষ্ট পরিমাণ হওয়া প্রয়োজন কারণ বেগ পরিবর্তনের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে নিম্নাভিমুখী গতিপথের আকার। উচ্চ 'জি'-এর প্রভাবের অথবা তীব্র তাপে ভস্মীভূত হয়ে মৃত্যু বরণ করা থেকে মহাকাশযাত্রীকে রক্ষা করে বেগ মন্দীভূত করে সম্পূর্ণ বেগহীন অবস্থায় আনা হচ্ছে আর এক সমস্যা।

মহাকাশযানের যে প্রান্তে তাপ আবরণ আছে সেই প্রান্ত সোজাসুজি বায়ুমণ্ডলের দিকে মুখ করে রাখা প্রয়োজন, কারণ যে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয় তা কেবল ওই প্রান্তই সহ্য করতে সক্ষম। এছাড়া গতি মন্দীভূত করবার জন্যে প্রয়োজনীয় বায়ুর পিছ্‌টানও এই প্রান্ত তৈরী করতে পারে। এর সামান্য বিচ্যুতিই মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করবে এবং মহাকাশযানটি ধ্বংস হবে। পৃথিবীতে ফিরে আসবার সময় মহাকাশযানটি যখন প্রথম লঘু বায়ুস্তরের সংস্পর্শে আসে তখন একটু দুলে ওঠে। এই দোলানী সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করতে হয় নইলে ক্যাপসুলটি

এমন ডিগবাজী খাবে যে মহাকাশযাত্রীর আর তা সংশোধন করার সময় থাকবে না।

ফিরে আসবার সময় সর্বাপেক্ষা চিন্তার বিষয় হচ্ছে তাপ। মহাকাশযানের ভিতরের চাপ ও তাপমাত্রা কেমন থাকে মহাকাশযাত্রীকে তা সবসময় নজরে রাখতে হয়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লে তা বোঝা যাবে অক্সিজেন সরবরাহের আকস্মিক পরিবর্তনে অথবা চাপের আকস্মিক বৃদ্ধিতে।

অবতরণের প্রথম পর্বে আসে তথাকথিত ড্রগ প্যারাস্যুট উন্মোচন। এটি করা হয় প্রায় ৭০,০০০ ফুট ওপরে থাকতে; এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মহাকাশযানকে স্থির অবস্থায় আনা। মহাকাশযানটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ১২,০০০ ফুট ওপরে থাকতে মূল প্যারাস্যুটের যন্ত্রপাতি কাজ শুরু করে এবং তখন থেকেই মহাকাশযানটি ভাসতে ভাসতে ভূপৃষ্ঠে (সাধারণতঃ সমুদ্রে) এসে পৌঁছায়। সমস্ত ব্যবস্থা এমন নিখুঁতভাবে করা হয় যাতে মহাকাশযানটি ঘণ্টায় কুড়ি মাইল বেগে সমুদ্রজলে এসে পড়ে। যদি মূল প্যারাস্যুটটি কোন কারণে না খোলে, তবে সেইরকম জরুরী অবস্থার জন্যে একটি বিকল্প প্যারাস্যুট থাকে।

যোগাযোগব্যবস্থা এত নিখুঁত থাকে যে, মহাকাশযানটি কোথায় পড়বে তা অনেক আগে থেকেই জানা যায়। সেই জায়গায় জাহাজ ও হেলিকপ্টার থাকে। তারাই মহাকাশযাত্রী ও মহাকাশযানটিকে উদ্ধার করে।

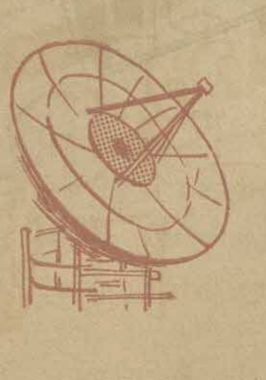
মহাকাশে শক্তির উৎস

মহাকাশযানের ভিতর এমন স্বল্পভারী, দীর্ঘায়ু যন্ত্রপাতি স্থাপন করা আবশ্যক যা বৈদ্যুতিক শক্তির জোগান দেবে। অধিকাংশ মহাকাশযানেই সৌরব্যাটারী এই শক্তির জোগান দেয়। সৌরব্যাটারী হচ্ছে ফটো-ইলেকট্রিক যন্ত্র যা সূর্যরশ্মিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে।

এছাড়া হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনকে বৈদ্যুতিক-শক্তিতে রূপান্তরিত করবার জন্যে গবেষণা চলছে। এটি সম্ভব হলে পানীয় জলও এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

পরমাণবিক শক্তিকে মহাকাশ অভিযানে কাজে লাগাবার জন্যে জোর প্রচেষ্টা চলেছে। এই প্রচেষ্টা সফল হলে পরমাণবিক শক্তিই বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করবে; ফলে যন্ত্রপাতি আরও হাল্কা হবে এবং শক্তির উৎসও অনেক দীর্ঘস্থায়ী হবে।

মহাকাশযাত্রায় রকেটের মতই গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী হচ্ছে বেতার ও র‍্যাডার





প্যারাস্যুটের সাহায্যে অবতরণ

মহাকাশে মানুষ

এবং মানুষের মহাকাশ বিজয়ের স্বপ্ন একদিন সত্যিই সফল হল। এই পৃথিবীর যে মানুষটি প্রথম মহাকাশে পৌঁছলেন তিনি হচ্ছেন সোভিয়েত রাশিয়ার মেজর য়ুরি গ্যাগারিন। ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল ভোস্টক ১ মহাকাশযানে চেপে ১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটে ২৬,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে এবং একবার কক্ষ আবর্তন করে তিনি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

সোভিয়েত রাশিয়ার গ্যাগারিনের পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেপার্ড ১৯৬১ সালের ৫ই মে মহাকাশে ওঠেন। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১১৫ মাইল ওপরে ঘণ্টায় প্রায় ৫,০০০ মাইল গতিতে তাঁর মহাকাশযানটি ছুটতে থাকে। তিনি পনের মিনিট মহাকাশে ছিলেন কিন্তু কক্ষপথটি সম্পূর্ণ একবার আবর্তন করতে পারেন নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম যে মহাকাশচারী কক্ষ আবর্তন করেন তাঁর নাম জন গ্লেন। কক্ষ আবর্তনের সময় ভূপৃষ্ঠ থেকে তাঁর উচ্চতা ছিল ৮৬ থেকে ১৪১ মাইলের মধ্যে। তাঁর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৭,৫০০ মাইল।

পৃথিবীর প্রথম নারী মহাকাশযাত্রী হচ্ছেন সোভিয়েত রাশিয়ার ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা। ১৯৬৩ সালের ১৬ই জুন তিনি মহাকাশে পাড়ি দেন এবং ৭০ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে ৪৮ বার কক্ষ আবর্তন করে এবং প্রায় ১,২৫০,০০০ মাইল পথ পরিভ্রমণ করে ১৯শে জুন আবার তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

য়ুরি গ্যাগারিন



এর পরই ১৯৬৪ সালের ১২ই অক্টোবর সোভিয়েত রাশিয়ার ভোস্কদ ১ মহাকাশযানটি একসঙ্গে তিনজন মহাকাশযাত্রীকে বহন করে মহাকাশে পাড়ি দেয়।

১৯৬৭ সালের ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেসব মহাকাশচারী মহাকাশ অভিযান করেছেন, তাঁদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা নীচে দেওয়া হল :

মহাকাশচারী	দেশ	মহাকাশযান	তারিখ	মাইল	কক্ষ আবর্তনের সংখ্যা	মহাকাশে উপস্থিতি	
						ঘঃ	মিঃ
যুরি গ্যাগারিন	রাশিয়া	ভোস্টক—১	১২. ৪.৬১	২৬,০০০	১	১	৪৮
অ্যালান শেপার্ড	আমেরিকা	ফ্রীডম—৭	৫. ৫.৬১		অসম্পূর্ণ	০	১৫
ভার্জিল গ্রীসম	আমেরিকা	লিবার্টি বেল—৭	২১. ৭.৬১		অসম্পূর্ণ	০	১৬
গেরমান তিতোফ	রাশিয়া	ভোস্টক—২	৬-৭. ৮.৬১	৭,৩৫,০০০	১৭	২৫	১৮
জন গ্লেন	আমেরিকা	ফ্রেণ্ডশিপ—৭	২০. ২.৬২	৮১,২৫০	৩	৪	৫৫
স্কট কার্পেণ্টার	আমেরিকা	আরোরা—৭	২৪. ৫.৬২	৮১,২৫০	৩	৪	৫৬
আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েভ	রাশিয়া	ভোস্টক—৩	১১-১৫. ৮.৬২	১৬,১২,০০০	৬৪	৯৪	২২
পাভেল পপোভিচ	রাশিয়া	ভোস্টক—৪	১২-১৫. ৮.৬২	১২,৪৭,০০০	৪৮	৭০	৫৭
ওয়াল্টার সিরা	আমেরিকা	সিগমা—৭	৩.১০.৬২	১,৭০,০০০	৬	৯	১৩
গর্ডন কুপার	আমেরিকা	ফেথ্—৭	১৫-১৬. ৫.৬৩	৫,৯৫,০০০	২২	৩৪	২০
ভ্যালেরি বিকোভস্কি	রাশিয়া	ভোস্টক—৫	১৪-১৯. ৬.৬৩	২,০৬০,০০০	৮১	১১৯	০৬
ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা (প্রথম নারী মহাকাশযাত্রী)	রাশিয়া	ভোস্টক—৬	১৬-১৯. ৬.৬৩	১,২৫০,০০০	৪৮	৭০	৫০
ভ্লাডিমির কোমারভ, কন্সট্যাটিন ফিওকটিস্টভ ও ডাঃ বরিস ইয়েগোরভ	রাশিয়া	ভোস্কদ—১	১২-১৩.১০.৬৪	৪,৩৫,২১৭	১৬	২৪	১৭
বেলায়েভ ও অ্যালেক্সি লিওনভ	রাশিয়া	ভোস্কদ—২	১৮.১৯. ৩.৬৫		১৭	২৬	০২
ভার্জিল গ্রীসম ও জন ইয়ং	আমেরিকা	জেমিনি—৩	২৩. ৩.৬৫		৩	৪	৫৩
জেমস ম্যাকডিভিট ও এডওয়ার্ড হোয়াইট	আমেরিকা	জেমিনি—৪	৩-৭. ৬.৬৫	১,৬০৯,৬৮৪	৬২	৯৭	৫৬
গর্ডন কুপার ও চার্লস কনরাড	আমেরিকা	জেমিনি—৫	২১-২৯. ৮.৬৫	৩,৩৩৮,২০০	১২০	১৯০	৫৬
ফ্র্যাঙ্ক বরম্যান ও জেমস লাভেল	আমেরিকা	জেমিনি—৭	৪-১৮.১২.৬৫	৫,১২৯,৪০০	২০৬	৩৩০	৩৫
ওয়াল্টার সিরা ও টমাস স্ট্যাফোর্ড	আমেরিকা	জেমিনি—৬	১৫-১৬.১২.৬৫		১৫	২৫	৫১
আর্মস্ট্রং ও স্কট	আমেরিকা	জেমিনি—৮	১৬. ৩.৬৬		৬½	১০	৪২
টমাস স্ট্যাফোর্ড ও ইউজিন কারনান	আমেরিকা	জেমিনি—৯	৩-৬. ৬.৬৬		৪৪	৭২	২১
জন ইয়ং ও মাইকেল কলিন্স	আমেরিকা	জেমিনি—১০	১৮-২১. ৭.৬৬		৪৩	৭০	৪৭
চার্লস কনরাড ও গর্ডন	আমেরিকা	জেমিনি—১১	১২-১৫. ৯.৬৬		৪৪	৭১	১৭
জেমস লাভেল ও অলড্রিন	আমেরিকা	জেমিনি—১২	১১-১৫.১১.৬৬		৫৯	৯৪	৩৫

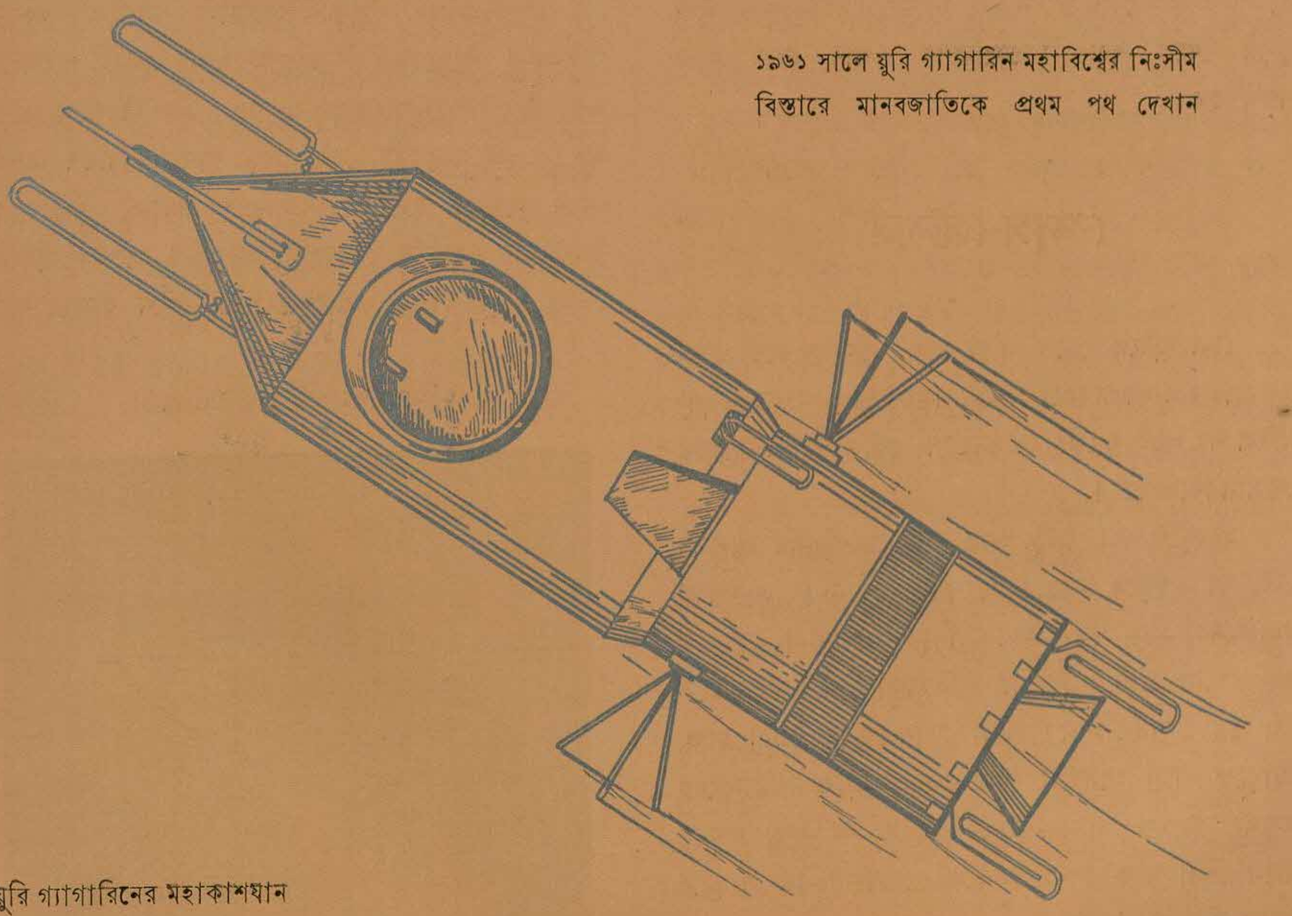
১৯৬৫ সালের ১৮ই মার্চ মহাকাশ অভিযানের প্রচেষ্টায় সোভিয়েত রাশিয়া এক নবদিগন্তের সৃষ্টি করল। ওই দিন ভোস্কদ ২ মহাকাশযানে চেপে বেলায়েভ এবং লিওনভ মহাকাশে পাড়ি দেন। কয়েকবার কক্ষ আবর্তন করার পর লিওনভ মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে এসে মহাকাশে পা ফেললেন। এবং দশ মিনিট কাল মহাকাশে পদচারণা করে আবার তাঁর মহাকাশযানে ফিরে গেলেন।

মহাকাশে মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে এসে পদচারণা করাটা মহাকাশ অভিযানের একটি পর্যায়। ভবিষ্যতের মহাকাশচারীদের তাঁদের মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে এসে নানা ধরনের কাজকর্ম করতে হবে। এইসব কাজের মধ্যে আছে এক মহাকাশযান থেকে আর এক মহাকাশযানে যাওয়া, দুটি মহাকাশযানকে জুড়ে দেওয়া, মহাকাশযানের বাইরের দিকে কোন কাজকর্ম থাকলে তা সেরে ফেলা, স্পেস স্টেশন নির্মাণ করা, প্রয়োজন হলে কোন কৃত্রিম উপগ্রহকে মেরামত করা ইত্যাদি।

১৯৬৫ সালের ৩রা জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট পৃথিবীর দ্বিতীয় মানুষ হিসাবে মহাকাশে পদচারণা করেন। তিনি মহাকাশযানের বাইরে প্রায় ২১ মিনিট ছিলেন।

এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশ অভিযানের প্রচেষ্টায় আর এক ধাপ এগিয়ে গেল। ১৯৬৫ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর বরম্যান এবং লাভেল জেমিনি ৭ মহাকাশযানে চেপে মহাকাশে পাড়ি দিলেন। তাঁরা মহাকাশে ছিলেন ১৮ই ডিসেম্বর অবধি। ইতোমধ্যে ১৫ই ডিসেম্বর সিরা এবং স্ট্যাফোর্ড জেমিনি ৬ মহাকাশযানে চেপে মহাকাশে পাড়ি দিলেন। এই দুটি মহাকাশযান মহাকাশে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। ২০ ঘণ্টা ২২ মিনিট

১৯৬১ সালে য়ুরি গ্যাগারিন মহাবিশ্বের নিঃসীম বিস্তারে মানবজাতিকে প্রথম পথ দেখান



য়ুরি গ্যাগারিনের মহাকাশযান

ধরে তারা পরস্পরের থেকে মাত্র ৬২ মাইল দূরে ছিল; এর মধ্যে তাদের নিকটতম দূরত্ব হয়েছিল মাত্র ছয় থেকে দশ ফুট।

১৯৬৬ সালের ৩রা জুন মার্কিন মহাকাশচারী কারনান মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে এসে মহাকাশে ২ ঘণ্টা ৮ মিনিট পদচারণা করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি মহাকাশযানের বাইরের গায়ে একটি চলচ্চিত্র ক্যামেরা স্থাপন করেন যেটি তাঁর গতিবিধির ছবি তোলে; মহাকাশযানের নাকের দিকে একটি আয়না স্থাপন করেন যার ভিতর দিয়ে স্ট্যাফোর্ড তাঁর গতিবিধি দেখতে পান এবং মহাকাশযানের পিছন দিকে চলে যান।

জেমিনি ১০ মহাকাশযানের মহাকাশযাত্রীদ্বয় ইয়ং এবং কলিন্স তাঁদের ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট আগে উৎক্ষিপ্ত অ্যাজেনা মহাকাশযানটির সঙ্গে মহাকাশে মিলিত হন। ১,৬৪,৮০০ কিলোমিটার পিছু ধাওয়া করে তাঁরা অ্যাজেনার সঙ্গে মিলিত হন এবং দুটি মহাকাশযানকে সংযুক্ত করেন। অ্যাজেনায় রক্ষিত জ্বালানি ব্যবহার করে মহাকাশযাত্রীদ্বয় রকেটে অগ্নি সংযোগ করেন এবং নিজেদের মহাকাশযানটিকে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭৫৮ কিলোমিটার ওপরে নিয়ে যেতে সক্ষম হন।

স্পেস-স্টেশন

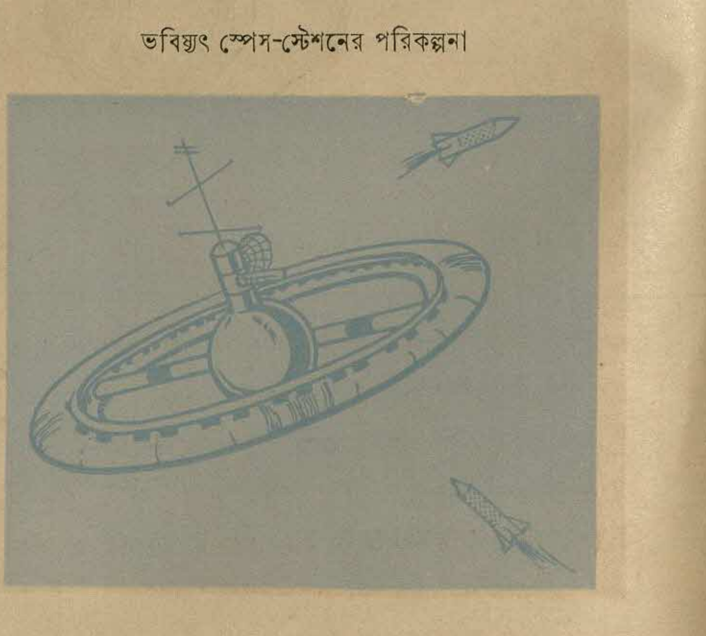
রেলগাড়ীতে চেপে সারা দেশ ঘুরে আসতে হলে একবারে জল-কয়লা নিয়ে কি তা সম্ভব হবে? না, কয়েকশ' মাইল পর পরই মাঝের স্টেশনগুলি থেকে জল ও কয়লার যোগান দিতে হবে।

মহাশূন্যে লম্বা পাড়ি দিতে হলে যে-পরিমাণ জ্বালানি চাই, তা একসঙ্গে নিয়ে যাত্রা সম্ভব হবে না। এ সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে এক ধরনের স্টেশন তৈরীর পরিকল্পনা করেছেন। একে বলা হয় স্পেস-স্টেশন। এই স্পেস-স্টেশন তৈরী হলে, মহাশূন্যে যাত্রা অনেকটা সহজ হওয়া ছাড়াও বিজ্ঞানীদের অসংখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হবে। সে সব কথা জানার আগে দেখা যাক স্পেস-স্টেশনের চেহারাটা কি দাঁড়াবে ও তা কিভাবে তৈরী হবে।

আসলে স্পেস-স্টেশন হবে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে এক নির্দিষ্ট উচ্চতায় এই উপগ্রহটি অনবরত পৃথিবীর চারিদিকে পাক খেয়ে চলবে। আমরা জানি স্পেস-স্টেশনটিকে পাক খাওয়ানোর জন্যে কোন রকেটের প্রয়োজন হবে। নির্দিষ্ট উচ্চতায় নিয়ে প্রয়োজনীয় চক্রবেগ দেওয়াতে পারলেই হল। কারণ আমরা জানি কোন বস্তু যদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে চক্রবেগে পাক দিতে শুরু করে তাহলে তা অনন্তকাল ধরে পৃথিবীর একটি উপগ্রহের মত পাক খেতে থাকবে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, পৃথিবী থেকে ২২,০০০ মাইল দূরে থেকে কোন বস্তু যদি চক্রবেগে পৃথিবীকে পাক দেয় তাহলে তার এক একটি পাকের জন্যে সময় লাগবে পুরো চব্বিশ ঘণ্টা। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে তাকিয়ে মনে হবে যেন এই বস্তুটি মহাশূন্যে স্থির হয়ে আছে। যেহেতু পৃথিবী ও উপগ্রহটির টান-ছুটের মধ্যে কোথাও কোনরকম বাধা নেই সেইজন্যে এ অবস্থায় স্পেস-স্টেশনটি হবে ভারশূন্য।

স্পেস-স্টেশন নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক রকমের পরিকল্পনা করেছেন। তাদের মধ্যে একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী স্পেস-স্টেশনের চেহারা হবে এক বিরাট চাকতির মত। এই চাকতির বেড় জুড়ে থাকবে বিভিন্ন অংশ; যেমন থাকবার ঘর, গবেষণাগার, কারখানা, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, বেতার যন্ত্র ইত্যাদি। স্পেস-স্টেশনের ভিতর বায়ুর চাপ ও উত্তাপের মাত্রা এমন থাকবে যাতে

ভবিষ্যৎ স্পেস-স্টেশনের পরিকল্পনা



সহজভাবে বেঁচে থাকা চলে। এছাড়া শরীরের সাধারণ ভারও থাকা প্রয়োজন। তাই কৃত্রিম উপায়ে ভারের অনুভূতি সৃষ্টি করার জন্যে চাকতির মতো স্পেস-স্টেশনটিকে নিজের অক্ষ দণ্ডের চারিদিকে পাক খাওয়ানো হবে। কামরাগুলির মেঝে হবে চাকতির বেড়-এর দিকে আর ছাদ হবে চাকতির কেন্দ্রের দিকে। অর্থাৎ কামরার মধ্যে কোন মানুষ দাঁড়ালে, তার মাথা থাকবে চাকতির কেন্দ্রের দিকে। চাকতি ঘুরতে থাকলে তৈরী হবে বহিঃকেন্দ্রিক শক্তির টান। এর টান বাইরের দিকে। অর্থাৎ কামরার ভিতরে মেঝের দিকে একটা টান তৈরী হবে। আর মেঝেটা সেই টানের বিরুদ্ধে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। ফলে তার থেকেই আসবে ভারের অনুভূতি। তবে ভিতরের মানুষ চাকতির অক্ষ-আবর্তন ও কক্ষ-আবর্তন কোনটাই টের পাবে না। যেমন মানুষ পৃথিবীর এই দু-ধরনের গতির কোনটাই টের পায় না।

স্পেস-স্টেশন তৈরী হলে তার ব্যবহার হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় এক এরোপ্লেন থেকে আর এক এরোপ্লেনে কিভাবে তেল নেওয়া হয় তা বোধহয় তোমরা অনেকেই জান। এইসব ক্ষেত্রে দুটি প্লেন একই বেগে ওড়ে সেইজন্যে এক প্লেন থেকে অপর প্লেনের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন সেটি স্থির, অতএব তেল নেওয়ার কোন অসুবিধা নেই। ঠিক তেমনি গ্রহান্তরে যাবার পথেও মহাকাশযানগুলি স্পেস-স্টেশন থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করবে। সেক্ষেত্রে মহাকাশযানটি প্রথমে উঠে আসবে স্পেস-স্টেশনের কক্ষপথে এবং সেখানে স্পেস-স্টেশনের পাশাপাশি চক্রবেগে কিছুক্ষণ পাক দেবে। সুতরাং সেই অবস্থায় স্পেস-স্টেশন থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করে নেওয়াটা মহাকাশযানটির পক্ষে কিছুমাত্র শক্ত কাজ হবে না। এবং যেহেতু সেখানে কোন কিছুর ওজন নেই সেইজন্যে অতি সহজেই বিপুল পরিমাণ জ্বালানি ট্যাংকসমেত এক মহাকাশযান থেকে খুলে নিয়ে এসে অন্য মহাকাশযানে লাগিয়ে দেওয়া যাবে।

আর তৈরী হবে সেই স্পেস-স্টেশনে বিরাট গবেষণাগার। এখানে কোন বস্তুর ভার নেই; সুতরাং বিশাল বিশাল যন্ত্রপাতিকে অনায়াসেই নাড়াচাড়া করা চলবে। খুব সহজেই নির্মাণ করা যাবে বিরাট বিরাট আকারের দূরবীক্ষণ যন্ত্র। পৃথিবীতে ২০০ ইঞ্চি মাপের একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করতে গিয়েই হিমসিম খেতে হয়। তার কাঠামোটাই হয়ে ওঠে এমন এক বিশাল ব্যাপার যে তার বহু অংশকেই নড়ানো-চড়ানো যায় না। কিন্তু স্পেস-স্টেশনের ওপর নির্মিত দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে যত খুশী লম্বা করা যেতে পারে। কয়েক মাইল দূরে দূরে দুটি লেন্স ছেড়ে দিলেই হলো। ব্যস, তাহলেই তৈরী হয়ে গেল দূরবীক্ষণ যন্ত্র! মাঝখানে কোন কাঠামোর প্রয়োজন হবে না, কারণ যেহেতু এখানে কোন কিছুর ভার নেই অতএব যেখানে যে জিনিসটি রাখা হবে সেখানেই তা থেকে যাবে। তাছাড়া চোখের সামনে অনাবশ্যক বিরক্তিকর আড়াল তুলে ধরবার জন্যে এখানে হাওয়া বা মেঘ কিংবা ধূলো নেই। সুতরাং মহাশূন্যের বহু অজানা রহস্যই অতি সহজেই জানা যাবে।

শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞান নয়। পদার্থবিজ্ঞানের জন্যেও এটি হবে এক আশ্চর্য গবেষণাগার। এখানে স্বাভাবিকভাবেই তৈরী হয়ে আছে এক নিশ্ছিদ্র ভ্যাকুয়াম। আবার এখানে অতি সহজেই শূন্যমানের তাপমাত্রা তৈরী করে নেওয়া চলে।

আর এখানে গবেষণা চলবে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে, বেগুনী পারের আলো নিয়ে, বায়ুমণ্ডলের আয়নিত স্তর নিয়ে।

এই স্পেস-স্টেশন থেকে পৃথিবীতে আবহাওয়ার খবর নির্ভুলভাবে পাঠানো যাবে। এর সাহায্যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত পৃথিবীকে এক একবার পর্যবেক্ষণ করে আসা সম্ভব হবে। সুতরাং কোথায় কখন ঝড়ো মেঘ জড়ো হচ্ছে সে খবর সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে পৃথিবীতে।

এই স্পেস-স্টেশনের মাধ্যমে রেডিও ও টেলিভিসন যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নত ধরনের হয়ে উঠবে।

এখানে আয়না বা ওই ধরনের কোন কিছুর ব্যবস্থা করে সংগ্রহ করা যেতে পারবে সূর্যের অফুরন্ত আলো ও উত্তাপ। তা দিয়ে চলবে ডায়নামো। তৈরী করা যাবে পাওয়ার স্টেশন।

আরও কত আশ্চর্যভাবে যে এই স্পেস-স্টেশনকে মানুষের কল্যাণে লাগানো সম্ভব তার পুরোপুরি বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব।

চন্দ্রে অভিযান



পৃথিবী থেকে চাঁদকে যেমন দেখায়

পৃথিবী থেকে চাঁদকে যত সুন্দর দেখায়, আসলে কিন্তু তেমন নয়। চাঁদের দেশে পা দিলেই দেখা যাবে এটি একটি প্রাণহীন জগৎ। জল নেই, গাছপালা নেই, মাঠ নেই, জীবনের কোন চিহ্নই নেই। শুধু ধু ধু করছে মরুভূমি, মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড এক একটি গহ্বর, মাঝে মাঝে উঁচু পাহাড়। কোথাও এতটুকু মসৃণতা নেই।

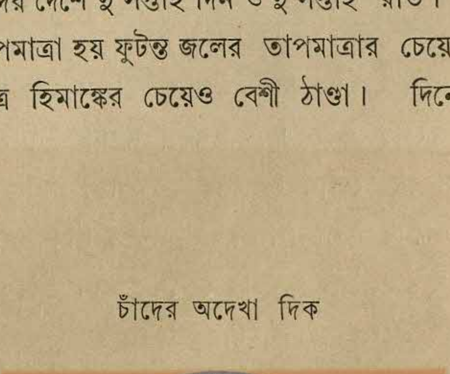
চাঁদের বায়ুমণ্ডল নেই। তাই সেখানকার আকাশ পৃথিবীর মত নীল দেখায় না; দিনের বেলাতেও আকাশ থাকে কুচকুচে কালো। সেই আকাশে দিনের বেলাতেও তারা ফুটে থাকে। তারাগুলিকে মনে হবে স্থির আলোর দ্যুতিমান বিন্দু। কোন ঝিকিমিকি নেই। আর সূর্যকে দেখাবে অস্বাভাবিক সাদা। চাঁদের আকাশে পৃথিবীকে দেখাবে মস্ত এক থালার মত—আবছা ও অস্পষ্ট। চাঁদের ব্যাস ২,১৬০ মাইল আর পৃথিবীর ব্যাস ৭,৯২৭ মাইল। সেইজন্যে পৃথিবীর আকাশে চাঁদের থালা যতটা বড় তার চেয়ে চাঁদের আকাশে পৃথিবীর থালা হবে চৌদ্দগুণ বড়। অর্থাৎ পৃথিবীর আকাশে নব্বুইটা চাঁদ থাকলে যতখানি আলো পাওয়া যেত, চাঁদের আকাশে একটি পৃথিবী থেকেই ততখানি আলো পাওয়া যাবে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আছে বলে চাঁদের আকাশে পৃথিবীকে অনেক বেশী উজ্জ্বল দেখাবে। পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে মনে হবে চাঁদের দেশের আকাশে পৃথিবী মোটামুটি একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। এমন হওয়ার কারণ, চাঁদের কক্ষ-আবর্তনে যতদিন সময় লাগে অক্ষ-আবর্তনেও ঠিক ততদিন (২৭ দিন, ৭ ঘন্টা এবং ৪৩ মিনিট) সময় লাগে। তার মানে যতটা সময়ে চাঁদ পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করছে, ঠিক ততটা সময়ে নিজে একবার লাট্টুর মত পাক খাচ্ছে। সেইজন্যে পৃথিবী থেকে আমরা সর্বদাই চাঁদের একদিকের অর্ধেকটা দেখতে পাই; অন্যদিকের অর্ধেকটা সবসময়েই আমাদের চোখের আড়ালে থেকে যায়।

চাঁদে বাতাস নেই। তাই মহাশূন্য থেকে মহাজাগতিক রশ্মি, আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি, উল্কাপাত অবাধে চাঁদে এসে পৌঁছবে। সুতরাং এ ধরনের বিপদ থেকে বাঁচবার জন্যে মহাকাশযাত্রীকে স্পেস-স্যুট ব্যবহার করতে হবে। চাঁদের দেশে জল নেই। সুতরাং পৃথিবী থেকে জল ও খাবার নিয়ে যেতে হবে। আর নিয়ে যেতে হবে বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন।

চাঁদের দেশে দু সপ্তাহ দিন ও দু সপ্তাহ রাত। দিনের দিকে তাপমাত্রা হয় ফুটন্ত জলের তাপমাত্রার চেয়েও বেশী আর রাত্রে হিমাঙ্কের চেয়েও বেশী ঠাণ্ডা। দিনের দিক

চাঁদের অদেখা দিক

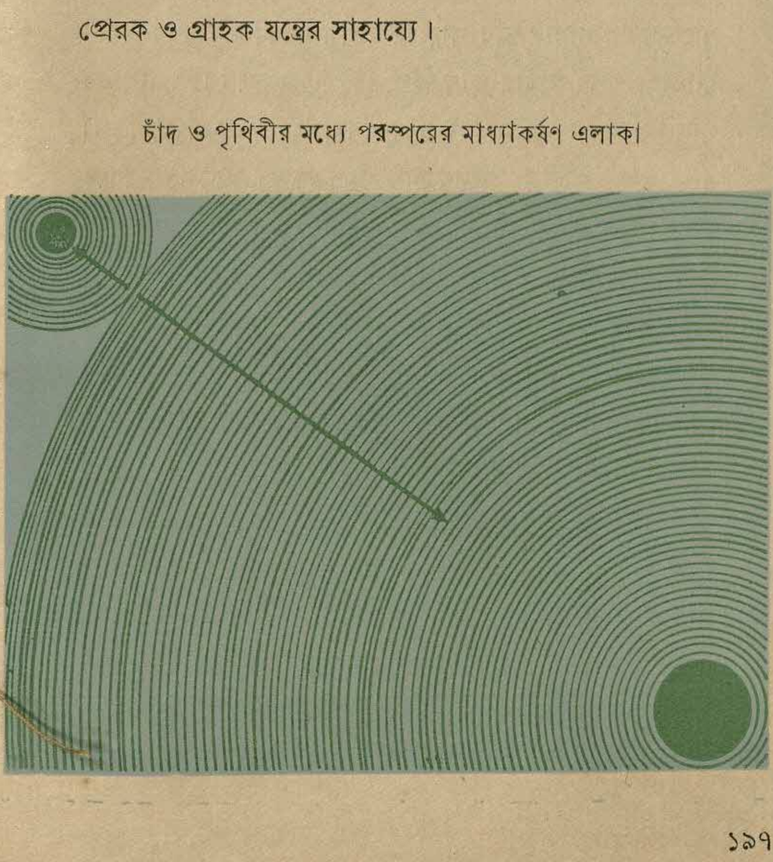


সূর্যের আলোয় উত্তপ্ত হতে হতে শেষকালে ফুটন্ত জলের চেয়েও বেশী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানীদের মতে, দিনের চাঁদের উত্তাপ ১০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের ওপরে ওঠে। আর রাতের চাঁদের উত্তাপ নেমে আসে শূন্য ডিগ্রির নীচে ১৬০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত। সুতরাং এর থেকে রক্ষা পেতে হলে চাই শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

আমরা জানি চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট। সুতরাং চাঁদে মাধ্যাকর্ষণের টানও অনেক কম। হিসাব করে দেখা গেছে চাঁদের টান পৃথিবীর টানের ছ'ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ পৃথিবীতে কোন জিনিসের ওজন ছ'মণ হলে, সেই জিনিসটি চাঁদে হবে মাত্র এক মণ।

চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে যোগাযোগ-ব্যবস্থা হবে বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে। কিন্তু এক্ষেত্রে নতুন ধরনের একটি অসুবিধা দেখা যাবে। বেতার-তরঙ্গের গতিবেগ, আলোর সমান। প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। চাঁদের দূরত্ব পৃথিবী থেকে প্রায় ২,৩৮,৮৫৭ মাইল; সুতরাং চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে বেতার-তরঙ্গের যাতায়াতের জন্যে প্রায় আড়াই সেকেণ্ড সময় লাগবে। পৃথিবী থেকে দূরত্ব যত বাড়বে, এই সময়ও ততই বেড়ে যাবে। চাঁদের দেশে বায়ুমণ্ডল নেই কাজেই সাধারণভাবে কথাবার্তা অচল। চারিদিক নিস্তব্ধ। এখানে কথাবার্তা বলতে হবে বেতার প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে।

চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে পরস্পরের মাধ্যাকর্ষণ এলাকা



চাঁদে যাওয়ার চেষ্টা

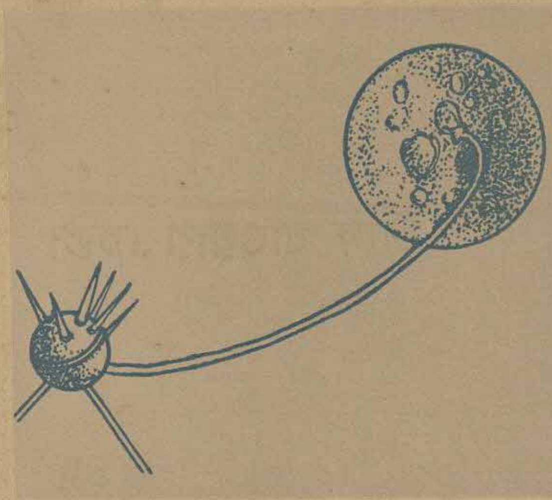
এটা সহজেই অনুমান করা চলে যে, মহাশূন্যে মানুষের প্রথম গন্তব্যস্থান হবে চাঁদ। কারণ চাঁদই হল মহাশূন্যে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা কাছে যখন থাকে তখন পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ২,২১,৪৬৩ মাইল এবং সর্বাপেক্ষা দূরে যখন থাকে তখন দূরত্ব হয় ২,৫২,৭১০ মাইল। পৃথিবী এবং চাঁদের গড় দূরত্ব হচ্ছে ২,৩৮,৮৫৭ মাইল।

আমরা জানি চাঁদে পৌঁছতে হলে আমাদের রকেটের গতিবেগ হওয়া দরকার ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল তা না হলে পৃথিবীর টান ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। এজন্যে তৈরী হবে বহু-পর্যায় বিশিষ্ট রকেট। তবে চাঁদে পাড়ি দেওয়ার আগে স্পেস-স্টেশন তৈরী করা হলে অনেক মুস্কিলই আসান হয়ে যাবে।

এ সবই আজও পরিকল্পনার স্তরে থাকলেও, সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় এই মহাকাশের যুগ ক্রমশঃ বাস্তব রূপ নিচ্ছে।

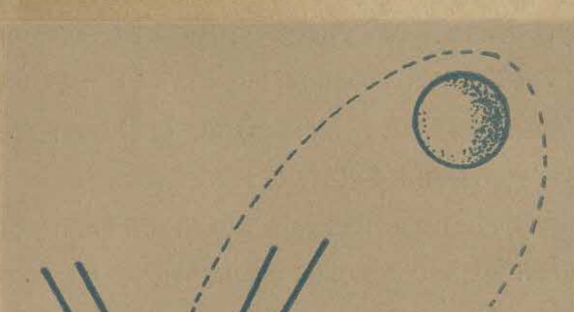
চাঁদে রকেট পাঠানো সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের নির্দিষ্ট বাস্তব পরিকল্পনা আছে। প্রথম ধাপে কয়েকটি অনুসন্ধানী রকেট চাঁদে অবতরণ করবে। এ ব্যাপারে সাফল্য ইতোমধ্যেই এসেছে।

প্রথম যে রকেট পৃথিবীর টান ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়, সেটি হল রাশিয়ার এক নম্বর লুনিক। ১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারী এই রকেট রওনা হয়। কিন্তু রকেটটি চাঁদকেও অতিক্রম করে চলে যায় অতল মহাশূন্যে যেখানে রকেটটি হয়ে উঠেছে সৌরমণ্ডলের একটি নতুন গ্রহ। এটি হল প্রথম কৃত্রিম গ্রহ।



রাশিয়ার দু নম্বর লুনিক সরাসরি চাঁদে আঘাত করে

প্রথম চাঁদে পৌঁছানোর কৃতিত্ব রাশিয়ার দু নম্বর লুনিকের। ১৯৫৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর রওনা হয়ে ১৪ই সেপ্টেম্বর দু নম্বর লুনিক সরাসরি চাঁদে আঘাত করে। এরপর চাঁদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে রাশিয়ার তিন নম্বর লুনিক ১৯৫৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর। এটি চাঁদের অপর দিক দিয়ে পাক খেয়ে পৃথিবীর দিকে ফিরে এসেছে ও চাঁদের অপর দিকের ফটো তুলে পৃথিবীতে পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। তিন নম্বর লুনিকের এই সাফল্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।



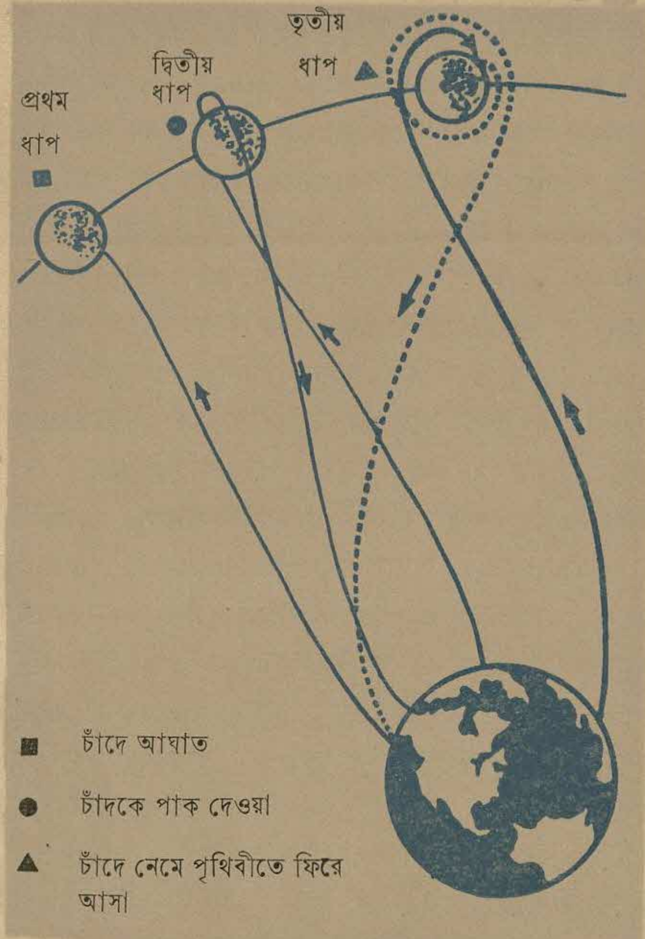
তিন নম্বর লুনিকের চাঁদ পরিক্রমা

পরীক্ষামূলক অভিযানের এই পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রেরণ করে রেঞ্জার উপগ্রহগুলি। চাঁদ এবং আন্তর্গ্রহ অভিযানের সময় রেঞ্জার কর্তৃক প্রেরিত তথ্যগুলি কাজে লাগবে। ১৯৬২ সালের ২৩শে এপ্রিল রেঞ্জার ৪ চাঁদে পৌঁছায়।

চন্দ্র-অভিযান-পরিকল্পনার পরের ধাপে, রকেট চাঁদের উপগ্রহ হয়ে পাক খাবে ও ধীরে ধীরে চাঁদের মাটিতে নেমে আসবে। এই রকেটের মধ্যে থাকবে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, যা চাঁদ ও মহাকাশ সম্পর্কে খবরাখবর বেতারযোগে পৃথিবীতে পাঠাবে। এই পর্যায়ের অভিযানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সার্ভেয়ার ১ ১৯৬৬ সালের ২রা জুন নিরাপদে চাঁদে অবতরণ করে। চাঁদে পৌঁছতে সার্ভেয়ারের সময় লেগেছিল ৬৩.৫ ঘণ্টা। গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৯,৬০০ মাইল। চাঁদে পৌঁছবার ৪০ মিনিটের মধ্যেই সার্ভেয়ার চাঁদের ছবি পাঠাতে শুরু করে। প্রথম চব্বিশ ঘণ্টায় সার্ভেয়ার ১৪৩টি ছবি পাঠায়। সার্ভেয়ার ৪৪ দিন "জীবন্ত" ছিল। এর মধ্যে সে ১১,১৫০টি ছবি পাঠায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীর হিসাবে পনেরো দিন যখন চাঁদে রাত্রি ছিল তখন চাঁদের আকাশে সূর্যের অনুপস্থিতির জন্যে সার্ভেয়ারে স্থাপিত সৌর ব্যাটারী কাজ করতে পারে নি সেইজন্যে সার্ভেয়ার কোন ছবি পাঠায় নি। পনেরো দিন পরে চাঁদের আকাশে আবার যখন সূর্য উঠল তখন সার্ভেয়ারও আবার ছবি পাঠাতে লাগল কারণ তখন সৌর ব্যাটারীগুলি আবার কাজ করতে শুরু করেছে। রাশিয়ার লুনিক ৯ অবশ্য এর আগেই চাঁদে নিরাপদে অবতরণ করেছিল।

এই ধরনের অনেকগুলি অনুসন্ধানী রকেট চাঁদে যাবে। শেষ ধাপে, একটি যাত্রীবিহীন রকেটকে চাঁদে পাঠিয়ে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হবে। তারপর কোন এক শুভক্ষণে মানুষ পাড়ি দেবে চাঁদের অভিমুখে।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হিসাব-নিকাশ করে মার্কিন বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করেছেন যে, অভিযাত্রী নিয়ে মূল মহাকাশযানটিকে চাঁদে নামানোর কোন প্রয়োজন নেই। যে রকেট এই মহাকাশযানটিকে উৎক্ষেপ করবে তার যা শক্তি তাতে সরাসরি মহাকাশযানটিকে চাঁদের চারিপাশে পাক খাওয়ানোর জন্যে কক্ষপথে স্থাপন করা সম্ভব হবে। এবং তখন এই মূল মহাকাশযান থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি মহাকাশযান দুজন অভিযাত্রীকে নিয়ে চাঁদে অবতরণ করবে। দ্বিতীয় এই ছোট মহাকাশযানের পক্ষে চাঁদে



চন্দ্র অভিযানের তিন পর্যায়

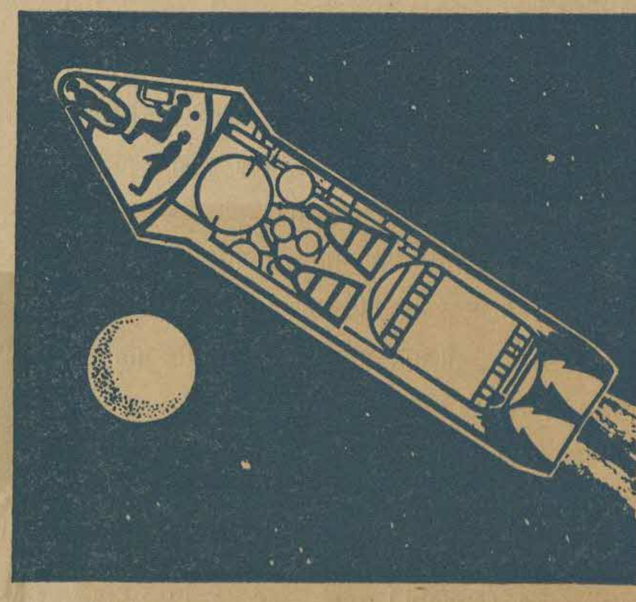
অবতরণ করে আবার উঠে এসে মূল মহাকাশযানটির সঙ্গে মিলিত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ।

এই পরিকল্পনাটি বৈজ্ঞানিকদের কাছে অনেক বাস্তব বলে মনে হয়েছে। কারণ এতে নতুন করে জ্বালানি নেবার হাঙ্গামা নেই। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যেখানে শূন্যের নীচে সেখানে এক মহাকাশযান থেকে আর এক মহাকাশযানে জ্বালানি স্থানান্তর করা বিপজ্জনক। কারণ সেখানে তো জ্বালানি ঢেলে দিলে চলবে না, পাম্প করে পাঠাতে হবে। এর জন্যে চাই বৈদ্যুতিক শক্তি যা আবার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেলতে পারে। তাছাড়া দ্বিতীয় মহাকাশযানটি ছোট হওয়ায় চাঁদের খুব কাছ দিয়ে এটি পাক খেতে পারবে এবং অভিযাত্রীদ্বয়ের পক্ষে অবতরণের জন্যে নিরাপদ স্থান নির্বাচন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

চাঁদে পাড়ি

চাঁদে যাঁদের পাঠানো হবে তাঁদের একটি দল তৈরী করে ইতোমধ্যেই কঠোর ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। কোন সেই তিনজন ভাগ্যবান যাঁরা প্রথম চাঁদের অভিমুখে পাড়ি দেবেন, তা ঠিক হবে শেষ মুহূর্তে। হয়ত নির্বাচন করতে হবে লটারির সাহায্যে ; কারণ সবাই সমান যোগ্য।

এর মধ্যে আমরা একবার ভবিষ্যৎ অভিযানটা দেখে নিতে পারি……



পরিকল্পিত মহাকাশযান

দৈত্যের মত বিশাল এক রকেট সমগ্র দৃশ্যটিকে আড়াল করে রেখেছে। সাদা পরিচ্ছদে সজ্জিত কর্মীরা কর্মব্যস্ত।

একটি গাড়ী এলো। তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন তিনজন অভিযাত্রী। চাঁদে অভিযান করবার জন্যে বিশেষভাবে তৈয়ারী পোষাকে তাঁরা সজ্জিত। রকেটের

পাশেই রয়েছে লিফ্‌ট্‌। তার মধ্যে তাঁরা গিয়ে ঢুকলেন। লিফ্‌ট্‌ তরতর করে ওপরে উঠে গেল। তাঁরা এসে পোঁছলেন মূল মহাকাশযানে। একে একে তাঁরা তার ভিতরে ঢুকলেন।

প্রজ্বলন। রকেটে প্রাণ সঞ্চার হল। আগুন এবং ধোঁয়া। রকেট ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল। তারপর আরও জোরে। আরও জোরে।

মহাকাশযানের ভিতরে অভিযাত্রীরা তখন তাঁদের আসনে শুয়ে। পৃথিবীর তুলনায় তাঁদের ওপর "জি" শক্তির প্রভাব তখন সাড়ে চার গুণ বেশী।

ঠিক আড়াই মিনিটে প্রথম পর্যায় পুড়ে শেষ হয়ে—তার জ্বালানি শেষ হয়ে গেছে—খসে পড়ে গেল। হাইড্রোজেন-জ্বালানি সমন্বিত দ্বিতীয় পর্যায় তার কাজ শুরু করল। এই মুহূর্তে "জি" শক্তি হঠাৎ কমে একেবারে স্বাভাবিক অবস্থার থেকেও নীচে নেমে গেল; কিছুক্ষণ পর রকেটে আবার গতি সঞ্চারিত হলে আবার তা বাড়ল। ঠিক সাড়ে ছয় মিনিট পরে এই পর্যায়টিও পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। সেটি আলাদা হয়ে গেল এবং তৃতীয় পর্যায় তার কাজ শুরু করল। এর অল্পক্ষণ পরেই মহাকাশযানটি কক্ষে পৌঁছে গেল এবং ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। মহাকাশযানটি পৃথিবীকে পাক খেতে লাগল।

তারপরই তৃতীয় পর্যায় আবার প্রজ্বালিত হয়ে উঠল এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে মহাকাশযানটির গতিবেগ দাঁড়াল ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল—যে গতিবেগ না হলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

এই সময় একটি রকেটের সাহায্যে অভিযাত্রীরা মূল মহাকাশযানটিকে একেবারে ঘুরিয়ে দিলেন এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দ্বিতীয় মহাকাশযানটির মুখের সঙ্গে মূল মহাকাশযানটির মুখকে বেঁধে ফেললেন। এর পরই তৃতীয় পর্যায়টি খসে পড়ল। আবার অভিযাত্রীরা ঘুরে গেলেন এবং দ্বিতীয় মহাকাশযানটিকে মূল মহাকাশযানের মুখে বেঁধে চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন।

চাঁদের দেশে বায়ুমণ্ডল নেই বলে সর্বদাই অবাধে উল্কাপাত হচ্ছে। এগুলি যাতে মহাকাশযানের ভিতরে ঢুকে পড়ে বিপর্যয় সৃষ্টি না করতে পারে তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। সৌর তেজস্ক্রিয়তা থেকে রক্ষা পাবার জন্যেও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। অস্বাভাবিক সূর্যরশ্মি দেখা গেলে পৃথিবী থেকে সঙ্কেত যাবে এবং মহাকাশযাত্রীরা উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। হয় তাঁদের মহাকাশযানটিকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেবেন অথবা চাঁদের মাটিতে থাকলে আবার মহাকাশযানের ভিতর ঢুকে পড়বেন।

তৃতীয় দিনে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনুভূত হল এবং ফলে মহাকাশযানের গতিও বাড়ল। এবার আবার একটি সংকটময় মুহূর্ত এলো। মহাকাশযানটিকে আবার ঘুরিয়ে দেওয়া হল এবং প্রায় ছয় মিনিট ধরে ইঞ্জিন চালু রইল। এর ফলে মহাকাশযানটির গতি কমে গিয়ে দাঁড়াল ঘণ্টায় প্রায় ৫,২০০ মাইল এবং সেটি চাঁদের প্রায় ১০০ মাইল ওপরে কক্ষপথে চাঁদকে পাক দিতে থাকল।

এরপর দুজন অভিযাত্রী দ্বিতীয় মহাকাশযানটিতে প্রবেশ করলেন এবং তার যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখে নিলেন। তারপর সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তাঁরা তার রকেট ইঞ্জিন প্রজ্বালন করলেন। প্রায় আধ মিনিট জ্বলে সেটি দ্বিতীয় মহাকাশযানটিকে ডিম্বাকার কক্ষপথে চাঁদ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় বারো মাইল ওপরে স্থাপন করল। মহাকাশযানটি আবার ঘুরে গেল এবং তার ইঞ্জিন আবার যাত্রাপথের দিকে মুখ করে থাকল।

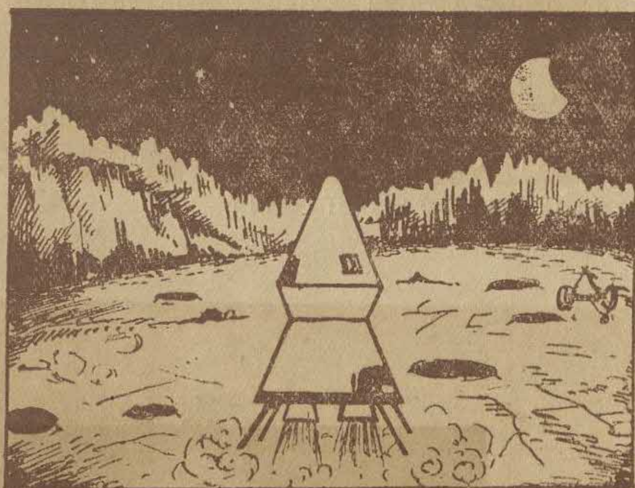
চাঁদের দেশে অনুসন্ধানী মহাকাশযান



মহাকাশযানের গতিবেগ ধীরে ধীরে কমে আসল এবং নীচের দিকে নামতে থাকল। ইঞ্জিনের শক্তি আবার কমিয়ে দেওয়া হল এবং মহাকাশযানটি চাঁদের মাটি থেকে প্রায় ৩০০ ফুট ওপরে পাক খেতে থাকল। মহাকাশযানের জানালা দিয়ে দেখে অভিযাত্রীদ্বয় অবতরণের জন্যে একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে নিলেন। এই সময় তাঁরা চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনুভব করবেন।

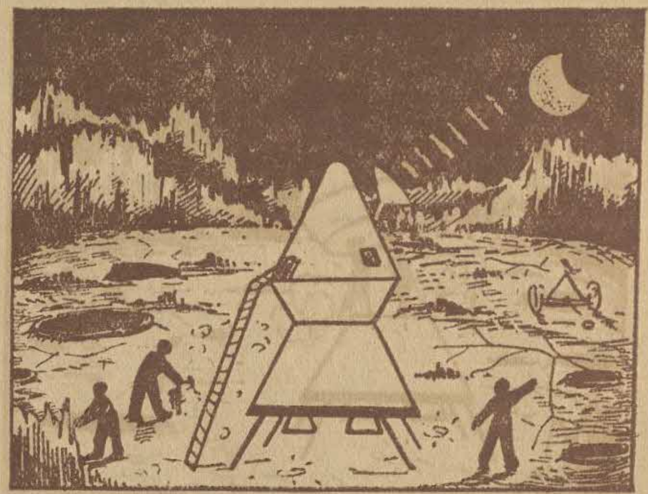
অবশেষে মহাকাশযান চাঁদে নেমে আসল।

এই সমস্তক্ষণ মূল মহাকাশযানটি তৃতীয় অভিযাত্রীকে নিয়ে মাথার ওপর কক্ষপথে পাক খাচ্ছে। যদি এর মধ্যে কোন মহাজাগতিক বিপদের আশঙ্কা দেখা দেয় তবে দ্বিতীয় মহাকাশযানটি তৎক্ষণাৎ ফিরে গিয়ে মূল মহাকাশযানটির সঙ্গে মিলিত হবে।



চাঁদে অবতরণ

অভিযাত্রীদ্বয় এবার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখলেন যে, তাঁদের মহাকাশযানটি ফিরে যেতে সক্ষম কিনা। যদি প্রয়োজন হয় তবে তাঁরা প্রয়োজনীয় মেরামতির কাজটি প্রথমে সেরে নেবেন। এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে তারপর একজন অভিযাত্রী বাইরে বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখার জন্যে আর একজন অভিযাত্রী মহাকাশযানের ভিতরেই থাকলেন।



চাঁদের পরিবেশ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ

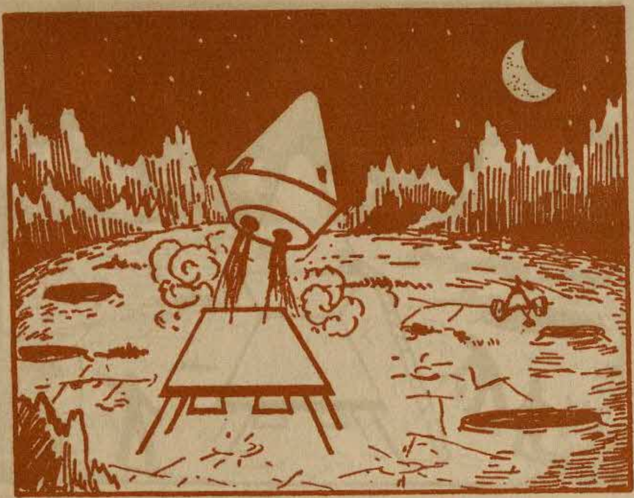
বাইরে বেরোবার আগে অভিযাত্রীরা পরীক্ষা করে নেবেন বাইরে কাছাকাছি তেজস্ক্রিয়তা কি রকম বা ওই এলাকায় উল্কাপাত হচ্ছে কি না।

অবস্থা অনুকূল ও নিরাপদ মনে হলে প্রথম অভিযাত্রী অক্সিজেন সরবরাহের সাজসরঞ্জাম, ক্যামেরা এবং ভৌগলিক পরীক্ষা করবার যন্ত্রপাতি নিয়ে চাঁদের মাটিতে পা দেবেন।

পর্যায়ক্রমে দুজন অভিযাত্রী চাঁদের মাটি থেকে নানারকম নমুনা সংগ্রহ করবেন এবং ফটো তুলবেন। নানারকম যন্ত্রপাতি স্থাপন করবেন যাতে তাঁরা চাঁদের দেশ ত্যাগ করার পরেও ওই সমস্ত যন্ত্র থেকে পৃথিবীতে সঙ্কেত যায়।

তারপর ফেরার পালা। মূল মহাকাশযানটিকে দিগন্তে দেখামাত্র তাঁরা নিজেদের মহাকাশযানটিকে চালু করলেন এবং উঠে গিয়ে মূল মহাকাশযানের সঙ্গে মিলিত হলেন। অবশেষে তাঁরা মূল মহাকাশযানে প্রবেশ করলেন। দ্বিতীয় মহাকাশযানটি যাত্রীহীন অবস্থায় চাঁদকে পাক দিতে থাকল।

ফিরতি পথের যাত্রা মোটামুটি এক ধরনের হলেও যাত্রার প্রারম্ভ অনেক সহজ। কারণ চাঁদের টান ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্যে প্রয়োজনীয় গতিবেগ মাত্র ঘণ্টায় ৫,২০০ মাইল। এই বেগে পৌঁছতে পারলেই মহাকাশযানটি চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের গণ্ডীর মধ্যে পৌঁছে যাবে। এরপর থেকে শুরু হবে পৃথিবীর টানে অবাধ অবতরণ। পৃথিবীর কাছাকাছি এসে মহাকাশযানটির গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল। এই প্রচণ্ড



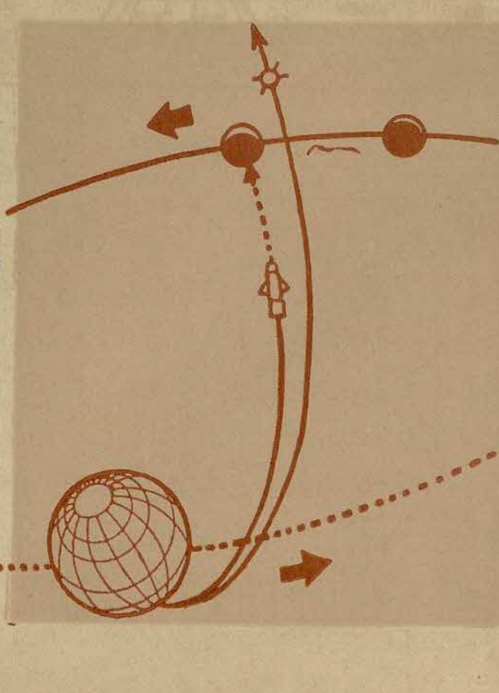
পৃথিবী অভিমুখে যাত্রা শুরু

গতিবেগে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করলে উল্কাপিণ্ডের মত পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সুতরাং মহাকাশযানটিকে নিরাপদে পৃথিবীতে নামিয়ে আনতে হলে গোড়ার কথাটা হবে বেগকে কমানো। সেটি সম্ভব হবে মহাকাশযানটির মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে ও আরেকটি রকেটকে চালু করে। এই রকেটের গতি বিপরীত দিকে বলে, বেগ অনেকটা কমে যাবে। এবার মহাকাশযানটির গতিপথকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হবে যে, সেটি পৃথিবীর চারিদিকে কৃত্রিম উপগ্রহের মত পাক খেতে থাকবে। বায়ুমণ্ডলের ছোঁয়ায় ক্রমশঃ বেগ কমে আসবে, ফলে মহাকাশযানটির কক্ষপথ ধীরে ধীরে পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসবে। শেষকালে মহাকাশযানটি প্যারাস্যুটের সাহায্যে ভাসতে ভাসতে সমুদ্রবক্ষে এসে পড়বে।

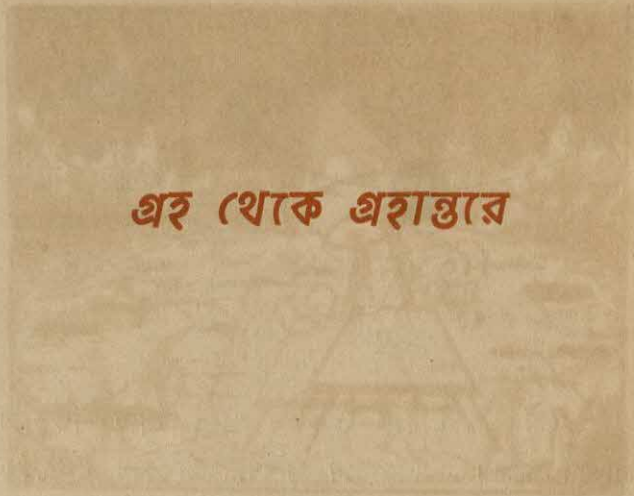
পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন



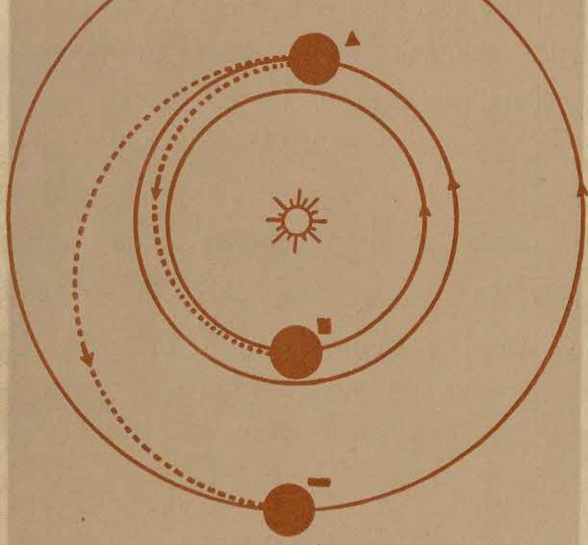
মানুষের চাঁদে অভিযান সফল হলে, বিজ্ঞানের দিক থেকে এক নতুন পথ উন্মুক্ত হবে। চাঁদ হবে মহাবিশ্ব সম্পর্কে গবেষণা চালাবার এক অপূর্ব জায়গা। গ্রহ, নক্ষত্র ও দূরের ছায়াপথ সম্পর্কে সূক্ষ্ম-পর্যবেক্ষণ করা যাবে চাঁদের মাটি থেকে। আকাশ-পর্যবেক্ষণ ছাড়াও সেখান থেকে পৃথিবী সম্পর্কে অনেক রহস্যের সমাধান পাওয়া যাবে। চাঁদকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। তাঁদের মতে চাঁদের মাটির তলা থেকে পাওয়া যাবে অজস্র খনিজ সম্পদ। অবারিত সূর্যের আলো থেকে তৈরী হবে বিদ্যুৎ। তৈরী হবে রাসায়নিক কারখানা। চাঁদ থেকে যাতায়াতের জন্যে রকেটের জ্বালানিও সেখানেই তৈরী হবে। শুধু তাই নয়—বিভিন্ন গ্রহে পাড়ি জমাবার জন্যে চাঁদ হবে একটি মধ্যবর্তী স্টেশন।



চাঁদ ও গ্রহান্তরে যাওয়ার গতিপথ



গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে



গ্রহান্তরে যাবার উড্ডয়নপথ

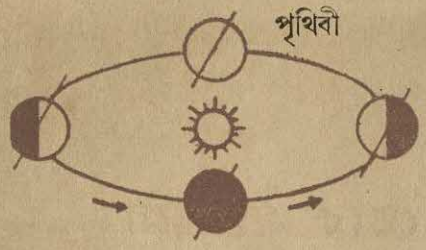
▲ পৃথিবী

■ শুক্র গ্রহ

▬ মঙ্গল গ্রহ

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, চাঁদে বার কয়েক যাতায়াত করতে পারলেই মঙ্গল ও শুক্র গ্রহে পাড়ি দেওয়াটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। সৌরজগতে শুক্র ও মঙ্গল হল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি গ্রহ। সুতরাং এরাই হবে প্রথম লক্ষ্য।

পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের গ্রহ শুক্র। এর দূরত্ব আড়াই কোটি মাইলেরও বেশী। সুতরাং গ্রহান্তরে অভিযান চালানোর কাছে চাঁদে অভিযান নেহাৎ-ই সহজ ব্যাপার। একটা লম্বা পথে পাড়ি দিতে হলে অনেকগুলি সমস্যার কথা চিন্তা করতে হবে। প্রথম হল সূর্যের টান— যে-বিপুল টানে ন'টি গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। শুক্র ও বুধ-এর কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের ভিতরের দিকে। সুতরাং এই দুটি গ্রহে যাবার রাস্তা সূর্যের টানের পক্ষে। আর মঙ্গল, বৃহস্পতি ইত্যাদি গ্রহে যাবার রাস্তা সূর্যের টানের বিপক্ষে।



কক্ষ-আবর্তন



অক্ষ-আবর্তন

এবার দেখা যাক শুক্র ও মঙ্গল গ্রহে কিভাবে যাওয়া সম্ভব। এ প্রসঙ্গে পৃথিবীর গতিবেগ সম্পর্কেও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। আমরা জানি পৃথিবীর ছ' ধরনের গতি আছে—কক্ষ-আবর্তন ও অক্ষ-আবর্তন। কক্ষ-আবর্তনের বেগ ঘণ্টায় ৬৬,৬০০ মাইল ও অক্ষ-আবর্তনের সর্বাপেক্ষা বেশী বেগ—বিষুব রেখার কাছে—ঘণ্টায় ১,০০০ মাইলের কিছু বেশি।

পৃথিবী ছাড়িয়ে যখন কোন ব্যোমযান মহাশূন্যে ছুট দেয় তখন এ ছুটি বেগও ব্যোমযানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। অর্থাৎ ব্যোমযানটি ঘণ্টায় ৬৭,৬০০ মাইল বেগে ছুটতে থাকে। এ অবস্থায় পৃথিবীর কোন টান থাকে না। ব্যোমযানটি বাঁধা পড়ে সূর্যের টানে।

যদি ব্যোমযানটির গতিবেগ পৃথিবীর সমান হয় তাহলে সেটি একই কক্ষপথে পৃথিবীর সাথে সূর্যের চারিদিকে পাক খেয়ে চলবে। যদি এর গতিবেগ পৃথিবীর চেয়ে বেশী হয় তাহলে ব্যোমযানটি সূর্য থেকে আরও দূরে সরে যাবে। আর গতিবেগ, পৃথিবীর কক্ষ আবর্তনের গতিবেগের চেয়ে কম হলে, ব্যোমযানটি সূর্যের টানে সূর্যের দিকে সরে আসবে।

শুক্র ও মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার পরিকল্পিত যাত্রাপথ ছবিতে দেখানো হয়েছে। শুক্র গ্রহে যাত্রা করতে হলে ব্যোমযানের গতিবেগ, পৃথিবীর কক্ষ-আবর্তনের গতিবেগের চেয়ে কম হওয়া দরকার আর মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার পথে ব্যোমযানের গতিবেগ, পৃথিবীর চেয়ে বেশী হওয়া দরকার।

বিজ্ঞানীদের অনুমানে শুক্র গ্রহে পৌঁছতে প্রায় ১৫০ দিন সময় লাগবে আর মঙ্গল গ্রহে ২৬০ দিন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যাত্রা করার সময় এমন নিখুঁত হিসাব করে বেরোতে হবে যেন গ্রহটি এক বিশেষ দিনে কক্ষপথের এক বিশেষ জায়গায় অবস্থান করে।

শুক্র গ্রহ পৃথিবীর এত কাছে থাকা সত্ত্বেও তার আসল চেহারাটা আজও জানা যায় নি। কেননা এই গ্রহটি সব সময়ে ঘন মেঘের স্তরে নিজেকে আড়াল করে রাখে। এত পুরু আর ঘন মেঘের অন্তরালে কি আছে তা সঠিক জানা সম্ভব হয় নি। একে আমরা প্রভাতের শুকতারা বলেই জানি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই গ্রহটি হচ্ছে এক মরুভূমির দেশ। জলের

গ্রহান্তরে যাত্রার সময় তালিকা

গন্তব্য স্থান	পৃথিবী থেকে মোটামুটি দূরত্ব (লক্ষ মাইলে)	সর্বাপেক্ষা কম যাত্রা-শুরুর বেগ (মাইল প্রতি ঘণ্টায়)	পৌঁছবার সময়	
			বছর	দিন
বুধ	৫৭০	৩০,০০০	—	১১০
শুক্র	২৫৭	২৬,০০০	—	১৫০
মঙ্গল	৪৮৭	২৬,০০০	—	২৬০
বৃহস্পতি	৩,৯০৩	৩১,০০০	২	২৭০
শনি	৭,৯৩১	৩৩,৪০০	৬	—
ইউরেনাস	১৬,৯০০	৩৪,৮০০	১৬	—
নেপচুন	২৭,০০০	৩৫,৫০০	৩১	—
প্লুটো	৩৫,৭৩৫	৩৬,২০০	৪৬	—

কোন অস্তিত্ব নেই। অসহ্য উত্তাপ। এর বায়ুমণ্ডল কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসে পূর্ণ। এ অবস্থায় প্রাণের কোন অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয় বলেই তাঁদের ধারণা।

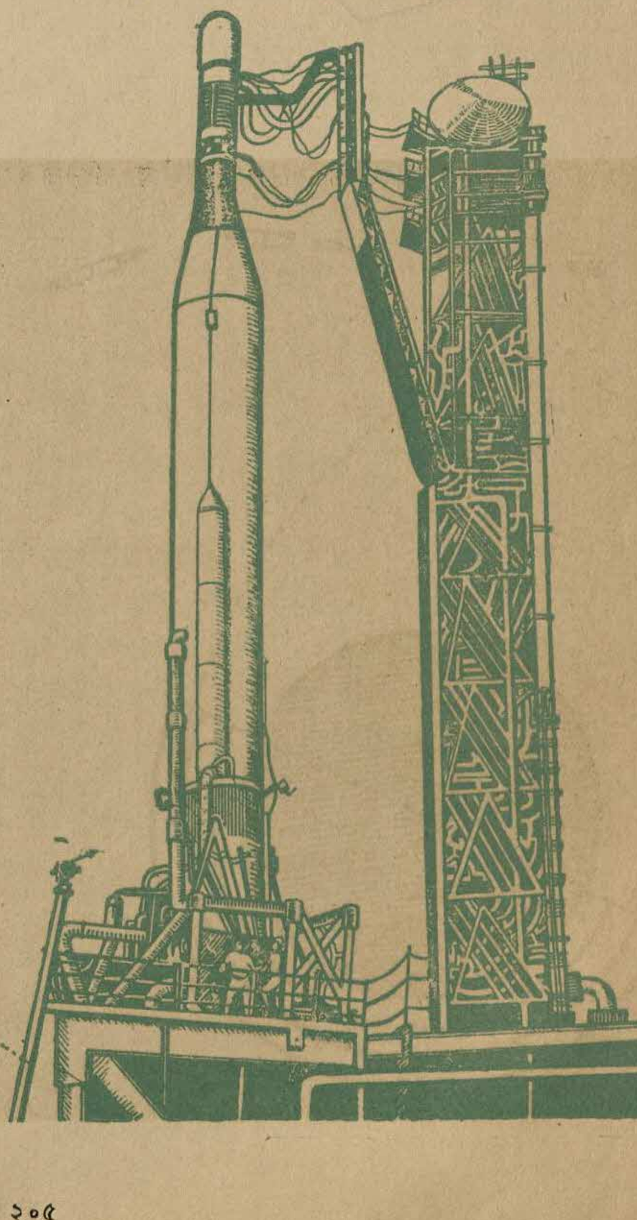
১৯৬০ সালের ১১ই মার্চ মার্কিন বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রেরিত পাইওনীয়ার ৫ মহাকাশযান পৃথিবী এবং শুক্র গ্রহের কক্ষপথের মধ্যবর্তী আন্তর্গ্রহ মহাকাশ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করে। এটি এখন কৃত্রিম গ্রহে পরিণত হয়েছে।

যথেষ্ট। শুক্র গ্রহের বায়ুমণ্ডল কার্বন ডাইঅক্সাইডে পূর্ণ। তাছাড়া শুক্র গ্রহের বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অপেক্ষা ১০ থেকে ৩০ গুণ বেশী ঘন। আরও জানা গেছে যে, শুক্র গ্রহের দিন এবং রাত্রি প্রত্যেকে পৃথিবীর হিসাবে ১১২½ দিন স্থায়ী হয় এবং সেখানে সূর্য পশ্চিম দিকে উদয় হয়ে পূর্ব দিকে অস্ত যায়। ১৯৬৩ সালের ৩রা জানুয়ারী মেরিনার ২-এর সঙ্গে পৃথিবীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।



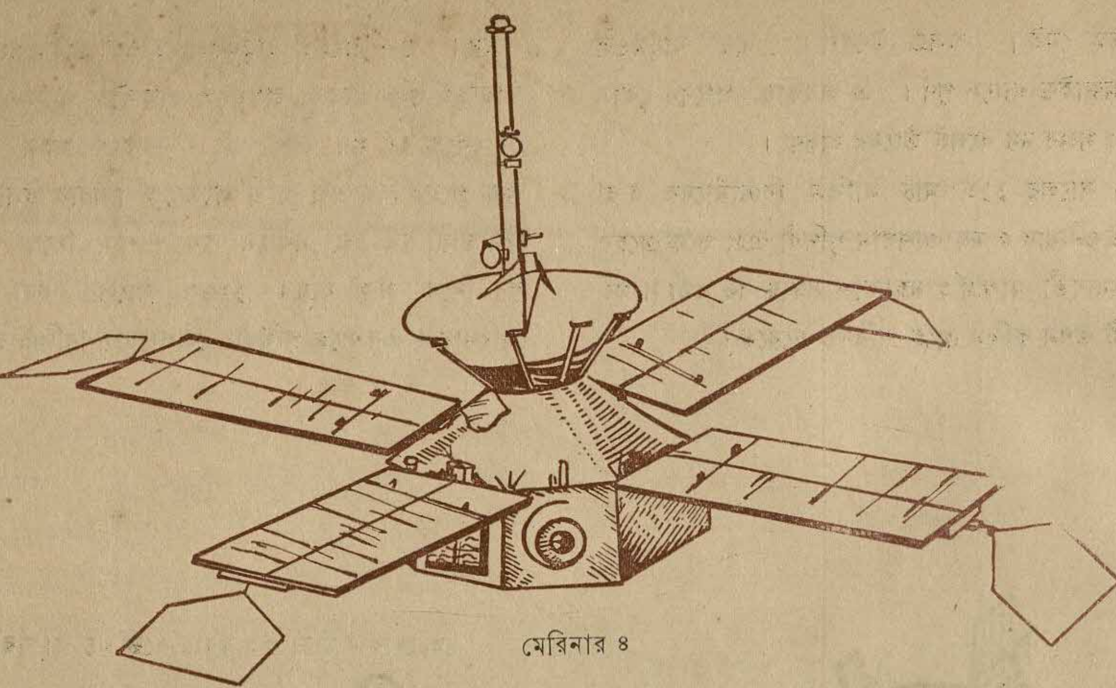
কৃত্রিম গ্রহ পাঁচ নম্বর পাইওনীয়ার

মেরিনার ৪ যাত্রা শুরু করার জন্যে অপেক্ষা করছে



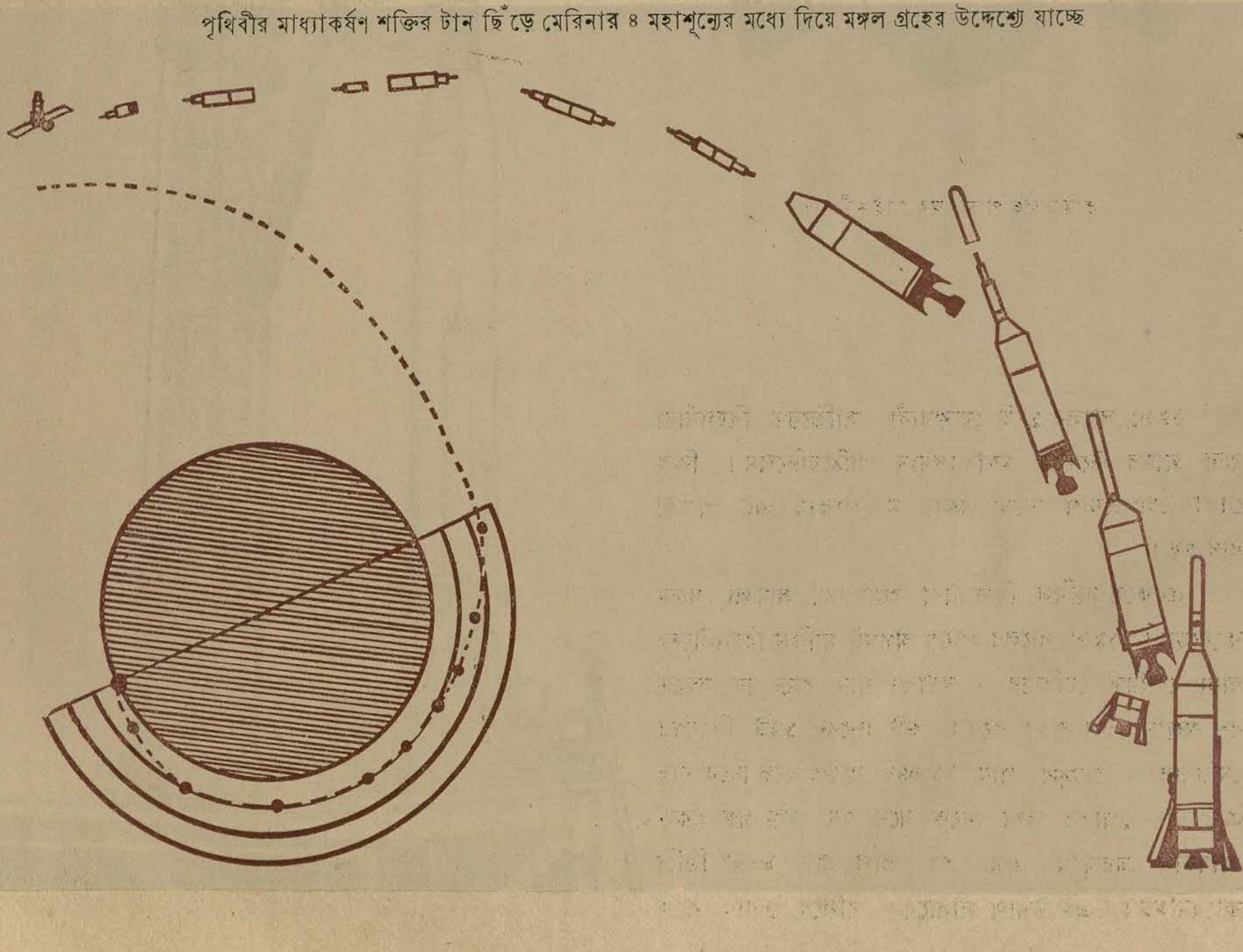
১৯৬১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা শুক্র গ্রহের উদ্দেশ্যে মহাকাশযান পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় না থাকায় এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

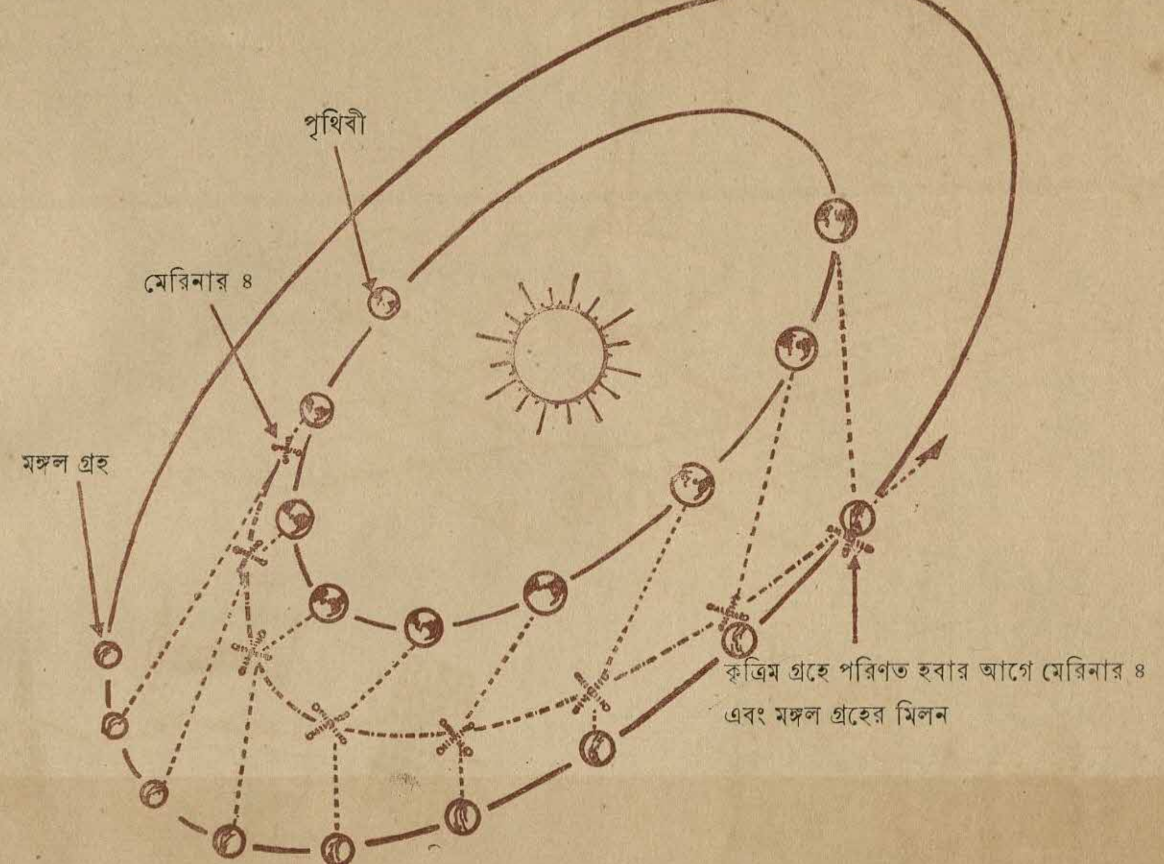
এক্ষেত্রে মার্কিন বিজ্ঞানীরা অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। ১৯৬২ সালের ২৭শে অগাস্ট মার্কিন বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রেরিত মেরিনার ২ মহাকাশযান শুক্র গ্রহ সম্বন্ধে বহু অজানা তথ্য সংগ্রহ করে। ওই বছরের ১৪ই ডিসেম্বর মেরিনার ২ শুক্রের প্রায় ২১,৬৪৮ মাইল কাছ দিয়ে যায় এবং তার প্রেরিত তথ্য থেকে মনে হয় শুক্র গ্রহ একটি প্রাণহীন মরুভূমি এবং এর তাপ প্রায় ৮০০° ডিগ্রি ফারেনহিট। এই উত্তাপ সীসাকেও গলিয়ে দেবার পক্ষে



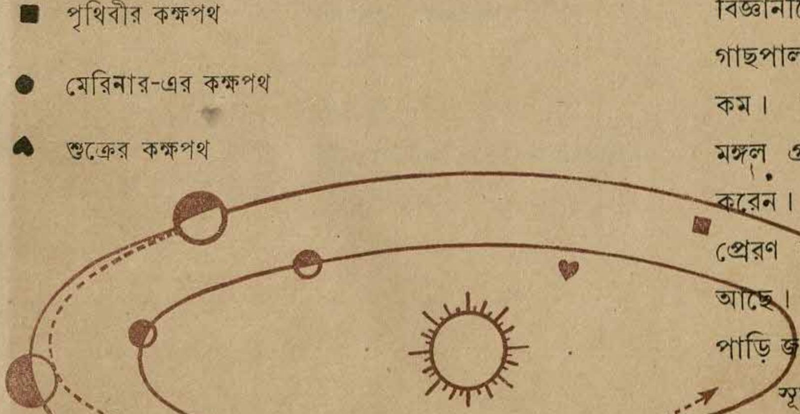
মেরিনার ৪

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান ছিঁড়ে মেরিনার ৪ মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে মঙ্গল গ্রহের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে





শুক্র গ্রহের দিকে মেরিনার মহাকাশযানের যাত্রাপথ



সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক গ্রহ হচ্ছে মঙ্গল। সৌর-জগতে এই একটি মাত্র গ্রহ যেখানে জীবনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। এই গ্রহে পৃথিবীর মতই ঋতু-পরিবর্তন ঘটে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় মঙ্গল গ্রহের মেরু-অঞ্চলের বরফের সাদা টুপি। এই গ্রহটি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অসীম কৌতূহল। এখানে বাতাস, জল ও গাছপালা আছে বলেই মনে হয়। তাপ অবশ্য অনেক কম। মার্কিন বিজ্ঞানীরা ১৯৬৪ সালের ২৮শে নভেম্বর মঙ্গল গ্রহের উদ্দেশ্যে মেরিনার ৪ মহাকাশযানটি প্রেরণ করেন। এই মহাকাশযানটি বহু মূল্যবান ছবি ও তথ্য প্রেরণ করেছে। মঙ্গল গ্রহের দুটি ছোট ছোট উপগ্রহ আছে। ভবিষ্যতে মঙ্গল গ্রহই হবে আরও দূরের গ্রহে পাড়ি জমাবার জন্যে একটি স্টেশন।

সুদূর মহাকাশে ভ্রমণের পথে অনেক বাধা বিপদ থাকবে এবং আছেও। অনেক বাধা দুরতিক্রম্যও মনে হবে—তবু নক্ষত্র-লোকের হাতছানি চিরকাল মানুষের হৃদয়কে দোলাবে।

সূচীপত্র

